REGISTERED No. C. 192.

ভারতী

OR

THE AGRICULTURIST.

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

শ্রীরামচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বৈশাখ
১৩২৭

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট শ্রীরাম প্রেসে,
শ্রীসারদাপ্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

"উৎসব"

হিন্দু ধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক-মূল্য ২৲
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম,এ,

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীগীতা—মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। মূল্য ১২৸০। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—আদর্শ নারীচরিত্র ও পতি-পরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য ১।০

৩। কৈকেয়ী—রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ।০

৪। ভারত সমর (১মখণ্ড)—মহাভারতের চরিত্রবিশ্লেষণ করিয়া লিখিত। মূল্য ৸০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—(তৃতীয় সংস্করণ) পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত—পতিব্রতা ধর্ম্মের জলন্ত ছবি ও সাধন-তত্ত্ব। মূল্য ।৵০

৬। গীতা-পরিচয়—শ্রীগীতা বুঝিতে হইলে ইহা আবশ্যক। মূল্য ১৲

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য স্বাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ—ভগবৎধ্যান ও স্তোত্রমালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০।
" বোর্ডে বাঁধাই ২৸০।
" কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৮। লীলা উপন্যাস ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
মূল্য—কাপ্তনে বাঁধাই ১।০।
" আবাঁধা ১৲

যদি সৌভাগ্যশালী

হইতে চান তবে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু লাভের উপায় সম্বলিত প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ আমাদের স্বাস্থ্য পুস্তকখানি পাঠ করুন। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় প্রেরিত হয়।

যোগ্যতমের চিরস্থায়িত্ব।

অধিক ঔষধ বিজ্ঞাপিত হইবে কি না প্রশ্ন ইহা নয়। বহু ঔষধ বিজ্ঞাপিত হইবেই। বর্ত্তমান উহা চায়। ধীরে এবং অসম্পূর্ণ ফলপ্রদ ঔষধ সমূহ দ্বারা গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট হইবেন কি?—না।

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকার

ন্যায় নিশ্চিত এবং ত্বরিত ফলপ্রদ ঔষধ সমূহ একবার পরিক্ষা করিয়া দেখিবেন ইহাই প্রশ্ন।

৩২ বটীকার এক কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

কবিরাজ—মণিশঙ্করগোবিন্দজি শাস্ত্রি।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা ঔষধালয়—

১৯৩।১ নং বড়বাজার কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,

ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

গ্রীষ্মকালের সব্জী ও ফুলবীজ—দেশী সব্জী বেগুন, ঢেঁড়স, লঙ্কা, মূলা, শশা, ঝিঙ্গে, টমাটো, বরবটি, পালমশাক, ডেঙ্গো প্রভৃতি ১৮ রকমে ১ প্যাক ১৸০; ফুলবীজ আমারান্থস, বালসাম, গ্লোব আমারান্থ, সনফ্লাউয়ার গাদা, জিনিয়া সেলোসিয়া, আইপোমিয়া, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ১০ রকম ফুলবীজ ১৸০;

নাবী নূতন আমদানী—ফুলকপি পাটনাই তোলা ৷৷০ আট আনা, সালগম তোলা ।০ চারি আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩২৭ সাল। | ১ম সংখ্যা

রবার rubber.

(পুনরাবৃত্তি)

বৃক্ষের ত্বকেই রবারক্ষীর পাওয়া যায়, "Bark is the mother of rubber" ত্বকের গভীর অভ্যন্তরভাগে ক্ষীরনিঃস্রবী নাড়ীসকল বিদ্যমান আছে, এই অংশ যত গভীর ক্ষত করা যাইবে ততই অধিক পরিমাণে ক্ষীর নির্গত হইবে। কাণ্ডমধ্যস্থ কাষ্ঠের উপরিভাগ এবং ত্বকের অভ্যন্তরভাগ এই উভয়ের সন্ধিস্থলে ক্যাম্বিয়াম্ (Cambium) নামক একটী স্তর বা ঝিল্লীদ্বারা রস উর্দ্ধাধঃ প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষের পোষণ এবং কাষ্ঠ ও ত্বক্‌ভাগের বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ত্বকের অভ্যন্তরভাগ বিশেষতঃ এই ক্যাম্বিয়াম্‌স্তর অবিচ্ছিন্নভাবে ও অনিয়মিতরূপে ঘন ঘন আহত হইলে বৃক্ষের ক্ষতনাশিনী (আরোগ্যকারী) শক্তি লোপ পায়। ত্বকের উপরিভাগ অত্যন্ত ক্ষত বক্ষত হইলেও যদি ক্যাম্বিয়ম্ স্তর অস্পৃষ্ট থাকে তাহা হইলে ত্বক্ শীঘ্রই পুনর্গঠিত হইতে পারে। ক্ষীর নিঃস্রবে বৃক্ষের যত অধিক ক্ষতি না হউক ত্বক্‌ভাগের অনিয়মিত ছেদনবেধনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হয়, এজন্য যাহাতে ত্বক্ অত্যন্ত গভীর ছিন্ন না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সকল জাতীয় রবার বৃক্ষের ক্ষীরনিঃস্রবী নাড়ীর সন্নিবেশ, আকৃতি ও গঠনপ্রণালী সমান নহে এবং একবিধ উপায়ে ইহাদের সকলের

ক্ষীর বাহির করিলে উৎপন্ন ক্ষীরের পরিমাণের অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে ; এজন্য বিবিধ বৃক্ষ হইতে বিবিধ উপায়ে ক্ষীর বাহির করাই বৈজ্ঞানিকদিগের মত। *

বৃক্ষের সমগ্র ত্বক্‌ভাগ ছেদন করিয়া ক্ষীর বাহির করিলে বৃক্ষ শীঘ্রই মৃত হয় ; এজন্য ত্বকের অর্দ্ধ বা চতুর্থ অংশ ক্রমে ক্রমে ক্ষত করিয়া ক্ষীর বাহির করাই নিয়ম প্রতিবৎসর ত্বক্‌ভাগ ক্রমে ক্রমে ছেদিত হওয়ায় একভাগ যেমন ক্ষতযুক্ত হয় অপরভাগ সেইরূপ পুনর্গঠিত হইতে থাকে, সুতরাং ত্বকের আংশিক বিলোপে বৃক্ষের কোন হানি হয় না ; অধিকন্তু বহুকাল যাবৎ এক একটী বৃক্ষ হইতে ক্ষীর বাহির হইতে পারে। অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত ত্বক্‌ভাগ পুনর্গঠিত হইতে দুইবৎসরেরও উপর সময় লাগে, এ নিমিত্ত প্রতি তিন বৎসর অন্তর নূতন ত্বক্ জন্মিলে কাটাই বিধেয়। যদি আংশিক বা অল্প-পরিমাণে ক্ষত করা যায়, তাহা হইলে এক বা দুইবৎসর অন্তর কাটিলে কোন ক্ষতি হয় না ; বস্তুতঃ ত্বক্‌ভাগ যতদিন না সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয় ততদিন না কাটাই শ্রেয়ঃ। ব্যয় সংক্ষেপ ও কার্য্য সৌকর্য্যার্থ কোন কোন বাগিচার বৃক্ষাদি উত্তর দক্ষিণাদি দিকক্রমে বিভক্তকরতঃ প্রতিবৎসর দুই দুই দিক্ হিসাবে বৃক্ষ কাটা হইয়া থাকে, ইহাতে বৃক্ষগুলি ১বৎসর বিশ্রাম পায়। অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রবার প্রাপ্তির আবশ্যক হইলে কোথাও কোথাও এক একদিকের বৃক্ষগুলির সমগ্র ত্বক্ গভীরভাবে ক্ষত করা হইয়া থাকে ; ইহাতে প্রত্যেক বৃক্ষেরত্বক্ পুনর্গঠিত হইবার জন্য চারি-বৎসরকাল অবকাশ পায়। প্রচুর বৃক্ষপূর্ণ কোন কোন সুবৃহৎ বাগিচায় প্রত্যেক বৃক্ষের ত্বক্ দীর্ঘে চারিভাগে বিভক্তকরতঃ প্রতিভাগ প্রতি বৎসর কাটা হইয়া থাকে, ইহাতে বৃক্ষের সম্পূর্ণ ত্বক্‌ভাগ ছেদিত হইতে চারি বৎসর সময় লাগে, সুতরাং পঞ্চম-বৎসরে বিশ্রাম না দিয়া পুনরায় নূতনত্বক্ ছেদন করিবার সুবিধা হয়। অধুনা এই পন্থা সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে কারণ অল্পে অল্পে ক্ষত করায় সম্পূর্ণ ত্বক্‌ছেদনের

* এবিষয়ে প্রাচীন সৌশ্রুতীয় মতটীও উদ্ধৃত হইল,—
যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা—
শরীরেষু তথা নৃণাং শুক্রং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ।
দুগ্ধে যে প্রকার ঘৃত বা ইক্ষুরসে যে প্রকার গুড় বর্ত্তমান আছে, মানবদেহেও সেইরূপ দুই প্রকারে শুক্রের অবস্থান ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ কাহারও শুক্র গোদুগ্ধ হইতে নবনীত ও ঘৃত উৎপত্তির মত সহজে ও শীঘ্র বা কাহারও ইক্ষুদণ্ডের পীড়নের পশ্চাৎ রসজ্বালন ও ঘনীকরণের পর গুড়ের উৎপত্তির ন্যায় বিলম্বে শুক্রের উৎপত্তি ও স্খলন হইয়া থাকে। যেরূপ মানবের প্রকৃতি ও শুক্র তাহা নাড়ী সকলের গঠন বৈচিত্র্যবশতঃ ইহা ঘটে সম্ভবতঃ বৃক্ষগণের ক্ষীরবহা নাড়ী সকলের পরস্পর গঠন বৈচিত্র্যবশতঃই এরূপ ঘটিয়া থাকে।

আবশ্যক হয় না, অথচ এক একটী বৃক্ষ আজীবনকাল অবিশ্রামে রবার প্রদান করিতে পারে।

মাত্র ত্বক্ বিদ্ধ করিয়া বা খর্জ্জুরের রস নিষ্কাশনবৎ ক্রমে ক্রমে চাঁচিয়া হিভয়ার ক্ষীর বাহির করাই নিয়ম। ক্রূরবৎ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, বা খর্জ্জুরেরমত সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধভাগে বা "V", প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আকারে কাটিয়া ক্ষীর বাহির করা হইয়া থাকে। ত্বক্‌ভাগ একেবারে উঠাইয়া দিলে পাছে বৃক্ষটী মরিয়া যায়, এজন্য ১ ফুট, ৬ বা ৩ ইঞ্চ অন্তর ত্বকের কিছু কিছু অংশ ভবিষ্যতের বর্দ্ধনের নিমিত্ত রাখা গয়। ক্ষীর নিষ্কাশনের জন্য এইসকল পন্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। ক্রূরমতন ঘুরাইয়া ত্বক্‌ভাগ কাটিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণ ক্ষীর বাহির হয়, কারণ ইহাতে সমস্ত ত্বক্‌ই ছিন্ন হইয়া যায় ; খর্জ্জুরবৃক্ষের মত থাকে থাকে কাটিলে অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষীর পাওয়া যায়। ক্ষতের নিম্নভাগে কোন টীন, কাষ্ঠ, মৃৎভাণ্ড বা অন্য কোনপ্রকার পাত্র রাখিয়া ক্ষীর সংগৃহীত হইয়া থাকে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা বা আসামের লোকেরা এত বৈজ্ঞানিকতার ধার ধারে না ; তাহারা গুরুভার কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত করিয়া ক্ষীরসংগ্রহ করে এবং কিছুকাল বৃক্ষকে বিশ্রাম দেয়। ত্বক্‌ভাগ পুনর্গঠিত হইলে আবার ঐ উপায়েই ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাতে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ বৈজ্ঞানিক উপায়লব্ধ অপেক্ষা কোনক্রমে অল্প হয় না, অথচ বৃক্ষটী শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ সতেজ হইয়া উঠে। কোথাও কোথাও বৃক্ষটী একেবারে ছেদন করিয়া কাণ্ডের ত্বক্‌ভাগ মধ্যে মধ্যে অঙ্গুরীয়বৎ গোলভাবে কর্ত্তন করিয়া অধঃস্থিত কোন পাত্রে সেই ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া থাকে ; এই দ্বিবিধ আদিম উপায়েই রবারক্ষীর সংগৃহীত হয়। শেষোক্ত পন্থায় বৃক্ষটী একেবারে নষ্ট হয়, এজন্য প্রথমোক্ত পন্থাই সবিশেষ প্রশংসনীয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সকলজাতীয় রবাররক্ষের ক্ষীরবহা নাড়ীসকলের আকৃতি ও গঠন-প্রণালী সমান নহে, যে পন্থায় হিভিয়া হইতে ক্ষীর নিঃসৃত হইতে পারে হয়ত ল্যাণ্ডল্‌ফিয়া, ফাইকাস বা ফাণ্টুমিয়ার পক্ষে তাহা অনুপযোগী, এই সকল অসুবিধা থাকায় অনেকে আদিমপন্থায় ক্ষীর নিঃসারণের পক্ষপাতী। স্থূলকথা বৃক্ষের মূলদেশ হইতে ৪ হস্ত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে ত্বকের গভীর প্রদেশ অযথারূপে ক্ষতবিক্ষত না করিয়া প্রত্যহ অল্পে অল্পে চাচিয়া বা বিদ্ধ করিয়া ক্ষীর বাহির করিতে পারিলে বৃক্ষের কোন অনিষ্ট হয় না।

সকল জাতীয় বৃক্ষের ক্ষীর একই উপায় গাঢ়ীভূত হয় না এবং গাঢ় হইলেও অনেক সময় তাহাতে জল থাকিয়া যায়, জল অধিক থাকিলে রবার কিছু অসংহত অর্থাৎ নরম ধাতুর হয়। জল যত অল্প থাকিবে রবার ততই কঠিন ও স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট হইবে। এইরূপে গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত নির্য্যাসের অবশিষ্ট জলভাগ নানাবিধ কৌশলে ও যন্ত্রযোগে চাপ

দিয়া নিঃসারণকরতঃ বিবিধ ছাঁচ অনুযায়ী আকারে রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন জাতীয় ক্ষীর বাতসংস্পর্শে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়; কোনটী বা পাত্রে সিদ্ধ, অগ্নিসন্তপ্ত বা সূর্য্যপক্বকরতঃ জলভাগ উড়াইয়া (evaporate) না দিলে জমে না; কোন্ কোন জাতীয় ক্ষীর অম্ল, সুরাসারাদি (Alcohol) সংযোগে ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। সদ্যক্ষত নির্গত হিভিয়ার ক্ষীর বাতসংস্পর্শে শীঘ্রই ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়; অল্পপরিমাণ এ্যাসিটিক এ্যাসিড (Acetic Acid) বা ক্রিয়োসোট (Creosote) বা উভয়ের যুগপৎ সংমিশ্রণে হিভিয়ার ক্ষীর উত্তম রবারে পরিণত হয়। রবারক্ষীরে ক্রিয়োসোট সহসা মিশ্রিত হয়না এজন্য ১ভাগ ক্রিয়োসোট ও ১০ভাগ সুরাসার (Alcohol) মিশ্রিত করতঃ তাহাই অল্পপরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। কেহ কেহ পাইরোলিগ্নাস এ্যাসিড (Pyrolignus acid) ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন; ইহা এ্যাসেটিক এসিডেরই প্রভেদবিশেষ। কোথাও পাত্রের মধ্যে ক্ষীর রাখিয়া একটী কাষ্ঠদণ্ড তন্মধ্যে নিমজ্জিতকরতঃ দণ্ডটী সধূম অগ্নির উপর আবর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষীর জমিয়া যাইলে পর পুনরায় উক্ত ক্ষীরপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া অগ্নির উপর ঘুরাইতে থাকে এবং যতক্ষণ না রবার ইচ্ছানুযায়ী স্থূলাকার প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ এই প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। আমেরিকায় সংগ্রহপাত্রের তলদেশে কিছু শুষ্কমৃত্তিকা রাখিয়া পাত্রটী ক্ষীরসঞ্চারমুখে রাখিয়া দেয়, ইহাতে জলভাগ শীঘ্রই শোষিত হইয়া যায়, যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে উহা দৃঢ়তর উৎকৃষ্ট রবারে পরিণত হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই দুই শেষোক্ত উপায়ে রবার প্রস্তুত করে এবং বাজারে সাধারণতঃ এই রবারই বিক্রয় হইয়া থাকে। আমেরিকায় ইউরোপীয় রবার কারকেরা সংগৃহীত ক্ষীরে কিছু ক্রিয়োসোট মিশাইয়া অগ্নি বা সূর্য্যোত্তাপে জলভাগ উড়াইয়া দিয়া অতি উৎকৃষ্ট রবার প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

কোন কোন জাতীয় ক্ষীর শীঘ্রই গাঢ়ীভূত হয়, আবার কোন কোনটী কতিপয় দিবস অতিবাহিত না হইলে গাঢ় হয় না। ক্ষীরমাত্রই অম্ল বা ক্ষাররসবিশিষ্ট বা উভয়রসবিহীন হইয়া থাকে, অথচ যতক্ষণ না ক্ষীর অম্লত্বে পরিণত হয় ততক্ষণ উহা ঘনীভূত হয় না; এজন্য বিবিধউপায়ে ও দ্রব্যান্তর সংযোগে রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল ক্ষীর কিয়ৎকাল বায়ুসংস্পর্শে থাকিলে পচিয়া উঠে বা প্রয়োজনবশতঃ যাহাকে অধিকক্ষণ তরল রাখা আবশ্যক, তাহাতে সামান্য পরিমাণ আমোনিয়া (Liqr, Ammonia) বা ফরম্যালীন (Formalin) সংযোগ করিলে তাহা তরল অবস্থায় থাকে পচে না।

কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি বা কাহারও ক্ষীরবহা নাড়ী সকল এরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতিযুক্ত যে উল্লিখিত উপায় সমূহদ্বারা তাহাদের রবার নিষ্কাশন করা দুরূহ, এজন্য উহাদিগকে কুট্টিত ও জলে সিদ্ধ করিয়া নানাবিধ যন্ত্রযোগে চাপ প্রদান করিয়া রবার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

পঞ্চমবৎসরে হিভিয়া হইতে গাছপ্রতি অর্দ্ধসের শুষ্ক রবার পাওয়া যায়। রবারের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য। বাজারে সাধারণতঃ ক্রেপ (Crepe), চাদর (Sheet), বিস্কুট (Biscuit), পিণ্ড (Ball), চতুরস্র (Square) এই কয় আকারের প্যারারবার (Para rubber) দৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টভেদে এই রবার পাউণ্ডপ্রতি ৩ হইতে ৫॥ শিলিং পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। অধুনা ব্রেজিলের জঙ্গল হইতেই অধিকাংশ প্যারারবার সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথায় এই হিভিয়ার সেপিয়ম্, (Sapium), ম্যানিহট (Manihot) প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় ক্ষীর মিশ্রিতকরতঃ রবার প্রস্তুত হয় বলিয়া বাগিচাজাত বিশুদ্ধরবার অপেক্ষা কিছু হীনগুণবিশিষ্ট। প্রস্তুতকালে বাগিচাজাত রবারে যাহাতে কোনরূপ জল, রজন (resin) বা প্রোটিডের অংশ না থাকিতে পায় তৎপ্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকা জাত রবারে এ সকল সতর্কতা অবলম্বিত হয় না, অধিকন্তু কৃত্রিমতা থাকিলেও ইহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশজাত রবার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সম্ভবতঃ দেশকাল পাত্রের তারতম্যবশতঃই এরূপ ঘটিয়া থাকে।

১। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং সিংহলে অধুনা প্রচুর পরিমাণ হিভিয়া ব্রেজিলিয়ানের চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যে ২।৪টা হিভিয়ার গাছ দেখা যায়, তাহাতে পার্ব্বত্য ও কঙ্করময় পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ইহা সুন্দর জন্মিবে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকজাতীয় হিভিয়া হইতে প্রচুরপরিমাণ রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে হিভিয়া ব্রেজিলিয়ানসিস্ (H' Braziliensis), হিভিয়া ডিস্কলর্ (H. discolor) এবং হিভিয়া বেন্থামিয়ানার (H. benthamian) উৎপন্নের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এদেশে ও সিংহলে হিভিয়া (H Spruceana) সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে।

হিভিয়ার জাতিগুলি—

Hevea similis	Hevea discolor
" spruceana	" pauciflora
" minor	" lutea
" benthamiano	" confusa
" rigidifolia	" gnianensis

প্যারা রবারের ব্যবহার—অধুনা নব্যপ্রণালী সম্মত ব্যোমজান নির্ম্মাণকল্পে প্যারারবারের প্রচুর ব্যবহার হইতেছে, ইহার বীজোৎপন্ন তৈল মসিনার তৈলের (Linseed oil) উৎকৃষ্ট অনুকল্প এবং খইল ও গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

২। **Castilloa elastica, Ule tree.**—ব্যবসায়ী মহলে ইহার নাম পানামারবার (Panama rubber), মধ্য আমেরিকা ইহার জন্মস্থান; কলিকাতা বোটানিকেল উদ্যানে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়, সিংহলে ইহার চাষ হইতেছে, কিন্তু সুবিধাজন

বলিয়া বোধ হয় না। এতদুৎপন্ন রবার পরিমাণে অল্প জন্মিলেও প্যারারবারের ন্যায় উৎকৃষ্ট। বৃক্ষ যেরূপ প্রকাণ্ড, পত্রগুলিও তদ্রূপ বৃহৎকায় হয়; ইহার কাণ্ডের ব্যাস সাধারণতঃ দুই হস্তেরও অধিক হইয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া রবার প্রদান করে। ক্যাষ্টিলোয়া ৬০ হইতে ৮০।৯০ ডিঃ উত্তাপ ও ৬০ ইঞ্চ বার্ষিক বারিপাতময় এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ ও উষ্ণ ভূমিভাগে উত্তম জন্মিয়া থাকে। অবাধে জল বহির্গত হইয়া যায় নদীতীরবর্ত্তী এরূপ অল্প ছায়াময় সরস দোয়াঁস মৃত্তিকাতে ইহা সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। ক্ষেত্র বন্যায় ডুবিয়া যাইলে বা মূলে অধিককাল জল সঞ্চিত হইলে বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট হয়, এজন্য ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে বাঁধ দেওয়া বা যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, শীত বা বর্ষার অধিক্য হইলে বৃক্ষ ভাল জন্মে না সুতরাং ইহার চাষের নিমিত্ত উষ্ণদেশই উপযোগী।

চাষ—বীজ ও কলম হইতে ইহার চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কলমের চারা সুবিধাজনক নহে কারণ উহা দীর্ঘে বড় বর্দ্ধিত হয় না, অত্যন্ত ঝোপ ও বহুবিলম্বে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। টব বা বীজ চৌকাতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রচুর পচাগোময় বা পাতা সারযুক্ত মৃত্তিকায় বীজ ২।৩ ইঞ্চ অন্তর ১ ইঞ্চ গভীর ঘনভাবে বপন করতঃ উপরে সূক্ষ্ম কর্ত্তিত নারিকেল ছোবড়া বা শুষ্ক পাতাসার আচ্ছাদন দিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একবার জলসেচন করিতে হইবে, কারণ কারণ অত্যধিক জলসেচনে বীজ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ১।১॥ মাসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুরিত হইবার পর ৪।৫টী পত্র বাহির হইলে ধীরে ধীরে উঠাইয়া পাতাসারযুক্ত এক একটী টবে রোপণ করতঃ ছায়াযুক্ত স্থানে বা চারা চৌকায় এক বা দুইবৎসর কাল পালন করিতে হইবে। চারাগুলি এক ফুট আন্দাজ উচ্চ হইলে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ভূমিতে বর্ষাকালে ১০ হস্ত অন্তর ১॥ বা ২ হস্ত গভীর খাদ খনন করতঃ তাহাতে রোপণ করিতে হইবে এবং যতদিন না গাছগুলি মাথা ছাড়াইয়া উঠে তত দিবস বিশেষ সতর্কভাবে জলসেচন করিতে এবং সদা সর্ব্বদা ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার ও মৃত্তিকা কোপাইয়া শিথিল রাখিতে হইবে। স্থান বিশেষে ১০ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে এ বৃক্ষে রবার পাওয়া যায় কিন্তু কাণ্ডের ব্যাস ১॥ হস্তের উপর না হইলে অধিক পরিমাণ রবার জন্মে না। কাণ্ডমধ্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিলে রবার-ক্ষীর নিঃসৃতঃ হয়, তাহাই সূর্য্যপাক করিলে বা যন্ত্রযোগে জলভাগ শোষিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ রবারে পরিণত হয়। অন্যসময় অপেক্ষা প্রাতে ও সন্ধ্যাতেই এবং নিম্ন অপেক্ষা ঊর্দ্ধদেশ হইতেই অধিকপরিমাণ ক্ষীর বাহির হয়। শুষ্ক অপেক্ষা বর্ষাকালে পঞ্চগুণ অধিকপরিমাণ ক্ষীর পাওয়া যায়। বৎসরের মধ্যে ৪।৫ বার ক্ষীর বাহির করা হয়, এবং প্রতিবারে ১পাউণ্ডের উপর বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায়; এই উৎপন্নের পরিমাণ অস্মদ্দেশীয় ফাইকাস ইলাষ্টিকা অপেক্ষা অল্প কিন্তু রবার তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয়। ইহার চাষ সহজ কিন্তু বহু বিলম্বে রবার প্রদান করে। ইহা ব্যতীত কাষ্টিলোয়া

জাতীয় আরও দুইটী বৃক্ষ হইতে ভূরি পরিমাণ রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে; যথা,—

Castilloa tunu.

" austrelis.

এ পর্য্যন্ত এদেশে এ দুইটীর চাষ আবাদ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা হয় নাই। অনেকে ক্যাষ্টিলোয়া মার্কহামিয়ানা (C. markhmiana) নামক বৃক্ষকে ক্যাষ্টিলোয়া (C. lactiflua) বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Perebea markhamina.

৩। **Ficus elastica**. কাশ্মীর—ব্যবসায়ী মহলে ইহার নির্য্যাস ইণ্ডিয়া (India rubber) নামে পরিচিত। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ইহার নামান্তর (Gutta Rumboug)। ভারতবর্ষে এই বৃক্ষ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ রবার পাওয়া যায় এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় রবার এ পর্য্যন্ত বিশেষ উপযোগী, বহুল প্রসবী বা লাভজনক বলিয়া নিরূপিত হয় নাই। অন্যান্য জাতীয় রবার অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব এই যে ১০।১২ বৎসরকাল অব্যবহারে রাখিয়া দিলেও ইহার কিছুমাত্র গুণ ব্যতিক্রম হয় না এবং শিল্পবেত্তাদিগের মতে ইহা প্যারারবার অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হইলেও শিল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত কোন অংশে অনুপযোগী নহে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে আসামদেশীয় লোকেরা মধু, গুড় প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখিবার জন্য সচ্ছিদ্র পাত্র, বেতের ঝুড়ি প্রভৃতি ইহার ক্ষীর দ্বারা প্রলেপ দিত। ৩।৪ বার প্রলেপ দিলে সমস্ত ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। মাড়োয়ারীরা আসামের জঙ্গলে তৈল, লবণ ও বস্ত্র লইয়া বসিয়া আছেন এবং স্থানীয় নাগা বা অন্যান্য অসভ্য লোকেরা রবারের পিণ্ড লইয়া আসিলে উপরিউক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে রবার লইয়া বিদেশে চালান দিতেছেন। ইহা হইতে তাঁহারা যেরূপ লাভ করিয়া থাকেন অন্যান্য দ্রব্যে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও লাভ হয় না। আসামের পাহাড়ীরা যাহা সংগ্রহ করে তাহাতে বিস্তর আবর্জ্জনা থাকে, এজন্য উহা কিছু অল্পমূল্যে বিক্রয় হয়, অতএব সংগ্রহকালে যাহাতে কোনরূপ আবর্জ্জনা না থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইহা বটজাতীয় বৃক্ষ ২৫।৩০ হস্ত উচ্চ হয়, পত্রগুলি অত্যন্ত তৈলাক্ত। ইহা বহুকাল জীবিত থাকে। আসামের শ্রীহট্ট, জয়ন্তী, খসিয়া পর্ব্বত প্রদেশেই এই বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মে, আসামের অন্যান্য প্রদেশ, মালাবার উপকূল ও দার্জ্জিলিং হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরবর্ত্তী সমগ্র পর্ব্বত্যপ্রদেশের পাদদেশেও ইহা জন্মে এবং তথায় ইহার প্রচুর চাষের চেষ্টা চলিতেছে। জাভা, মালয় এবং প্রণালী উপনিবেশেও ইহার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই জাতীয় প্রকাণ্ড সতেজ বৃক্ষ দেখা যায়, এগুলি সখের হিসাবে রোপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ইহাদের ক্ষীর বাহির করিবার কোনরূপ

চেষ্টা হয় নাই ; যাহা হউক এই সমস্ত প্রমাণদৃষ্টে আশা হয় শুদ্ধ বঙ্গদেশে কেন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার সুন্দর আবাদ হইতে পারে।

বটাদির ন্যায় ইহার ফল জন্মে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে পরিপক্ক বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হয়, কলম হইতেও চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিমসাগরের (Coleus amboynicus)ন্যায় ইহার পত্র হইতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার একজন সাহেব নিম্নলিখিত উপায়ে পত্র হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। একটী বালুকাপূর্ণ টবের উপর সুপক্ক পত্র রাখিয়া তদুপরি এক "ঘ" স্থূল বালুকা চাপা দিয়া কোন শীতল ছায়াময় স্থানে রাখিয়া প্রত্যহ বা এক দিবস অন্তর আবশ্যকমত জলসেচন করিতে হইবে যেন কোনরূপে বালুকা শুষ্ক না হয় ; অধিক সেচনে পত্র পচিয় যাইতে পারে, এজন্য মাত্র বালুকা আর্দ্র থাকে এরূপভাবে জলসেচন করিতে হইবে। একমাসের মধ্যে পত্রের প্রান্তভাগ হইতে বহুসংখ্যক চারা বাহির হইয়া থাকে ; গাছ ১ বা ১॥ ইঞ্চ প্রমাণ উচ্চ হইলে ধীরে ধীরে উঠাইয়া পাতাসারযুক্ত টবে রোপণ করতঃ শীতল ছায়াময় স্থানে ১ বা ২য় বৎসর কাল পালন করিতে হইবে। অনেকে ইচ্ছা করিলে এইটী পরীক্ষা করিতে পারেন। বটজাতীয় বৃক্ষের নিয়মানুসারে ইহার বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা উচিত। চারা ১।১॥ ফুট আন্দাজ উচ্চ হইলে নিরূপিত ক্ষেত্রে বসাইবার উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অন্যান্য জাতীয় রবারের ন্যায় ইহাও প্রচুর উষ্ণবাষ্প পরিপূর্ণ দেশে ও সরস দোয়াঁস মৃত্তিকায় সুন্দর জন্মে। ক্ষেত্র উত্তমরূপ কর্ষণ ও সমতল করতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বরাবর বৃষ্টি হইলে ১৫ হস্ত অন্তর সারি লাগাইয়া গহ্বর খনন করতঃ টব হইতে চারাগুলি ধীরে ধীরে খসাইয়া লইয়া একটী গহ্বর মধ্যে বসাইয়া মৃত্তিকা জোরে দাবিয়া দিতে হইবে ইহার পর গাছ বাড়িতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করা ও মৃত্তিকা কোপাইয়া শিথিল করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য পাইটের আবশ্যক হয় না। যতদিন চারাগুলি মাথা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে বিশেষরূপে শাখা প্রশাখা বিস্তার না করে, ততদিন উল্লিখিতরূপে গাছের যত্ন করিতে হইবে, পশ্চাৎ, বৎসরে একবার মাত্র কোপাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিলেই চলে। অনেক গবাদি পশুর উৎপাত হইতে গাছের রক্ষার জন্য ছোট ছোট বাঁশের ঘেরা লাগাইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

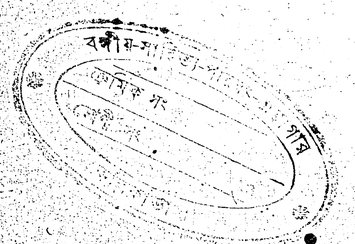

পটলের আবাদ।

(১)

পটল—(Trichosathes diocia. Ronbe.) ইহা শাসাকী-জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত।

পটল—মৃত্তিকা বেলে দোয়াশ—সার—পগারের মাটি, চূর্ণমিশ্রিত ছাই, পলিমাটি কিম্বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল চাষ খুব লাভের হয়।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ প্রণালী—সাধারণতঃ দোয়াশ মৃত্তিকাই প্রশস্ত।

সার (একর প্রতি)— নাইট্রোজেন ... ৫০ হইতে ৬০

পটাস ... ১৫০ হইতে ১৬০

ফস্ফরিক অম্ল ... ৮০ হইতে ১০০

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজ হইতে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়। পটলের বীজ বুনীয়া চারা করা হয় না। মূল রোপণ করিয়া পটলের আবাদ করিতে হয়।



যে জমিতে পটল চাষ হইবে তাহার চারিধারে পগার কাটিলে মন্দ হয় না, কারণ জলের ধোয়াটে জমির সারাংশ যাহা কিছু উহাতে সঞ্চিত হইবে, উপযুক্ত সময়ে সেই পগারের সার মাটী তুলিয়া জমিতে ছড়াইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে। নদীর চরে পটল ভাল হয়। বেলে দোয়াস মাটিতে এক বৎসর অন্তর শুক্না পাঁকমাটি

DAMAGE PAGES,

ছড়াইলে ফলন ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অধিক পটল ভাল জন্মায় না।

অল্পোচ্চ, খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্র-বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই পটল চাষ ভাল হয়। পটল গাছ বা পাতাকে পল্‌তা বলে। গাছ ও পাতা তিক্ত কিন্তু ফল মিষ্ট।

জমির সহিত সার মাটি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। গোল আলুর ন্যায় পটলের ক্ষেতের জমিকে গভীর ভাবে কর্ষণ ও মাটি ধুলিবৎ করিতে হইবে। আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে পটলের গেঁড় বা মূল রোপণ করিতে হয়। পটল গাছ অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক স্থানে ভাল হয় না। আবার অতি বৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়া যায়।

মূল রোপণ প্রণালী—পটলের স্ত্রী পুরুষ জাতীয় দুই প্রকার লতা হয়। উভয় জাতীয় লতাতে ফুল ফুটিতে দেখা যায় কিন্তু পুং জাতীয় লতার ফল হয় না। দুই তিন বৎসরের পুরাতন মোটা মূল পুতিলে গাছ তেজস্কর হয়া ঝাঁড়াইয়া যায়, পটল জন্মায় না. অতএব এক বৎসরের নূতন লতার সরু সরু ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইয়া ক্ষেতে পুতিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে যখন কেহ পুরাতন পটল ক্ষেত কর্ষণ করিতে থাকে, তখনই উক্তরূপ সরু সরু স্ত্রী জাতীয় লতার ছোট ছোট মূল বাছিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছয় ফিট অন্তর এক একটী ছোট ছোট মাদা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক মাদায় চারি ফিট অন্তর দুই তিনটী হিসাবে মূল রোপণ করিয়া তাহার উপরে অল্প অল্প খড় কুটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ইহাতে অধিক রৌদ্রের উত্তাপে মূল বা গেঁড়ের মাথা গুলি শুকাইয়া যায় না। দীর্ঘ প্রস্থে রীতিমত জল নিকাশী প্রণালী থাকা উচিত, কারণ জল বসিলে পটলের মূল পচিয়া যায়। মাদাগুলি সমতল জমি হইতে অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ হওয়া উচিত।

ক্ষেত্রের পাট—কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে মূল গুলি নূতন ক্ষেত্রে নূতন শিকড় ফেলিয়া গাছ গুলি কিঞ্চিৎ লতাইয়া না উঠিলে, ক্ষেতের মৃত্তিকা নাড়াচাড়া করিতে গেলে মূলের গাত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় গুলি নাড়া পাইয়া অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া শীতকালে বারিপাত হইলে হাল্‌কা কোদালী দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া ক্ষেত হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে মূল গুলিকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলে মাদা গুলিতে বাঁশ ইত্যাদির পুরাতন পাতা বিছাইয়া দিয়া তদুপরি নাড়া খড় অথবা যে স্থানে তাহা সুপ্রাপ্য এরূপ তৃণাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে. ইহাতে অনেক গুলি লাভ আছে। প্রথম (১) গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে, (২) মাদায় ঘাস প্রায় জন্মায় না, (৩) গাছের আঁকড়া গুলি ঐ সমস্ত তৃণাদি অবলম্বন করিয়া লতাইয়া যাইবার সুবিধা পায়, (৪) বর্ষাকালে লতা

গুলি মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না, (৫) কেয়ারীর জল সহজে নিকাশ হইয়া যায় অথচ মৃত্তিকা সরস থাকে এবং তৃণ পত্রাদি পচিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে পটল ক্ষেত্রে জল সেচনের প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু আজকাল অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি হেতু যেরূপ ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিতেছে তাহাতে কলবল বা কূপ খননের দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুই একবার চৌকা গুলিতে জল সেচন করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই গাছগুলি লতাইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করিবে। কৃষকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জলদি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া, তাহারা উপরন্তু খরচা বাদে বেশ দু পয়সা লাভ করিতে পারে।

তিন চারি বৎসরের অধিক এক স্থানে পটল ভাল হয় না। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে, অন্য কোন নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করিতে হয়। প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রীতিমত চাষ দিয়া পুরাতন লতা পাতা পরিষ্কার করতঃ তৈল শস্য সরিষা রাই, শোরগুজা ইত্যাদি একটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ফসল অন্তে ক্ষেতে পুনরায় কিঞ্চিৎ পুরাতন পাঁক মাটী ছড়াইয়া ক্ষেতের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই চলে।

বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় পটল জন্মিতে দেখা যায় তাহার মধ্যে কাজলী, ধানি, মাকড়া ও পাটনাই পটলই উৎকৃষ্ট। পটলের জালি জন্মাইবার তারিখ হইতে ৫ দিন মধ্যে খাইবার উপযুক্ত হয়-সুতরাং ৪।৫ দিন অন্তর ক্ষেত হইতে পটল তোলা উচিত নতুবা পাকিয়া যায়। অনেকে কিন্তু সখ করিয়া পাকা পটল খাইয়া থাকে। ক্ষেত হইতে পটল তুলিবারও একটী নিয়ম আছে, ক্ষেতের এক দিক হইতে ক্রমাগত সারিবদ্ধ প্রত্যেক মাদার গাছ হইতে পটল তুলিতে আরম্ভ করিয়া জমির শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত, তাহাতে কোন মাদা বাদ যায় না সুতরাং পটল তুলিতে বাদ পড়িয়া পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, নতুবা বিপর্য্যস্ত ভাবে পটল তুলিলে সকল গাছ হইতে পটল তুলিতে ভুল হইয়া যায়।

পটলের জন্য জমির অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত সার ব্যতিত খৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের জন্য পোনের সেরের অধিক মূলের আবশ্যক হয় না। মূল যত সরু হইবে তত কম মূল আবশ্যক হয়। স্ত্রী জাতীয় লতার মূলই রোপণ করিতে হয় কিন্তু তাহার সহিত পুংজাতীয় লতার মূলও কিছু পরিমাণ থাকা আবশ্যক ; কারণ স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প এই দুইয়ে সঙ্কর না হইলে পটল ভালরূপ জন্মিবে না। এইরূপ হইতে না পাইলে অনেক সময় পটলের ছনিগুলি বোটা হইতে খসিয়া পড়িয়া শুকাইয়া যায়।

DAMAGE PAGES,

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের খরচ—

৪ বার লাঙ্গল দেওয়া	...	২৷৷০ টাকা
মূল রোপণ ও মাদা প্রস্তুত	...	৩৲ "
কোপান ও মাটি দেওয়া	...	৩৲ "
জল সেচন	...	৩৲ "
২ বার নিড়ানি	...	২৷৷০ "
মূল খরিদ		৩৲ "
জমির খাজনা	...	৩৲ "
		২০৲

এক বিঘা জমিতে পটল খুব কম ফলিলেও ২৫ মণ পটলের কম প্রায়ই হয় না এবং প্রতি বিঘায় ৫০ মণ পর্য্যন্ত পটল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। পটল প্রায়ই ১৷৷০ টাকা মণের কম বিক্রয় হয় না এবং প্রথম যখন পটল উঠে তখন সহর নগরে বার আনা, এক টাকা সের বিক্রয় হয়। বাজারে নূতন জিনিষ অথচ আমদানী কম বলিয়া এত দর হয়, কিন্তু প্রচুর আমদানী হইতে আরম্ভ হইলেও বহুদিন ধরিয়া কলিকাতার বাজারে আট কিম্বা দশ পয়সা সের দর থাকে। এতদবস্থায় এক বিঘা পটল চাষ হইতে খরচ বাদে ৫০৲ কিম্বা ৬০৲ টাকা লাভ হওয়া কোনক্রমে বিচিত্র নহে।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে একবার একটী পনর কাঠা পরিমাণ জমিতে পটল করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে ৬০৲ টাকা মুনফা হইয়াছিল। ঐ জমির মৃত্তিকা দোয়াঁস, জমিটি বহুদিন পতিত ছিল সুতরাং গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থে সারবান, তার উপর পুষ্করিণীর পাঁক মাটি ছড়ান হইয়াছিল। পটল চাষের পূর্ব্বে ইহাতে বেগুণ প্রচুর ফলিয়াছিল। বেগুণচাষ বর্ণনার সময় তাহার হিসাব দেওয়া যাইবে। এই দুইটী চাষ তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিশ্বাসের ভত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদে পটলের বহুবিধ গুণ বর্ণিত আছে। ইহার স্নিগ্ধত্ব ও পিত্তনাশক গুণ সর্ব্বজনবিদিত। ইহার পাতার ও পটলের রস ঔষধার্থে সেবন করা হয়।

পটল চাষের নূতন প্রণালী—বাঁশের কঞ্চির আড়াই বা তিন হাত উচ্চ এবং যথেচ্ছাভাবে লম্বা করিয়া 'ফেন্‌সিং' অর্থাৎ ঝাঁপের বেড়া প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রের দীর্ঘ প্রস্থ ভাবে উভয়ের মধ্যে ৭ হাত ব্যবধান রাখিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে, ২ত সারি হইতে পারে, বেড়া বসাইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে মধ্যে একটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ খুটী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়া গুলি বাঁধিয়া দিতে হয় এবং ঐ বেড়ার ধারে পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ ফিট অন্তর মাদা করিয়া, যথারীতি গাছ লাগাইয়া বেড়ায় দুই ধার হইতে পটল লতা উঠাইয়া দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়া যায়। অধিকন্তু দুইটি বেড়ার অন্তর্গত তলস্থ ক্ষেত্রে মুথ-

কচু এবং ওল রোপণ করিয়া, কার্ত্তিক মাস মধ্যে, আরও দুইটি ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পগারের সন্নিকট চারিপার্শ্বে বেড়ার উপর, শাঁক-আলু, ঝুপি-আলু, বরবটীর গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কোন কোন স্থানে বেড়া ও বরজের উপর পটল গাছ উঠাইয়া দিয়া চতুরতার সহিত বারমাস ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকারের জমিতে খাটিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যে জমিতে বর্ষার জল জমে তথায় এই প্রকারে পটল চাষের সুবিধা হয় না কিম্বা যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য এককালে আট দশ বিঘা জমিতে পটল চাষ করিবেন, তাঁহাদের এই প্রথায় চাষের সুবিধা হয় না। খুচরা চাষীগণের পক্ষে অথবা ঘর খরচের জন্য চাষের পক্ষে এরূপ মিশ্র চাষই লাভজনক

পটল গাছের সঙ্গে আরও একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নাম ঘৃত কাঁকরোল। ঘৃত কাঁকরোল রন্ধন করিলে প্রকৃতই ঘৃতের ন্যায় গলিয়া যায়। এই গাছ পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। ঘৃত কাঁকরোলও পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বার মাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছোট ছোট নরম কাঁটা আছে। মূলে গাছ হয়, বীজেতে গাছ জন্মে না। এক স্থানে অনেক দিন জীবিত থাকিয়া ফল দান করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের এক বিঘা জমিতে ২৫ হইতে ৪০ মণ পটল জন্মিয়া থাকে। নদীর চরে ফল কিছু অধিক হয়। আমাদের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বিঘা প্রতি ৫০ মণেরও অধিক পটল ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটা বাগান তুলিয়া দিয়া পটলের ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছিল—জমি হাল্‌কা দোয়াস, তার উপর পাতা পচা সার পাইয়া আরও হাল্‌কা হইয়াছিল—পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ব্যতীত অন্য কোন সার ব্যবহার করা হয় নাই।

পটল নূতন উঠিলেই খুব দরে বিক্রয় হয়, এমন কি এক টাকা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দর উঠে। যত শীঘ্র আমদানী করিতে পারেন, তিনি তত অধিক দর পান, কিন্তু এ দর অতি অল্প দিনের জন্য। গড়ে পটলের মণ দেড় টাকা কিম্বা এক টাকা বার আনা ধরিলেও পটল চাষে সচারীর ৪০৲ হইতে ৬০৲ টাকা খরচ বাদে লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের খরচ—

৪ বার লাঙ্গল দেওয়া		২৷৷০ টাকা
মূল রোপণ ও মাদা প্রস্তুত	...	৩৲ "
কোপান ও মাটি দেওয়া	...	৩৲ "
জল সেচন	...	৩৲ "
২ বার নিড়ানি	...	২৷৷০ "
মূল খরিদ		৩৲ "
জমির খাজনা	...	৩৲ "
		২০৲

এক বিঘা জমিতে পটল খুব কম ফলিলেও ২৫ মণ পটলের কম প্রায়ই হয় না এবং প্রতি বিঘায় ৫০ মণ পর্য্যন্ত পটল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। পটল প্রায়ই ১৷৷০ টাকা মণের কম বিক্রয় হয় না এবং প্রথম যখন পটল উঠে তখন সহর নগরে বার আনা, এক টাকা সের বিক্রয় হয়। বাজারে নূতন জিনিষ অথচ আমদানী কম বলিয়া এত দর হয়, কিন্তু প্রচুর আমদানী হইতে আরম্ভ হইলেও বহুদিন ধরিয়া কলিকাতার বাজারে আট কিম্বা দশ পয়সা সের দর থাকে। এতদবস্থায় এক বিঘা পটল চাষ হইতে খরচ বাদে ৫০৲ কিম্বা ৬০৲ টাকা লাভ হওয়া কোনক্রমে বিচিত্র নহে।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে একবার একটী পনর কাঠা পরিমাণ জমিতে পটল করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে ৬০৲ টাকা মুনফা হইয়াছিল। ঐ জমির মৃত্তিকা দোয়াঁস, জমিটি বহুদিন পতিত ছিল সুতরাং গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থে সারবান, তার উপর পুষ্করিণীর পাঁক মাটি ছড়ান হইয়াছিল। পটল চাষের পূর্ব্বে ইহাতে বেগুণ প্রচুর ফলিয়াছিল। বেগুণচাষ বর্ণনার সময় তাহার হিসাব দেওয়া যাইবে। এই দুইটী চাষ তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিশ্বাসের ভত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদে পটলের বহুবিধ গুণ বর্ণিত আছে। ইহার স্নিগ্ধত্ব স্তম্ভ পিত্তনাশক গুণ সর্ব্বজনবিদিত। ইহার পাতার ও পটলের রস ঔষধার্থে সেবন করা হয়।

পটল চাষের নূতন প্রণালী—বাঁশের কঞ্চির আড়াই বা তিন হাত উচ্চ এবং যথেচ্ছাভাবে লম্বা করিয়া 'ফেন্‌সিং' অর্থাৎ ঝাঁপের বেড়া প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রের দীর্ঘ প্রস্থ ভাবে উভয়ের মধ্যে ৭ হাত ব্যবধান রাখিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে, যত সারি হইতে পারে, বেড়া বসাইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে মধ্যে একটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ খুটী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়া গুলি বাঁধিয়া দিতে হয় এবং ঐ বেড়ার ধারে পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ ফিট অন্তর মাদা করিয়া, যথারীতি গাছ লাগাইয়া বেড়ায় দুই ধার হইতে পটল লতা উঠাইয়া দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়া যায়। অধিকন্তু দুইটি বেড়ার অন্তর্গত তলস্থ ক্ষেত্রে মুথ

কচু এবং ওল রোপণ করিয়া, কার্ত্তিক মাস মধ্যে, আরও দুইটি ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পগারের সন্নিকট চারিপার্শ্বে বেড়ার উপর, শাঁক-আলু, ঝুপি-আলু, বরবটীর গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কোন কোন স্থানে বেড়া ও বরজের উপর পটল গাছ উঠাইয়া দিয়া চতুরতার সহিত বারমাস ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকারের জমিতে খাটিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যে জমিতে বর্ষার জল জমে তথায় এই প্রকারে পটল চাষের সুবিধা হয় না কিম্বা যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য এককালে আট দশ বিঘা জমিতে পটল চাষ করিবেন, তাঁহাদের এই প্রথায় চাষের সুবিধা হয় না। খুচরা চাষীগণের পক্ষে অথবা ঘর খরচের জন্য চাষের পক্ষে এরূপ মিশ্র চাষই লাভজনক

পটল গাছের সঙ্গে আরও একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নাম ঘৃত কাঁকরোল। ঘৃত কাঁকরোল রন্ধন করিলে প্রকৃতই ঘৃতের ন্যায় গলিয়া যায়। এই গাছ পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। ঘৃত কাঁকরোলও পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বার মাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছোট ছোট নরম কাঁটা আছে। মূলে গাছ হয়, বীজেতে গাছ জন্মে না। এক স্থানে অনেক দিন জীবিত থাকিয়া ফল দান করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের এক বিঘা জমিতে ২৫ হইতে ৪০ মণ পটল জন্মিয়া থাকে। নদীর চরে ফল কিছু অধিক হয়। আমাদের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বিঘা প্রতি ৫০ মণেরও অধিক পটল ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটা বাগান তুলিয়া দিয়া পটলের ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছিল—জমি হাল্‌কা দোয়াস, তার উপর পাতা পচা সার পাইয়া আরও হাল্‌কা হইয়াছিল—পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ব্যতীত অন্য কোন সার ব্যবহার করা হয় নাই।

পটল নূতন উঠিলেই খুব দরে বিক্রয় হয়, এমন কি এক টাকা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দর উঠে। যত শীঘ্র আমদানী করিতে পারেন, তিনি তত অধিক দর পান, কিন্তু এ দর অতি অল্প দিনের জন্য। গড়ে পটলের মণ দেড় টাকা কিম্বা এক টাকা বার আনা ধরিলেও পটল চাষে সুচারুরূপে ৪০৲ হইতে ৬০৲ টাকা খরচ বাদে লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

CONTINUOUS

পটলের আবাদ

(২)

সাধারণে কিভাবে পটলের চাষ করিয়া থাকে

ইতিপূর্ব্বে মালদহ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সরকার মহাশয় পটল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। আমি অনেক দিন হইতেই আমাদিগের পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফলাফল "কৃষকের" পাঠকবর্গকে জানাইবার সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু সময়াভাবে এত দিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আজ সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পটল সম্বন্ধে আমারও দুই একটী কথা লিখিবার ইচ্ছা হইল। কারণ, সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পটলের আবাদ করিতে গেলে, আমার বোধ হয় তাঁহার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য বিষয় উপস্থিত হইতে পারে। সরকার মহাশয় পটলের চাষ আবাদ যত সহজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ আয়াস সাধ্য বলিয়া বোধ হয়। পটল মাঠান, ফসল নহে। সাধারণতঃ নদীর ধারে চড়ায় ঘোলা জলের পলি পড়া জমিতেই ইহার নাম আবাদ হইয়া থাকে। পলির উপর যেরূপ পটল ধরে সেরূপ আর কোথাও ধরে না। কিন্তু উক্ত ফসল মাঠান জমিতে উৎপন্ন করিতে হইলে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে কখনই তাদৃশ ফললাভের আশা করিতে পারা যায় না।

পটল দীর্ঘ কাল স্থায়ী ফসল এবং বাঙ্গালীর একটা প্রধান তরকারী। যাহাতে সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে পটলের চাষ আবাদ হয় তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। কিন্তু সকল প্রকার মাটিতে পটল ভালরূপ জন্মে না, এ জন্য রাঢ় অঞ্চলে অনেক স্থানে তাদৃশ পটলের আবাদ দেখা যায় না। মালদহে যেরূপ পটলের আবাদ হয়, বোধ হয় অনেকেই জানে না যে, মুর্শিদাবাদেও তদ্রূপ যথেষ্ট পরিমাণে পটলের আবাদ হইয়া থাকে।

পটল অতি লাভজনক ফসল। যত্ন পূর্ব্বক ইহার আবাদ করিতে পারিলে বিঘা প্রতি ১০০৲ এক শত হইতে ১৫০৲ দেড় শত টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। কখন কখন ইহাপেক্ষাও অধিক লাভ হইতে দেখা যায়। কারণ, জমি উর্ব্বরা হইলে এক জমিতে এবং একই আবাদে দুই বৎসর প্রায় সমান পটল ধরিয়া থাকে। এ অঞ্চলের বহুদর্শী বৃদ্ধ মুসলমান কৃষকেরা বলিয়া থাকে—

"যা না করে আল্লা,
তা করে এক বিঘা পোল্লা।"

ঐ সকল অভিজ্ঞ কৃষকদিগের দ্বারা উপাদিষ্ট হইয়া এবং তাহাদিগের অনুকরণ করিয়া আমরা বিশেষ ফললাভ করিয়াছি।

দোঁয়াস ও হাল্কা দোঁয়াস মাটিই পটল চাষের বিশেষ অনুকূল। উপযুক্ত পরিমাণে

সার দিতে পারিলে বেলে মাটিতেও পটল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এঁটেল মাটি পটল আবাদের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। পটলের আবাদ করিতে হইলে, যে পরিমাণ জমিতে পটল আবাদ করিবার ইচ্ছা হইবে তাহার চারি গুণ জমি উক্ত কার্য্যের জন্য রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ ১ বিঘা জমিতে পটলের আবাদ করিতে হইলে ৪ বিঘা জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাস হইতে পটলের জমির চাষ আরম্ভ করিতে হয়। মনে করুন, কেহ ১ বিঘা জমিতে পটলের আবাদ করিবার উদ্দেশ্যে ৪ বিঘা পতিত জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে প্রথম বৎসর কার্ত্তিক মাসের প্রথমে ১ বিঘা জমি লাঙ্গলের দ্বারা দোয়ার চাষ ও মই দিয়া রাখিতে হইবে। অথবা যাঁহার উপায় আছে তিনি ঐ সময় উক্ত জমি কোদালী দ্বারা উল্টাইয়া দেওয়াইতে পারেন। পুনরায় কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগে দোয়ার চাষ ও মই দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোদালী দ্বারা উল্টান হয়, তাহা হইলে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে তাহাতে দোয়ার চাষ ও মই দিতে হইবে। পরে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথমে ও মধ্যভাগে এক খানি করিয়া চাষ ও মই দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তদনন্তর যেখানে পুষ্করিণীর পচা মাটি সহজে ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়, সেখানে চৈত্র মাসের শেষে উক্ত ১ বিঘা জমিতে ১০।১২ গাড়ী পাঁক মাটি ডেলা বিহীন করিয়া ছড়াইয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ চাষ ও মই দিতে পারিবেন। আর যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে পাঁক মাটির পরিবর্ত্তে গোবর সারই ব্যবহার করিবেন ; কিন্তু অল্প পরিমাণে। কারণ, পটলের জমিতে অপরিমিত গোবর সার প্রয়োগ করিলে লতা অত্যন্ত স্থূল ও দীর্ঘাকার হয় এবং এত ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া যায় যে, মৃত্তিকা হইতে উপর্য্যুপরি প্রায় ৫।৭ স্তর লতা জন্মিয়া যায় এবং তাহাতে অতি অল্প, এমন কি কখন কখন আদৌ ফল ধরে না। ইহাকে এ অঞ্চলে ঝাঁড়া লতা কহে। ঘন বর্ষা হইলে নিম্নের সমস্ত লতা গুলি পচিয়া যায় ; অনেক সময়ে বর্ষাকালে জমিতে এক কালীন লতা থাকে না, তজ্জন্য ক্ষেত্র স্বামীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। গোবর সার ও পাঁক মাটির পার্থক্য এই যে, গোবর সার প্রয়োগ করিলে লতার বৃদ্ধি হয়, আর পচা মাটি ব্যবহার করিলে ফল ও ফলনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমি পাঁক মাটি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে এক একটা পটল ৪½'' ইঞ্চি হইতে ৫'' ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা এবং তদনুরূপ স্থূল হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পটল ধরিয়াছে।

যেখানে কোন প্রকার সার কি পাঁক মাটি পাইবার সুবিধা নাই, অথবা ব্যয় সাধ্য, সেখানে সব্জী সার ব্যবহার করিলেও বিশেষ ফল পাইবেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্ত্তিক মাসে দুই খানি করিয়া চাষ ও মই দিয়া রাখিতে হইবে। পরে বৈশাখ মাসে বারিপাত হইলেই উক্ত জমিতে অড়হর, কৃষ্ণ তিল অথবা কাঠ তিল এবং সীম প্রভৃতি বীজ বপন করিয়া একখানি চাষ ও মই দিয়া রাখিবেন। আষাঢ় মাসের শেষে অথবা মধ্য ভাগে উক্ত অড়হর, সীম প্রভৃতি গাছ গুলি ১ ফুট কিম্বা ১½ ফুট পরিমিত হইলে যখন ঘন বৃষ্টি

CONTINUOUS

আরম্ভ হইবে সেই সময়ে ঐ সকল ফসল গুলির মধ্যে উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়া গাছ গুলি মাটির সহিত এরূপ ভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে যাহাতে শীঘ্র পচিয়া যায়। আষাঢ় মাসের এই চাষের সঙ্গে সঙ্গেই জমির চতুর্দ্দিকে অন্ততঃ ৬" ইঞ্চি উচ্চ আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে, যাহাতে বর্ষার জল সম্পূর্ণরূপে জমিতে বসিতে পায় এবং উক্ত অড়হর প্রভৃতি গাছ পালা গুলিকে শীঘ্র পচাইয়া দেয়। এইরূপে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত চাষ দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক চাষের উপরেই মই দেওয়া আবশ্যক। কেবল যে জমির রস রক্ষা করিবার জন্যই মই দেওয়ার প্রয়োজন তাহা নহে। মই দেওয়ার আরও অনেক উপকারিতা আছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে চাষের উপর মই দিলে ঘাস গুলি জমির উপর ভাসিয়া উঠে এবং তাহাদিগের শিকর পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও শিকড়ের মাটি ঝরিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত শীত ও রৌদ্রে জমি শীঘ্রই ঘাসহীন হইয়া যায়। আর বর্ষাকালে চাষের উপরে মই দিলে ঘাস উপরে ভাসিয়া উঠে না, কিন্তু মাটিতে চাপিয়া যায় ও ঘন বৃষ্টিতে শীঘ্র পচিয়া যায়। কিন্তু এই সময়ে ঘাস গুলি একবার চাষের পর মাটিতে শিকড় না বসাইতে বসাইতে আর একবার স্থানচ্যুত হইলে অতি সহজেই পচিয়া সারে পরিণত হয়। ইহাকেই পচান করা কহে। জমি উত্তমরূপে পচান করিতে পারিলে প্রায় অন্য কোন সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। জমির পচানের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ভাদ্র, আশ্বিন মাসের রৌদ্রে দিন কয়েক উপর্য্যুপরি চাষ ও মই দিয়া জমিকে এক কালীন ডেলা বিহীন করিতে হইবে। তখন জমির চাষের কার্য্য শেষ হইল। এক্ষণে পটলের লতা বসাইবার যোগাড় করিতে হইবে। অন্য জমি হইতে বেশ ধরাটে লতা (যে লতায় যথেষ্ট ফল ধরিয়াছিল) আনিয়া লতা গুলিকে ৪।৫ হাত লম্বা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে। ঐ সকল খণ্ডীকৃত লতা কতকগুলি একত্র করিয়া এক একটী গুছি করিতে হইবে কিন্তু বাঁধিতে হইবে না। পটলের জমিতে একখানি লাঙ্গলের দ্বারা ২।, ২॥ হস্ত অন্ততঃ ৯" ইঞ্চ গভীর এক একটি ভাঁওড় (?) দিয়া যাইবে। ভাঁওড় গুলি বেশ প্রশস্ত হওয়ার দরকার। যদি একবারে ভাঁওড় গুলি তেমন প্রশস্ত না হয় তাহা হইলে পুনরায় ঐ সকল ভাঁওড়ের মধ্য দিয়া বেশ চাপিয়া লাঙ্গল চালাইতে হইবে, অথবা লাঙ্গলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একখানি লাঙ্গল একই ভাঁওড়ের মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে। তাহা হইলে ভাঁওড় গুলি বেশ পরিসর হইবে।

পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল যে, পটলের লতা বসাইবার সময়ে জমির আকৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জমি যদি সমতল হয়, তাহা হইলে কেবল মাত্র জমির প্রস্থের দিকে লম্বালম্বি লতা বসাইলেই চলিবে। আর জমি সমতল না হইয়া যদি কিয়দংশ একদিকে এবং কততকাংশ অন্য দিকে ঢালু থাকে, তাহা হইলে দুইদিকে দুই-

* ভাওড় পটি, মাদা তাহার মধ্যে পটলের লতা রোপণ করা যায়।

ভাগে লতা বসাইতে হইবে। অর্থাৎ জমির একাংশ যদি দক্ষিণ দিকে ঢালু থাকে, এবং অপরাংশ যদি পূর্ব্ব দিকে ঢালু থাকে, তাহা হইলে প্রথম অংশে উত্তর দক্ষিণে ও দ্বিতীয় অংশে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি লতা বসান উচিত। বর্ষাকালে লতা রক্ষা করা এবং যথেষ্ট পরিমাণে ফল লাভ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু জমি যে দিকে ঢালু যদি তাহার বিপরীত দিকে লম্বালম্বি লতা বসান হয়, তাহা হইলে, ভিলি টানা গেলে, বর্ষাকালে ঘনবৃষ্টির সময় প্রত্যেক জুলিতেই জল জমিয়া থাকিবে এবং লতাগুলিকে শীঘ্রই পচাইয়া দিবে।

জমিতে লতা বসান কার্য্য শেষ হইলে, কয়েক দিনের জন্য, পটলের জমির অন্য কোন কার্য্য নাই। এমন কি জাবত জমিতে নবোদ্গত পত্রাদি বেশ ভাল রূপ দৃষ্ট না হইবে, তাবৎ জমিতে প্রবেশ না করাই ভাল। পটলের লতা অঙ্কুরিত হইতে প্রায় পনর ষোল দিন সময় লাগে। মৃত্তিকা কিছু রসহীন হইলে, আরও দুই চারি দিন বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু তজন্য ব্যস্ত হইয়া জল সিঞ্চনাদির দ্বারা ব্যয় বাহুল্য করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। কার্ত্তিক অগ্রাহায়ণ মাসে কর্ষিত জমিতে যে রস থাকে এবং যেরূপ শিশির পাত হয়, তাহাই বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট।

এই সময়ে দ্বিতীয় খণ্ড জমি কেদালির দ্বারা উত্তমরূপে কোপাইয়া রাখিতে হইবে। অভাবে লাঙ্গলের দ্বারা দুই তিনখানি চাষ ও মই দিতে থাকিবে।

নূতন লতাগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইলে একবার কোদালির দ্বারা জমি কোপাইয়া ডেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। পরে অগ্রাহয়ণ মাসে আর একবার জমি কোপাইয়া ভিলি টানিয়া দিতে হইবে। ভিলি গুলি দুইটী লতাশ্রেণীর মধ্যস্থল দিয়া লতাশ্রেণীর সহিত (parallel) সমান্তরাল ভাবে যাইবে। ভিলি গুলি অন্ততঃ ১৫" ইঞ্চি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। ভিলি টানা হইলে জুলি (উভয় ভিলির মধ্যবর্ত্তী স্থান) সমতল করিয়া একদিক কিঞ্চিৎ ঢালু করিয়া দেওয়া উচিত, যেন সামান্য বৃষ্টি হইলেও জল গড়াইয়া যাইতে পারে। তদনন্তর জমির আইলের চতুঃপার্শ্বে এরূপ ভাবে পয়োনালা কাটিয়া দিতে হইবে যাহাতে জমির সমুদায় জল উক্ত নালায় আসিয়া দাড়ায় এবং আবশ্যকমত আইল কাটিয়া দিলে নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া যায়। এই সকল কার্য্যগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদের পরিবর্ত্তে কোন অনুকল্প ব্যবস্থা নাই। ব্যয় সাধ্য হইলেও করিতে হইবে।—শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণসর্ব্বাধিকারী, গোরাবাজার, রঙ্গপুর।

আমেরিকাতে কৃষির প্রচুত আয়োজন

সেখানে কলে লাঙ্গল ও মই দেওয়া হয় জমি কোপান হয়, জমিতে জল সেচন হয়।

সেখানে চাষীর সহিত ধনীর যোগ আছে—সেখানে সমবায় প্রণালীতে কাজ হয়—আমেরিকায় ২।৩।১০ জন চাষীতে মিলিয়া নূতন নূতন কৃষিযন্ত্র ক্রয় করে এবং আবশ্যক মত সকলে ব্যবহার করে। তাহার লাঙ্গল বিশেষ সাহায্যে ক্ষেতের আলু, পিয়াজ উঠায় এই লাঙ্গলকে potate grubbor বলে। আমেরিকায় কলে ভুট্টা বা জনার কাটা বা বাঁধা হয়।

কলে ধান যব গম কাটা বাঁধা হয় একজন লোকেই এ কল চালাইতে পারে। ১০ঘণ্টা কল চালাইলে ১০০ বিঘা জমির ফসল কাটা ও বাঁধা হইয়া যায়। এই কলের নাম মোলাইন। আমেরিকায় ইনিয়ন ষ্টেটের মোলাইন নামক স্থানে প্রস্তুত হয়।

আমেরিকার চাষীরা ফলের গাছে পোকার উপদ্রব দেখিলে পিচকারী দ্বারা গাছ ধৌত করে। ২০।২৫ ফিট উচ্চ গাছও ইহার দ্বারা ধৌত করা যায়।

তাহারা পোকার উপদ্রব দমনের জন্য ফসলের অনিষ্টকারী পোকার শত্রু পোকা পালন করে এবং সেগুলিকে ক্ষেতে ছাড়িয়া দিয়া ফসলের শত্রু নাশ করে।

আমেরিকার গো-শালা বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ধোয়া কাপড় পরিয়া হাত পা ধুইয়া তথাকার গোয়ালিনীগণ দুগ্ধ দোহন করে।

কৃষি বিদ্যালয়ে আমেরিক ছাত্রগণ দোহান গাইয়ের তত্ত্বাবধান শিক্ষা করে।

কৃষি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ জীবতত্ত্ব অধ্যয়ন কালে ঘোড়া, গো, মহিষাদির ও ভেড়া ছাগল প্রভৃতি প্রকৃতি চর্চ্চা করে।

কৃষি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা করে এবং এখানে তাহারা উদ্ভিদ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন করে।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিরা এখানে ভেষজ উদ্যান রচনা করে। ভেষজ উদ্ভিদের সহিত এখানে ছাত্রদের পরিচয় হয়। ভেষজ উৎপাদন, রক্ষা ও তাহার প্রয়োগ শিক্ষা ছাত্রগণ করিতে পায়। ভেষজ দ্বারা চিকিৎসাও তাহারা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিতে পারে।

ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সবজীর বাগানের ন্যায় ভেষজ উদ্যানও সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয়।

আমেরিকার কৃষক ও গভর্মেণ্ট

আমেরিকার কৃষি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে পরিচালিত হয় বলিয়া ক্ষেতে ফসল উৎকৃষ্ট ও অধিক উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে কৃষক চাষীরা বেশ সচ্ছল এমন

কি ধনী অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার চাষীরা শ্রমলাঘব কলের যন্ত্র চাষে প্রয়োগ করিয়া অর্থ শ্রম ও সময় অল্প ব্যয় করিয়াই অনেক ফসল জমির নিকট হইতে আদায় করে। মাতা বসুমতী তাঁর উদ্যোগী সন্তানদের ধনধান্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া লক্ষ্মীশ্রীতে তাদের মণ্ডিত করিয়া তোলেন।

আমেরিকার চাষীদের সফলতার দ্বিতীয় কারণ তাদের সমবায়। একজন চাষীর পক্ষে চাষের নানা রকম কলের যন্ত্র কেনা যদি সম্ভবপর না হয়, সেইসব কলে একদিনে একটানায় যতখানি ক্ষেত চষিতে নিড়াইতে পারে অথবা যত বড় জমিতে বিধে বা মই দিতে অথবা ফসল কাটিতে পারে ততখানি জমি যদি একজন চাষীর না থাকে, তবে বহুচাষী একত্র দলবদ্ধ হইয়া সমবায় করে এবং একের যাহা বোঝা হইত দশের তাহা লাঠি হইয়া উঠে; সকলের চাঁদায় এক প্রস্থ কলের যন্ত্র কেনা হয় এবং সেই যন্ত্রে সকলের ক্ষেত চষা নিড়ানো বিধে বা মই দেওয়া হয় এবং সকল ক্ষেতের ফসল কাটা, আঁটি বাঁধা, আছড়ানো, ঝাড়া, বস্তাবন্দী, মাপা অল্প সময়ে ও অল্প খরচে হইয়া যায়।

চাষীদের পরস্পরের সংযোগিতা ছাড়া গভর্মেণ্টও চাষীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া থাকেন। আমেরিকায় আমাদের দেশের মতন দু-থাক গভর্মেণ্ট—খণ্ড খণ্ড ষ্টেট বা প্রদেশগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে, এ-কে বলে ষ্টেট গভর্মেণ্ট; আবার এই সমস্ত ষ্টেট গভর্মেণ্ট সমবায়ে পরস্পরের মধ্যকার ও বিদেশের সঙ্গে ব্যবহারের সমস্যা মীমাংসার জন্য যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে তারা হয় সমবায় গভর্মেণ্ট, যাকে আমেরিকার বলে ফেডারেল গভর্মেণ্ট—যেমন আমাদের প্রাদেশিক বা প্রভিন্সিয়াল গভর্মেণ্ট এবং ইণ্ডিয়া বা ইম্পিরিয়াল গভর্মেণ্ট। আমেরিকার সমবায় গভর্মেণ্টের সঙ্গে যে কৃষিবিভাগ আছে তার কর্ম্মচারীদের সংখ্যা অনেক, কুড়ি হাজার; আর এই বিভাগের খরচ বছরে একুশ কোটি টাকা। এই বিভাগের উদ্দেশ্য দেশের চাষীদের যন্ত্র বা কৃষিতত্ত্ব তাদের জানাইয়া বুঝাইয়া অবলম্বন করিতে সাহায্য করা, নব নব কৃষিতে তাদের উৎসাহ দেওয়া, নিরন্তর প্রবৃত্তি উৎপাদন করা। এই উদ্দেশ্যে বৎসরে পঁচিশ কোটি পত্রিকা পুস্তিকা রিপোর্ট চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কলে ভুট্টা বা জনার ফসল কাটা ও আঁটি বাঁধা—কলে ধান যব গম কাটা ও আঁটি বাঁধা। একজন লোকেই কল সহজে চালাইতে পারে। ১০ ঘণ্টা কল চালাইলে ১০০ বিঘা জমির ফসল কাটা ও বাঁধা হইয়া যায়। এই কলের নাম মোলাইন। আমেরিকার ইলিনয় ষ্টেটের মোলাইন নামক স্থানে প্রস্তুত হয়। ফলের গাছে কীটনাশক ঔষধের ধারা দিবার পিচকারী ও তাহারা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইরূপে তাহারা শত সহস্র বিঘাব্যাপি ফলের বাগান তাহারা কীটাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করে। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ষাটটি কৃষিপরীক্ষার ক্ষেত্র আছে; সেখানে কৃষির যন্ত্র পদ্ধতি উপায় তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা পরিবর্ত্তন ও অনুসন্ধান করা হয় এবং

সন্ধানের ফল কৃষিবিভাগের মারফতে দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা হয়। এই সব কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রে সন্ধান করা হয়—(১) উদ্ভিদ ও পশুর শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার অথবা আবিষ্কৃত তত্ত্বের সত্যতা নিরূপণ ও তাহা কর্ম্মে প্রয়োগ ও ব্যবহার; বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থায় তাদের দেহের বিবিধ রাসায়নিক অবস্থা নির্ণয়; (২) এক জমিতে নানা ফসল ঘুরাইয়া উৎবরন করার উপকারিতা এবং কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল উৎপন্ন করিলে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট ত হয়ই না বরং বৃদ্ধি হয় এবং ফসলও উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পাওয়া যায়; নূতন গাছ বা ফসল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া কেমন করিয়া দেশে আজ্জানো যাইতে পারে, দেশের আবহাওয়া বিদেশী উদ্ভিদ কেমন অবস্থায় সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে; (৩) ক্ষেত্রের মাটী ও জল বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষায় গুণাগুণ নির্দ্ধারণ এবং ক্ষেত্রের মাটি ও জলে যে যে পদার্থ আছে তাহা কোন্ কোন্ ফসল ফলনের অনুকূল; (৪) স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সার নির্ণয়, বিভিন্ন সারের রাসায়নিক বস্তু-বিভাগ নির্ণয় বিভিন্ন ফসল ফলনের কোন্ সারের কিরূপ ক্ষমতা ও উপযোগিতা তাহা নির্দ্ধারণ, (৫) পশুখাদ্য ঘাস তৃণ উৎপাদন, বিভিন্ন তৃণের পুষ্টিকরতা ও পশুদেহে উপকারিতা নির্ব্বাচন; (৬) গৃহপালিত পশুদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের বস্তুতত্ত্ব ও হজমের তারতম্য করা; (৭) ঘি মাখন ছানা ক্ষীর প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার এবং ভালো জিনিষ সস্তায় উৎপাদন ও দেশ-বিদেশে যোগান্ দিবার উপায় সন্ধান।

এই সব পরীক্ষাক্ষেত্রে কোনো চাষী তার জমির মাটি ও জল অল্প দিয়া আসিলে সন্ধানীরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দ্যান তার জমিতে কোন্ কোন্ ফসল ফলিবে ভালো, কোন্ অবস্থায় কোন্ সার দিলে কোন্ ফসল ভালো হইবে, ইত্যাদি।

আমেরিকার কৃষিবিভাগ অনেকগুলিদপ্তরে বিভক্ত। চারা আজ্জানো দপ্তর নূতন ফসল আমদানী করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সতত সচেষ্ট; এই দপ্তরের কর্ম্মচারীরা বসুমতীর কোল খুঁজিয়া নূতন অথবা উন্নত আকার ও গুণের ফল ফুল তরকারী শস্য গাছ ঝোপ বাহির করে এবং নিজদের দেশে নেই-সব আজ্জইতে চেষ্টা করে। অল্প দিন আগেও আমেরিকায় ধান হইত না, আমেরিকানরা বিদেশের চাল কিনিত; কিন্তু চারা আজ্জানো দপ্তরের চেষ্টায় এখন আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল প্রদেশে প্রচুর ধান জন্মিতেছে; টেক্সাস ও লুইসিয়ানা প্রদেশে ধেনো জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। এখন আমেরিকা নিজের ঘরের অভাব মিটাইয়া বিদেশে, এমন কি ধেনো দেশেও, উদ্বৃত্ত ধান রপ্তানী করিয়া আনিতে পারিতেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ধান্য উৎপাদনের দেশ; ভারতের চাল বিদেশে রপ্তানী হইয়া মদের ভাঁটিতে যখন মাদকতার উপকরণ জোগায় তখন ভারতবাসীর পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণের অভাবে যে অবস্থা হয় তাকে গভর্মেণ্ট না বলিলেও আমরা দুর্ভিক্ষ; এইরূপ অবস্থায় আমাদের অন্নপূর্ণা ভারতমাতা আমেরিকার কাছে ভিক্ষাপাত্র পাতিতে বাধ্য হন।

আমেরিকায় কয়েক বৎসর পর পর অনাবৃষ্টি হওয়াতে গমের ফসল নষ্ট হইয়া ক্ষতি হইতে থাকে তখন চারা আজ্জানো দপ্তরের চেষ্টা হইল সন্ধান করিতে হইবে পৃথিবীতে এমন কোনো জাতের গম আছে কি না যাহা অল্প জলেই জন্মিতে পারে। ভূতত্ত্বল তল্লাস করিয়া বাহির করিল সাইবেরিয়া দেশে দুমরুম নামে পরিচিত গম অল্প বৃষ্টিতেই ফলে। চারা আজ্জানো দপ্তরের কর্ম্মচারীরা সাইবেরিয়া হইতে আমেরিকায় দুমরুম গমের বীজ রপ্তানী করিতে লাগিল। এবং অল্প দিনেই গমের ফসলের অনাবৃষ্টির ভয় দূর করিয়া দুমরুম আমেরিকায় কায়েমি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এখন দুমরুম চাষে বছরে ন ববই কোটী টাকা আমেরিকার চাষীরা লাভ করে।

চারা আজ্জানো দপ্তর নূতন চারা আমদানী করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না; তারা গাছপালায় রোগ সম্বন্ধেও ডাক্তারদের মতন সন্ধান ও প্রতিকার করে।

কোনো চাষার ক্ষেতের কোনো ফসলের কোনো রকম পীড়া কীড়া বা উপদ্রব উপস্থিত হইলে তারা ঐ দপ্তরে জানায়; দপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞরা ঐ রোগ কীড়া বা উপদ্রবের স্বরূপ ও প্রকৃত কারণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করে ও তার প্রতিকারের উপায় চাষীকে জানাইয়া দ্যায়। এর জন্য চাষীর কাছে কোনো মূল্য লওয়া হয় না।

ফসলের শত্রু পোকার শত্রু-পোকার পালনের ক্ষেত্র—পাতি লেবুর গাছে এক রকম পোকা লাগিয়া ফসল নষ্ট করিত; সেই পোকার শত্রু খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির হইল দক্ষিণ আফ্রিকার একরকম উকুন-মাছি; সেই মাছি দেশে লইয়া গিয়া পোকাদের লেলাইয়া তাদের বিনাশ করা হইতেছে। তুর্কা-দেশে একরকম পোকা আছে যারা ডুমুরের গাছে লাগিয়া ডুমুরের ফলন বেশী করে। চারা আজ্জানো দপ্তর তার সন্ধান পাইয়া সেই পোকা আমেরিকায় আমদানী করিয়া ডুমুর ফলনের সুবিধা বাড়াইয়া লইয়াছে। এক ক্যালিফর্নিয়া দেশে বছরে ২০০।২৫০ মোন ডুমুরের ব্যবসা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষিবিদ্যালয়ে দোহাল গাইএর তত্ত্ব অধ্যয়ন—কৃষিবিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব শ্রেণীর ছাত্রেরা ঘোড়ার প্রকৃতি শিক্ষা করিয়া থাকে। ধোয়া বিশুদ্ধ কাপড় পরিয়া আমেরিকার গোয়ালিনীর দুধ দোওয়া নিয়ম। পশুপালন দপ্তর দেশের পশুপালন ও পশুপক্ষীর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির তত্ত্বাবধান করে। গোরু ঘোড়া ভেড়া ছাগল শূকর মুরগী হাঁস ইত্যাদি পশুপক্ষীর জাতের উৎকর্ষসাধন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট বড় পশুপক্ষী আমদানী করিয়া দেশে তাদের বংশ বিস্তার, শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচন করিয়া করিয়া তাদের বংশানুক্রমে গুণের উৎকর্ষ সাধন, পশুআহার বাস রোগ-চিকিৎসা ইত্যাদি এই দপ্তরের ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। কোথাও কোনো লোকের পালিত পশুপক্ষীর রোগ বা মারী হইলে এই দপ্তরে খবর পাঠাইলেই প্রাজ্ঞেরা গিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। দোহাল পশুদের পালনপ্রণালী প্রচার

করাও এই দপ্তরের প্রধান কর্ত্তব্য। গোয়ালাদের ক্ষীর ছানা মাখন সর প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক ও বিশুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য অভিজ্ঞ লোকেরা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়া বেড়ায় এবং কেহ নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করিলে তারা তাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে।

এইরূপ আরো অনেক রকমের দপ্তর দেশের কৃষক ও ব্যাপারীদের সাহায্যের জন্য কৃষিবিভাগের অন্তর্গত হইয়া আছে।

চাষী যদি আরো বেশী জমি জমা লইবার, জমির সার কিনিবার, মোটর লাঙ্গল ইত্যাদি কলের যন্ত্র কিনিবার, বা ঘোড়া গোরু কিনিবার ইচ্ছা করে এবং কোথাও সুবিধার সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে না পারে তবে তারা গভর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠিত কৃষিব্যাঙ্কে গেলেই কর্জ্জ পায়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এমন বারোটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। এইসব ব্যাঙ্ক চাষীদের বছরে শতকরা ৫।৬ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ দেয়; সেই টাকা ৪০ বছরের মধ্যে শোধ করিতে পারিলেই হইল। এইরূপে ব্যক্তির ইচ্ছা ও আগ্রহকে ফলবান হইতে দেশের গভর্মেণ্ট নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞান যেমন শিল্পসাধনার ভৃত্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি কৃষিরও ভৃত্য হইয়াছে। কৃষি ও চাষ এখন প্রতিপদে বিজ্ঞানের নিপুণ সেবায় ও যত্নে ক্রমশ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে।

বিশুদ্ধ জড়বিজ্ঞান ও রসায়ন, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, যন্ত্রবিজ্ঞান সমস্তই কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে এবং চাষীকে এইসব বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি কার্য্য করিতে হয় বলিয়া তাকেও এইসব বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইতে হইতেছে। জমির গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য ভূতত্ত্ব, সারের জীবাণুর ও ফসলের কীটের প্রকৃতি জানিবার জন্য জীবতত্ত্ব, ফসলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়ন, যন্ত্রপাতি চালনা ও মেরামতের জন্য জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান, পশুপক্ষী পালন ও রক্ষার জন্য প্রাণীতত্ত্ব জানা কৃষক ও চাষীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর চাষা বলিতে অসভ্য মূর্খ লোক বুঝায় না, চাষা এখন ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ারের সমতুল্য সুশিক্ষিত ভদ্র ব্যবসাদার; চাষা হইতে হইলে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া হাতেকলমে কাজ শিখিয়া তবে সিদ্ধ হইতে হয়। এখন আমেরিকার প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্যালয়ে কলেজে স্কুলে নানা শিক্ষার সঙ্গে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে শত শত চাষা শিক্ষক অধ্যাপক হাজার হাজার ছাত্রকে চাষা হইবার শিক্ষা দিয়া থাকেন; এখন সমস্ত দেশে হাজার হাজার ছাত্র চাষের কাজ শিখিতেছে। চার বৎসর অন্তর এতগুলি চাষা ক্ষেতে ক্ষেতে চারাইয়া যায়।

আমেরিকার চাষারা এইরূপ শিক্ষায় ও গভর্মেণ্টের সাহায্যে ও সহযোগিতায়

পৃথিবীর মধ্যে সবার সেরা চাষা হইয়া উঠিয়াছে; তাদের কাছে পৌঁছিতে পারে এমন চাষা কোনো দেশেই দেখা যায় না। গোরু ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল দিয়া চাষ একরকম উঠিয়াই গিয়াছে; এখন জমি চষা, বিধে দেয়া, মই দেওয়া, আস নিড়োনা, ফসল কাটা, আটী বাঁধা, শস্য আছড়ানো, মাপা, বস্তাবন্দী, সব কলে চটপট হয়; সেইসব কল চলে হয় মোটরে নয় কেরোসিন তেলের আগুনের তেজে। পাঁচবৎসর আগে দেশে একটীও কলের লাঙ্গল ছিল না; কিন্তু এখন ৫ লক্ষ কল ক্ষেতে ক্ষেতে খাটিতেছে। কলের সাহায্যে ক্ষেতের উৎপন্ন ও কৃষকের লাভ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। কলের সাহায্যে চাষার কাজ লাভজনক যেমন হইয়াছে তেমনি সুখকর সহজ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষিবিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা,—আমেরিকার চাষাদের এই সমূহ উন্নতি ও সুখসম্পদ হইয়াছে দুই কারণে—(১) চাষারা উন্নত কল্যাণকর উপায় বুঝিয়াছে ও তাহাই তৎপরতার সহিত অবলম্বন করিয়াছে, পুরাতনের বর্জ্জনে ও নূতনের অর্জ্জনে তাদের দ্বিধা হয় নাই, বাপপিতামহের আমলের জ্ঞানের জন্য মোহ তাদের অন্ধ করিয়া রাখে নাই; (২) গভমেণ্ট নানা রকমে সাহায্য করিয়া চাষাদের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অগ্রসর তৎপর করিয়া তুলিয়াছেন। সে দেশের গভমেণ্ট জানেন যে, বৃহৎ সমাজদেহেরই সামান্য অবয়ব গভর্ণমেণ্ট, সমগ্র কলেবরের তুলনায় অবয়ব নগণ্য, কলেবরের কল্যাণকর সেবার জন্যই অবয়বের আবশ্যকতা; অবয়ব কলেবরের ভৃত্য মাত্র, ভৃত্যের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা শুশ্রূষাই করা; কলেবরের উপর প্রভুত্ব ফলাইবার অধিকার তার নাই। গভমেণ্ট সমাজের সেবক ও ভৃত্য, সমাজের শাসক ও প্রভু নয়; গভমেণ্ট সামাজিক হিতসাধনের উপায় মাত্র। দেশের জন্যই গভর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্টের জন্য দেশ নয়।

ভারতের গভমেণ্ট কি তাঁদের এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন?

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(পুনরাবৃত্তি)

পূর্ব্বে কায়স্থ জাতিই বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও উন্নত ছিলেন; কিন্তু ইহারা বরাবরই বিলাসী ও অমিতব্যয়ী। এ প্রদেশের ভূম্যধিকারীর মধ্যে প্রায় সকলেই কায়স্থ ছিলেন। ইঁহারা কখনই স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতেন না এবং এখনও করেন না। ইহাদের চাকরীই উপজীবিকা। ইহা ব্যতীত প্রায় সকলেরই ভূসম্পত্তি থাকায় কৃষাণ রাখিয়া চাষ করিতেন এখনও করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতিরা

এত চাকরী প্রিয় ছিলেন না। এ জন্য পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় কায়স্থগণের এত চাকরি দুর্লভ ছিল না। চাকরী-প্রিয় কায়স্থ জাতির সভ্যতা, বিলাসিতা, বিদ্যা বত্তা পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও উন্নতি দেখিয়া অন্যান্য জাতিগণ কৃষিশিল্পি প্রভৃতি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর জন্য লালায়িত। বৈদ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসার জন্য বরাবরই উন্নত। এ অঞ্চলে বৈদ্য জাতি নাই। ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া চাকরী প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা বিশেষ উন্নত। পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ কম ছিলেন, এখন অনেক ব্রাহ্মণই সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর (নিষ্কর জমির অধিকারী ছিলেন, এখনও কেহ কেহ আছেন। ইহাঁরাও পূর্ব্বে কৃষাণ রাখিয়া আপনাদের ব্রহ্মোত্তর জমির আবাদ করিতেন, এখনও করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি থাকিলেও এক্ষণে কায়স্থ জাতির আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। চাকরীর দুর্লভতা ও অমিতব্যয়িতা বিলাসিতার জন্য কায়স্থ জাতির এক্ষণে আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও কায়স্থ জাতির অবনতির অন্যতম কারণ। পুত্র কন্যার বিবাহেও অনেক কায়স্থ এক্ষণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সকল কায়স্থ ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে ভূমিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। বিলাসিতাও অমিতব্যয়িতাও চাকরী প্রিয়তাই ইহাদের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। আর্থিক বিষয়ে কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ উন্নতি পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলের প্রায় সকল জাতিই কৃষি উপজীবী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিগণ স্বহস্তে চাষ করিতেন না, বটে, কৃষাণ রাখিয়া প্রায় সকলেই চাষ করিতেন। ধানের চাষই এ প্রদেশের কৃষকগণের প্রধান অবলম্বন। এ প্রদেশের শিল্পীগণ ধানের আবাদের সময় শিল্প কার্য্য বন্ধ করিয়া চাষে মনোযোগী হইত। ধান চাষই এখনকার সকলেরই প্রধান উপজীবিকা ছিল। তখন পরিশ্রমের ও শস্যের মূল্য কম থাকায়, সাধারণের অবস্থা অবনত ছিল।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে টাকা অতি দুর্লভ ছিল। এ প্রদেশের কৃষিজাত ও শিল্পিজাত দ্রব্য এত সুলভ বা সস্তা ছিল যে, বহুসংখ্যক দ্রব্য বিক্রয় না করিলে একটী টাকা পাওয়া যাইত না; শস্যের পরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল. একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এমন কি মজুরদিগের পারিশ্রমিক ও শস্যে প্রদত্ত হইত। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে বিলাসতা, সভ্যতা ও আড়ম্বর প্রিয়তা না থাকায়, নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য প্রয়োজনে পরিণত হইত না। অধিকাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই গৃহে উৎপন্ন হইত, তজ্জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় বা শস্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইত না। তখন কড়ির ব্যবহারও খুব প্রচলন ছিল। কড়ি দিয়া সকল দ্রব্যই ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। পয়সার একপণ কড়ি করিয়া প্রচলন ছিল। পূর্ব্বে আধলা (অর্দ্ধপয়সা) মুদ্রারূপে ব্যবহার হইতে

দেখিতে পাওয়া যাইত না। আধ পয়সার বা সিকি পয়সার জিনিষ কিনিতে হইলে, কড়ি দিয়াই ক্রয় করা হইত। প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যই কৃষিজাত থাকায় ক্রয় করিতে হইত না। চাউল, কলাই ডাইল, তরিতরকারী, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যই কৃষিজাত থাকায় ক্রয় করিতে হইত না। সকল গৃহস্থ সে সময়ে নিজ নিজ বাটীতে বা বাড়ীর পার্শ্বস্থ জমিতে প্রয়োজনীয় তরিতরকারী, ফলের বৃক্ষ বপন বা রোপণ করিত। বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা প্রয়োজনীয় তরকারী আবাদ করিতেন, তজ্জন্য এখানকার ন্যায় হাটে বাজারে পয়সা দিয়া তরিতরকারী ও শাক সব্জী ক্রয় করিতে হইত না। চাষে যে শর্ষপ ও তিল জন্মিত, তাহা কলুকে দিয়া তৈল ও খইল গ্রহণ করিত। লবণ সকল গৃহস্থকেই ক্রয় করিতে হইত। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে বিলাতী আলু, কপি প্রচলন কম ছিল। পূর্ব্বে ঐ সকলের চাষ এ প্রদেশে হইত না। আলু হাটে ও বাজারে পূর্ব্বেও কিনিতে পাওয়া যাইত। এখন ঐ সকলের চাষ ও এ অঞ্চলে হইতেছে। বাঁশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ। গৃহাদি নির্ম্মাণে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সকল গৃহস্থেরই বাঁশ ছিল। এখনও অনেকেরই আছে। বাঁশের ন্যায় প্রয়োজনীয়, লাভজনক উদ্ভিদ এ প্রদেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ স্থানেই ৬০ তোলায় সের ছিল। কয়েক বৎসর হইতে ৮০ তোলায় সের হইয়াছে। পূর্ব্বে ধান্য চাউল, কলাই, প্রভৃতি শস্য ওজনে বিক্রিত হইত না। শস্যাদি মাপিবার জন্য বেতের সের, কাঠার প্রচলন ছিল। ৬০ তোলা পরিমিত চাউল বা কলাই চুড় দিয়া বেতের যে পাত্রে ধরিত, সেই পাত্র সের বলিয়া উহার দ্বিগুণ পরিমিত শস্য চূড় দিয়া ধরিলে কাঠা বলিয়া থাকে। যে কাঠায় চাউল, কলাই দুই সের ধরে, সে কাঠায় ধান মাপিলে ৬০ তোলা সেরের ওজনের দুই সের ধান ধরে না। ওজনের দুই সেরের অপেক্ষা অনেক কম হয়। ঐরূপ দুই সেরের কাঠার ২৮ কাঠা হইতে স্থান বিশেষ ৩২ কাঠায় একমণ হইয়া থাকে। মোটামোটি ৩০ কাঠার ওজনে একমণ ধান হয়। ধানের মোটা মিহি এই ন্যূনাধিক্য থাকায় এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে।

উর্ব্বরা জমিতে যে ধান জলে দাঁড়াইয়া পাকে, সে ধানের গুরুত্ব অধিক। এইরূপ ধানই ২৮ কাঠার ওজনে একমণ হইয়া থাকে। নিস্তেজ জমিতে ধান পাকিবার অনেক পূর্ব্বে যে জমির জল শুষ্ক হইয়া যায়, সে জমিতে যে ধান জন্মিয়া থাকে, তাহার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এইরূপ ধান ২৯ কাঠা হইতে ৩২ কাঠার ওজনে একমণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ধান্য চাউল, বেত্র নির্ম্মিত সের, কাঠায় মাপিয়া ক্রয় বিক্রয় হইত। এখন সের কাঠায় মাপিয়া ধান্য চাউল কলাই প্রভৃতি শস্য আর ক্রয় বিক্রয় হয় না।

(ক্রমশ)

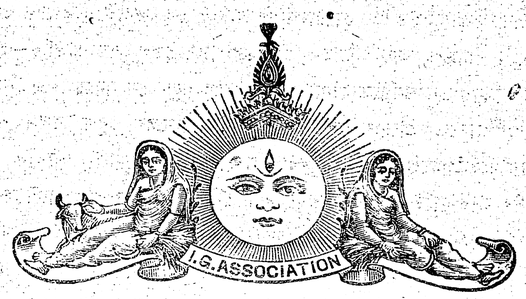

বৈশাখ, ১৩২৭ সাল।

চাষে উন্নতির অন্তরায়

অনেক স্থলে জমিতে প্রজার কায়েমী সত্ব না থাকায় তাহারা জমির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে পারে না—করিতেও চায় না। তাহার জমির খাজনা বাড়িতে থাকে—বাকী খাজনার দায়ে তাহাদের জমি নিলাম হয়—তাহাদের কত সাধের জমি কথায় কথায় অন্যের হাতে চলিয়া যায়। যেখানে বাঁধাবাঁধি সর্ত্তও থাকে—সেখানেও প্রজার কষ্ট—আইন দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে পারে না। জমিদার প্রবল—মনে করিলেই ছলে, বলে, কৌশলে প্রজার জমি কাড়িয়া লইতে পারেন এবং তাহা প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে! এই সকল কারণে প্রজা নিজের উন্নতিতে; জমির উন্নতিতে আস্থাহীন। 'রায়ত' প্রাজর দুঃখের কাহিনীর একটী সুন্দর চিত্র দিয়াছেন—প্রজাগণ বলেন যে, দশ আইন, প্রজাস্বত্ব আইন—এই দুই আইনের যে দুইটি মনির মালা আমাদের গলায় পরাইয়াছেন তা ফণী হইয়া আমাদিগকে কি দংশন যাতনাই না দিতেছে! আমাদের খাজনা বাড়িয়া চলিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে আমাদের খাজনা বাড়াইবার কথা কৈ? আমার জমি,যা আমি রৌদ্রে পুড়িয়া—বিষ্টিতে ভিজিয়া কর্দ্দমে পচিয়া, জোঁক পোঁক সাপ বাঘের দংশন যাতনা সহিয়া,-দেহের শ্রম, সিন্দুকের পুঁজি পাটা সমস্ত ঢালিয়া পাইয়াছি,—তাহা আমার দান বিক্রী হস্তান্তর করিয়া ক্ষমতা নাই। আমার পিতৃ-পুরুষের বাস্তভিটায় আমার কোন অধিকার নাই। যখন জমিদার ধমক দিবে তখনই আমার সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িতে হইবে। আমার জমির গাছ আমি কাটিতে পারি না, তা কাটে জমিদার, আমার জমিতে আমি পুকুর কাটিতে পারি না, পাট ভিজাইবার ডোবা খুড়িতে পারি না, ইন্দারা কূপ কাটার আমার অধিকার নাই—দায় ঠেকিয়া—রায়তের ঘরের বৌ যায় ক্রোশ ব্যবধান হইতে জল আনিতে। রায়তের যা ছিল তা সবই গিয়াছে। সে হালট, হাট

বাট, গোবাট ঘাট নাই—সে শ্মশান গোরস্থান বারোয়ারী ইদ গাহের ভূমি নাই। সে আগার পগাড় ভাগাড় নাই। গোচারণের মাঠ নাই। সেই ছাব্বিশ ইঞ্চি হাতের মাপ নাই; আইল বাতর সরহকমি নাই, এসব আমাদের আদি কাল হইতে পাওয়া বিভব; হিন্দু রাজার দান, বৌদ্ধ সম্রাটের দান; মোগল পাঠান বাদসাহের দান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মঞ্জুরী প্রাপ্ত বৈভব। জমিদারের হাতে পড়িয়া একে একে সব গিয়াছে; মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে,—উড়িয়া উপিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—এখন দেশে ঠাঁই হইয়াছে উঠবন্দী ও কোর্ফার। জমিদারের রাক্ষসী উদরে সব লয় হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

ইহার উপর জমীদার রায়তের ঘাড় মোড়া দিয়া আদায় করেন ৪০।৪২ রকমের ট্যাক্স। অগ্রিম দেয় টাকার উপর সুদ—তা চক্রবৃদ্ধি হারে—নেংটি সম্বল রায়তের দেহ পীড়নে শোষণে দলনে দমনে অস্থিচর্ম্মসার; জঠর শুষ্ক। এমন করিয়া আথমাড়া কলে ফেলিয়া পিষিলে, এমন করিয়া নিংড়াইলে তরু শুষ্ক হইবে না' ত কি? তাই তরু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

আজ সুবাতাস বহিয়াছে. আজ হাওয়া বদ্‌লাইয়াছে। বিজেতার হস্তে ইংরাজ যে মহাদান করিয়াছেন, দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কী শাসন যা পরিবর্ত্তন করিতেছেন রায়ত হুসিয়ার হইলে আইন সভার কর্ত্তৃত্ব রায়তের হাতে আসিবেই আসিবে; রায়তের বরাত আবার ফিরিবে। সেই আশায় আজ রায়ত মাতিয়াছে আসাম-অরাকান প্রান্ত হইতে বিহার-আরা প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলনের তরঙ্গ হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চৌতারায় সভা, মূল গ্রামে সভা, বিক্রপুরে সভা, নাকদি সভা, কৃষ্ণনগরে সভা, ফরিদপুরে সভা মৈমনসিং—গফর গাঁওতে ঢাকা-রাজাপুর ও আর্চ্চাতে, মালদহে—কতস্থানে নাম করিব, প্রবন্ধের কলেবর আর কত বাড়াব? আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল রায়ত সভা সমিতি দেখিতেছি, যে সকল সভা সমিতির অহ্বান পাইতেছি, তাহার ভাব ভঙ্গীতে উৎসাহ অনু প্রেরণাতে উপলব্ধি করিতেছি—বুঝিবা আবার রায়তের সুখের দিন ফিরিয়া আইসে—বুঝিবা 'শুষ্কতরু মুঞ্জরে'

রায়তসভা—চৌতারার সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১ম প্রস্তাবন—এই সভা সরকার বাহাদুরে নিকট সবিনয়ে নিবেদন করেন যে, বাংলার রায়ত সাধারণের সহিত অগৌণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হউক এবং রায়তের ভূসম্পত্তিতে নিব্যূঢ় স্বত্বাধিকার স্থাপিত হউক।

২য় প্রস্তাব—এই সভা প্রস্তাব করেন যে, জমিদাদেরা যে সকল আবুয়াব বা বে-আইন আদায় সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা এককালে বন্ধ করার জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে এমন একটী ধারা সন্নিবেশিত হউক যাহাতে আবুয়াব বা বে-আয়িনী আদায় সংগ্রহ করা Cognizable বা পুলিশ চালানি অপরাধ মধ্যে গণ্য হয়।

৩য় প্রস্তাব।—এই সভা প্রস্তাব করেন যে, সংস্কার আইন মূলে রায়তসাধারণ আইন সভায় সভ্য পাঠাইবার যে অধিকার পাইয়াছেন, তাহাতে রায়তের হিতৈষী ব্যক্তি দিগকেই যেন সভ্য মনোনয়নকল্পে ভোট দেওয়া হয়।

চর জমি সম্বন্ধে নিয়মাবলী

নদীর চর জমির দখলি স্বত্ব লইয়া মাঝে মাঝে গবরমেণ্টের সহিত জমিদারের বা রায়তের বিবাদ এবং মামলা হইয়া থাকে। নদীগর্ভে সহসা উত্থিত চরের দখল লইয়া এইরূপ অনেক হাঙ্গামা—অনেক মামলাও হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চর জমির দখল জনিত বিবাদের প্রতিবিধানকল্পে এক বিল পেশ হইয়াছে। এই বিলে চর জমির দখল লইয়া যাহাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না ঘটে, তাহার প্রতিকার কল্পে ত্বরিত কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য কলেক্টরকে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

১। লুপ্ত পয়স্থি ও স্বস্থল পয়স্থি জমি লইয়া বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বদাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নানাবিধ মামলা হইয়া থাকে। বলিতে গেলে অধিকাংশ গুরুতর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার মূল কারণই লুপ্তপয়স্থি ও স্বস্থল পয়স্থি জমি লইয়া বিবাদ ও তর্ক। ইহা কিপ্রকারে মীমাংসিত হইবে তৎসম্বন্ধে বহুকাল আলোচনা করিয়া গবরমেণ্ট সম্প্রতি একটী আইনের পাণ্ডুলিপি আইন সভায় উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাহা বিবেচনা করার জন্য সিলেক্ট কমিটির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। প্রস্তাবিত আইনটী সম্বন্ধে যাহাতে সর্ব্বসাধারণে আলোচনা করিয়া মন্তব্যাদি প্রকাশ করিতে পারেন, তজ্জন্য উহার ধারাগুলির চুম্বক নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

২। কালেক্টর সাহেব যখন জানিতে পারিবেন যে কোন চর লইয়া বিরোধ কিংবা বিরোধের সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি উহা ক্রোক করিতে এবং পিলার দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করিতে পারিবেন। ঐরূপ ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি কালেক্টর স্বয়ং কিম্বা রিসিভার নিযুক্ত পূর্ব্বক শাসন সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। স্বার্থবিশিষ্ট কোন পক্ষ যদি দেখাইতে পারেন যে কোন বিরোধ কিংবা বিরোধের সম্ভাবনা নাই, তবে কালেক্টর তাঁহার হুকুম রহিত করিবেন।

৩। তৎপরে কালেক্টর ঐ ভূমি জরিপ করাইয়া নক্সা প্রস্তুত করিবেন এবং তিনি যে সকল স্বার্থ বিশিষ্ট লোকের নাম জানিতে পারেন, তাহার তালিকাসহ কাহার স্বত্ব আছে, তাহা নির্ণয় জন্য বিষয়টী জেলার প্রধান দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ করিবেন। ঐ আদালত স্বয়ং বা তাহার আদেশমত অধীনস্থ কোন আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার মত উহার বিচার করিবেন। আদালত কোর্টফিস ও অন্যান্য খরচা সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ সঙ্গত মনে করিবেন, তাহা দিতে পারিবেন এবং উহা রাজকীয় প্রাপ্যের মত আদায় হইবে। আদালতের আদেশ দেওয়ানী বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। দেওয়ানী আদালত স্বীয় বিচার ফল কালেক্টরকে জানাইবেন এবং কালেক্টর তদনুসারে স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে দখল করার অনুমতি দিবেন।

৬। ৩ ধারার কার্য্য ও ৪ ধারামতে জরিপবন্দী মধ্যে যে সমস্ত খরচা হইবে, তাহা কোন্ কোন্ ব্যক্তি কি কি অংশে দিবে, তাহা আদালত নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং উহা রাজকীয় প্রাপ্যের মত আদায় হইবে। এই খরচার আদেশের বিরুদ্ধে কমিসনারের নিকট আপীল চলিবে।

৭। উপরোক্ত কার্য্য সকল নির্ব্বাহের জন্য এবং বর্ত্তমান আইনের উদ্দেশ্য গবরমেণ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রচার করিবেন।

৮। এই আইন অনুসারে কালেক্টর সদ্‌জ্ঞানে যে সমস্ত কার্য্য করিবেন, তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ মোকদ্দমা চলিবে না।

৯। ৩ ধারামতে কালেক্টর কোন্ চর ক্রোক করিবেন, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ১৪৫ ধারামতে কোন মোকদ্দমা চলিবে না। পূর্ব্বে ঐরূপ মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়া থাকিলে তাহা স্থগিত থাকিবে।

বিহারে কৃষক কনফারেন্স

প্রজাদের দাবী

(১) জমিদারের বিনা অনুমতিতে "কাস্তকারি" জমি হস্তান্তরিত হইতে পারে।

(২) ঠিকা জমিতে প্রজাদের গাছ পুঁতিবার অধিকার আছে এবং গাছ কাটিবার ও বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

(৩) "কাস্ত" জমিতে প্রজাদের কূপ খনন করিলে, বাড়ী নির্ম্মাণ করিলে তাহার 'কাস্ত' জমি বাজেয়াপ্ত হইবে না।

(৪) যতদিন গবমেণ্ট ছিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া না দেন, তত দিনে জমির খাজনা বাড়ান হইবে না।

ভারতের কৃষি-কার্য্য

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই দেশের কৃষি-বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছেন। রোথাম ষ্টেড হইতে এই অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাকে "অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিও" প্রদান করা হইতেছে। তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া য়্যাসোসিয়েসনে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ৩৩০,০০১,০০০ লোকের ভিতর ১৯৬,০০০,০০০ লোক কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সুতরাং এদেশে কৃষি বিজ্ঞানকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। ভারতবর্ষে প্রায় ৩৪৮,০০০,০০০ একার জমি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার ভিতর হইতে কেবল মাত্র ২৪৫,১০০,০০০ একার বর্ত্তমানে কৃষি কার্য্য ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে আবাদী জোতের আয়তন এতই ক্ষুদ্র, শ্রম লাঘবকারী

যন্ত্রপাতি এতই কম এবং কৃষকেরা এত অনভিজ্ঞ যে বিলাতে ৫০ একারের একখানি আবাদী জমিতে একজন কৃষক যে কাজ করিতে পারে এখানে ৫০ জনেও তাহার বেশী করিতে পারে না। চাষ আবাদের উপযোগী সমস্ত জমিই যদি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যায় এবং বিশ বা ত্রিশ একার করিয়া জমি লইয়া যদি একটী জোত গড়িয়া লওয়া যায়, তবে তাহাতে প্রায় ১৭,০০০,০০০জন কৃষক নিযুক্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে কৃষি পদ্ধতি যে বিশেষ ভাবে অবৈজ্ঞানিক এবং তাহার আদর্শ যে পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও আলোচনা হইয়াছে। অথচ আমাদের একটু দেশনায়কদের মাথার টনক তাহাতে মোটেই নড়ে নাই। এই বিশেষজ্ঞটীর কথার হয় তো অনেকেই মাথা একটু ঘামাইবেন এবং তাহার পরেই ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্যাপারের মত ইহাও ধামা চাপা পড়িয়া যাইবে।

জমিদার ও স্যার পি-সি রায়

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বাঙ্গালার দেশছাড়া জমিদারদের সম্বন্ধে "রায়ত" কাগজের সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের আসল কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"কয়েক বৎসর হইল, খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় যাই। সভামণ্ডপে অনেক মান্যগণ্য জমিদার উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—আমাকে যদি ব্যবস্থাপক সভায় একদিনের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, তবে আমি "দেশ-ছাড়া" জমিদারদের বৎসরে অনূন তিন মাস তার জমিদারীতে বাস করিতে বাধ্যকর আইন করি। আমি প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে মাসাবধি কাল দেশে বাস করি; নানা খালবিলের মধ্যে বেড়াই; প্রজাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত হয়। তাহারা ডিঙিতে একবেলার পথ বাহিয়া একটু কাদামোলা "মিঠা" পানি আনে। এতদ্ভিন্ন নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা, ডাক্তারখানা প্রভৃতির জন্য প্রায় শতকরা নিরানব্বইজন জমিদার মহাশয়গণ কপর্দ্দকও ব্যয় করা অপব্যয় মনে করেন। তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা কিসে জমির হার বাড়াইবেন। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া মোটর, চৌরঙ্গীর প্রাসাদ ও নানা রকম বিলাসিতায় এই অত্যাচারলব্ধ অর্থ ব্যয় করেন। আমি বৎসরাবধি দু-একজন বন্ধুকে বলিতেছি যে, এমন একজন উৎসাহী ও উদ্‌যোগী যুবক মিলে তিনি নানাস্থানে যাইয়া বাংলার কতকগুলি বিশেষ ধনী জমিদার সালিয়ানা কত ফালেক্‌টারীতে খাজনা দ্যান ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে কত উপস্বত্ব ও আয় ভোগ করেন এবং তাঁদের প্রজাদের কল্যাণের জন্য কয়টি পাঠশালা ডাক্তারখানা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তবে আমি তাঁর পাথেয় ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ আড়াই শত টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কোনো উপযুক্ত লোক পাই নাই। যদি "রায়তে'র পরিচালকগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া কোনো প্রতিনিধিকে ইহাতে ব্রতী করেন ও একটী রিপোর্ট রায়ত পত্রিকায় স্তম্ভে প্রকাশিত করেন, তবে আমি আমার প্রতিশ্রুত ব্যয় দিতে প্রস্তুত আছি।

আমি আমার পরীক্ষাগারের সময় হইতে কয়েক মিনিট ব্যয় করিয়া এই পত্র লিখিতেছি—অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনীয়।

উপসংহারের বক্তব্য—এর প্রতিকার রায়তদের নিজেদের হাতেই। যদি সংস্কৃত ভারতশাসন ব্যবস্থায় রায়তেরা শ্রীযুক্ত জে এন রায়ের ন্যায় রায়ত-বন্ধু লোকদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত করেন, তবে তাঁদের অভাব ও অত্যাচারের প্রতিকার অচিরেই হইতে পারিবে।"

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতায় স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। আমরা এই প্রকার প্রদর্শনীর আবশ্যকতার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে চাহি না। স্বাস্থ্য-হীন দেশে স্বাস্থ্য-কথা তুলা মন্দ নহে। তবে একটি কথা সব সময়ে মনে রাখা দরকার—সেটি হইতেছে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদ। ভারতবর্ষে গোজাতির বড় কষ্ট, তাহা আমরা জানি। এই জন্য প্রতি প্রদেশে গো-রক্ষা কনফারন্সেরও অধিবেশন হইতেছে। স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে আমরা এই গো-সমস্যার একটি অদ্ভুত মীমাংসা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ছোট ছোট টালির ঘর করিয়া দেখান হইয়াছে, গরুগুলিকে যদি জীর্ণ-শীর্ণ ঘরে না রাখিয়া টালির নির্ম্মিত ঘরে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা থাকিবে ভাল। মশা মারিবার জন্য, মাছি ধরিবার জন্য, ছারপোকা বিনাশের জন্য, হুকওয়ার্ম-ব্যারাম ভাল করিবার জন্য—যাহাকে বলে বাস্তবিক মশা মারিবার জন্য কামান দাগা, তাহাই করা হইয়াছে। আতুড় ঘরটি দিল্লী হইতে কলিকাতায় আনিবার জন্য নাকি ব্যয় পড়িয়াছে প্রায় দুই সহস্র টাকা। উক্ত ঘরটী এইখানে তৈয়ারী করিলে কোন মতে ২০৲ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। আশাকরি, পরবর্ত্তী প্রদর্শনীতে বাঙ্গালাদেশের পল্লী গ্রামগুলির অবস্থা-সম্বন্ধে যেন এইরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় না দেওয়া হয় ও অযথা অজস্র অর্থব্যয় না করা হয়।—হিন্দুস্থান।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—০:০—

জ্যৈষ্ঠ মাস

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুণ ভাঁটি বাঁধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসে বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত, কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শশার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, গোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মুল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতিত আমরান্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, ও পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপ কলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল। | ২য় সংখ্যা

রবার rubber.

(কৃষি-দর্পণ হইতে পুনরাবৃত্তি)

রবারবৃক্ষ রোপণের পর ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে বৃক্ষগুলি রবার বাহির করিবার উপযোগী হইয়া উঠে; কোথাও কোথাও ভূমির প্রচুর উর্ব্বরাশক্তি নিবন্ধন ৮।১০ বৎসরের মধ্যে গাছ তৈয়ার হয় এবং অল্প অল্প রবার প্রদান করিয়া চাষের খরচা সঙ্কুলান করিয়া থাকে। ১০।১৫ বৎসরের বৃক্ষ হইতে /২॥, /৩ সের রবার পাওয়া যায়। সমুদ্রোপকুলস্থ প্রণালী-উপনিবেশজাত বৃক্ষ হইতে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ পরিমাণ রবার উৎপন্ন হওয়ার কথা শুনা যায়, জলবায়ু ও দেশের গুণে এইরূপ হওয়া সম্ভব।

বৃক্ষ প্রকাণ্ডকায় হইলে উর্দ্ধাধঃ সমগ্র বৃক্ষকাণ্ডে ও স্থূল শাখায় ১ ফুট অন্তর অস্ত্রাঘাত করিলে বটের ন্যায় শুভ্র ও গাঢ় ক্ষীর নির্গত হয়; এই ক্ষীর কোন পাত্রে রাখিলে স্বভাবতঃ অল্পকালমধ্যে শ্বেতবর্ণ আঠা ও জল এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে; এই আঠা গোল, লম্বা চৌকা, বোতল, প্রভৃতি নানা আকারে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বৃক্ষের নিম্ন অপেক্ষা উর্দ্ধদেশ হইতেই অধিক ক্ষীর নিঃসৃত হয়। নূতন অপেক্ষা পুরাতন বৃক্ষের ক্ষীর অধিকতর গাঢ় এবং শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই অধিক পরিমাণ ক্ষীর নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপে সংগৃহীত ক্ষীরের তিনভাগের একভাগ রবার এবং অবশিষ্ট ভাগ জল। বৃক্ষ একবার কাটিয়া ১৫।২০ দিবস বিশ্রামের পর পুনরায় কাটিলে পূর্ব্ববৎ ক্ষীর পাওয়া যায়। এইরূপে বৎসরে ১২ হইতে ১৫ বা ২০ বার পর্য্যন্ত গাছকাটা যাইতে পারে, অন্ততঃ আসামের বন্যজাতিরা এইরূপেই রবার সংগ্রহ করিয়া থাকে। একটী পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ

হইতে বৃক্ষের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নির্দ্দয়ভাবে ক্ষত করিলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ক্ষীর বাহির হয়, এমনকি ১২ সেরেরও অধিক বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বৃক্ষ একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তী দুইবৎসর সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম না দিলে পূর্ব্ব সামর্থ্য ফিরিয়া পায় না। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর এইরূপে ক্ষীর বাহির করিলে বৃক্ষ অনেক সময় মরিয়া যায়। অধুনা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতি তিনবৎসর অন্তর বৃক্ষ হইতে রবার বাহির করা হইয়া থাকে, ইহাতে বৃক্ষ সতেজ থাকে সন্দেহ নাই কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ অনেক অল্প হয়, এজন্য অনেকে বৎসরে ৬।৮ বা ১২ বার এবং কেহ কেহ একবৎসর অন্তর রবার বাহির করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ ইহাতে উৎপন্নের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় অথচ বৃক্ষের কোন অনিষ্ট হয় না। প্রত্যেক কাটে ১ পোয়া আন্দাজ শুষ্ক রবার পাওয়া যায়।

যতদিন না ক্ষির বাহির করা হয়, ততদিন ইহার চাষে কেবল খরচই হইয়া থাকে, এজন্য অনেকে বৃক্ষপংক্তির মধ্যে২ কদলি, অরহর আনারস পেপিয়া, পটোল বা অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যের চাষ করিয়া খরচা উঠাইয়া থাকেন; অর্থোপার্জ্জনের ইহা একটী সুপন্থা সন্দেহ নাই। বৃক্ষগুলি প্রকাণ্ড হইলে তন্নিম্নে আর কোন উদ্ভিদ জন্মেনা। এক বন্দে ১০।২০।৫০।১০০ বা ততোধিক বিঘা পরিমাণ ভূমি লইয়া রবারের চাষ করা উচিত এবং এইরূপ চাষ করিয়া লাভ বুঝা যায়, তবে পরিক্ষার্থ অল্প পরিমাণ ভূমিতেও চাষ করা চলে। আসাম অঞ্চলে বিস্তর পতিত ভূমি পাওয়া যায়, চেষ্টা করিলে অল্প খাজনায় এ সকল ভূমি বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে এবং সরকারও এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে জমীর খাজনা, চারা ক্রয় সরঞ্জামী খরচা বাদে গড়ে বিঘাপ্রতি ২০ টা খরচা পড়ে; ভূমির অবস্থা অনুযায়ী এই খরচের হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। কিন্তু এ হিসাব সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, কারণ সরকার পরীক্ষার্থেই ব্যয় করেন লাভের জন্য নহে; সুতরাং সরকারী ব্যয় অধিক হইবেই। ব্যবসায় হিসাবে কার্য্য আরম্ভ করিলে ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয় হইতে পারে। এদেশে ইহার চাষ এখনও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই সুতরাং খরচা সম্বন্ধে একটি নির্দ্দিষ্ট হিসাব এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

কয়েক জাতীয় রবার বৃক্ষ

২। **নেপালী বট**—Ficus Macrophylla—স্থানীয় নাম টিমলা—নেপাল, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর জন্মে; ইহা বটজাতীয় মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ঠ বৃক্ষ; বৎসরে সকল সময়ে ডুমুরের ন্যায় ইহার ফল পাওয়া যায় এবং তাহা তরকারিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত করিলে বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘন শ্বেতবর্ণ প্রচুর ক্ষীর পাওয়া যায় এবং তাহাই রবারে পরিণত হইয়া থকে। ফাইকাশ ইলাষ্টিকা অপেক্ষা ইহার রবারের পরিমাণ কিছু অল্প। বঙ্গের সর্ব্বত্র এই জাতিয় বৃক্ষ জন্মিতে পারে।

৩। **ফাইকাস বা আফ্রিকান বট**—Ficus vogelie, Ficus Guinensis johnstonii.—ফাইকাশগণের এই কয়েকটী বৃক্ষ আফ্রিকায় জন্মে; ইহাদের রবার মধ্যম শ্রেণীর নিতান্ত নিকৃষ্ট নহে; এ দেশে ইহারা সুন্দর জন্মিতে পারে। ইহাদের চাষাবাদ ফাইকাস ইলাষ্টিকার মত।

৪। **কাঁটালজাতীয় বৃক্ষ**—(**Artocarpus integrifolius**) পনস, কাঁটাল। ইহা ক্যাষ্টিলোয়া, ফাইকাসাদিগণের ন্যায় আর্টিকেসিয়া (Urticaceœ) বর্গের অন্তর্গত। সুবিখ্যাত রুটিবৃক্ষ (Bread fruit tree) ইহার অন্তর্গত। কাঁটালের সর্ব্বাঙ্গ এবং ফল হইতে নির্য্যাস পাওয়া যাইলেও পক্ক অপেক্ষা অপক্ক ফলে অধিক পরিমাণ নির্য্যাস পাওয়া যায়। এই নির্য্যাসে নিকৃষ্টজাতীয় রবার প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এপর্য্যন্ত এবিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। এক একটী বৃক্ষের ফল হইতে ⁄১॥ ⁄২ সের পরিমাণ নির্য্যাস পাওয়া যায় এবং কাল বিলম্বে ইহা হরিদ্রাভ হইয়া থাকে। রবারের নিমিত্ত চাষ করিতে হইলে যে সকল বৃক্ষে প্রচুর ফল জন্মে, তাহারই বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা উচিত, কারণ ফলের সংখ্যা যত বাড়িবে রবারের পরিমাণও তত বাড়িবে। আঠার অন্য ব্যবহার—কাষ্ঠখণ্ডে কাঁটালের আঠা জড়াইয়া শুকাইয়া জ্বালাইলে রাত্রিতে উজ্জল মশাল হয়; পূর্ব্বে পল্লিগ্রামে অনেকে বর্ষাকালে বা রাত্রিতে ব্যবহারের জন্য এইরূপ মসাল প্রস্তুত করিত। ইহার উৎপন্ন রবারের পরিমান বটাদির ন্যায়। নদীয়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলায় বিস্তর দেখা যায়, চেষ্টা করিলে এই সকল জিলার লোকেরা এই রবার সংগ্রহ করিতে পারেন।

৫। **ব্রেজিল দেশীয় বট**—**Manihot glaziozii—Ceara rubber.** ম্যানিহটজাতীয় রবারের নামান্তর ম্যানিকোবা রবার (Manicoba rubber)। ইহা ব্রেজিলদেশীয় রবার ভারতবর্ষে অনেক স্থানের ইহার চাষসম্বন্ধে পরীক্ষা চলিছে, এবং পরিক্ষায় ফল বিশেষ সন্তোষজনক হওয়ায় চাষের আশা করা যায়। সিংহলে ইহার চাষ হইতেছে কিন্তু এখনও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, সিংহল অপেক্ষা মান্দ্রাজ, মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রচুর চাষ হইতেছে। এই জাতীয় বৃক্ষ সরস ও নিরস সর্ব্বপ্রকার ভূমির উপযোগী হইলেও কিছু নিরস আঠাল বা কঙ্কর ময় ভূমিতে ভাল জন্মে। ইহা অত্যন্ত দৃঢ়প্রাণ (Hardy) উদ্ভিদ, সমুদ্রতট হইতে ৬০০০হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং বাৎসরিক স্বল্প বৃষ্টিপাতশীল, ৪৪হইতে ৮০ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপময় ভূমি ভাগে জন্মিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর এবং চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটী প্রভৃতি জিলায় ইহা সুন্দর জন্মিবে আশাকরা যায়। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে ইহা অতি সুন্দর জন্মিতেছে।

শীতের প্রারম্ভ বা বৈশাখ, জৈষ্ঠ মাসই বীজবপনের প্রকৃত সময়। অবাধবাতাতপ সঞ্চারশীল উন্মুক্তস্থানে সাধারণ মৃত্তিকার সহিত কিছু কয়লা গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া বীজগুলি

৩ ইঞ্চি অন্তর বপন করিতে হয়, উপরে ১ ইঞ্চিপরিমাণ মৃত্তিকাচাপা দিয়া মধ্যমরূপ দাবিয়া দিতে হয়। এইরূপ শীতবাতবর্ষময় স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে ২।৩মাসের মধ্যেই বীজ চৌকায় যাহাতে কোন রূপে জঙ্গল জন্মিতে না পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সিয়ারার বীজ হইতে চারা উৎপাদনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুকর ও শ্রেষ্ঠপন্থা। ইহার বীজাবরণী ত্বক অত্যন্ত কঠিন এবং কৃত্রিম উপায়ে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে। নিম্নলিখিত উপায়গুলি দ্বারা অতি শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

১। বীজের উভয় পার্শ্ব উকার দ্বারা সামান্য চাঁচিয়া লইয়া পরে কথিতমত মৃত্তিকায় বপনকরতঃ প্রত্যহ দুইসন্ধ্যা জলসেচন করিতে হইবে।

২। বীজ উষ্ণজলে ভিজাইয়া সেইজল শীতল হইলে পূর্ব্বমত বপন করিতে হইবে।

৩। বীজ ছয়দিবসকাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পূর্ব্ববৎ বপন করিতে হইবে।

৪। ৮।১০ ইঞ্চি উচ্চ কোন কাষ্ঠের বাক্স বা টব ৩ ইঞ্চি পুরু সদ্য অশ্ববিষ্ঠারদ্বারা পূর্ণকরতঃ সামান্য দাবিয়া তাহাতে ঘনকারে বীজবপন করিয়া তদুপরি ঐরূপ ৩ইঞ্চি পুরু অশ্ববিষ্ঠার আচ্ছাদন দিতে হইবে এবং যাহাতে বিষ্ঠা শুষ্ক হইতে না পায় তজ্জন্য মাঝে মাঝে জল দিয়া আর্দ্র রাখিতে হইবে; ইহাতে ৮।১০ দিনের মধ্যে বীজগুলি সার রাশি ভেদ করিয়া অঙ্কুরিত হইবে; তৎপরে ২।৩টী পাতা ছাড়িলে চারাগুলি ধীরে উঠিয়া এক একটী মাঝারি আকারে টবে রোপন করিবে এবং চারা চৌকায় রাখিয়া আবশ্যকমত জল-সেচনাদিদ্বারা পালন করিতে হইবে। উল্লিখিত কয়টী উপায়ে ১ হইতে ৪ সপ্তাহের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

চারাগুলি ১ফুট আন্দাজ উচ্চ হইলে পূর্ব্ব হইতে কর্ষনাদি দ্বারা প্রস্তুত ও নিরূপিত ক্ষেত্রে অর্দ্ধ হস্ত আন্দাজ গভীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর খনন ও তাহাতে সার মিশ্রিত করিয়া আষাঢ়ের প্রথম বরাবর কোন সজল মেঘাচ্ছন্ন দিবসে চারাগুলি টব হইতে খুলিয়া লইয়া রোপন করিয়া মৃত্তিকা উত্তমরূপ দাবিয়া দিতে হইবে। যতদিন না লাগিয়া যায় ততদিন প্রত্যেক চারার উপর কোন আচ্ছাদন দেওয়া উচিত; গবাদি পশুতে গাছ খাইয়া ফেলে এজন্য চারায় ঘেরা বা সমস্ত খেতে বেড়া দিতে হইবে। ইহার পর ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার করা এবং বৎসরে একবার দুইবার কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কোন পাইটের আবশ্যক হয় না। বীজ ব্যতীত অঙ্গুলি প্রমাণ স্থূল শাখা হইতেও কলমের চারা প্রস্তুত হইতে পারে।

সিয়ারাবৃক্ষ ২৪।৩০হস্ত উচ্চ হয় ও ৬০।৭০ বর্ষকাল জীবিত থাকে। ইহা স্থানভেদে ৬ হইতে ৮।১০বৎসরের মধ্যে রবার নিঃস্রবেনের উপযোগী হইয়া উঠে ও পরবর্ত্তী ৩০ বৎসর কাল প্রচুর পরিমাণে রবার প্রদান করে, তৎপরে ইহার উৎপন্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসে। এই জাতীয় রবার প্যারা অপেক্ষা পরিমাণে অল্প উৎপন্ন হইলেও উৎকৃষ্ট জাতীয় ও মূল্যবান, উত্তমরূপ প্রস্তুত করিতে পারিলে প্যারার সমান দরে বিক্রয় হয়। স্বল্পদিনের বৃক্ষ হইতে গড়ে বাৎসরিক একসের আন্দাজ শুষ্করবার

পাওয়া যায় এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত এই পরিমাণেরও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ ১০।১৫ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত গাছপ্রতি দুই সের হইতে ৪ সের পর্য্যন্ত শুষ্ক রবার উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সরস ও নীরস প্রভৃতি ভূমির অবস্থাভেদে এই পরিমাণেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা মাত্র ত্বক্‌ভাগ মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দিলে ক্ষীর বিন্দু বিন্দু ধারায় বৃক্ষের মূলদেশে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং তাহাই সূর্য্যের উত্তাপে ঘনীভূত ও শুষ্কপিণ্ডবৎ রবারে পরিণত হয়; আমেরিকান্‌রা এই উপায়ে এই জাতীয় রবার প্রস্তুত করিয়া থাকে। লেবুররসে বা লবণাক্তজলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া বৃক্ষকাণ্ড উত্তমরূপ ধৌত করিবার পর শুষ্ক হইলে ত্বকের উপর তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বক্রভাবে কতকগুলি ক্ষত করিলে নির্গত ক্ষীরবিন্দু ধীরে ধীরে সঞ্চিত ও ঘনীভূত হইয়া রবারে পরিণত হয়, পরদিবস তাহা উঠাইয়া লইলেই হইল। মস্যুঁর লেক্রেফ (Lecref) নামক একজন ফরাসী রবারবিদ্ দুই বৎসরের বৃক্ষ হইতে এইরূপে রবার নিষ্কাশন করেন। ২।৪টা বৃক্ষ সম্বন্ধে এই উপায় প্রযুক্ত হইতে পারে কিন্তু বহুসংখ্যক বৃক্ষে ইহা সুবিধাজনক নহে, বিশেষতঃ ব্যয়বাহুল্য আছে। স্বল্পবয়স্ক বৃক্ষ হইতে খরচা বাদে গাছপ্রতি ১৷৷০ টাকা লাভ হয়।

মানি ছোট রবার—Manihot dichotoma; Manihot piauhyensis; Manihot hep aphyll. Manicoba rubbers. ইহাদিগকে ম্যানিকোবা রবারও বলে। এই তিনজাতীয় ম্যানিহট রবারবৃক্ষ যথাক্রমে ব্রেজিলদেশের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলস্থ বাহিয়া (Bania) পিয়াহী (Piauhy) এবং রাইওসান ফ্রান্সিস্কো (Rio sau fransisco) নামক প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটীর পার্থক্য অতিসামান্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যতীত অনুভব হয় না। সিয়ারা অপেক্ষা ইহারা অধিকপরিমাণ রবার উৎপাদক ও অধিকতর ঋতুদ্বন্দ্বসহনশীল; ঝড় ইহাদের কোন অপকার করিতে সক্ষম হয় না। ত্বক্ অপেক্ষাকৃত কোমল এবং অনিয়মিতরূপে অধিকপরিমাণ নির্য্যাস বাহির করিলেও সহসা মরিয়া যায় না; ইহারা কিছু শুষ্ক ভূমিতে ভাল জন্মে এবং ভূমি অনুর্ব্বরা হইলেও বৃক্ষের বৃদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় না। সমুদ্রতট হইতে ২০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিতেই সুন্দর জন্মে। প্রতি একরে প্রায় ১০০।১২০টা বৃক্ষ ধরিতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তটী ১৫।২০ হস্ত উচ্চ বৃহৎঝোপে পরিণত হয় এবং এঁটেল দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে, ইহার ত্বক সিয়ারা অপেক্ষা কোমল ও ফিকাবর্ণ; চারিবৎসরের মধ্যে গাছগুলি রবার নিঃসারণের উপযোগী হয়; প্রথম প্রথম গাছপ্রতি অর্দ্ধসের রবার পাওয়া যায়। শেষোক্ত দুইটী বেলেদোয়াঁশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মে এবং দশহস্ত উচ্চ ঝোপে পরিণত হইয়া থাকে। তিন বৎসরের মধ্যে গাছগুলি রবার নিঃসারণের উপযোগী হয় এবং গাছপ্রতি গড়ে ১ সেরের উপর শুষ্করবার পাওয়া যায়। এই তিন জাতীয়

রবারবৃক্ষ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অনেক স্থানে ইহাদের চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। এদেশের শুষ্কভূমিতে সিয়ারার ন্যায় ইহাদের চাষ সফল হইবে আশা করা যায়। সিয়ারার নিয়মানুসারেই ইহাদের চারা প্রস্তুত ও চাষ আবাদ করা উচিত। ইহাদের উৎপন্ন রবার প্যারা অপেক্ষা ৬ পেন্স হইতে এক শিলিং পর্য্যন্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

মানি ছোট রবার বৃক্ষ আবাদের বিশেষ নিয়ম—

ম্যানিহট জাতীয় রবারবৃক্ষ সাধারণতঃ ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই রবার প্রদান করে, বয়োবৃদ্ধির সহিত এই পরিমাণেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃক্ষগুলি বড়ই ভঙ্গুর ও মাথা অত্যন্ত ভার হইয়া পড়ে, প্রবল বায়ু বা ঝড়ে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায় বা উৎপাটিত হয়, এজন্য ইহাদিগকে পাঁচহস্ত অন্তর রোপণ করিলে শাখা সকল পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায় ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। ইহাদের কলম হইতেও চারা প্রস্তুত হয়, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বা ২ইঞ্চ স্থূল শাখা হইতেই কলম করা বিধেয়। সকল বৃক্ষ হইতে সমানপরিমাণ ক্ষীর নিঃসৃত হয় না, অতএব যেগুলি হইতে অধিকপরিমাণ ক্ষীর বাহির হইবে তজ্জাত কলম বা বীজোৎপন্ন চারা হইতে অধিকপরিমাণ রবার পাওয়া যাইবে ইহাই তদ্বিদ্গণের মীমাংসা। রোপণের পর ২।৩ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের বীজ জন্মিয়া থাকে। সিংহলে বিগত ৪।৫ বৎসর-ধরিয়া শেষোক্ত তিনটী রবারের চাষ আরম্ভ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ইহাদের উৎপন্ন রবারের পরিমাণ সবিশেষ নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রথম প্রথম চারাগুলি পাঁচহস্ত অন্তর রোপণ করা উচিত পরে ইতস্ততঃ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই মধ্যের ২।১টী করিয়া বৃক্ষ কাটিয়া উঠাইয়া দিলেই উন্মুক্ত স্থানলাভ করিয়া অবশিষ্ট বৃক্ষগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৬। Sapium—সেপিয়ম। সেপিয়ম জাতীয় রবারবৃক্ষ মেক্সিকো, ব্রেজিল, কলম্বিয়া, ইকোয়েডর, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশে স্বভাবতঃ জন্মে। ইহাদের মধ্যে ভেনিজুয়েলার সেপিয়ম ষ্টাইলেয়ার (Sapium stylare) হইতে প্রচুর পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং ৫৫ হইতে ৬০ ডিগ্রি উত্তাপযুক্ত দেশে ইহা সুন্দর জন্মে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক সেপিয়ম জাতীয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী হইতেও রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে, অপরগুলি কোন কর্ম্মে লাগে না।

Sapium laterifolium	Mexico
„ paubinervum	„
„ verum	Columbia
„ ciliatum	North Brazil.

উত্তমাধম নানাজাতীয় রবার প্রস্তুতের জন্য হিভিয়ার সহিত ইহাদের ক্ষীর মিশ্রিত হইয়া থাকে। ভারতবাসীয় দ্বীপপুঞ্জে সেপিয়ম ইনসাইনি (Sapium Insigne) নামক এই জাতীয় এক বৃক্ষ হইতে মধ্যমাশ্রেণীর রবার প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাও নানাবিধ রবারে মিশ্রণের জন্য ব্যবহার হয়। ডাঃ প্রেনের (D. Dr. prain) গ্রন্থে চট্টগ্রাম

অঞ্চলে এই বৃক্ষ জন্মিবার উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত নিম্নবঙ্গ, সুন্দরবন ও চট্টগ্রামের স্থানে স্থানে আরও তিনটী সেপিয়ম জাতীয় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে কিন্তু ইহাদের রবার উৎপন্ন হয় না, যথা—

Sapium indicum. সুন্দরবন।
„ baccatum. চট্টগ্রাম।
„ sebeiferum. উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপশ্চিম হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ।

সেপিয়ম সেবিফেরমকে মোমচীনা কহে, কারণ ইহার ফল হইতে মোমের ন্যায় একপ্রকার গাঢ় তৈলবৎ জ্বলনশীল পদার্থ পাওয়া যায়, তদ্বারা পূর্ব্বে দুঃস্থ লোকেরা দীপকার্য্য সমাধা করিত।

৭। Hancornia speciosa—হাঙ্কর্নিয়া স্পেসিওয়াসা—Mangaba rubber—ব্যবসায়ী মহলে ইহাকে মাঙ্গাবা রবার কহে। ব্রেজিল, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে স্বভাবতঃ জন্মে, সমুদ্রতট হইতে ৫।৬ শত ফিট উচ্চ ও শুষ্ক ভূমিভাগে সতেজে বর্দ্ধিত হয়। বৃক্ষগুলি ৮ হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত শাখা প্রশাখাবান হইয়া থাকে।

৮। Brosimum galachodendron—ব্রোসিমাম্ গ্যালাকোডেনড্রন্ ইহা প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষ বিশেষ, দক্ষিন আমরিকাতে জন্ম, এতদুৎপন্ন রবার রজন পরিপূর্ণ (resinous matter) ও নিকৃষ্ট জাতীয়।

৯। Mascarenhasia lisianthiflora
„ anceps
„ longiflora

ইহারা বৃক্ষজাতীয়, মাদাগাস্কার দ্বীপ ও আফ্রিকাই ইহাদের জন্মস্থান। ইহাদের ক্ষীরে শতকরা ৯০ ভাগ অতি উৎকৃষ্ট রবার পাওয়া যায়, কিন্তু এপর্য্যন্ত অন্যত্র ইহাদের চাষের চেষ্টা হয় নাই, Mascarenhasia utilis নামক এই জাতীয় আর একটী উদ্ভিদ হইতে স্বল্পমূল্য নিকৃষ্টজাতীয় রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১০। Funtumia elastica—ফান্টুমিয়া ইলাষ্টিকা আফ্রিকার লাইবিরিয়া, আশান্টি, স্বনেপিকুল, নাইজিরিয়া, কঙ্গো, উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্টজাতীয় রবার উৎপন্ন হয়, ক্ষীরে শতকরা ৯০ অংশ বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায়। মহীশূর ও সিংহলে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। প্রকাণ্ড ও স্তম্ভাকার এবং ৬০।৭০ হস্তেরও উপর দীর্ঘে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহারা বিরল ভাবে ইতস্ততঃ একআধটী জন্মে না, স্থানে স্থানে দুই তিন শত বৃক্ষ একত্র জন্মিয়া থাকে। ত্বকের ছেদন বা বেধনে ইহার ক্ষীর নিঃসৃত হইয়া থাকে ক্ষির সূর্য্যোতাপে শোষিত করিয়া বা হিভিয়ার ন্যায় নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার

উৎপন্নের পরিমান প্রচুর কিন্তু ২০।২৫ বৎসর অতিবাহিত না হইলে ইহা হইতে রবার উৎপন্ন হয় না। Funtumia africana এবং Funtum latifolia নামক এইজাতীয় আরও দুইটি উদ্ভিদ হইতেও উৎকৃষ্ট জাতীয় রবার পাওয়া যায়। (Kickxia elastica) কিক্সিয়া ইলাষ্টিকাল নামক রবারেরও নাম শুনা যায় কিন্তু অনুমান হয়। কিক্সিয়া ইলাষ্টিক ফান্টুমিয়ারই নামান্তর। অনেকের মতে কিক্সিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয়, নবদ্বীপ, বোর্নিও, সিলিবিস, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে কিক্সিয়া স্বভাবতঃ জন্মে। আফ্রিকায় কোন কিক্সিয়া হইতেই রবার উৎপন্ন হয় না। কিক্সিয়াজাত রবার তত উৎকৃষ্ট নহে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী

বিগত বর্ষে ২৭শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার টাউন হলে বাঙ্গালার গবর্ণর স্বাস্থ্য এবং শিশু মঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে কতকগুলি শিখিবার ও দেখিবার বিষয় ছিল। অনেক সময় অভিজ্ঞতার ও জ্ঞানের অভাবে র‍্যায়াম পীড়ার আক্রমণে কাবু হইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থার দোষে ও অভিজ্ঞতার দোষে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। যদিও প্রতিকার করিবার উপায় থাকে সেই অবস্থাও স্বাস্থ্যরক্ষার-পক্ষে অবহেলার দরুণ অবস্থা অস্বাস্থকর হইয়া পড়ে। এই প্রদর্শনীতে সেই সকল বিষয় দেখানো এবং বুঝানো হইয়াছিল। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং সেই বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার উন্নতি হয় তাহার জন্যই এই উদ্যম।

লালনপালন এবং অবহেলার দোষে কত শিশু কুসুমকোমল অবস্থায় কালের কবলে নিপতিত হয় তাহার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। শিশু মৃত্যু সংখ্যার হার দেখিলে চমকিত হইতে হয়। কলিকাতার শিশু মৃত্যু সংখ্যার প্রতিই একবার দৃষ্টিপাত করা যাউক। এই কলিকাতা নগরীতে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে একবৎসর পূর্ণ না হইতেই হাজার করা ৩৫২টী শিশুর মৃত্যু হয়। ইহা কি কম ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়? ইহার কারণ কি, কিভাবে এই সমস্যার প্রতিকার করা যায় তাহা এই শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে দেখাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

তাহার পর ব্যারামের কথা ব্যারামের মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত এবং ক্ষয় রোগ সচরাচরই লোকের জীবন হরণ করিয়া থাকে। ইংরেজী ১৯১০ সালের কলিকাতার মৃত্যুর তালিকা দৃষ্টে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই বৎসর ওলাউঠা এবং বসন্ত রোগে যথাক্রমে ৩৬৮৮ জন এবং ১৮৭০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার পর ক্ষয়রোগের কথা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সীতে অন্যান্য রোগে যত লোকের মৃত্যু হয় ক্ষয় রোগে অন্ততঃপক্ষে তাহার শতকরা দশজন লোক মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে প্রতিকার পাইবার যদি উপায় থাকে তবে তাহা রোধ করা হয় না কেন ইহাই প্রধান সমস্যা। প্রথমতঃ কোন জিনিস হইতে শরীরের মধ্যে কোন রোগ প্রবেশ করিতে পারে সেই বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে ধারণা এবং অনুভব শক্তির অভব। সকলেই ইহা জানেন যে, কোন লোকই একাকী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, জীবনধারণের জন্য নানা লোকের সংশ্রবে তাহাকে আসিতে হয়। বাজারের একটী লোক যদি ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহার রোগের প্রতি অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে তাহার সেই রোগের বীজ সংক্রামক ভাবে একজন মেধাবী ছাত্র, একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ ডাক্তার অথবা একজন পরোপকারব্রতী হিতৈষী কর্ম্মীর শরীরে দৃষ্ট হইতে পারে।

যাহারা টাউনহলে গিয়া এই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তাঁহারা এই সকল বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। প্রদর্শনী গত ২৭শে মার্চ্চ খোলা হইয়াছিল এবং সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী দেখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শিশুদের মঙ্গলের জন্য শিশু জীবনের চারিটী ভাগ করিয়া সেই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমতঃ শিশুদের গর্ভে থাকার সময়ের অবস্থা, এক বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত আর একটী অবস্থা, তৎপর স্কুলে যাইবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত আর একটা অবস্থা, স্কুলে যাইবার বয়সের অবস্থা। এই চারিটী অবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টী রাখা দরকার। কোন অবস্থায় কি ভাবে চলিতে হইবে তাহাও শিখিবার বিষয়। প্রত্যেক অবস্থায়ই শিক্ষার অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ডাক্তার ও ধাত্রীগণের উপদেশ ও শিক্ষানুযায়ী শিশুর মাতাকে চলিতে হইবে, শিশুর মাতা ও পিতাকে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহার পর শিশু জন্মিলে যে তাহাকে সংরক্ষণ করিবে তাহার শিক্ষার দরকার। শিশুর মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি কিরূপে হইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় আবশ্যক সকল রকমের বিষয়ের জ্ঞান পরিচারক বা পরিচারিকার থাকা দরকার। শিশুর চারিটী অবস্থায়ই এই সকল উন্নতি বিষয় শিক্ষা পাইলে তবে শিশুর মঙ্গল সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে। এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগে এই সকল তথ্য সতর্কতার সহিত অঙ্কিত করিয়া

দেখানো হইয়াছিল এবং প্রত্যহ বক্তৃতা দ্বারা আলোচনা দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথমতঃ টাউন হলের নীচের তলায় ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ আছে। এই বিভাগে বাটীর অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শত দিকে শত রকমে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিকার করিলেও বাটীর অবস্থা যদি কদর্য্য হয় তাহা হইলে সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যায়। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাড়ীর ভিতরে পথের ধূলা ঢুকিয়া থাকে যদি বাটীর পার্শ্বের জঞ্জাল ও নর্দ্দমার দুর্গন্ধ প্রবেশ করে, যদি পীড়ার বাহন কীট ও মশা মাছি সর্ব্বদা ভিতরে ঢুকিয়া উৎপাত করে তাহা হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার বাহিরের অন্যান্য ব্যবস্থায় কি করিবে। যে সকল জিনিষের কথা উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেকটিই যেন "জীবন্ত জেপেলীন, কেবল রোগের বীজাণুতে পূর্ণ, তাহার প্রত্যেকটি জীবাণু বোমা অপেক্ষাও লোকের জীবন নষ্ট করিতে অধিকতর শক্তিশালী।"

তাহার পর শিশুর স্কুলের জীবন। শিশুকে সুপরিচালিত স্কুলে দিতে হইবে। যে স্কুলের শিক্ষকগণের পরিদর্শন ক্ষমতা আছে। যাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি জানেন তাঁহাদের অধীনে শিশুর শিক্ষার ভার অর্পণ করিলে সুফল লাভ হইতে পারে। বাড়ীতে শিশুর যে সকল দোষ ধরা পড়ে নাই, তাহা সুবিজ্ঞ শিক্ষকগণের নজরে পড়িলে বেশ সুফল লাভ করা যায়। যে শিশু তাহার কম বয়সের অন্যান্য শিক্ষা অপেক্ষা নীরব প্রকৃতির ও ধীর প্রকৃতির তাহার অঙ্গ চালনার ও পুষ্টির ও বৃদ্ধির হীনতা রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। এই ভাবে শিশুর প্রত্যেক কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিশুর মঙ্গল সাধনের উপায় করিতে হইবে।

যে শিশুর ক্ষয় রোগের অঙ্কুর উপস্থিত হইয়াছে সেই শিশু প্রায়ই দিনের শেষভাগে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়, অবসন্ন হইয়া যেন নোয়াইয়া পড়ে। এই সব বিষয় খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়।

তাহার পর প্রদর্শনীর "স্কুল হাইজিন" বিভাগেও শিশুর পীড়ার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শিশুর প্রকৃতি, চালচলন, কার্য্যকলাপ এবং অন্যান্য অনেক অবস্থার বিষয় সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই এই প্রদর্শনী দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছিল এবং বৎসর বৎসর এইরূপ প্রদর্শনী খোলা হইলে দেশে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা। কেবল কলিকাতা কেন প্রত্যেক বিভাগে বিভাগে এই প্রকার প্রদর্শনী খোলা উচিত এবং সন্তান-পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তিকা সকল স্বল্পব্যয়ে সাধারণে প্রচার করা কর্ত্তব্য।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে প্রায় সকল প্রকার শস্যই ঐরূপে মাপিয়া কেনা বেচা হইত। এখন আর মাপিয়া কেনা বেচা হয় না। সকল শস্যই ওজন করিয়া ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। পেত্র নির্ম্মিত সের কাঠার চলন এখনও অনেক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১ম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থ চাষীদিগের মধ্যে অনেকেই কৃষি ব্যতীত চাকরীও করিতেন। যাহারা কেবল কৃষিজীবী ছিলেন, তাহাদের টাকা দুষ্প্রাপ্য ছিল, এ জন্য তাহারা অনেক স্থলেই কৃষিজাত শস্যের বিনিময়ে আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। এমন কি তাহাদের রায়তী স্বত্বের জমির খাজনা টাকার হিসাবে না দিয়া শস্যের হিসাবে প্রদান করিতেন। যাঁহারা চাকরী বা অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, কেবল তাঁহাদেরই টাকায় ভূমির রাজস্ব নিরূপিত হইয়াছে। তখন টাকায় চারিসলি (২০ কাটার সলি) অর্থাৎ ৮০ তোলা সেরের দুই মণের উপর ধান পাওয়া যাইত। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে একবিঘা জমির খাজনা ১৲ এক টাকা অথবা চারিসলি ধান (৮০ তোলা মণের দুই মণের উপর) রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল। এখনও ঐরূপ হিসাবে ধান্য খাজনা স্বরূপে আদায় হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে চারি সলি ধান্যের মূল্য ১৲ টাকা ছিল খাজনার জন্য টাকা সংগ্রহ কৃষিজীবিদিগের কষ্ট ছিল বলিয়া এক বিঘা জমির খাজনা এক টাকা না দিয়া চারি সলি ধান খাজনা স্বরূপে অনায়াসে প্রদান করিতেন। শস্যের হিসাবে খাজনা লইয়া জমি বন্দোবস্ত করাকে "সাল্লা বিলি" বলে। কাহারও কাহারও ধান ও নগদ টাকা স্বরূপ ধার্য্য আছে। কাহারও বা কেবল ধান কাহারও বা কেবল টাকা বার্ষিক খাজনারূপে ধার্য্য হইয়াছিল। এখনও সেই হিসাবে ধান ও টাকা খাজনা স্বরূপে ধার্য্য আছে। সে সময়ে এক বিঘা জমির খাজনা ১৲ এক টাকা বা ১৲ টাকা মূল্যের চারিসলি ধান দেওয়া কাহারই পক্ষে লাভ লোকসান ছিল না। এবং সে সময়ে ধান বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করা কষ্টকর ছিল। এজন্য অনেকেই জমির খাজনা ধান্যে ধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। এখন ঐ চারি সলি ধানের মূল্য ১৩৲ দশ টাকা হইয়াছে পূর্ব্বে যাহারা খাজনা ধানে ধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে চারি সলি ধান বা তাহার মূল্য ১৩৲ টাকা দিতে হইতেছে। যে সকল নামের জমাতেই ধান ও টাকা খাজনা স্বরূপে থাকায় এক্ষণে ধানের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। হয়ত অনেক পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝান হইতেছে।

একটী জমার যেন ১২/০ বিঘা জমি, ৪/০ বিঘার সাজা ধান ১৬ সলি অবশিষ্ট ৮/০ বিঘা জমির খাজনা ৮৲ টাকা ধার্য্য আছে, এক্ষণে ঐ ১৬ সলি ধানের মূল্য ৪০৲ টাকা আর ৮৲ টাকা। মোট ৪৮৲ ১২/০ বিঘা জমির খাজনা স্বরূপে এক্ষণে দিতে হইতেছে। যে সকল জমির কেবল ধান রাজস্বরূপে ধার্য্য ছিল, সে রূপ অনেক জমি অনেকেই ইস্তফা দিয়াছে। এক্ষণে শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত জমির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায়, অনেকেই ইস্তফা দিতে পারেন নাই। ২য় শ্রেণী ভুক্ত কৃষকের অনেকেরই জমির রাজস্ব ধান্যে ধার্য্য আছে। ঐ শ্রেণীর কৃষকেরা নিজের শারীরিক পরিশ্রমে বিনাব্যয়ে শস্য উৎপাদন করায় তাহাদিগকে ততদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। ১ম শ্রেণীর কৃষকদিগকে জমির বার্ষিক খাজনা ধান্যের হিসাবে দিতে হইলে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। এক্ষণে অনেকেই ধান্যের পরিবর্ত্তে টাকার খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতেছেন। ধান্যের পরিবর্ত্তে টাকার জমি ধার্য্য করিয়া লইতে হইলে ভূম্যধিকারীকে অনেক টাকা দিয়া বন্দবস্ত করিয়া লইতে হয়।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশের কৃষিজাত দ্রব্য মাত্রেই খুব সুলভ ও শস্তা ছিল, যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভিন্ন স্থান হইতে আনীত হইত, তাহা এখানকার অপেক্ষা বহুগুণে শস্তা হইলেও স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় কিছু মহার্ঘ ছিল। তৎকালে টাকায় কি পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রতিটাকায়	দ্রব্যের নাম	পরিমাণ
১	ধান্য	পরিমাণ ২/০ মণ
১	চাউল	১।০ ,,
১	মসুর	১।০ ,,
১	মাসকলাই	১/০ ,,
১	গুড়	৸০ হইতে ১/০ মণ
১	মটর	১।০ ,,
১	খেসারি	১৷৷০ ,,
১	দুগ্ধ	৸২ সের
১	ঘৃত	/২ হইতে /২৷৷ ,,
১	তৈল	/৸ ,,
১	কৃষ্ণমুগ	১/০ মণ
১	মৎস্য	৸০ হইতে ৸২ সের

ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই শস্তা ছিল। তখন টাকাই বরং দুর্ল'ভ ছিল। সে সময় তরিতরকারী এত শস্তা ছিল যে, চারি পয়সার তরকারী আনিতে সময়ে মুটেরও প্রয়োজন হইত। তখন শাক সবজী, তরি তরকারীর খরিদারই ছিল না।

সকল বাড়ীতেই প্রয়োজনীয় শাক তরি তরকারী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্যই উৎপন্ন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কোন গৃহস্থকেই হাট বা বাজারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। মৎস্য অধিকাংশ লোককেই কিনিয়া খাইতে হইত না।

প্রায় সকল গৃহস্থেরই পুষ্করণী বা ডোবা ছিল, সে সময়ে সকল পুষ্করণী বা ডোবাতে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য পাইত। তৎকালে এ প্রদেশের কাহারই মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। এখনকার ন্যায় সে সময়ে খাদ্য বা পরিচ্ছদের এত আড়ম্বর ছিল না। পূর্ব্বে পুষ্করণীতে যে রূপ মৎস্য, ক্ষেত্রে যে রূপ ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হইত এখন বিশেষ যত্ন স্বত্তেও আর সেরূপ জন্মেনা।

পূর্ব্বে এ প্রদেশে ধান্য ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকার ফসল জন্মিত, এখন ধান্য ব্যতীত অন্য ফসল জন্মে না বলিলেই চলে। পূর্ব্বে মসুর, খেসারী, অড়হর, কৃষ্ণমুগ, এবং তিল শর্ষপ, ইক্ষু; মটর ইত্যাদি ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। এখন ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসলের চাষ এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। পূর্ব্বে যে রূপ নানা প্রকার ধানের চাষ হইত, এখন তাহা হয় না—মোটা ধান ক'টে ও রকম রকম ধান। ক'টে ধানের চাল ঈষৎ লালবর্ণ, রকম ধানের ফ'ল সাদা। ক'টে ধানের ভাত দেখিতে ভাল দেখায় না, কিন্তু খাইতে সুমিষ্ট কোমল ও বেশ পুষ্টিকর এবং সহজেই পরিপাক হয়। রকম ধানের ভাত সুধু খাইলে, কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। একটু থাকলেই কঠিন হইয়া যায়, খাইতে কষ্ট হয়। সহজে পরিপাক হয় না, কটে ধানের ভাতের ইহা ন্যায় পুষ্টীকর নয়। এখনকার আর কেহই কটে ধানের ভাত পচ্ছন্দ করে না। ঐ ধান বা উহার চাউল বিক্রয় করিতে গেলে রকম ধানের চাল অপেক্ষা কম দামে বেচিতে হয় এজন্য ক'টে ধানের চাষ একবারে উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সকলেরই ক'টে ধানের চাষ ছিল, ক'টে ধানের ভাত খাইতে সকলেই ভাল বাসিত। রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত এখন আর কেহই ক'টে ধানের ভাত পচ্ছন্দ করেন না। পূর্ব্বে রকম ধানের চাষ খুব কমই হইত, সরু ধানের চাষও খুব কম হয়, কারণ সরু ধান অপেক্ষা মোটা ধানগাছ অধিক জন্মে, কখনও অধিক হয়। সরু ধান ভাল জন্মে না বলিয়া চাষিরা খুব কম জমিতে সরু ধানের চাষ করিয়া থাকে।

এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে বাজার হইতে ক্রীত ভেজাল দেওয়া দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া রুগ্ন দুর্ব্বল হইতে হইত না। তখন সকলেই গৃহজাত ও কৃষিজাত টাটকা বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানিয় ভোজন করিয়া স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেন। ম্যালেরিয়া, অম্লের পীড়া তখন প্রাই দেখিতে পাওয়া যাইত না। তখন সকলেই প্রচুর (দেড়গুণ দ্বিগুণ) খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া অনায়াসে পরিমাণ করিতেন। আমরা পূর্ব্বে বাল্য কালে কোন কোন লোককে এত অধিক পরিমিত দ্রব্য ভোজন করিতে দেখিয়াছি যে, এখন সে সকল মনে হইলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল ভোজনবান

লোক দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন আর প্রায় সেরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে খাদ্য শস্য অর্থাৎ ধান চাউল যেরূপ মহার্ঘ হইয়াছে তাহাতে চারিদিক হইতেই চিৎকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। কেবল ধান চাউল বলিয়া নহে, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই দারুণ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে জন মজুরের পারিশ্রমিকও দেড় দুই গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গরুর খাদ্য বিচালী ও খইল ও অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রাদিরও মূল্য চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এরূপস্থলে খাদ্য শস্য ধান্য চাউল ইত্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত না হইলে কৃষিজীবিদিগেরই বা চলিবে কিরূপে! অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সস্তা থাকিলে খাদ্য শস্য সুলভ হইলেও কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ দুঃসময়ে ধান্য চাউল প্রভৃতি খাদ্য শস্য সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইলে কৃষকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে! এমন কি কৃষকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবার সম্ভাবনা! আমাদের ন্যায় দেবমাতৃক দেশে সর্ব্বত্র সুবর্ষা হইয়া প্রতি দশ বৎসরে ২।৩ বৎসরও প্রচুর ধান্য জন্মে কি না সন্দেহ। এরূপ দুঃসময়ে খাদ্য শস্য মহার্ঘ থাকায় ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে যাঁহারা কৃষাণ রাখিয়া জন মজুর খাটাইয়া চাষ করেণ, এক্ষণে এত সমার্ঘ দরে শস্য বিক্রয় করিয়াও তাঁহারা বিশেষ লাভবান হন কিনা সন্দেহ। উপস্থিত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেনীর কৃষকেরা বিশেষ লাভবান হইতেছেন, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ কৃষকের সংখ্যা খুব কম। এই শ্রেনীর কৃষকেরা মহার্ঘ দরে ধান্যাদি বিক্রয় করিলেও পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও তাহাদিগকে খুব মহার্ঘ দরে ক্রয় করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে সমস্ত দ্রব্যই সস্তা ছিল, কারণ জন মজুরের প্রারিশ্রমিকও কম ছিল, এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই খরচ খুব কম ছিল, একারণ খুব সুলভ মূল্যে ধান্য চাউল বিক্রয় করিয়াও কৃষকেরা তাদৃশ ক্ষতিগ্রস্থ হইত না। প্রক্ষণে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত ধান্য চাউলাদিরও মূল্য বৃদ্ধি অবস্বম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে এ প্রদেশের মধ্যবৃত্ত স্ত্রীলোক দিগের পরিচ্ছদের আড়ম্বর মোটেই ছিল না। আমরা বাল্যকালে অনেক মধ্যবিত্ত পুরুষকেও কখন জামা গায়ে দিতে দেখি নাই। তখন মোটা সাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা পরিতুষ্ট হইত। এখন আর সেকাল নাই। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত প্রতেক স্ত্রীলোকেই সামিজ, বডি, জ্যাকেট প্রভৃতি পরিচ্ছদে সুশোভিত হইতেছেন। এখনও এপ্রদেশে স্ত্রীলোকের পায়ে জুত উঠে নাই। পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যে বিশেষ সঙ্গতিশালী গৃহস্থের বাটিতেই স্ত্রীলোকের ব্যবহার জন্য ২।১ বালুচরী সাড়ী ও বেনারসী সাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন প্রায় সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাটীতেই উক্ত সাড়ী সকল ও স্ত্রীলোকের ব্যবহারোপযোগী খুব মূল্যবান পরিচ্ছদ সকল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় মধ্যবিত্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও দেখিতে পাওয়া যাইত না। এক্ষণে যে সকল

স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইতেছেন, তাঁহাদেরই উদ্ধতম স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে রৌপ্যালঙ্কারে সুশোভিত হইতেন। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরাই ২।৪ খানা স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইতেন। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রামে এত স্বর্ণালঙ্কারেরও প্রচলন ছিল না। পূর্ব্বে যে সকল স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন ছিল, এক্ষণে তাহা লয় প্রাপ্ত হইয়া নূতন অলঙ্কার তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে এ প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের স্ত্রীলোকদের অধিকাংশেরই ২।১ খানি খুব কম মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার থাকিত, নচেৎ রৌপ্যালঙ্কারই অধিক থাকিত। এখনকার ন্যায় তখন স্ত্রীলোকদিগের সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের প্রথাই ছিল না। এই অল্প দিনের মধ্যেই কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সামাজিক আচার ব্যবহারেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ এত দায়ের ছিল না। সামান্য ব্যয়ে ভাল ঘরে ভাল মতে কন্যার বিবাহ দিতে পারা যাইত। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে ধনী ও সুশিক্ষিত পাত্রের এত আদর ও গৌরব ছিল না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির মধ্যে কৌলিন্যের মর্য্যাদাই অধিক ছিল। সে সময়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বা মৌলিক কায়স্থের কন্যাকে কুলিন পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইলে বিস্তর খরচ পত্র করিতে হইত। কুলিন ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ দেওয়া নিতান্ত কষ্টকর ছিল; এখনও আছে। তখন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরও কন্যা বিক্রয় প্রথা বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। এক একটী কন্যা ৪।৫ শত টাকা পণে বিক্রীত হইত। কায়স্থের মধ্যেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে ব্রাহ্মণের ন্যায় এত অধিক নহে। পূর্ব্বে কুলিন ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকেই পণ দিয়া কন্যা বিবাহ করিতে হইত। মৌলিক কায়স্থ কুলিনের কন্যা বিবাহ করিলেও কুল মর্য্যাদা অর্থাৎ পণ দিতে হইতে হইত। কুলিন কায়স্থের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পণ দিয়া কুলিনের কন্যা বিবাহ করিতে হইত। কুলিন কায়স্থের ১ম পুত্র ব্যতীত অবশিষ্ট পুত্রেরা মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিয়া কন্যাভরণ, বরাভরণ ও কুল মর্য্যাদা পাইতেন। কায়স্থদের মধ্যে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ হইলে, কন্যাকর্ত্তাকে প্রায়ই কন্যাভরণ বরাভরণ দিতে হইত না, বরং অনেক স্থলেই কন্যাকর্ত্তা পণ স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতেন। কায়স্থদের মধ্যে কন্যা বিক্রয় প্রথা খুব কম প্রচলন ছিল। তাহা অনেক দিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচলন ছিল। এখন ইহা খুব কমিয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সকল উন্নত জাতিকেই কন্যার সুপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে বিস্তর খরচ পত্র করিতে হয়। কায়স্থ কন্যার বিবাহে যত অধিক টাকা খরচ করিত, অন্য জাতির কন্যা বিবাহে তত অধিক টাকা খরচ করিতে হয় না। খরচ পত্র করিয়া অর্থাৎ কন্যাভরণ, বরাভরণ, যৌতুক প্রভৃতি বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিবার বিষয়ে কায়স্থজাতিই আদর্শ স্থানীয়। এখন আর কায়স্থ জাতির মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা ততদূর প্রবল নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে

কুলিন কায়স্থ কন্যার বিবাহ দিতে কিছুমাত্র খরচ করিতে হইত না, বরং অনেক স্থলে কুল মর্য্যাদা স্বরূপে কিছু গৃহীত হইত। এখন কুলিন কায়স্থকেও মৌলিকের পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে অবস্থানুযায়ী বিস্তর খরচ পত্র করিতে হয়। কায়স্থ দিগকে কন্যার বিবাহে যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিকে ততদূর হইতে হয় না। এক্ষণে বিবাহে যেরূপ ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না। খুব সামান্য ব্যয়েই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত। কেবল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইতে বিস্তর খরচ করিতে হইত। এমন কি অনেককে বিবাহ জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরিবর্ত্ত বিবাহ প্রথা খুব প্রচলন ছিল। এক্ষণে এই সকল চলন আর নাই বলিলেও চলে।

পূর্ব্বেও কোন কোন বৎসর কোন কোন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত অজন্মা হইত। অজন্মা হইলেই শস্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত। পূর্ব্বে অর্থাৎ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রেলওয়ে এখনকার ন্যায় বিস্তৃতি লাভ না করায়, এখনকার ন্যায় শস্যাদি আমদানী রপ্তানীর সুবিধা ছিল না। কোন প্রদেশে অজন্মা হইলে অন্য প্রদেশ হইতে সে স্থানে খাদ্য শস্য আনিবার সুবিধা না থাকায় দুর্ভিক্ষ হইত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে (আমাদের জ্ঞানে) সন ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ঐ সময়ের দুর্ভিক্ষে বহু সংখ্যক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ সালের দুর্ভিক্ষে অনশনে উড়িষ্যায় বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। সন ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের পর আর এরূপ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সন ১২৭১ সালের শারদীয় শুক্ল পঞ্চমীর দিন ভয়ানক ঝড় হয়। সে ঝড় আমাদের এখান অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে খুব প্রবল হইয়াছিল। ঐ ঝড়ে হিজলী অঞ্চলে বঙ্গসমুদ্রের জল প্লাবিত হইয়া বহুসংখ্যক লোককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিল। ঐ ঝড়ে অনেক স্থান বৃক্ষ ও গৃহাদি শূন্য হইয়াছিল, ঐ ঝড়ের ঠিক দশ বৎসর পরে অর্থাৎ সন ১২৮১ সালের শারদীয় শুক্ল পঞ্চমীতে ও ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল। সেই ঝড় আমাদের এ প্রদেশে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহুসংখ্যক লোককে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছিল, বৃক্ষ গৃহাদি এ প্রদেশে ছিল না বলিলেও চলে। সন ১২৮১ সালের ন্যায় ভয়ঙ্কর ঝড় আমরা কখন দেখি নাই। সে ঝড়ে এ প্রদেশের যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আমর ন্যায় লোকের লেখনী দ্বারা চিত্রিত করা অসম্ভব।

সন ১২৭১ সালে ভাল ধান্য জন্মে নাই, যাহাও জন্মিয়াছিল, আশ্বিন মাসের ঝড়েও তাহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। সন ১২৭২ সালে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত মোটেই আবাদ হয় নাই। ঐ বৎসর এ প্রদেশে কিছুমাত্র ধান্য জন্মে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! সন ১২৭৩ সালে প্রথম ২।১ মাস কষ্টে সৃষ্টে সঞ্চিত ধান্য হইতে চলিয়াছিল, উক্ত বৎসরের আষাঢ় মাস হইতে অনেকেই কাল দুর্ভিক্ষ গ্রাসে পতিত হয়। প্রথম প্রথম অর্থাৎ উক্ত বৎসরের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে টাকায় ১৫।২০ সের পর্য্যন্ত চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। যে

সময়ে টাকায় দেড়মণ চাউল ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, সে সময়ে হঠাৎ ধান চাল মহার্ঘ হওয়ায় চারিদিক হইতে দারুণ চিৎকার উপস্থিত হইল। যদিও এ প্রদেশের অধিকাংশ লোককেই ধান্য চাউল ক্রয় করিতে হইত না, কিন্তু অজন্মা বশতঃ ধান্য উৎপন্ন না হওয়াতে মহাজনেরাও ধান্য বাড়ী দিতে অসমর্থ হওয়ায় চারিদিকেই ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হয়। ক্রমে চাউল আরও মহার্ঘ হইতে লাগিল। আষাঢ় মাসে চাউল টাকায় ১০।১২ সের করিয়া বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহাও সকল সময় পাওয়া যাইত না। চাউলের দর ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ভাদ্র মাসে টাকায় ৬ সেরে পরিণত হইল। লোকে জমি জায়গা, অলঙ্কার, তৈজসপত্র বন্ধক বা বিক্রয় করিয়া কিছুদিন চালাইল; ক্রমে কচু, বৃক্ষ পত্রাদিও ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনেক ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। সকলেরই অভাব ভিক্ষা দিবে কে! প্রায় সকলেই অন্নের জন্য লালায়িত, পাঠক বুঝিয়া দেখুন এখনও টাকায় ৬ সের চাউল পাওয়া যাইতেছে—ইহাও দুর্ভিক্ষের দর বলিয়া চারিদিক হইতে চিৎকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। তখন টাকায় দেড়মণ চাউল পাওয়া যাইত, সে স্থলে হটাৎ টাকায় ৵৬ সের চাউল হইলে, কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল! পূর্ব্বে এখনকার ন্যায় টাকা সুলভ ছিল না। টাকা খুব কম লোকেরই ছিল! এক টাকাও সংগ্রহ করা তখনকার লোকের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর ছিল। এরূপ মহার্ঘ দরে চাউল খরিদ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে অনেকেই অক্ষম ছিল। ফলতঃ সে বৎসর যে রূপ লোকের কষ্ট হইতে দেখিয়াছি, ইহার পরও যে সকল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে লোকের সেরূপ কষ্ট হইতে দেখি নাই।

সে বৎসর লোকের কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, আমাদের গ্রামের একটী চাক্ষুষ ঘটনা প্রমাণ স্বরূপে এস্থলে লিখিত হইল। সে বৎসর আমাদের গ্রামের ২।৩ ঘর ব্যতীত সঞ্চিত ধান্য কাহার ছিল না, যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহাও প্রচুর নহে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই খাইতে না পাইয়া পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠে। যাহাদের মহায়ে সঞ্চিত ধান্য ছিল, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু ধান্য বাড়ী (ঋণ) দিবার জন্য অনশন ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কাকুতি মিনতি সহকারে বলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল না। তখন তাহারা নিজের ও স্ত্রী পুত্রের ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। দিনের বেলায় বহু সংখ্যক লোক একত্র হইয়া বল পূর্ব্বক ঐ সকল লোকের মরায়ের ধান লুণ্ঠন করিতে লাগিল। লুণ্ঠিত ধান তখনই ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া খুন্নিবৃত্তি করিল। তৎপরে পুলিস আসিয়া লুণ্ঠিত ধান্য সহ অনেককেই গ্রেপ্তার করিয়া তৎকালীন এপ্রদেশের মহকুমা জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগে) চালান দেন। লুণ্ঠন কারীগণের মধ্যে কয়েকজন চৌকীদারও ছিল। দুর্ভিক্ষের জন্য ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া এরূপ অবৈধ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জাহানাবাদের বড় ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে লঘুদণ্ড অর্থাৎ ছয়মাস

হইতে একবৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডের অনুমতি দেন সাধারণের ছয়মাস কারাদণ্ড এবং চৌকীদারদের একবৎসর কারাদণ্ড হয়।

সন ১২৮২ সালেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সন ১২৭৩ সালের ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে। সন ১২৮২ সালের দুর্ভিক্ষে টাকায় ১০।১২ সের করিয়া চাউল বিক্রিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টও স্থানে স্থানে সাহায্যের বন্দবস্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই বর্দ্ধমান জেলায় ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়। এই সময়েই ম্যালেরিয়া দমন জন্য অস্থায়ী ভাবে গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে ডাক্তার সহ দাতব্য ঔষাধালয় সংস্থাপন করেন। বর্দ্ধমান জেলার বহুসংখ্যক লোক সেই সময়ে ম্যালেরিয়ার জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সময় হইতে বর্দ্ধমান জেলার লোক ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে।

(ক্রমশ)

মূলা (Raphanus Sativus)

The Radish.

ইহা ক্রুসিফেরী উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শরিষা, বাঁধা কপি, সালগম এ জাতীয় উদ্ভিদ মূলাও সেই জাতীয় উদ্ভিদ। শর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদের যেমন পুষ্পদণ্ড বাহির হইয়া তাহাতে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, শরিষার যেমন শুঁটী (pod) হয় ইহার তেমনি ফুল ফল শুঁটী হয়। শুঁটীগুলি বীজে পূর্ণ থাকে। মূলা ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে মূলা বলে, অন্যত্র ইহার নাম মুরি, মুরা মুলি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইহাকে তারা বলে। এতদঞ্চল হইতে তারা বীজ আমদানী হইয়া তৈল নিষ্কাশনার্থ শরিষার তৈলের সহিত ভেজাল হইয়া থাকে।

শীত প্রধান পার্ব্বত্য ভূমিতে বারমাস ইহার আবাদ করা যাইতে পারে কিন্তু সমতল ভূমিভাগে শীতকালেই ইহার আবাদ করা চলে। গ্রীষ্মের শেষে বর্ষারম্ভে একপ্রকার মূলার চাষ হয় তাহাকে বর্ষাতি (Rainy season radish) মূলা বলে। এই জাতীয় মূলার মূল তাদৃশ বড় হয় না। অধিকাংশ সময় শাক খাইবার জন্য ইহার চাষ করা হয়। ভাল বীজ লইয়া সারবান মৃত্তিকাতে চাষ করিলে মূল পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট হয়।

মূলার ভেষজ গুণ—বন মূলা ভারতের বনে জঙ্গলে নদী ও জলাশয়ের ধারে যথাতথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূলা চাষ দ্বারা উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে, ইহার পাতার তীব্র গন্ধ দূর হইয়াছে, মূল পুষ্ট, আঁশ শূন্য ও মাংসল হইয়াছে, আস্বাদে মিষ্ট ও মুখ

রোচক হইয়াছে। বন মূলার মূল ও শিকড়ের রসে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। ইহাতে প্রশ্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা দূর হয়। গো-অশ্বাদির এইরূপ প্রকার পীড়া হইলে বনমূলার রস প্রয়োগে অনেক উপকার পাওয়া যায়। মূলা চাষে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াও ইহার ভেষজ গুণের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। বন মূলার পাতার রস যেমন গণোরিয়া সিফিলিস ব্যাধিতে পরম হিতকারী ক্ষেতের মূলা পাতার রসেও সমগুণই দৃষ্ট হয়; কেহ বলেন যে বন মূলা পাতার রস উক্ত ব্যারামে অধিকতর কার্য্যকারী। মূলা কাটিয়া শুখাইয়া রাখিলে অসময়ে তরকারীর সহিত খাওয়া চলে এবং মূলাচাকার জল ভেষজরূপে ব্যবহার করাও চলে। উহাতে প্রশ্রাবের দোষ দূর হয়, কোষ্ঠ সাফ হয়।

খাদ্য হিসাবে ব্যবহার—মূলার মূলই আমাদের ভক্ষ্য; ইহা সিদ্ধ, ভাজা প্রভৃতি অবস্থায় আমরা ব্যবহার করি। মূলা সিদ্ধ বড় হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। পশ্চিম দেশীয় লোকে এবং বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে কাঁচা মূলা অনেকে খায়, খাইতে নিতান্ত খারাপ নয়, ইহাতে উদর পূর্ত্তি হয়, ইহাতে শরীর পোষণ উপযোগী জিনিষ আছে এবং হজম-শক্তি-বৃদ্ধি-কারিতা গুণ আছে বলিয়া ইহা উপকারী। অন্য তরকারীর সহিত ইহার ব্যঞ্জন রাধিয়া খাওয়া যায়। গবাদি পশুকে পাতা মূল খাইতে দিলে তাহারা সানন্দে আহার করে এবং উহা প্রচুর পরিমাণে খাইলেও তাহাদের কোন অপকার হয় না।

তৈল—মূলা বীজে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। তৈলের স্বাদ গন্ধ ভাল নহে ইহা কিন্তু বর্ণহীন বলিয়া শরিষার তৈলে অবাধে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার তৈলবত্তা হেতু ইহার বীজের ব্যবসা রীতিমত চলিতেছে। যাহারা শরিষা পীড়ন করিয়া তৈল প্রস্তুত করে তাহারাই ভেজালের জন্য তারা বীজ (মূলা বীজ) খরিদ করে। শরিষার তৈলের ন্যায় ইহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে গন্ধক আছে। ইহার তৈল অপকারী নহে বলিয়া বোধ হয় কিন্তু গন্ধ ভাল না হওয়ায় ভেজাল করিলে শরিষার তৈলের সুগন্ধের ব্যতিক্রম হয়। ইহার তৈল কিন্তু পার-ক্লোরাইড যুক্ত পারদের সহিত সংমিশ্রণে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা এক প্রকার শাদা গুঁড়া (white precipitate); ইহা ঘা চুলকনা, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে ও ক্ষতরোগে মহৌষধ বিশেষ।

মূল হইতেও তৈল বাহির হয় কিন্তু পরিমাণ তাদৃশ অধিক নহে। এই তৈলেরও অনেক ভেষজ গুণ আছে। পাকস্থলীর পীড়া উপশমে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মূল-জাত তৈলের সাধারণ ব্যবহারের জন্য ব্যবসা কমই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মূলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া অসময়ে ব্যবহারের জন্য শুকাইয়া রাখা হয়। আদ্রের সহিত চাটনি করিয়াও অনেকে অসময়ের জন্য রাখে। ইহার চাটনি বড়ই মুখপ্রিয়। আমাদের দেশে ভাত কেহ একক সুধু খায় না—ভাতের সহিত ব্যবহারার্থ ব্যঞ্জনাদি উপকরণের আবশ্যক আমাদের দেশে ভাতকে অন্ন বলে—অন্ন ব্যঞ্জন এক সঙ্গে আমাদের আহার। চাউল সিদ্ধ ভাতে শ্বেতসার ও শর্করাই অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হয়—

শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ শ্বেতসার বা শর্করা আছে, প্রোঠিড যাহা খাদ্যের মেদকারিতা গুণ তাহা ইহাতে ৬।৮ ভাগ মাত্র দৃষ্ট হয়। মানুষ কেবল শ্বেতসার বা শর্করা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না—প্রোঠিড এবং তৈলময় পদার্থ চাই। চাউলে যে পরিমাণে প্রোটিড আছে তাহা হইতে পোষোপযোগী প্রোটিড সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক ভাত খাওয়া আবশ্যক। ভাত অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যঞ্জনাদি নানাবিধ উপকরণের আবশ্যক হয়। ব্যঞ্জনের সঙ্গে তৈল ঘৃতাদিও সংযোগ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

মুলার রাসায়ণিক খাদ্যগুণ *

দাহ্যগুণ	—	মেদকারিতা গুণ—	—
শ্বেতসার ও শর্করা	৩-৪	প্রোটিড	০·২
তৈল	কিঞ্চিৎ	ভস্ম	০·৮

জল ৯৫·৭

রাসায়নিক খাদ্যগুণ বিচার করিলে, মুলা উৎকৃষ্ট তরকারী নহে। তবে কচিমুলা লঘু পথ্য। ইহাতে গন্ধক থাকায় ইহা চর্ম্মরোগের পক্ষে হিতকারী। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা উষ্ণ, রুচিজনক, লঘু, পরিপাচক, স্বরবর্দ্ধক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসিকা, কণ্ঠ ও চক্ষুরোগ বিনাশক। কিন্তু শক্ত মুলার অনেক দোষ। "খাদ্য-তত্ত্ব" ৩৭।৩৮ পাতা।

তরকারি হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট না হইলেও ভাতের উপকরণ হিসাবে ইহা শ্রেষ্ঠ। এক মুলা ভাতে তৈল লবণ সংযোগে লোকে আবশ্যক পরিমাণ ভাত খাইয়া ফেলিতে পারে। মুলা, মুলার তরকারি ও চাটনী অতিশয় মুখরোচক। আমাদের দেশে সাধারণতঃ অনেকেই গরীব, ইহা গরীবের বিশিষ্ট তরকারি। একটা কাঁচা মুলা এবং কিছু পরিমাণ মুড়ী বা চাউল ভাজা বা সাতু খাইয়া একজন চাষী একবেলা কাটাই দিয়া থাকে। খাদ্যাভাবের যুগে ইহার চাষ বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক এবং সস্তার সময় মুলা কিনিয়া অসময়ের জন্য সংরক্ষণ করাও বিধেয়। মুলার পাতাও আমরা নানা প্রকার ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি, এবং একেক ভাজিয়া ও সিদ্ধ করিয়া খাইয়া থাকি। সাহেবী খানায় ইহা মশালারূপে ব্যবহার করা হয়, ইহা তাহাদের pot herbএর সামিল। মুলার পুষ্পিত দণ্ডও আমাদের আহার্য্য। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় পসন্দ করেন। ইহাকে মুলার সরতা শাক বলা হয়। ইহাদের নিকট মুলার শুঁটীও অখাদ্য নহে। কচি শুটী সিদ্ধ ঘৃতে ভাজিলে বা তরকারি রাঁধিলে অতিশয় মুখপ্রিয় হয় এবং ইহা উত্তম খাদ্যও বটে।

* শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী এম, আর, এস, কৃত খাদ্যতত্ত্ব নামক পুস্তকে আমাদের নিত্য খাদ্য সমূহের গুণাগুণ বিশেষরূপ বর্ণিত আছে।

শিকড়ে মুলা (Ruphanus sativus Linn. var. Caudatus. The Rat-tail Radish, ইহাকে হিন্দিতে মুগরা বা মুঙ্গরা বলে। ইহার মূল তাদৃশ মোটা হয় না। সাধারণ মুলা যাহার চাষ স্বভাবত প্রচলিত ইহা তাহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কোন কোন উদ্ভিদ তত্ত্ববিদের মতে ভারতে যে মুলার চাষ অধুনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উহাদের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ নহে। উহাদের পুরোবর্ত্তিগণ ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিয়াছে সে চিন্তার এখন বিশেষ আবশ্যক নাই, আমরা দেখিতেছি যে বহুযুগ ধরিয়া ভারতে ইহার চাষাবাদ চলিতেছে। ভারতে খুব বড় মোটা মুলা উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু উহা ইউরোপের মত এত উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে না। এখানকার বড় মুলা প্রায়ই ফাপা হয় এবং আস্বাদ ও মিষ্টতায় ভারতীয় মুলা বিলাতী মুলা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এখানে লম্বা মুলাই দৃষ্ট হয়, বড় শাদা কিম্বা লাল। বিলাতে গোলাকার, চেপ্টা (turnip shaped), কতকটা ডিম্বাকৃতি (olive shaped), সম্পূর্ণ গোল (Chlnese red radish) প্রভৃতি কত সুন্দর রঙ্গের ও সুন্দর আকারের মুলাই দেখা যায়। উহাতে আঁশ ভাগ খুব অল্পই থাকে, খাইতে অধিকতর সুস্বাদু। ভারতের মুলার অপেক্ষাকৃত আঁশ বহুল এবং মুলার গায়েও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় দৃষ্ট হয়। ভারতের মুলা উন্নতি বিধান নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি মুলা বীজ কি প্রকারে তৈয়ারি করা হয়। ক্ষেত মুলা চাষ করিয়া তাহা পরিণত হইতে দিলে তাহা হইতে শীষ বাহির হয় এবং তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ হইতে পারে কিন্তু সে বীজ হইতে আহারোপযোগী ভাল মুলা হইবে না। মুলা কিঞ্চিৎ বড় হইলে মাটী হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া, মূল অংশের তিন ভাগ বাদ দিয়া কাটিয়া কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে বসাইয়া দিলে তাহাতে ফুল হয় এবং যে বীজ উৎপন্ন হয় সেই বীজই ভাল। এইরূপে ২।৩ বার কাটিয়া বসান হইলে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর বীজ পাওয়া যায়। এই প্রকারে উৎপাদিত বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিন্তু লম্বা মুলা হইতে লম্বা মুলাই উৎপন্ন হইবে। সাঙ্কর্য্যের দ্বারা উহাকে নানা আকারে পরিণত করা যায় এবং তাহাকে বিশিষ্ট ভাবে আঁশশূন্য করা যায়। ভারতীয় কৃষি-সমিতি আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই চেষ্টা করিতেছে এবং ফলও অনেকটা আশাপ্রদ বলিতে হইবে এবং এমন আশা করা যায় কিছুদিন পরে যে বিলাত বা আমেরিকা হইতে চাষের জন্য মুলা বীজ আমদানী করিতে হইবে না। র‍্যাট টেল মুলার (the rat tail radish) কথা বলিতে বলিতে অন্য বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এই মুলাই আমাদের আদীম মুলা—ভারতের খাস অধিবাসী, চীন দেশ পর্য্যন্ত ইহাদের বাস বিস্তার দেখা যায়। ভারতের বনমুলা ইহাদের আদি পুরুষ বলিয়া মনে হয়। পঞ্জাবে ইহার চাষ প্রথম বিস্তার লাভ করে। তাহারা মুলার জন্য ইহার চাষ প্রথমতঃ করিত না। মুলা কিছু বাড়িলেই কাটিয়া লইয়া পুনরায় ক্ষেতে বসাইয়া আবাদ করিত। এইরূপ প্রথায় আবাদ করিলে পুষ্পদণ্ড হইতে

যে গুটী হয় তাহা আকারে বড়, রসাল ও মাংসল হয়। এই গুটীর উৎকর্ষ সাধনই তাহাদের লক্ষ্য। ক্রমশঃ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া গুটীগুলি ১ হাত ১॥ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে মুলার চাষ হয় তাহার গুটী সুপ্রণালী মত চাষাবাদ দ্বারা এত বড় হইতে দেখা যায় না। বড় বড় গুটিগুলি তরকারী হিসাবে সুখাদ্য। গুটী পাকিয়া শুষ্ক হইলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহা পরবর্ত্তী চাষের জন্য রক্ষিত হয় এবং বাড়তী বীজ তৈল পেষণার্থ ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার গুটীর আচার বা চাটনী তৈয়ারি করিয়া ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আমরা অতঃপর দেশী বিলাতী মুলা চাষের পরিচয় দিতেছি—

বিলাতী মুলা

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ



দেশী মূলা—লাল।

মৃত্তিকা।—হাল্কা দোঁয়াস মাটি। মাটি ১॥০ কিম্বা ২ ফিট গভীর কর্ষিত হওয়া আবশ্যক।

সার।—পুরাতন গোবর-সার। গোবর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে সারে পরিণত না হইলে ব্যবহার করা উচিত নয়। অপরিণত বা অর্দ্ধপরিণত সার প্রয়োগ করিলে, কীটাদির উপদ্রব উপস্থিত হয়। একর প্রতি মুলার জমিতে ৬/ মণ হিসাবে খৈল দিলে খুব ভাল ফসল হয়।

বপনাদি প্রণালী—হাপরে বীজ না ফেলিয়া, চাষের জমিতে বীজ বপন করিলে ভাল হয়। নাতি প্রসস্ত "চৌকা" বা "পটী" নির্ম্মাণ করিয়া—সেই চৌকা বা পটীতে পাতলা করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়। পরে চারা বহির্গত হইয়া—স্থানান্তরিত করিবার উপযুক্ত হইলে—যদি ঘন বোধ করেন, তবে চারি ইঞ্চি পৃথক প্রত্যেক চারাগুলি রাখিয়া বাকিগুলি উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে।

অবশিষ্ট কার্য্য।—যথারীতি জলসেচন ও মধ্যে মধ্যে আগাছা উৎপাটন ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করিতে হয় না।

বিশেষ কথা—বিলাতী মুলা, দেশী মুলা অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হয়। জলদী জাতীয়গুলি, বীজ বপনের একমাস বা দেড় মাসের মধ্যেই আহারের উপযোগী হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার আস্বাদন কোমল ও সুঘ্রাণ-যুক্ত। দেশী বোম্বাই মুলা ও জাড়ার মুলা খুব বড় হয় ও এক একটা ১০।১২ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

আমাদের দেশের সাধারণ গরীবলোকের মুলা একটা মন্দ খাদ্য নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে মুটে, মজুর, গরীব চাষী দুই একটা মুলা খাইয়া একবেলা কাটাইয়া দেয়। ইহা তাদৃশ পুষ্টিকর না হইলেও সাধারণতঃ একটী ভাল তরকারি, ইহার ব্যঞ্জন অতি সুস্বাদু।

মুলা জমি তুলা হওয়া আবশ্যক—এই জন্য হাল্কা বেলে দোয়াঁস মাটি চাই। জমিতে না জল বসে—সুতরাং উঁচু জমি চাই। শাক খাইবার জন্য মুলা বারমাস বপন করা যাইতে পারে। অন্য সময় জল সেচন আবশ্যক—বর্ষায় তাহার আবশ্যক হয় না।

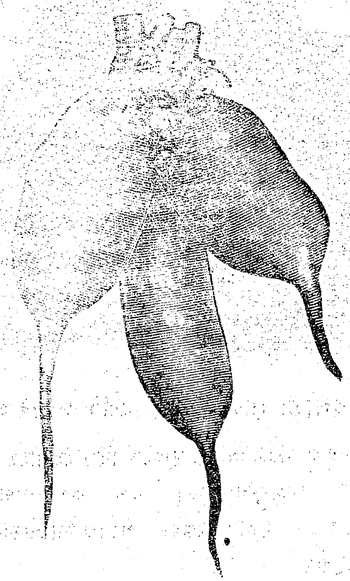

মূলা—ফ্রেঞ্চ ব্রেক ফাষ্ট—ইউরোপীয়গণের বড়ই আদরের।

মূলা দুই শ্রেণীর—(১) আশু; ২য় হৈমন্তিক বা পৌষীয়।

আষাঢ় মাসে বর্ষারম্ভে মুলার চাষ হয়, এই মুলার পাতা অধিক হয়, মূল তত বড় হয় না। পাটনাই মুলা বীজে খুব জলদী ফসল হয়, ইহা কিন্তু দেশী এই শ্রেণীর মুলা অপেক্ষা খাইতে ঝাল। আষাঢ় মাসে বীজ বপন করিলে ভাদ্র মাস নাগাইদ ফসল

তৈয়ারি হয়। চাষীরা ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় হিসাবে মূলা উঠাইতে থাকে এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মধ্যে আশু খন্দ নিঃশেষ হইয়া যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিলে পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে পৌষীয় খন্দ শেষ হয়। দুই বার বীজ বপন না করিয়া আশু পিছু তিন চারিবার বীজ বপন করা মন্দ নহে। মূলা জমি সরস থাকা চাই, শীতের হাওয়ায় জমি শুকাইতে আরম্ভ হইলেই মূলা ক্ষেতে তিন চারিবার জলসেচনের আবশ্যক।

মূলা ক্ষেতে বিঘায় ৫/ পাচ মণ খৈল ছড়াইলে মূলা আশাতীত বড় হয় এবং ফসলের পরিমাণ শতাধিক মণ হইয়া থাকে।

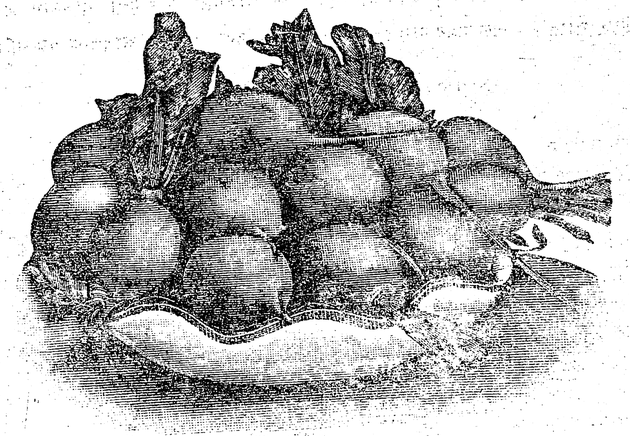

মূলা—বিলাতী লাল গোল—দেখিতে বড়ই সুন্দর।

আকৃতিগত বিভিন্নতা ধরিয়া আমরা মূলাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি—লম্বা, গোল, ও চেপটা, সালগম-আকৃতি। কখন কখন লম্বা ও গোলের মাঝামাঝি একটা আকৃতি দেখা যায়। মূলার রঙেরও অনেক বিভিন্নতা—সাধারণতঃ সাদা, লাল, কাল-রঙের মূলা দেখা যায়।

অনেকের বিশ্বাস শাদা মূলা খাইতে মিষ্ট হয় না। সেটা কিন্তু খুব ঠিক ধারণা বলিয়া বোধ হয় না। আমেরিকান সিলিণ্ড্রিকাল গোল মূলা অনেকটা ফ্লাট সালগমের মত। খাইতে সুমিষ্ট, বড় ৫ সের পর্য্যন্ত হয়। এই মূলা প্রদর্শনীতে পারিতোষিক লাভ করিতে অদ্বিতীয়।

বীজের পরিমাণ—এক একরে/১॥ সের।

ভারতে একটি শিল্পগার স্থাপনের প্রস্তাব

মিউনিশনস বোর্ড ভাঙ্গিয়া শিল্পবিভাগ গঠিত হইবে—তাহার কর্ত্তা হইবেন বলিয়া সার টমাস হলাণ্ড আবার ভারতে আসিয়াছেন। তবে কবে যে সে বিভাগের কাজ আরম্ভ হইবে, তাহা প্রকাশ পায় নাই এবং সে বিভাগ কি ভাবে কাজ করিবেন, তাহাও জানা নাই। তবে সে বিভাগের কাজ যে ভাবেই কেন পরিচালিত হউক না, ভারত সরকার ব্যবসার ক্ষেত্রে কি নিতি অবলম্বন করিবেন, তাহা প্রকাশ পাইলে লোক অবস্থা বুঝিতে পারিত এবং তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিত।

বিদেশ হইতে যে সব ঔষধ আসিত এ দেশে সে সব ঔষধ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এডভাইসের আদেশ অনুসারে ভারত সরকার এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এ দেশে ঔষধের উপকরণ-সংগ্রহের জন্য বৃক্ষলতার চাষ ও সেই সকল হইতে ব্যবসার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিবার সুবিধা বিবেচনা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। গত মে মাসে এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে স্থির হয়—

(১) সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর্স বিভাগের অনুসন্ধানাগারে প্রধানত অনুসন্ধানের কাজ চলিবে এবং উদ্ভিদ ব্যতীত অন্যান্য পদার্থ হইতেও ঔষধ প্রস্তুত করিবার কাজ এই সমিতি অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

(২) সমগ্র ভারতে কোথায় ঔষধের কি উদ্ভিদ জন্মে, তাহার অনুসন্ধান করা হইবে এবং কোথায় কি উদ্ভিদ কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বর্ত্তমানে কোথায় কোন্ উদ্ভিদের কিরূপ চাষ হয়, তাহারও অনুসন্ধান করা হইবে।

(৩) এ দেশের যে সব ঔষধোপকরণ উদ্ভিদ এখনও বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত হয় নাই অর্থাৎ বিলাতি ঔষধের জন্য যে সকলের ব্যবহার হয় না, সে সকলেরও অনুসন্ধান করা হইবে।

(৪) রোগবাহী ও অন্যবিধ কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রহত করিবার ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য কোন অনুষ্ঠান হইলে তাহাকে সাহায্য-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) সকল প্রাদেশিক সমিতিতে ঔষধ প্রস্তুত কমিটীর কথা জানাইয়া আবশ্যক সংবাদাদি প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইবে।

ইহার মধ্যে এ বিষয়ে যে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ, পূর্ব্বে বিদেশ হইতে যে সব জিনিষ আমাদানি করিতে হইত, এমন ৬০টিরও অধিক ঔষধ এখন সরকারের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। উদ্দেশ্য এই, যে সব ঔষধ অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপন্ন করা যায়, সে সব এ দেশে প্রস্তুত করিবার জন্য লোককে আহ্বান করা হইবে।

এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে তাহাতে দেশের লোকের বিশেষ উপকার হইবে এবং দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের ধনবৃদ্ধির উপায়ও হইবে।

এ দেশে ঔষধের জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদের অভাব নাই। সে সকলের উপযুক্ত চাষ হইলে এদেশে উপকরণের অভাব হইবে না। আমরা জানি, এ দেশেই হইতে অনেক উদ্ভিদ্ বিদেশে ঔষধের জন্য রপ্তানী হয় এবং তাহা হইতে সে সব দেশে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। তাহা না হইয়া যদি এ দেশেই ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়, তবে যে বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার এ দেশের অনেক উদ্ভিজ্জ এখনও বিদেশে ঔষধ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এ দেশের বেল, বেলেডোনা, একোনাইট, কুরচী, অনন্তমূল অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই বিদেশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাপ পর এ দেশে বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসুটিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতি এ দেশে চলিত অনেক উদ্ভিজ্জ ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা কুটজ, কালমেঘ, অশোক, প্রভৃতির নির্য্যাস গ্রহণ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন এবং সে সব এখন দেশে ব্যবহৃতও হইতেছে। অবশ্য তাঁহারা বিদেশী বৈজ্ঞানিক প্রথায় সে সব ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। এখনও এ দেশে বহুবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। অবজ্ঞায় ও অবহেলায় অনেক ঔষধের কথা দেশের লোক ভুলিয়া যাইতেছে। সে সকলের সম্যক্ সদ্ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশীয় এই জাতীয় উদ্ভিদের প্রয়োগ বিষয়ে একখানি বিস্তৃত পুস্তক-প্রচারের আয়োজন হইতেছিল—তাহার শেষ ফল কি হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। এবার সরকার যে সমিতি গঠিত করিলেন, সে সমিতি যদি এ দেশের লোকের মধ্যে প্রচলিত উদ্ভিজ্জ ঔষধের বিষয় সম্যক্ অনুসন্ধান করেন এবং এ দেশের লোকও সমিতিকে সাহায্য করেন, তবে যে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানারূপ উদ্ভিদ জন্মে—চেষ্টা করিলে অন্য নানাজাতীয় উদ্ভিদের চাষও যে না হইতে পারে, এমন নহে। সে জন্য আবশ্যক চেষ্টার ও উৎসাহের প্রয়োজন।

সরকার এবার যে সমিতি গঠিতে করিয়াছেন, আমরা আশা করি, সে সমিতির চেষ্টায় এ দেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।—বসুমতী।

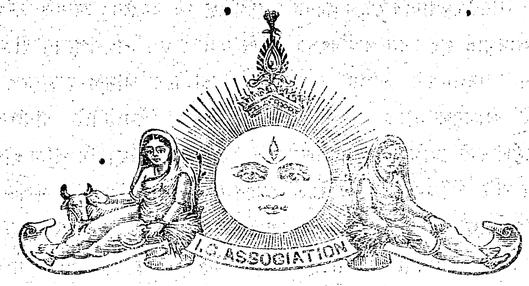

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল।

আম্র প্রসঙ্গ

১। এখন আমের সময়। কলিকাতার বাজারে চারিদিক হইতে আম আমদানি হইতেছে। প্রথমে বাজারে দেশী আম দেখা দেয়, তার পর দেশী বোম্বাই এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দেশীয় বোম্বাই, ল্যাঙড়া আসিয়া হাজির হয়। এই সকল আমের আমদানী কমিয়া আসিলে আষাঢ় শেষ হইতে ফজলী ও মালদহের ও অন্যান্য স্থানের আম আসিয়া কলিকাতার বাজার জাঁকাইয়া তুলে। বর্ত্তমান বৎসর আম অতি বিস্তর ফলিয়াছে। দেশীয় আমাদের দর ১।১৷৷টাকা প্রতি শত; বোম্বাই ভাল টাকায় ২৫টা; ল্যাঙড়ার আমদানী এখনও প্রচুর হয় নাই, এখনই কিন্তু টাকায় ১২।১৪।১৬টা বিকাইতেছে। আবার মান্দ্রাজের আমের কলিকাতার বাজারে সর্ব্বদাই আমদানী দেখা যায়।

২। আমাদের দেশে আম একটি শস্যের মধ্যে পরিগণিত। উহা খাইয়া গ্রীষ্মের চারিমাস কাল উত্তর ভারতের অনেক দরিদ্রই ক্ষুন্নিবারণ করে। বেহারের উত্তরে মিথিলায়, উত্তর ভাগলপুর ও পুর্ণিয়ার চারি পাঁচশত বিঘা ব্যাপিয়া এক একটা আমবাগান ছিল। বাজে বুনগাছ কাটিয়া সে কালের লোকে আমের কানন সৃষ্টি করিতেন। মধ্যে আফিমের বাক্স তৈয়ারি করিবার জন্য অনেক আমগাছ নষ্টকরা হয়। বাঙ্গালার ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও সার রিচার্ড টেম্পল আমের তক্তায় আফিমের বাক্স তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা রোধ করিয়া যান। ভারতে অন্নসমস্যা লাগিয়া আছে; এই জটীল অন্ন সমস্যার কথঞ্চিৎ মিমাংসা করিবার জন্য আম কানন রক্ষা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পুরাতন আমবাগান রক্ষার পক্ষে আর একটি বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সেইটি কলমের আমগাছ বসাইবার প্রবৃত্তি—কলমের

বাগান করিবার এমনি সখ উঠিয়াছে যে সখের চোটে অনেক পুরাতন আঁটির বাগানও নষ্ট হইতেছে। প্রায়ই দেখাযায় যে কলমের আমগাছে ২৫ বৎসরের অধিক ফল ফলে না। ভাল আঁটির আমগাছ দুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ফল দেয়। ভাগলপুরের বাঁকা মহকুমার অধীনে একটা আমগাছের তলায় হাট হয়। তাহাকে আমুয়া হাট বলে। তেমন দীর্ঘশাখ বিরাট আম্রবৃক্ষ নাকি পৃথিবীতে আর নাই। ছোঠলাট সারজন উডবরণ পর্য্যন্ত এই আমুয়া হাট দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই গাছের ছায়ায় পাঁচ হাজার লোক বসিয়া দোকান হাট ও কেনাবেচা করিতে পারে। আঁটির গাছে ফলও অত্যধিক হয়। আঁটির গাছ কমিয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বাপেক্ষায় বাঙ্গালায় আমও কমিয়াছে। বিহার অঞ্চলে বড় বড় আমবাগান আছে। বিহার অঞ্চলে বড় বড় আম বাগান অনেকের সম্বল গ্রাম্মকালে সরকারি লোকজন সকলে যাইয়া উহার তলায় তাঁবু ফেলিয়া সরকারি কাজ কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন। যখন এতাদৃশ্য রেল বিস্তার হয় নাই তখন দেশ বিদেশে যাতায়াত কালে পথিকগণের আমবাগানই বিশেষ আশ্রয় স্থল ছিল।

৩। আম বাদ দিলেও আঁটির আমবাগান একটা প্রচুর লাভের সম্পত্তি। আঁটির আমের গুড়ি এত বড় ও মোটা হয় যে একটা গাছের গুঁড়ি হইতে ২ ফিট্ × ৬ফিট্ শতাধিক তক্তা পাওয়া যাইতে পারে; এতদ্ব্যতীত উহার মোটা মোটা শাখা হইতে অপেক্ষাকৃত কম লম্বা চওড়া আরও অনেক তক্তা হইয়া থাকে। দীর্ঘ কালের আমগাছ যাহা বার্দ্ধক্য হেতু শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং প্রচুর ফল প্রদানে অক্ষম হইয়াছে সেগুলি বিক্রয় করিয়া বিশেষ অর্থাগম হইতে পারে। কলমের গাছে গুঁড়ি খুব ছোট হয় এবং তক্তা হওয়ার মত ভাল গুড়ি খুব কমই পাওয়া যায়। আমের আঁটির ভিতরে কসী পুষ্টিকর খাদ্য। আঁটির আমের আঁটি স্বভাবত কিছু বড় এবং তাহাতে শস্যও অধিক মাত্রায় থাকে। বিহারে গরিব লোকেরা বাড়ী বাড়ী যাইয়া পাকা আমের আঁটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। সেই আঁটি প্রথমে শুকাইয়া তাহার উপরকার শক্ত খোলা কাটিয়া কসী বাহির করে। এই খোলাগুলি শুকাইয়া রাখে শীতকালে উহা পোড়াইয়া আগুন তাপে শীতত্রাণ হয়। কসীগুলি প্রথমে সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ বাহির করিয়া দেয়। তাহার পর আবার শুকাইয়া যব বা গমের সহিত মিসাইয়া পিষিয়া ময়দা করে এবং তাহারই রুটি খায়। এই জন্য বিহারের এই প্রবাদ আছে—

চার মাহিনা আম খাঁউ
চার মাহিনা গুষ্ঠি
চার মাহিনা পহঁ নাই খাঁউ
কাম সেরহ ছুটি

যাহা অতি দরিদ্রেরও খাদ্য ছিল, যাহা অতি দরিদ্রও পাইত, আজ তাহা স্বচ্ছল গৃহস্থের পক্ষেও অনায়াস লভ্য নহে। ইহা চিন্তার কথা। পূর্ব্বে কোন ধনী বা

জমিদার আমবাগান বেচিতেন না। নিজে খাইতেন এবং গ্রামশুদ্ধ লোককে খাওয়াইতেন ও বিলাইতেন। এখন কাহারও বাগানে যাইয়া দুইটা আম পাড়িলে বা তলা হইতে কুড়াইলে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হয়।

আম গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল; গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভিন্ন উহা জন্মায় না, ভারতের উহা নিজস্ব সম্পত্তি। পৌরানিক ইতিবৃত্তে বলে যে ইহা সিংহল হইতে ভারতে আসিয়াছে। আবার ভারতবর্ষ হইতে কুলি রপ্তানি সঙ্গে সঙ্গে আমের আঁটি জ্যামেকা, কিউবা, ফিজি মরীচি, নেটাল, পূর্ব্ব আফ্রিকা কালিফর্ণিয়া, ট্রিনিদাদ প্রভৃতি দ্বীপে ও দেশে যাইয়া নূতন করিয়া আমের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। তবে ক্যাম্বেডিয়া, এনাম, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের বৌধ ওধনিবেশিকগণ আম রপ্তানি করিতেন ইতিহাসে পাওয়া যায়। দক্ষিণ চিনেও আমগাছ আছে। হংকংএও আমগাছ আছে।

৪। আমরা এক্ষণে বড় আম, মিষ্ট আম, আঁশশূন্য আম সকলেই খুজিয়া থাকি কিন্তু আমাদের আশল, গাঢ়,রসাল আমের প্রভূত প্রয়োজন ,কারণ ইহাতে আমসত্ত্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাই আম ফালা করিয়া খাইতে ভাল কিন্তু ইহার ও ল্যাঙড়ার রস পাতলা সুতরাং আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিতে ভাল নহে। দেশী মিষ্ট-গাঢ় রস বিশিষ্ট আমই আমসত্ত্বের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। টক রস বিশিষ্ট দেশী অমে চাটনী মোরব্বা ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। খুব টকো আম শুকাইয়া আমসী, টকচাটনী, কাসুন্দী সুন্দর হয়। অসময়ে ব্যবহারের জন্য এই সকল আমই বিস্তর আবশ্যক হয়। যেমন বিলাতি কুল ও দেশী কুল, পাটনাই ও কাশির কুল, বিলাতি কুল যেমন বাজারে আমদানী হইল অমনি লোকে ফল হিসাবে ব্যবহার করিয়া ফেলিল কিন্তু দেশী কুল অসময়ের বন্ধু—কুলের আচার, কুল শুষ্ক, কুলের জেলী বারমাস খাওয়া চলে।

৫। নবাবী আমলে বড় আকারের আমের আদরছিল না কিন্তু সে অন্য কারণে। ছোট আম আর আঁটির গাছের আমই নবাবী ও বাদসাহী রুচির অনুরূপ ছিল। যাহাকে আমরা প্যায়রাফুলি বলি তাহার আসল নাম প্যারাগুল্ অর্থাৎ আদদের ফুল। ইহা ছাড়া জরদালু, নবাব ভোগ. গোপাল ভোগ, মিছরিকন্দ আমের নবাবি আমলে আদর ছিল। তোয়াজ করিয়া আম খাওয়ার প্রদ্ধতি লক্ষ্ণৌ, পাটনা ও মুর্শিদাবাদেই প্রচলিত ছিল। ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্রে আম কখনই কাটা হইত না। বাঁশের চেঁচাড়ির ছুরি, তালের বালদোর ছুরি অথবা শিঙের তৈরি ছুরি, ইদানিং কাঁচের ছুরি দিয়া নবাব বাড়িতে এবং নবাবি রুচি বড়লোকের বাড়িতে আম তৈয়ারি করা হইত। খুব শিতলজল কিম্বা বরফজলে কয়েক ঘণ্টা আম ভিজাইয়া আমির ওমরাও নবাব বাদসাগণ ব্যবহার করিতেন। কোন কোন আম জলের ভিতর ছাড়াইয়া না লইলে তাহার স্বাদ খারাপ হইয়া যায়।

৬। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার আমের বিশিষ্টতা এই যে, উহা হইতে এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশের আমে নাই।

CONTINUOUS

পাঞ্জাবে, রাজপুতনায়, শিন্ধুপ্রদেশে ভাল আমগাছ হয় না, ভাল ফলও হয় না। আমরা বোম্বাই আমের কথা বলিতেছি। বোম্বাই প্রদেশে কিন্তু এ আম নাই। ইহা কেবল বাঙ্গলা দেশেই আছে এবং বোম্বাই প্রদেশের আমের সহিত সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম বোম্বাই হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে এলফেঞ্জো, হাফিজ, প্যারি, ক্ষীরথণ্ড প্রভৃতি প্রচলিত আছে। মান্দ্রাজ দেশেও অনেক রকমের আম আছে কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আমের মত এত সদ্‌গন্ধ পূর্ণ নয়। উড়িষ্যায় ভাল আম হয় না। লোনা মাটিতে এবং জলা দেশে আমের চাষ ভাল হয় না।

৭। আমের কলম ১৫০ বৎসর আন্দাজ এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমের কলমের কলমের গাছ এদেশে ছিল না। পূর্ব্বে অর্থাৎ নবাবি আমলে খাসি করা বা চসমা লাগান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইদানিং বোধ হয় এক দ্বারভাঙ্গার মহারাজই খাসি ও চসমার আম বাগান তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছেন। বোম্বাই আমের খাসি হয় না, কারণ উহা কলমের ফল। ন্যাংড়া ও ফজলির আসল গাছের বীজ লইয়া খাসি করা হইয়াছে। তাহার ফল কেমন হয় এখনও ঠিক বলা যায় না। "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ" গত বৎসর খবর দিয়াছিলেন যে কালিফার্ণিয়ায় মার্কিনের মালীরা হিমসাগর ও ফজলির খাসি করিয়া দুই সের আড়াই সের ওজনের একএকটা আম তৈয়ারি করিয়াছে। খাসি করিয়া আবাদ করিলে যে কোন ফল ফসলের উৎকর্ষ সাধন হয়। বীজ হইতে গাছ জন্মিলে তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া তাহার মূল শিকড় কিঞ্চিত ছাঁটিয়া বসাইলে তাহা হইতে উত্তম ফল ফলিবে। কেহ কেহ এক দুই বার তদ্ভোধিক বার গাছ নাড়িয়া তবে বিশিষ্ট স্থানে বসাইয়া থাকেন। খাসিকরা গাছের বেগুণ বড় মাংসাল ও সুস্বাদু হয়। খাসি করিয়া আমের আবাদ করিলে আমের আঁটি ছোট, আম রসাল ও মিষ্টি হয় এবং তদ্বিরে ক্রমশ আঁশের মাত্রা কমিয়া যায়।

৮। ন্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, প্রভৃতি নামজাদা আম সাঙ্কর্য্যের দ্বারা উৎপাদিত অর্থাৎ দুই রকমের আমের স্ত্রী মুকুল পুং পরাগ সম্মিলিত করিয়া এবং জমিতে নূতন রকমের চাষ দিয়া এই সকল আমের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল আম নবাবিষ্কৃত বা উদ্ভূত। শুনা যায় পাটনা ও ভাগলপুরের ডেভিস সাহেব বোম্বাই আমের সৃষ্টিকর্ত্তা। পাটনার বিভাগীয় কমিশনার জেঙ্কিন্স সাহেব ল্যাংড়ার আবিষ্কর্ত্তা। মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট র‍্যাভেন্সা সাহেব ফজলিকে খুঁজিয়া বাহির করেন। ইহারাই এই সকল আমের প্রচার করেন। আম সম্বন্ধে কৃষকে আরও অনেক কথা বাহির হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

—:*:—

আষাঢ় মাস

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা শীতের শসা, লাউ, বিলাতী বেগুন পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জল্‌দি ফসল করিতে গেলে, এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলি বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা; বেল, যুঁই, প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলী যুঁই বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বা মোথা (শীর্ষ) বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

CONTINUOUS

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়, কাঁঠালের গোড়া খুড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও আসামের কতস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকী নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছা বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপিচারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি কড়াই শুটী প্রভৃতি আমদানি হয়। পাটনা হইতেও ঐ সময় ফুলকপি আমদানী হইয়া থাকে।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

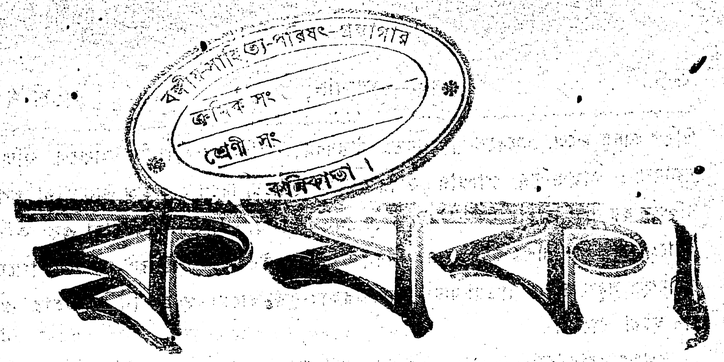

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড | আষাঢ়, ১৩২৭ সাল। | ৩য় সংখ্যা

রবার rubber.

(কৃষি-দর্পণ হইতে পুনরাবৃত্তি)

লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ হইতে রবার উৎপত্তি

অনেকেই দেখিয়াছেন যে আকন্দ গাছ হইতে কত প্রচুর পরিমাণে তরল আঠা নির্গত হয়। এই আঠা জমাইয়া রবারে পরিণত করা যাইতে পারে। কয়েক জাতীয় আকন্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দুই তিন জাতীয় আকন্দ হইতে প্রচুর নির্য্যাস নির্গত হয় উহারা calotropis gigantea; C. procera প্রভৃতি।

ইহাদের তরল নির্য্যাস হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় রবার উৎপন্ন হইতে পারে। রবার প্রস্তুত করিতে হইলে আকন্দ হইতে যে ক্ষীর পাওয়া যাইবে, তাহা কোন পাত্রে রাখিয়া সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করতঃ ঐ পিণ্ড উষ্ণজলে ফেলিয়া কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে থাকিলে, উহা রবারের ন্যায় কোমল ও স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট হয়; জলে ধাবনক্রিয়া কালে ইহার অভ্যন্তরস্থ মলরাশি বহির্গত হইয়া যায়। ইহা টার্পিন তৈলে দ্রবীভূত হয় এবং উষ্ণজল সহযোগে যেরূপ কোমল শিতল জল সংস্পর্শে সেইরূপ কঠিন হইয়া পড়ে। বৃক্ষের পরিত্যক্ত লতা, পত্র, শাখাদি কুটিত করিয়া রবার বাহির করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই যন্ত্রযোগে আকন্দ হইতে প্রচুর পরিমাণ রবার প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কারণ আকন্দের ক্ষীর সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন, বহু সময় ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। আকন্দ হইতে অতিউৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য সূত্রও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

Apocynum cannabinum—এপোসাইনম্ ক্যান্নাবিনাম্; আরও কয়েক প্রকার গাছ আছে যাহা এপোসাইনম উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকায় এই

উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে, এদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মিবার সম্ভাবনা; গাছগুলির গোড়ার উপর হইতে ছাঁটিয়া দিলে ২।৩ হস্ত উচ্চ শাখা প্রশাখা বহির্গত হয় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যে শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস পাওয়া যায় তাহা শুষ্ক করিলে রবারের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। এই নির্য্যাস ব্যতীত ইহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়নোপযোগী ক্ষৌমসূত্র সদৃশ সূত্রও পাওয়া যায়; আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে সূত্রের নিমিত্ত ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে।

গেয়ুল রবার (Guayule rubber) এই উদ্ভিদ ২।২॥ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না এবং অত্যন্ত শাখাপ্রশাখাবান গুল্মবিশেষ। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫৬০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূভাগে জন্মিয়া থাকে। উত্তর মেক্সিকো হইতে মার্কিনের টেক্সাস ও আরিজোনা পর্য্যন্ত ভূভাগে স্বভাবতঃই জন্মে।

কলারেডো রবার Hymenoxys Sp : Colorado rubber. ইহা আমেরিকার কলোরাডো ও নিউমেক্সিকোর পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রচুর জন্মে; এই রবার নিকৃষ্ট জাতীয়, নির্য্যাসে শতকরা ১০ ভাগ রবার পাওয়া যায়।

কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ ব্রহ্মদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়, ইহাদের উৎপন্ন রবার উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং নির্য্যাসে রবারের পরিমান অত্যন্ত অধিক; এ পর্য্যন্ত ইহাদের চাষ সম্বন্ধে কোন-প্রকার চেষ্টাই হয় নাই।

মিল্ক উইড—এই জাতীয় গুল্ম পূর্ব্বআফ্রিকায় জন্মে; ইহা মিল্ক উইড্ (Milkweed) বর্গীয় মূল জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার মূলোৎপন্ন রবার উৎকৃষ্টজাতীয় ও মূল্যবান্। যথায় বৃক্ষ বা গুল্মজাতীয় রবার জন্মে না তথায় ইহার সুবিধাজনক চাষ হইতে পারে। মহীশূরে ইহার পরীক্ষা হইতেছে। ইহার মূল দেখিতে অনেকটা বিট শালগমাদির ন্যায়।

ভাইন রবার।

Landolphia rubber Vines—আধুনিক শিল্পব্যবহার্য্য রবারের চতুর্থাংশ লতাজাত; লতাজাতীয় রবারের সংখ্যা বিস্তর। তন্মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী দেশ মাত্রেই ল্যাণ্ডলফিয়া জাতীয় রবার উৎপন্ন হয়; ভূমির উপরিভাগস্থ বা অভ্রভেদী বৃক্ষশিখরপ্রসর্পিত স্থূল কাষ্ঠময় লতাকাণ্ড হতেই এইজাতীয় রবার সংগৃহীত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার লতা জাতীয় রবারের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহার উৎপন্নের পরিমানও প্রচুর। প্যারা-রবার অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট না হইলেও নিতান্ত হেয় নহে; কারণ আফ্রিকার দেশীয়-লোকেরা ইহা ভালরূপ প্রস্তুত করিতে জানে না ও নানাপ্রকার ভেজাল মিশ্রিত করে বলিয়া বাজারে ইহার মূল্য কিছু অল্প; আজকাল নানাবিধ শিল্প কার্য্যে রবারের ব্যবহার হইতেছে বলিয়া ইহার মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আফ্রিকা যেরূপ উষ্ণপ্রধান

দেশ, তাহাতে ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বৃহৎ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ বালুকাময় উষ্ণ-দেশগুলি বিশেষতঃ বঙ্গের সিকতাময় অরণ্যপ্রদেশ সমূহে ইহা সুন্দর জন্মিতে পারে, কারণ সিংহল দ্বীপে অধুনা এই জাতীয় রবারের বিস্তর চাষ হইতেছে এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূলভাগে জলবায়ুর সহিত সিংহলের আবহাওয়ার অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়; ইহার চাষ যেরূপ স্বল্পব্যয়সাধ্য এবং সুকর তাহাতে আমরা ইহার চাষের প্রবর্ত্তন করিলে বিশেষ সফল ও লাভবান হইতে পারিব।

এপর্য্যন্ত ২০।৩০টী ল্যাণ্ডলফিয়া জাতীয় রবার আবিস্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রচুরপরিমাণে উৎকৃষ্ট রবার উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

Landlphia owariensis পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্র।
" heudelotii সেনিগাল।
Landolphia kirkii পূর্ব্বআফ্রিকা।
" thollonii "

ইহাদের মধ্যে তারকাঙ্কিতগুলিই শ্রেষ্ঠ। এদেশে যাঁহারা ইহার চাষ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত উপরে দেশ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তদ্দৃষ্টে আফ্রিকার তত্তৎদেশজাত গাছ ভারতবর্ষের তত্তৎ গুণবিশিষ্ট দেশে চাষ করিতে পারেন। কিন্তু যে কোন বিশেষজাতী যে কোন বিশেষদেশে উৎপন্ন হউক না কেন, রবারতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে সকল জাতীয় লতারবারই আফ্রিকার সর্ব্বত্র জন্মিতে পারে এবং জন্মিয়া ও থাকে।

পতিত, চাষের অনুপযোগী, বালুকাময় বা বালিয়াঁশ বা যাহাতে অন্য কোন ফসল আদৌ জন্মিতে পারে না, এরূপ ভূমিতে ল্যাণ্ডলফিয়া অত্যন্ত তেজের সহিত বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইহা কোনমতে অধিক উত্তাপ বা কণ্টক ও ক্ষুদ্রবৃক্ষের সংস্রব সহ্য করিতে পারে না। এই লতাকাণ্ড ১০।১২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট স্থূল ও কাষ্ঠময় (Woody climber) এবং অত্যন্ত দীর্ঘাকার বলিয়া শতশত হস্ত ভূমির উপর বা বৃক্ষসকলের অতুচ্চ শিখরদেশ দিয়া প্রসারিত হয়। ভূমির উপর হইতে বৃক্ষাগ্রের ৪।৫ হস্ত নিম্নভাগ পর্য্যন্ত কেবল লতাকাণ্ডও স্থূল শাখাগুলি ব্যতীত পত্রাদি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত যে সকল উষ্ণদেশে এই সকল লতা জন্মে, তথাকার ভূমি সাধারণতঃ বালিয়াঁশ, সরস সমতল, এবং অত্যুচ্চ ঘনসন্নিবিষ্ট, নিম্নান্ধকারময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ সমাকুল; ল্যাণ্ডলফা সেই সকল বৃক্ষকাণ্ড জড়াইয়া উঠে এবং বৃক্ষের শিখরভাগ ক্ষুদ্রশাখা পত্রপুষ্পাদি দ্বারা আচ্ছন্ন রাখে বলিয়া নিম্নদেশ সম্পূর্ণ ছায়া ও অন্ধকারময় থাকায় গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয় নিম্নে তৃণগুল্মাদি কিছুই জন্মিতে পারে না; যথায় উচ্চ বৃক্ষের একান্ত অসদ্ভাব তথায় ইহার চাষের চেষ্টা করা বৃথা। ত্রিবাঙ্কুর মহীশূর, মান্দ্রাজের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ, পুরী সুন্দরবন চট্টগ্রাম প্রভৃতি উষ্ণ, বালুকাময় ও উচ্চবৃক্ষপূর্ণ দেশে সম্ভবতঃ

ইহাদের চাষ সফল হইতে পারে। সিংহলে যদিও আজকাল এইজাতীয় রবারের চাষ হইতেছে তথাপি উচ্চবৃক্ষের জঙ্গলের অভাবে চাষের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। যাহাহউক চাষের লাভ বা ক্ষতি হইবে এরূপ সন্দেহস্থলে যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষার্থ অন্ততঃ ২০।২৫টা গাছ রোপণ করি, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি ত নাইই বরং তাহার ফলাফল কর্ম্মশীল উত্তরপুরুষগণের সাধনার বিষয় হইতে পারিবে।

ইহার পুষ্পগুলি গুচ্ছ বদ্ধ প্রস্ফুটিত হয় এবং বীজ শ্রাবণ ভাদ্রমাসে পাকে, পরিপক্ক বীজ ভূমিতে রোপন করিলেই গাছ বাহির হয়, নতুবা অধিকদিবস রাখিয়া রোপণ করিলে বীজের জীবনিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার চারা নাড়িয়া পুতিলে বিশেষ জোর করে না এজন্য কোন প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকটে ভূমি প্রস্তুত করতঃ একেবারেই তাহাতে বীজ বপনকরা বিধেয় যেন ভবিষ্যতে সেই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াই লতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। বীজ ব্যতীত কাটীকলমেও (Cutting) গাছ হইয়া থাকে, তবে বীজোৎপন্ন চারার জীবনীশক্তি অধিক।

লতাগুলি ৬।৭ বৎসর অতীত না হইলে রবার নিঃসারণের উপোযোগী হয় না; বর্ষাকালেই গাছ ক্ষত করিয়া ৪।৫ বার ক্ষীর বাহির করা হইয়া থাকে। ত্বকের উপরিভাগের ৪।৫ইঞ্চিব্যাপক স্থান চাঁচিয়া ছুরি প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রদ্বারা গভীর ভাবে আঘাত করিলে তরল নির্য্যাস বহির্গত হয়; লতাকাণ্ডের সকল অংশ হইতেই নির্য্যাস পাওয়া যায়। গাছের ছাল বুদ্ধিপূর্ব্বক কতকরাখিয়া কতক কাটিয়া নির্য্যাস বাহির করিলে পুনরায় গ্রীষ্মারম্ভের পূর্ব্বেই নূতন ছাল উৎপন্ন হইয়া গাছ বেশ সতেজ হইয়া উঠে ও পরবর্ত্তী বর্ষায় ক্ষত করিবার সুবিধা হয়। ল্যাণ্ডলফিয়ার অস্থূলতা ও পত্রাদি হইতেও রবার পাওয়া যায়, এজন্য অনেকে ঐ সমস্ত কুটিয়া কার্ব্বন বাইসালফাইড (Carbon Bisulphide) যোগে যন্ত্রবিশেষ দ্বারা রবার বাহির করিয়া থাকেন। আফ্রিকার অধিবাসিরা নির্য্যাস উষ্ণ করিয়া বা তাহাতে নানাবিধ উদ্ভিদাম্ল সংযোগ করতঃ জলভাগ পৃথক করিয়া এই জাতীয় রবার প্রস্তুত করিয়া কাকে। ইহাতে অনেক ভেজাল মিশ্রিত থাকে, ইহাকে উল্লিখিত বা অন্যান্য উপায়াদি দ্বারা শোধন করিয়া শিল্প ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। উগাণ্ডায় রবার ক্ষেত্রের কর্ম্মাধক্ষ্য বিখ্যাত ডাক্তার ক্রিষ্টী (Dr. Christy) এই ল্যাণ্ডলফিয়া হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্যারারবারের সমানমূল্য বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট রবার কেক্ প্রস্তুত করিতেছেন।

২১। Cryptostegia grandiflora. পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার নাম চাবুকছড়ি, ব্যবসায়ীমহলে ইহাকে মাদাগাস্কার রবার বলিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের অনেকস্থানে ইহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, কোথাও কোথাও ধনী লোকের উদ্যানে সকের হিসাবে ২।৪ টা গাছ দেখা যায়। ইহার দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস হইতে রবার পাওয়া যায়, তাহা অনেক স্থলে পেনসিলের দাগ মুছিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এতদুৎপন্ন রবার অতি উৎকৃষ্ট জাতীয়, ইহার ক্ষীরে শতকরা ৮০ ভাগের উপর বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ইহার চাষের কোন প্রকার চেষ্টা হয় নাই বা ব্যবসায়ের জন্য ইহা কদাপি সংগৃহীত হয় নাই; ইহা ভারতবর্ষের নিজ সম্পত্তি, এই উৎকৃষ্ট জাতীয় রবারের চাষে আমরা বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারি। ইহার চাষ আবাদ সমস্তই উল্লিখিত ল্যাণ্ডলফিয়ার ন্যায়। এই লতাজাত সূত্র অতি শুভ্র, কোমল ও দৃঢ় এবং ক্ষৌমসূত্রের (Flax) ন্যায় উৎকৃষ্টজাতীয় বস্ত্রবয়নের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে হইতে পারে। Cryptostegia madagascarensis নামক এই জাতীয় আর একটি লতা আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপে জন্মে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট রবার উৎপন্ন হয় এবং চেষ্টা করিলে এ দেশে জন্মিতে পারে।

২২। Urceola esculenta. ব্রহ্মদেশ।
" elastica. মালয়।
" acuteacuminata. বোর্ণিও।
" maingayi. শিঙ্গাপুর।
" brachysepala. মালয়, বোর্ণিও, জাভা।

আসিওলা জাতীয় উপরোক্ত কয়েকটি উদ্ভিদ হইতে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট রবার পাওয়াযায়, ক্ষীরে শতকরা ৮০ ভাগ রবার থাকে। ব্যবসায়ী মহলে ইহার নাম বর্ম্মা রবার। ইহারা সমুদ্রতট হইতে ২০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিভাগে জন্মে। ইহাদের চাষ আবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। সিংহলে আসিওলা এস্কুলেণ্টার (U. esculenta) চাষ হইতেছে; এ দেশে প্রথমোক্ত দুইটী সুন্দর জন্মিতে পারে। ল্যাণ্ডলফিয়ার ন্যায় অযত্ন বপনে ইহাদের চারা জন্মে না, একন্য সার মৃত্তিকাযুক্ত বীজ চৌকায় চারা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত কয়েক জাতীয় লতারবার সাধারণতঃ সমুদ্রতট হইতে ২০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চভূমিভাগেই জন্মিয়া থাকে। বীজচৌকায় চারা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাকালে ২০ হস্ত অন্তর এক একটি বৃক্ষ সমীপস্থ ভূমিতে সেইগুলি রোপণ বা ঐ স্থানে বীজ একেবারেই বপন করা যাইতে পারে। গাছ বাড়িতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া দেওয়া ও জঙ্গল পরিস্কার করা ভিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্যক হয় না। ৬।৭ বৎসর অতিবাহিত না হইলে এ সকল লতা হইতে প্রচুর পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয় না, তবে অল্পদিনের গাছ হইতে অল্প অল্প পরিমাণে রবার উৎপন্ন হইয়া চাষের খরচা পোষাইয়া থাকে। উচ্চ বৃক্ষের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিলে লতা ভূমিতে প্রসারিত করিয়াও চাষ করা যাইতে পারে; এরূপস্থলে ২।৩ বৎসরের মধ্যেই লতাকাণ্ড হইতে রবার পাওয়া যায়। এই সকল রবারের লতাকাণ্ড ও মূলদেশ ক্ষত করিলে উভয় স্থান হইতেই ক্ষীর নির্গত হয়। মৃত্তিকা মধ্যস্থ মূল সযত্নে উঠাইয়া ক্ষীর বাহির করতঃ পুনরায় মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করা বিধেয়,

নতুবা মুল কাটিয়া ফেলিলে গাছ মরিয়া যায়। মূল হইতে শতকরা ১১ ভাগ ও লতা-কাণ্ড লইতে ৮ ভাগ বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায়। এই সকল রবারের মূল্য পাউণ্ড প্রতি সাধারণতঃ ২॥ হইতে ৩ শিলং। ল্যাণ্ডলফিয়ার রবার ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

২৩। বর্ণিও রবার Willughbeia edulis. লতি আম। বোর্ণিওদ্বীপ হইতে সর্ব্ব এই গাছের রবার আবিষ্কৃত হয়, এজন্য ইহার নামবোর্ণিও রবার। ব্রহ্ম, আসাম ও প্রথম চট্টগ্রামের জঙ্গলে এই লতা প্রচুর জন্মে এবং স্থানীয় লোকে ইহার ফলও খাইয়া থাকে। অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে এই লতার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘন দুগ্ধবৎ নির্য্যাস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রপক্ক করিলেই রবার প্রস্তুত হইল; ইহা কিছু নিকৃষ্ট জাতীয় রবার। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ইহার বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা উচিৎ। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও মালাবার অঞ্চলে এই জাতীয় (Willughbeia zeylanica) উইলুগবিয়া জিলানিকা নামক আর একটী লতা প্রচুর উৎপন্ন হয়। লোকে ইহারও ফল খাইয়া থাকে, এই লতারও সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘন দুগ্ধবৎ নির্য্যাস পাওয়া যায়। ইহাদের ক্ষীরে শতকরা ২০।৩০ ভাগ রবার আছে।

২৪। Melodinus monogynus—সাতুল কাওয়া। এই উদ্ভিদ লতা জাতীয়, উত্তরবঙ্গ, কুচবিহার ও শ্রীহট্টের জঙ্গলে স্বভাবতঃ জন্মে এবং ল্যাণ্ডল ফিয়ার মত অত্যুচ্চ বৃক্ষাগ্র ভাগের উপর দিয়া প্রসারিত হয়। ইহার ফল খাইতে অতি সুস্বাদু ইহা হইতেও রবার প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার রবার নিঃসারণের কোন প্রকার চেষ্টাই হয় নাই।

২৫। Forsteronia gracilis. ফরষ্টারোনিয়া গ্রেসিলিস্।
" floribunda. ,, ফ্লোরিবাণ্ডা।

লতাজাতীয় এই দুইটী উদ্ভিদ মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে জন্মিয়া থাকে; বিশেষতঃ শেষোক্তটী জ্যামেকাতেই প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উৎপন্ন রবার স্বল্পমূল্য ও অন্যান্য জাতীয় রবারের সহিত মিশ্রণের নিমিত্ত ব্যবহার হয়।

২৬। Clitandra orientalis—ক্লাইটাণ্ড্রা ওরিয়েণ্টালিস্। ইহা লতা জাতীয়, কঙ্গো ফ্রি ষ্টেট (Congo Free State) ও উগাণ্ডায় (Uganda) স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে, সমুদ্রতট হইতে ৪০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিভাগে সতেজে বর্দ্ধিত হয়। এই জাতীয় রবার অতি উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য কিন্তু অত্যন্ত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ক্লাইটাণ্ড্রা হেনরিকেসিয়ানা (Clitandra henriqussiana) নামক এই জাতীয় আর একটী গুল্ম আছে কিন্তু তাহার রবার তত উৎকৃষ্ট নহে। ইহাদের মূলদেশ হইতেই রবার পাওয়া যায়।

২৭। Parameria glandulifera—প্যারামেরিয়া গ্ল্যানডুলিফেরা। ব্রহ্ম, আন্দামান, মালয়, বোর্ণিও, ফিলিফাইন প্রভৃতি দেশে এই লতাজাতীয় রবার উৎপন্ন হয়, ইহার রবার উৎকৃষ্ট জাতীয়; ক্ষীরে শতকরা ৯০ ভাগ বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায় প্যারামেরিয়া ফেডাকুলোসা (Parameria fedunculosa) নামক এই জাতীয় আর একটি উদ্ভিদ উল্লিখিত স্থান সমুহেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহার রবার অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতীয়।

২৮। Carpodinus Sp.—কার্পোডিনাস। এই জাতীয় ৬৭টী উদ্ভিদের মূল হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে, আফ্রিকাই ইহাদের জন্মস্থান।

২৯। Leuconotis elastica. লিউকোনোটীস ইলাষ্টিকা।
,, subavenis ,, সুবাভেনীস।

এই দুইটী লতাজাতীয় রবার বোর্ণিও দ্বীপে প্রচুর জন্মিয়া থাকে; ইহাদের রবার উৎকৃষ্টজাতীয়, এজন্য বিবিধ শ্রেণীর রবারে মিশ্রণের জন্য (adulteretion) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেনাং, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে লিউকোনোটীস ইউজিনিফোলিয়া (Leuconotis eugenifolia) নামক এই জাতীয় আর একটী উদ্ভিদ জন্মে, কিন্তু তাহার রবার তত উৎকৃষ্ট নহে।

৩০। Marsdenia tenacissima—মার্সডেনিয়া টেনাসিসিমা। রাজমহল, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে এই জাতীয় লতা প্রচুর উৎপন্ন হয়। লতাকাণ্ডে অস্ত্রাঘাত করিলে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস বহির্গত হয় এবং তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে রবারে পরিণত হয়; ইহা দ্বারা পেন্সিলের দাগ প্রভৃতি সুন্দর মুছা যায়। এ পর্য্যন্ত ব্যবসায় হিসাবে ইহার রবার নিঃসারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার চেষ্টা হয় নাই। ইহার বল্কল হইতে অতি সুদৃঢ় সুত্রও প্রস্তুত হইতে পারে।

উল্লিখিত উদ্ভিদগণ ইউফর্বিয়াসি (Fuphorbiacee) আপোসাইনেসি (Apocynaceoe) আর্টীকেসি (Urticaceoe), আসক্লেপিডেসি (Asclepiadaceov), (Lhbeliaceoe) নামক এই কয়টী বর্গের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত ইউফর্বিয়া বর্গের মধ্যে সুহী (মনসা), বজ্রী (তেকাটাসিজ) বাগভেরেণ্ডা, জাট্রোফা (Jatropha) এবং সিফোনিয়া (Siphonia); আপোসাই নেসি বর্গের মধ্যে সপ্তপর্ণ (ছাতিম), তগর, করবীর এবং হাপরমালী; আসক্লেপিডেসি বর্গের মধ্যে জিম্‌নেমা (Gymnema), তিতকোঙ্গা, ডাজিয়া (Dragia) প্রভৃতি, হইতে প্রচুর ক্ষীর নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং সম্ভবতঃ উপায়বিশেষ দ্বারা এগুলি হইতেও রবার প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তবে ইহাদের মধ্যে রজন (Proteid), প্রেটিড্ (কুচুক (Caoutchouc) অর্থাৎ রবার প্রভৃতির অংশ কাহাতে কিরূপ বর্ত্তমান তাহারই পরীক্ষা সাপেক্ষ্য।

(ক্রমশঃ)

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(পুনরাবৃত্তি)

পূর্ব্বে এদেশ এখনকার ন্যায় সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী ছিল না। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতা না থাকায় এত অনাবশ্যক দ্রব্যের প্রয়োজন হইত না। যতই সভ্যতা ও বিলাসিতা বর্দ্ধিত হইবে ততই নূতন নূতন শিল্পের প্রয়োজন হইবে। আদিম কাল হইতে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে দেশের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে কেবল চাকরী চাকরী করিয়া বেড়াইলে কিছুতেই অন্ন কষ্ট দূরীভূত হইবে না। এখন অনেককেই সুশিক্ষিত হইয়া কৃষি শিল্পাদি বিষয়ের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। বৈদেশিক শিল্পজাত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় দেশের কৃষিশিল্পাদি সম্পাদন করিলে চলিবে না। বৈদেশিক শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি সুসভ্য দেশ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্র সাহায্যে কৃষি শিল্প সম্পন্ন করিতে হইবে। নচেৎ দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। হস্তচালিত যন্ত্রোৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য কখন বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা চালিত শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। এক্ষণে দেশীয় কৃষিশিল্পের দুরবস্থার দূর করিতে হইবে। এবিষয়ে অশিক্ষিত অজ্ঞ কৃষক ও শিল্পিগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এ বিষয়ে সুশিক্ষীত যুবকগণকে মনোযোগী হইয়া কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সুশিক্ষিত যুবকগণকে পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে যাইয়া কৃষি শিল্পাদি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া আসিতে হইবে। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। এবিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ড ও ধনীগণের সাহায্য ব্যতীত আশা সফল হইবে না। এক্ষণে দেশের যে রূপ দুরবস্থা, চারিদিকে যে রূপ করুণ ক্রন্দন রোল উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে মিশ্চেষ্ট থাকা কোন সহৃদয় মনস্বী ব্যক্তির কার্য্য নহে। যাহাতে দেশীয় অশিক্ষিত, অজ্ঞ কৃষক ও শিল্পীগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুনিপুন হয় তাহা করিতে হইবে।

আমাদের ন্যায় দেব মাতৃক দেশে আশানুরূপ শস্য উৎপাদন করা সুকঠিন। আবশ্যক মত জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বঙ্গদেশের প্রধান খাদ্য শস্য ধান্য। এই ধানের চাষ পর্জ্জন্য দেবের কৃপার উপর নির্ভর করে। প্রতি দশ বৎসরে ২।১ বৎসর ব্যতীত পর্জ্জন্য দেবের কৃপায় শস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রতি বৎসর সকল স্থানে ভাল ধান্য জন্মে না। অনেক স্থলেই পূর্ব্বে জল সেচনের উপায় ছিল, এক্ষণে সেই সকল জল সেচনোপযোগী জলাশয় ক্রমশঃ মজিয়া যাওয়ায়, তাহাতে আর জল থাকে না। এ প্রদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই বারমাস জল সেচনোপযোগী জলাশয় ছিল,

এক্ষণে সে গুলি ভরাট হওয়ায় বারমাস জল থাকা দূরে থাকুক বর্ষাকালেও সেচনোপযোগী জল থাকেনা। সেই সকল জলাশয়ে বারমাস যাহাতে সেচনোপযোগী জল থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থানে স্থানে খাল খনন করাইয়া শস্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ কৃষির উন্নতি সুদূর পরাহত।

এই সকল কার্য্যের ব্যয় ভার দরিদ্র কৃষকগণের বহনের শক্তি নাই। এ বিষয়ে স্থানীয় গভরমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিকট বোর্ডের কৃপাদৃষ্টি আবশ্যক। জল সেচনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিঘাপ্রতি কিছু কিছু কর ধার্য্য করিলে সেই কর দ্বারা খাল খনন ব্যয় ক্রমশঃ পরিশোধ হইতে পারে। জল সেচনের সুব্যবস্থা হইলে কৃষাণগণ বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতেও কুণ্ঠীত হইবে না। অথচ এই কার্য্যদ্বারা দেশের মহোপকার সাধিত হইবে। শস্য রক্ষা জন্য যেমন জলসেচনোপযোগী খাল বা জলাশয় করা আবশ্যক হইয়াছে, সেরূপ গ্রামে গ্রামে সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করাও অতীব প্রয়োজনীয়। সত্যবটে,স্থানীয় গভরমেণ্ট পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্তও আশানুরূপ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। মফঃস্বলের প্রতিগ্রামের যদি সুপেয় পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা রোগ ও মৃত্যু সংখ্যা যে নিশ্চয়ই হ্রাস হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেশে এক্ষণে কৃষি উন্নতি জন্য যেরূপ স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার সংস্থাপন আরো বহুলরূপে করিতে হইবে। কিরূপ মৃত্তিকা ও কিরূপ সার কোন শস্যের উপযোগী তাহা অজ্ঞ অশিক্ষিত কৃষকগণকে চাক্ষুষ দেখাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে সারের উপযোগীতা তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রতি জেলায় প্রতিবৎসর না হয়, ২।১ বৎসর অন্তর কৃষিশিল্প প্রদর্শনী বসাইতে হইবে। কৃষিশিল্পের উপযোগী কৌশল ইত্যাদি বিষয় সুশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কৃষি শিল্পাদি বিষয়ের উত্তম যন্ত্রাদি আবিষ্কারককে পুরস্কারাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে বহু বৎসরের পর এ বৎসর বর্দ্ধমানে একটী কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ যত্নেই এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। আশা করি মহারাজবাহাদুর যেন অতঃপর প্রতি বৎসরই এইরূপ উদ্যোগী হইয়া বর্দ্ধমান কৃষি শিল্প প্রদর্শনী বসাইয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হন।

শ্রীনারায়ণ বিশ্বাস।

আহার বেলমা—বর্দ্ধমান।

উপায় চিন্তা।

দেশের অবস্থা দিন দিন যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে রাজা প্রজা সকলকেই প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে। রাজা বিদেশী—রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা বিদেশী বলিয়া দেশের লোকের অর্থাৎ প্রজাসাধারণের অভাবের কথা, অভাবের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে পারেন না—জানিয়া প্রতীকার করিতে একটু বিলম্বও অনিবার্য্য হয়। বাঙ্গালা দেশে নদী হাজিয়া মজিয়া যাওয়াতে দেশের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া সরকার আজ প্রতীকারকল্পে যে চেষ্টা করিতেছেন, যদি ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও সে চেষ্টা হইত, তবে দেশরক্ষার অনেকটা উপায় হইতে পারিত। বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া সেনসস রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—

"বৎসরের পর বৎসর জ্বর বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। প্লেগে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; জ্বরে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে প্রাণত্যাগ করে। জ্বরে কেবল যে মৃত্যু-হেতু লোকসংখ্যার হ্রাস হয়, তাহাই নহে; পরন্তু যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে—তাহাদের জীবনশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়—উৎসাহ নষ্ট হয়—প্রজনন-ক্ষমতার হ্রাস হয়। তাহাদের জীবনে শৃঙ্খলা থাকে না। জ্বরে দেশে শিল্পের ও বাণিজ্যের স্রোত বন্ধ হয়। বাঙ্গালায় দারিদ্র্যের ও অন্য অনেক অসুবিধাজনক কারণের মূলই ম্যালেরিয়া।"—

A leading cause of poverty and of many other disagreeables in a great part of Bengal is the prevalence of the Malaria.

সরকারী রিপোর্টেই এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় এই ম্যালেরিয়ার মূলোৎপাটন করিতে কি চেষ্টা হইয়াছে? সরকার উকিবরে পয়সা পুলিন্দা কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেই কি সরকারের কর্ত্তব্যের অবসান হয়? বাস্তবিক এত দিন সরকার প্রজার এ বিষয়ে অভাবের পরিমাণ স্থির করিতে পারেন নাই। এখন স্থির করিতে পারিয়াছেন এবং সে জন্য চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন যে একবার বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন কাজে—কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব হয়, তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—শাশকে শাসিতে প্রভেদ। "যেখানে অন্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়।" নূতন ব্যবস্থায় যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের ভার দেশের লোকের—মন্ত্রীদিগের প্রতি অর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেও বোধ হয়, সরকার আপনাদের এই অসুবিধা বুঝিয়াছেন বলিয়া—দেশের লোক নহিলে দেশের লোকের অভাবের স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, সেই জন্যই

কথা—সুশাসন কখন স্বায়ত্ত-শাসনের সমান হইতে পারে না—Good government cannot be a substitute for self-government.—

"রুটী বল, লুচি বল, ভাতের পারা নয়;
মাসী বল, পিসি বল—মায়ের বাড়া নয়।"

যাহা হউক, বর্ত্তমানে সরকার যে দেশের লোকের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকারোপায় চিন্তা করিতেছেন, সে জন্য আমরা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। সে চিন্তা যদি আবশ্যক পথে পরিচালিত হয়, তবে সুফল ফলিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু এখনও সময় সময় আবশ্যক উপায়-অবলম্বনে বিলম্ব ঘটিতেছে। দেশে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির সম্পর্কে মিঃ হিনস যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে—রপ্তানীর পর দেশে যে পরিমাণ শস্য ছিল, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।—The safety margin afforded by the surplus grain and pulse ordinarly exported was small.

যখন অবস্থা এমন, তখন পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া সরকারের কর্ত্তব্য ছিল।

সে দিন সফরে বাহির হইয়া লর্ড রোণাল্ডসে দেশে এই দুর্ম্মূল্যতার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সে দিন কৃষি-প্রদর্শনীতে বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমান সময়ে আমরা সকলেই দুর্ম্মূল্যতায় কষ্ট পাইতেছি। অন্ন, বস্ত্র আরামের দ্রব্য—যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য আমরা অবগত আছি। যুদ্ধের সময় লোকে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আবশ্যক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারেন নাই। তাহার ফলে যুদ্ধের পর দ্রব্যের অভাবে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়। যুদ্ধের পরই যে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু ভারতবর্ষ যুদ্ধের ফল প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করে নাই—পরোক্ষভাবে করিয়াছে। সে অবস্থায় যে সব সামগ্রী জন্য ভারতবর্ষকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না, বরং ভারতবর্ষই অন্যান্য দেশকে সে সব সামগ্রী যোগায়, সে সব দ্রব্যের সম্বন্ধে ত এ কথা বলা যায় না। কবি ভারতবর্ষের কথায় বলিয়াছেন—

"চিরকল্যাণময়ী, তুমি ধন্য;
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

ভারতে এই অন্ন যে দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহার কারণ কি? লর্ড রোণাল্ডসের কথায় মনে হয়, যে সব দেশে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয় নাই, সে সব দেশের টানে ভারতে খাদ্য-শস্যের দাম চড়িয়াছে। ইহা যে সম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য; এবং বিদেশের টানে এ দেশের খাদ্যশস্যের দাম যে চড়িয়াছে, সেই কথাই দেশের লোক

বলিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার সে কথা স্বীকার করেন না। আমরা উপরে যে সমিতির উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমিতির প্রথম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সে দিন বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছে—লোকের বিশ্বাস, ১৯১৮ অব্দের শেষে বিলাতকেও অন্যান্য মিত্রদেশকে খাদ্যশস্য যোগাইতে ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব হইয়াছে; কিন্তু রপ্তানীর হিসাব দেখিলে সে কথা যথার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মিষ্টার ইনিস হিসাব দেখাইয়া বলেন—

The table did not support the theory that India was draine of food stuff during the war বরং দেখা যায়, কম শস্যই রপ্তানী করা হইয়াছিল the amount was small in comparison with the total yield fo grain and pulse.

সুতরাং ভারত সরকারের মতে বিদেশের টানে এ দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। তবে কেন এমন হইল? বিদেশ হইতে যে সব জিনিষ আনা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই, সেই সব জিনিষের-কাপড়ের লোহা লক্কড়ের দাম চড়িয়াছে এবং চড়া দামে সেই সব জিনিষ কিনিতে হয় বলিয়া চাউলের বাজারও চড়িয়াছে। ইহাই কি বাঙ্গালা সরকারের ধারণা?

সে যাহাই হউক, লর্ড রোণাল্ডসে প্রতীকারের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে মতভেদ নাই—উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে—increased production, আপাততঃ ইহাই প্রতীকারের উপায়। আমরা বলিলাম, "আপাততঃ—কারণ, সকল দেশেই এই কথা হইতেছে। পৃথিবীর সকল দেশেই যদি এই উপায় অবলম্বিত হয়, তবে পণ্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। কিন্তু যখন শিরে সংক্রান্তি, তখন এই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে।

এই জন্য লর্ড রোণাল্ডসে এখন দুইটি পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

(১) সমবায়-নীতি অবলম্বন।

(২) অভিজ্ঞতালব্ধ উপায় অবলম্বন। তিনি বলিয়াছেন, সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে অধিক সামগ্রী উৎপন্ন করা যায়—স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করিলে তাহা সম্ভব হয় না।

আর যে সব 'ডাঙ্গাজমী' অনেক সময় পতিত থাকে, তাহাতে চীনের বাদাম উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এইরূপে যে স্থলে এখন একটি দানা উৎপন্ন হয়, কিসে সেই স্থানে দুইটি দানা উৎপন্ন করা যায়, তাহাই এখন পরীক্ষার ও চেষ্টার বিষয়। মার্কিণে ও জাপানে সেইরূপ পরীক্ষায় ও চেষ্টায় কিরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহা অবশ্যই বাঙ্গালা সরকারের অবিদিত নাই।

কিন্তু এ বিষয়ে কেবল লোককে পরামর্শ দিলেই ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না। লোক লাভজনক কাজ করিতে প্রস্তুতই আছে। এ বিষয়ে সরকারকে অগ্রণী হইয়া কাজ করিতে লইবে। হিতবাদী

গোময় ও গোমূত্রের ব্যবহার

লেখকের প্রার্থনামত হিতবাদী হইতে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত

এতদ্দেশে অনেক কাজেই গো-ময় ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু গো-মূত্রের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। সকলেই গো-ময় ও গো-মূত্রের ব্যবহার প্রায়ই জানেন না। বিনা কাজে প্রচুর পরিমাণে গো-ময়, স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া থাকে; এবিষয়ে যদি একটু দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা উক্ত গো-ময় সংগ্রহ করিয়া জমিতে ব্যবহার করিলে লাভবান হইতে পারি। বঙ্গদেশে হিন্দু, মুসলমান প্রায় সকলেই গরু পুষিয়া, অল্পাধিক পরিমাণে গো-ময় পাইয়া থাকেন এবং চেষ্টা করিলে ঘাট মাঠ ও গো-চারণ ভূমি প্রভৃতি স্থান হইতে কতক পরিমাণে গো-ময় সংগ্রহ করিয়া উহা জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে পারেন। অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে উদাসীন; কাজেই প্রচুর পরিমাণে গোময় পাওয়া গেলেও যথাযথ ব্যবহার না হইয়া অধিকাংশই অপব্যবহার হইয়া থাকে। এদেশে গো-চারণের ভূমি নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কাজেই গরু চরাইবার জন্য লোকে নানা প্রকার স্থান যথা:—ঘাট, মাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া করিয়া থাকেন এবং এবং যে সময়ে গরু, বাছুর ইত্যাদি ঐ সকল স্থানে থাকিয়া খাদ্য গ্রহন করে, তখন তাহারা যে গোময় ত্যাগ করে তাহা প্রায়ই কেহ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান না। আবার অনেকে জমি হইতে ফসল কাটিয়া লইবার পর ঐ সকল জমিতে গরু চরাইয়া থাকেন কিন্তু কেহ উক্ত স্থান হইতে গোময় সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করেন না। ঐরূপ স্থান হইতে গো-ময় সংগ্রহ করা অতি সহজ। কৃষকেরা মনে করিয়া থাকে, উক্ত গো-ময়দ্বারা জমির উন্নতি সাধিত হয়। ইহা একটি ভুল ধারনা মাত্র। কেন না কাঁচা গোময় ক্ষেত্রে ছড়াইয়া রাখিলে, তাহাতে ক্ষেত্রের উপকার না হইয়া বরং অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। উহা ক্ষেত্রে রৌদ্রে শুখাইয়া, সারাংশ বাহির হইয়া ঘাস হয় অথবা বৃষ্টিতে ধুইয়া বা পচিয়া নষ্ট হয়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, কাঁচা গোময় ব্যবহারের জন্য ক্ষেত্রে পোকার উপদ্রব হয়। মনে করুন, আমরা যদি তিল বা সরিসা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া উহার ছাবড়া বা খইল তৈলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, তাহাতে

যেমন তৈলাক্ত পদার্থ না থাকায় উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; সেইরূপ ঘাস বা শুষ্ক গোময় ব্যবহার করিলে, উহাতে সারাংশ না থাকায় উপকার হয় না অথবা কাঁচা গোময় ব্যবহারে পোকার সৃষ্টি হয়।

সাধারণতঃ গোময় জমির সারের জন্য হয় ব্যবহৃত হয়। হিন্দুগণ এই গোময় দ্বারা উচ্ছিষ্ট স্থান ও পরিষ্কার করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য কাজেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে অন্য প্রকার ব্যবহারের বিষয় বলিবার আমার ইচ্ছা নহে; কেবল মাত্র কিরূপে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গোময় সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হয় ইহাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু গোমূত্র যে একটি প্রধান সারবান্ পদার্থ একথা হয় ত অনেকেই জানেন না, কাজেই তাঁহারা অবহেলা করিয়া ইহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। গোময় অপেক্ষা গোমূত্রে সারের অংশ বেশী বিদ্যমান রহিয়াছে এইজন্য শুধু গোমূত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। (জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে যেমন জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আবার অত্যধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিলে উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি না হইয়া বরং অপকারই হয়)।

গোমূত্রে সোরার ভাগ বেশী পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সোরা জমির পক্ষে বিশেষ উপকারী কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ব্যবহৃত হইলে, অপকার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে গোশালার নিকটবর্ত্তী ও মেঝের মাটী দিয়া সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল কারণ এই গোমূত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে, লোকে কোন এক খোলা (অনাবৃত) স্থানে গোময় আল্‌গা ভাবে জমা করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহার কতক অংশ রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া, কতক অংশ বৃষ্টিতে ধুইয়া এবং পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গো-ময়ের কতক সারবান্ পদার্থ আল্‌গা থাকার দরুন বায়ু কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এরূপ সার জমিতে ব্যবহার করিলে, বড় কিছু ফল পাওয়া যায় না। কারণ রৌদ্রে, বৃষ্টিতে ও বায়ুতে, শুকাইয়া ধুইয়া এবং উড়িয়া উহার অধিকাংশ সারই নষ্ট হইয়া যায়। যাহা কিছু সামান্য সারের ভাগ থাকে তাহাতে আংশিক কিছু কাজ করিয়া থাকে। যদি একটু যত্ন করা যায় তাহা হইলে সমপরিমাণ গোময় দ্বারা দ্বিগুণ, তিনগুণ বা তদপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া লইয়া লাভবান হইতে পারা যায়। অথচ খরচও বড় কিছু করিতে হয় না।

যাহাদের গরু আছে, তাহারা সকলেই গোময় সারের জন্য সংরক্ষণ করিতে পারেন উন্নত প্রণালী অনুসারে গো-ময় রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য করা দরকার।

১। গোশালার নিকটবর্ত্তী বা অন্য কোন স্থানে ৭।৮ ফুট লম্বা, ৪।৫ ফুট প্রস্থ এবং ৩ কিম্বা ৪ ফুট গভীর একটী চৌবাচ্চা (গর্ত্ত) করিতে হইবে। এই গর্ত্ত, গো-ময়ের পরিমাণ অনুসারে ছোট বা বড় করা যাইতে পারে। গর্ত্তের নিম্নদিক (তল) বেশ করিয়া এটেল মাটী দিয়া পিটাইয়া শক্ত করিয়া দিতে হইবে। উহার সঙ্গে

কিছু পরিমাণে গো-ময় দিলে ভাল হয়। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, রক্ষিত সার হইতে, জলীয় পদার্থ মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে না পারে। ঐ গর্ত্তের উপরে চারিদিকে অর্দ্ধ হস্ত বা এক হস্ত পরিমাণ উঁচু এমন ভাবে একটী আইল তৈয়ার করিতে হইবে যে বর্ষার সময় উক্ত সারের গর্ত্তে চতুষ্পার্শ্বস্থ জল প্রবেশ করিতে না পারে। জল প্রবেশ করিলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইবে। উক্ত গর্ত্তের উপরে চারি কোণে ৪ খান বাঁশ বা, অন্য কোন গাছের খুটী পুতিতে হইবে এবং উহার উপরে ১ খানা খড়ের চালা তুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে ঐ চালা হইতে বৃষ্টির জল সহজে সরিয়া পড়ে, সেজন্য এক দিক একটু ঢালু করিতে হইবে। চালার উচ্চতা গর্ত্ত অনুসারে হওয়া দরকার। যদি চালা বেশী উচু হয় তবে রৌদ্র প্রবেশ করিয়া গো-ময় শুষ্ক হইয়া যাইবে। এইজন্য উহা বেশী উচু করা বিধেয় নহে। বৃষ্টির জল ও রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য চালা দেওয়া হইয়া থাকে।

২। উক্ত সারের গর্ত্তে গো-ময় এবং গো-মূত্র সঞ্চয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গো-শালার মেঝে, সমতল না করিয়া এক দিকে একটু ঢালু করত ঐ ঢালু দিকের শেষ প্রান্তে ড্রেন (নালা) করিতে হয়। ঐ নালা দিয়া যাহাতে, গো-মূত্র সরিয়া পড়িতে পারে, সেইরূপ করা উচিত। যে স্থানে গো-মূত্র জমা হয়, সেই স্থানে একটী মেটে বা অন্য কোন পাত্র এরূপ ভাবে বসাইয়া রাখিতে হইবে যে অনায়াসে সমুদায় গো-মূত্র ঐ পাত্রে আসিতে পারে। রাত্রে যে গো-মূত্র জমা হয়, তাহা পরদিন প্রাতেই সংগ্রহ করা দরকার। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে রাত্রি কালের অধিকাংশ গো-মূত্রই রক্ষা করা যাইতে পারে. কিন্তু দিনের বেলায় গো-মূত্র সংগ্রহ করা একটু কষ্ট সাধ্য। প্রতিদিন সকাল বেলা গো-শালা হইতে এবং অন্য স্থান হইতে (যদি পাওয়া যায়) গো-ময় সংগ্রহ করিবে। উক্ত গো-ময় পূর্ব্ব কথিত সারের গর্ত্তে প্রথমতঃ রাখিতে হইবে, পরে উহার উপর গোয়ালের পতিত খড় ও আবর্জ্জনা ইত্যাদি রাখিয়া তাহার উপর সঞ্চিত গো-মূত্র ছিটাইয়া দিবে। উহার সঙ্গে ৩।৪ দিন পর কিছু পরিমাণ গোয়ালের মাটী দিলে ভাল হয়। কারণ গো-মূত্রের কিয়দংশ ঐ মাটীতে শুষিয়া লয়। দরকার হইলে, গোয়ালে নূতন মাটী দিয়া পূরণ করিবে। প্রতি দিনই সার সঞ্চিত করিয়া, কোদাল বা অন্য কিছু দিয়া চাপিয়া সমতল ও শক্ত করিয়া দিবে। গো-ময় কখনও আলগা ভাবে রাখিতে নাই। যে পর্য্যন্ত গর্ত্ত পরিপূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপে সার সঞ্চিত করিবে। গর্ত্তটী পরিপূর্ণ হইলে, উহার উপর মাটী দিয়া লেপিয়া রাখিলে ভাল হয়। এইরূপে রক্ষিত সার আস্তে আস্তে গর্ত্তের ভিতরে সমভাবে পচিয়া অতি উত্তম ও মূল্যবান সারে পরিণত হইয়া, এক বৎসরে উহা জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। একটী গর্ত্ত পূর্ণ হইলে, পূর্ব্ব লিখিত মতে অন্য একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করিবে। একজন গৃহস্থের সাধারণতঃ ২টী গর্ত্ত হইলেই চলে। এরূপ

প্রস্তুত সার জমিতে ব্যবহার করিলে 'সাধারণ রক্ষিত সার' প্রয়োগ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। ফসল করিবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে, জমির উর্ব্বরতা শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, পরিমাণানুযায়ী সার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া, চাষ ও মই দিয়া মাটীর সঙ্গেমিশাইয়া দিতে হয়।

শ্রীমৃগেন্দ্রকুমার দাস, গবর্ণমেণ্ট কৃষিপ্রদর্শক, গাইবান্ধা, (রংপুর)।

কৃষির উন্নতির উপায়

কৃষিই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। কৃষির উন্নতির সহিত আমাদের দেশের উন্নতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কৃষকদিগকে মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া সমবেত ভাবে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

কৃষির অবস্থা পূর্ব্বে এত শোচনীয় ছিল না। তখন অল্প জমিতে সময় মত গভীর চাষ, ভাল জাতের খাটি বীজ, ভেজাল সার দিয়া ও উপযুক্ত যত্ন পরিশ্রম করিয়া লোকে বিঘা প্রতি যে ফসল পাইত এখন তাহার দেড়গুণ জমি হইতেও সে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে গো মহিষের উপযুক্ত পরিচর্য্যা ও তাহাদের চোনা গোবর চালা ঘরের নীচে সারকুড় (সারকূপ) করিয়া রাখা, জানিত ভাল বীজ ব্যবহার ও নিজ যত্ন ও তত্ত্বাবধানে সুন্দর চাষ আবাদ করা হইত। বর্দ্ধমানে এ সকলের কিছুই করা হয় না। গবাদির মলমূত্র এখন যে ভাবে ফাঁকা জায়গায় গাদা দিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে তাহার সার পদার্থের অধিকাংশই রৌদ্র, বৃষ্টি ও বাতাসের প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। লালমাটীর জন্য হাড়ের গুড়া খুব ভাল সার, কিন্তু কৃষকেরা তাহার ব্যবহার ও উপকারিতা জানে না, ফলে দেশের হাড়গুলি বিদেশে চলিয়া যায়। হৈমন্তিকের জমিতে ধৈঞ্চা বীজ বিঘা প্রতি ৵৩৹ হিসাবে ছড়াইয়া দিয়া উহার গাছগুলি কিছু বড় হইলে, আষাঢ় মাসের প্রথমে সেই গাছগুলিকে কাদা চাষের দ্বারা মাটীর সহিত মিলাইয়া ধান রোপণ করিলে বিঘা প্রতি ৩.৪ গাড়ী গোবর সার দেওয়া জমীর ফসলের অপেক্ষা অধিক ফসল জন্মিয়া থাকে। বীরভূম জেলার লোক এই ব্যাপারে সম্যক বুঝিয়া কৃষি সমিতি ও মণ্ডলী গঠন আরম্ভ করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। কৃষি সম্বন্ধে দশে মিলিয়া আলোচনা, নানাবিধ তথ্য প্রচার, বীজ ও সার একত্র ক্রয় এবং কৃষি বিভাগের অনুমোদিত অধিক লাভজনক প্রনালীর প্রবর্ত্তন—এই কার্য্যে থানায় থানায় পাকা চাষী লইয়া মণ্ডলীবদ্ধভাবে আরম্ভ করিলে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণ সে

কার্য্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকেন। সমিতির সম্পাদক সমিতির ব্যয়ে বীজ সার ইত্যাদি আমদানী ও বিলি করিবেন এবং নিজের বাড়ীতে একটী বীজাগার রাখিবেন। সমিতির মধ্যে শিক্ষিত লোক ও নিরক্ষর কৃষক উভয়েরই থাকা প্রয়োজন। নূতন প্রণালী অবলম্বনে বেশী লাভ দেখিয়াই সকল কৃষকই সে পথ অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইবে। সমিতিগুলি যতই অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং যতই তাহারা কৃষিবিভাগ, পশুচিকিৎসা-বিভাগ প্রভৃতির সাহায্য পাইতে থাকিবে, ততই তাহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি বাড়িয়া যাইবে। তখন তাহারা কেবল বীজ ও সারের আমদানী ও নূতন নূতন ফসলের চাষের প্রবর্ত্তন লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে না পরন্তু নূতন নূতন কৃষি যন্ত্রের প্রবর্ত্তন, গোয়াল ঘরের সার উপযুক্তরূপে রক্ষা ও ব্যবহার, শস্যের কীট ও পীড়ার প্রতিকার; পশু খাদ্যের ব্যবস্থা, পশু পীড়ার প্রতিকার ও চিকিৎসা, গো-বংশের উন্নতি, মৎস্য পালন, রেশম গোকা পালন, একই জমিতে প্রতি বৎসরে একাধিক ফসলের চাষ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম হইবে। তাহা ছাড়া ইহারা ভাল ভাল পরীক্ষাক্ষেত্র সভা করিয়া নূতন প্রণালীর উপকারিতা কৃষকদিগকে দেখাইয়া দিবে। স্থানে স্থানে কৃষি ও পশু প্রদর্শনী করিবে ও তাহাদের সভ্যেরা মাঝে মাঝে সরকারী পরীক্ষা দেখিতে যাইবে।

এই সমস্ত শাখা-সমিতি জমিতে জল সেচনের ও গো-চারণেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কৃষকদিগের জমিগুলি ক্রমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হইয়া যাইতেছে, ইহাতে চাষের খরচ যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, তেমনই আর অনেক রকম অসুবিধাও হইতেছে। শাখা সমিতিগুলি এই বিষয়টীরও আলোচনা করিয়া তাহার মীমাংসার সহায়তা করিতে পারিবেন। এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত জটীল বিষয়ের মীমাংসা ব্যাপারে শাখা সমিতিগুলি জেলা-সমিতির সাহায্য পাইবে সন্দেহ নাই। জেলা সমিতিতে সমস্ত শাখা সমিতিরই প্রতিনিধি আসিবে এবং সেই প্রতিনিধিগণ শাখা সমিতির সভ্যদিগের মত লইয়াই কাজ করিবেন। ফল কথা কৃষির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করা, কৃষিজাত লাভজনক শিল্পের প্রবর্ত্তন, ও কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করাই সমস্ত স্থানীয় সমিতির উদ্দেশ্য হইবে। সুতরাং এইরূপ কৃষি সমিতির প্রতিষ্ঠা কল্পে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কৃষকদিগকে মণ্ডলীবদ্ধ করিবার চেষ্টা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের গ্রামে গিয়া মণ্ডলী গঠন করিতে আরম্ভ করুন। প্রত্যেক শিক্ষিত কৃষক ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র, সকল প্রকার কৃষককে লইয়া মণ্ডলী গঠন করুন। ধনী যাঁহারা তাঁহারাই এই মণ্ডলী গঠন ও প্রচার কার্য্যে অর্থ সাহায্য করুন শিক্ষিত যাহারা তাঁহারা শাখা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হইয়া সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে থাকুন, এবং পল্লীতে পল্লীতে নূতন শাখা সমিতি স্থাপন করুন। তাঁহাদের চেষ্টায় জেলা-সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠ হউক এবং জেলা সমিতি প্রকৃত কার্য্য করিতে অগ্রসর হউক। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া

জেলা-সমিতিগুলি শাখা সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতে থাকুক। তারপর কলিকাতা নগরীর নেতৃগণ মিলিত হইয়া কলিকাতায় একটী কেন্দ্র সমিতির প্রতিষ্ঠা করুন।

সকল বিষয় গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না, গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয় সমিতিগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু কৃষি সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা ও চালাইবার কার্য্য মুখ্যতঃ বে-সরকারী লোকদিগকেই করিতে করিতে হইবে। এইরূপে তাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পারিবেন। এইরূপেই তাঁহারা দেশের বহুসংখ্যক সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য সাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সহায়তা করিতে পারিবেন। সমিতিগুলি সকলের ভিত্তি ও জীবন স্বরূপ থাকিবে। এই শাখা সমিতি-গুলির সহিত জনসাধারণের প্রাণের যোগ থাকিবে। দেশের কৃষকেরাই ইহাদের সভ্য এবং সভ্যদিগের দৈনিক জীবন যাত্রার ব্যবস্থার উপরই ইহাদের কাজ স্থাপিত হইবে। দেশের মধ্যে এই সমিতিগুলিই প্রজাদিগের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। ইউনিয়ন কমিটী অপেক্ষাও ইহারা প্রজাদিগের উৎকৃষ্টতর প্রতিনিধি হইবে এবং ইউনিয়ন কমিটী অপেক্ষা ইহাদিগের জীবনীশক্তি বেশী হইবে।

যখন সমগ্র দেশ সমিতিতে ছাইয়া যাইবে, তখন আমাদের কৃষকেরা কৃষির উন্নতি করিতে যত্নবান হইতে শিক্ষা করিবে এবং আমাদের উন্নতির সহিত যে সব বিষয়ের সম্বন্ধ আছে এরূপ অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁহারা ক্রমে আগ্রহান্বিত হইতে শিক্ষা পাইবে, এইরূপে দেশে জাতীয় জীবনের প্রকৃত পত্তন হইবে।

বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় যাবতীয় কৃষকদিগকে মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া বহুসংখ্যক কৃষিসমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে দেশের জনসাধারণ একত্র চিন্তা করিতে ও সকলের উপকারের জন্য একত্র কার্য্য করিতে শিক্ষা করিবে। আমাদের পল্লীজীবনে "সামাজিক একত্ব" বোধ আর নাই। শাখা কৃষি সমিতির দ্বারা এই একত্ব বোধের পুনরুদ্ভব হইবে এবং পল্লীসংস্কার ও জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের স্বাভাবিক উপায় দেশে জন্মলাভ করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালার যুবক বৃদ্ধ কাহারও সম্মুখে লোকসেবার ইহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ উপস্থিত হইতে পারে না।

আপনারা কার্য্য আরম্ভ করিলে গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্রমশঃ অর্থ সাহায্যও পাইতে পারিবেন। কিন্তু যাহা প্রধান কার্য্য, সেই মণ্ডলী গঠন কার্য্যের ভার আপনাদিগকেই লইতে হইবে। মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়া কৃষির উন্নতির জন্য অক্লান্ত চেষ্টা আপনাদিগকেই করিতে হইবে।

কার্য্যের গুরুত্ব দেখিয়া উৎসাহহীন হইবার প্রয়োজন নাই। বার মাসেরও কম সময়ের চেষ্টায় বীরভূম জেলায় যে ফল লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত

হইয়াছে যে, নিরক্ষরই হউক আর পণ্ডিতই হউক, বাঙ্গালী কৃষককে কৃষিরউন্নতির জন্য কেহ মণ্ডলীবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে সে বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিবে না।

কৃষি বিভাগের বাছাই করা বীজ ব্যবহারে মেদিনীপুর জেলায় নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গিয়াছে ঃ—

১। পাট—স্থানীয় বীজের ফসল অপেক্ষা পিঙ্গলা, মহিষাদল, প্রভৃতি স্থানে ২/০ মণের অধিক ফসল পাওয়া গিয়াছে।

সদর মহকুমার "কটকতারা" আউস ধান স্থানীয় সকল বীজ অপেক্ষা প্রায় ১/০মণ অধিক ফলিয়াছে।

৩। পিঙ্গলা, মহিষাদল, সেরপুর, নাটদিঘি, প্রভৃতি স্থানে ইন্দ্রশালী ধান হইতে স্থানীয় ফসল অপেক্ষা গড়পড়তা প্রতিবিঘায় ২॥০ মণ অধিক ফসল হইয়াছে।

৪। পিঙ্গলা, তুর্কা ঝাড়গ্রাম, মহিষাদল, কাথি প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় বীজ অপেক্ষা নাগরা বীজে প্রতি বিঘায় ২/ মণের অধিক ফসল হইয়াছে।

কৃষি সমিতি গঠন করিয়া উপস্থিত এই কয়েকটি কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে ঃ—

১। ডাঙ্গা পতিত বেলে মাটিতে চিনা বাদাম আবাদ।

২। উচ্চ (ধোশা) আশ্বিনে ধানের জমিতে কটকতারা ধান।

৩। আষাঢ় শ্রাবণে এক হাঁটু ও প্রথমে কার্ত্তিকে যৎসামান্য জল বা রস থাকে এইরূপ জমিতে সরু নাগরা ধান।

৪। আষাঢ় শ্রাবণে ২ফুট পর্য্যন্ত ও মধ্যকার্ত্তিকে আধ হাত আন্দাজ জল থাকে এমন জমিতে ইন্দ্রশাল ধান।

শ্রীচুনীলাল মুস্তফী।

কৃষি-সভা—গত মঙ্গলবার স্থানীয় সবরেজিষ্ট্রী অফিসে কৃষির উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ এবং উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত একটী সভার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের মেদিনীপুরের জেলা কৃষি অফিসার শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুস্তফী মহাশয় সেদিন সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ সরকারী উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম-এ, বি-এল মহাশয় সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দিলে কৃষি অফিসার চুনী বাবু জমীতে সার প্রদানের উপকারিতা, গোবর সার রক্ষা করিবার প্রণালী এবং তাঁহার পরীক্ষিত কতকগুলি উন্নত জাতীয় চাষর প্রণালী বিবৃত করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। চুনীবাবু দীর্ঘকাল সরকারী কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া হাতে কলমে নানাপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা কৃষি কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞতার ফল তিনি সাধারণের গোচর করিয়া

কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ও আজকাল এদেশে কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ বিধান জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। যাহা হউক, এই কৃষি প্রধান দেশে যাহাতে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা উচিত। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য চুনী বাবুর প্রবন্ধটী অন্যত্র প্রদান করিলাম।

শিশু-পালন—আমাদের দেশে শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি হইতেছে, অনেক শিশু রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। এদেশে শিশু মৃত্যুর হিসাবের প্রতি দৃক্‌পাত, করিলে, একেবারে স্তম্ভীত হইতে হয়। ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে চারিটী করিয়া শিশু মরিতেছে, একি ভয়ঙ্কর কথা! জনক জননীর শিশু-পালন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার জন্যই যে এদেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জননীদিগকে কিরূপভাবে বাস করিতে হইবে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কিরূপ সতর্কভাবে তাহাকে পালন করিতে হইবে, শিশুটীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আহারের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, খেলার ও শিক্ষার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—এই সকল বিষয় অতি সুন্দর ভাবে ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার উপযোগী সরল ভাষায় "শিশু পালন" নামক একখানি অতি উপাদেয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হৃদয় ডাক্তার স্বদেশ-সেবক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্‌-বি মহাশয় দেশের জনক জননীদের কাছে ধরিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক শিশুর পিতামাতাকেই এই গ্রন্থখানি পড়িতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। পড়িলে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে এবং অনেক শিশু মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। স্বদেশ হিতৈষী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক বাবু "স্বাস্থ্যসমাচার" মাসিক পত্র প্রবর্ত্তন দ্বারা স্বাস্থ্যহীন রোগ-প্রপীড়িত স্বদেশবাসীর বিশেষ কল্যাণ সাধনে ব্রতী রহিয়াছেন। এখন তিনি এই উপাদেয় পুস্তকখানি প্রণয়ন দ্বারা দেশের যে কি উপকার করিলেন, তাহা বলিবার নহে। দেশের বর্ত্তমান ভীষণ শিশু মড়কের দিনে ইহার এইরূপ প্রতিকার প্রচেষ্টা সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়। এজন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থখানির মূল্য মাত্র ॥০ আট আনা। আমরা বঙ্গের গৃহে গৃহে এই উপাদেয় পুস্তকখানি সমাদৃত হইবার সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। প্রাপ্তিস্থান—৪৫ নং আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষির উন্নতির চেষ্টা—ইউরোপ, আমেরিকা, ও জাপান প্রভৃতি দেশে নিত্য নিত্য নব নব উন্নত প্রণালীর কৃষি যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা হওয়ায় সেই সকল দেশের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রেও কৃষিকার্য্যের আশাতীত উন্নতি লাভ হইতেছে; কিন্তু এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশে আবহমান কাল হইতে যে

প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইয়া আসিতেছে, আজও তাহার কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত না হওয়ায় এদেশে কৃষির অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছে। এই কৃষি প্রধান দেশে কৃষির সম্যক প্রকার উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে দেশের দৈন্য দারিদ্র্য যে দূর হইবে না, লোকে ইহা ক্রমেই করিতে পারিতেছে। গভর্ণমেণ্টও এখন এই বিষয় বুঝিতে পারিয়া কৃষির উন্নতি-কল্পে মনোযোগী হইয়াছেন।

আমাদের মেদিনীপুর জেলায় সর্ব্বমোট প্রায় ২০ লক্ষ একর আবাদী জমি আছে, তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ একর জমীতে ধান চাষ হয়। এই জেলার কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট এখন একজন জেলাকৃষি অফিসার একজন মহকুমার অফিসার এবং ৯জন কৃষিকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। জেলার কালেক্টর বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শালবনী, গড়বেতা, দাঁতুন, ঘাটালও তমলুক প্রভৃতি স্থানে সমিতির কার্য্য চলিয়াছে এবং যাহাতে জেলার সর্ব্বত্র সমিতির কার্য্য প্রসারিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা চলিয়াছে। জেলা কৃষি অফিসার চুনী বাবু এবং আমাদের সবডিবিজনাল অফিসার মহাশয়দ্বয় এখন এই মহকুমার কৃষির উন্নতি কল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, আগামী ১লা জুন হইতে ৮ই জুন পর্য্যন্ত যথাক্রমে এগরা, পটাশপুর অমর্শী, বাসুদেবপুর, কালীনগর ও হেড়্যা, ভগবানপুর, মারিশদা এবং রামনগরের সাখা-রণকে পরীক্ষিত কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া শাখা-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক একটী সভা হইবে। এই সভায় জেলা কৃষি অফিসার এবং সবডিবিজনাল অফিসার উভয়েই উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এ ছাড়া সাধারণের সুবিধাজনক স্থানে এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও বীজাগার স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছে। জেলা কৃষি অফিসার মহাশয় যে যে ধান অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, অতি গভীর জমীতে যাহা জন্মিতে পারে, লোণা জমিতে যাহা উত্তম জন্মে, এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে পাকিয়া যায় অথচ ফলনে বেশী হয়, কৃষি বিভাগ হইতে এরূপ ধান্য চাষের পরীক্ষা করিয়া এ অঞ্চলে উহার প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য ইহাদের এই সকল চেষ্টার ফলে এ অঞ্চলের কৃষির যদি উন্নতি হয়, তবে দরিদ্র প্রজাদের উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সঙ্গে জলনিকাশের অভাব বাঁধের অভাব, কৃষকের দুর্গতি ও গোজাতির হীনাবস্থা প্রভৃতি কৃষির উৎকর্ষ সাধনের যে সকল প্রধান অন্তরায়গুলি রহিয়াছে, সেগুলিরও যদি উপযুক্ত প্রতিকারের চেষ্টা হয়, তবেই উহাতে প্রকৃত সুফল ফলিবার আশা করা যায়।

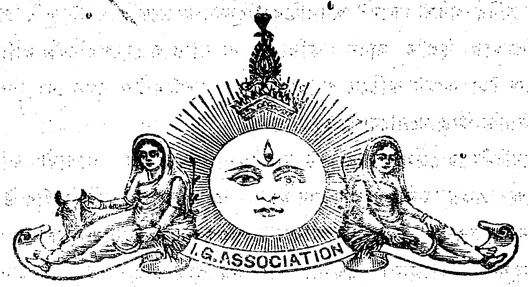

আষাঢ়, ১৩২৭ সাল।

কাহার দেশ

রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলেই বলে আমার দেশ। বাড়ীর কর্ত্তা বলে আমার বাড়ি, বাড়ির পুরাতন ঝিও বলে আমার বাড়ি কিন্তু প্রকৃত বাড়ি কাহার, দেশ, কাহার? যে যেখানে থাকে খায়, বেড়ায়, ঘুমায় সে সেই স্থানকে বলে আমার দেশ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের কতটুকু, কোনটুকু তাহাদের? আমরা কি দেখি দেশের পোনেরো আনার লোক দুঃখ ভোগ করে, সুখ ভোগ করে এক আনা—দেশ ঐ পোনেরো আনা লোকের না ঐ এক আনার? একথার কে উত্তর দিবে! কিন্তু ঐ পোনেরো আনা লোক না থাকিলে দেশ কোথায় থাকিত দেশ কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়াইত! দেশের ধন সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী যাহারা তাহারা কিন্তু ধন হইতে বঞ্চিত।

সমাজের ভিত্তি স্বরূপ যে পনের আনা লোক চাষ করে, তুলা পেঁজে রেল পাতে, কাঠ কাটে, ইঁট গড়ে; কয়লা তোলে, ইঞ্জিন চালায়, তাহারা পয়সার মুখ দেখিতে পায় না, কিন্তু যে এক আনা লোক কখনও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে না, তাহাদের ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। যাহারা যুদ্ধকালে দলে দলে তোপে ওড়ে ও জলে ডোবে, তাহাদের যুদ্ধ বন্ধ করিবার কোন অধিকার নাই। বিপদে আপদে, দন্দ, যুদ্ধে তাহারাই মাথা বাড়াইয়া দেয় দেশের কি ও কতটুকু তাহাদের?

কোন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,—

(Consider for a movement this cry "your countay is in dnger." whose country do the workers owen? What part of the country do the workers own? How many of Railways, the factories, mines, the shipyard, the dockss and the ships, do the workers own? How much of the land do they own?)

সমাজের অধিকাংশ লোক কেন দরিদ্র, এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে বুঝিতে হয় ধন কি ধনোৎপাদন কিসে হয়, এবং এই ধন উপভোগ করে কাহারা এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করিলে বুঝাযায় ভূমির স্বাভাবিক সম্বলে শ্রম প্রযুক্ত হইলে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার নাম ধন। (Wealth is the product of human labour applied to the natural resourecs of the land'.'). চাল; গম বস্ত্র, যন্ত্র, ঘর, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি মানবের সকল সম্পদের মূলাধার ভূমি। (The concrete things which constitute material wealth are all products of the land and the sea which is included in the term land"

ধন দুইটি উপাদানে গঠিত হয় ভূমি ও শ্রম। সমাজের সাড়ে পনের আনা লোকের দ্বিতীয় উপাদান আছে, কিন্তু ভূমি নাই। আধ আনা লোকে ভূমির মালিক বলিয়া সাড়ে পনের আনার নিকট হইতে খাজনা আদায় করে, গ্রামের ষোল আনা ফল জোর করিয়া কাড়িয়া লয়। তাহারা খাটিয়া মরে কিন্তু শ্রমের পূর্ণ ফল হইতে বঞ্চিত হয়। এই অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ ঐ স্বাধীন চেত মনুষ্য বলিয়াছেন যে বায়ু বা সমুদ্রের যেমন মালিক নাই, ভূমিরও সেইরূপ জমিদার থাকা উচিত নহে। ভূম্যাধিকারী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। (No man made the land no man can therefore own the land. The land can be used only. It can not be own by an individual anymore than can the sea or the air..... ....Form the ownership of land comes rent, a perpetual income for the non—workers at the expense of the woakers".)

কল কারখানার কর্ত্তারা লক্ষপতি কোটিপতি, কিন্তু যাহাদের রক্ত জল হইয়া কল কারখানা চলে, তাহাদের সম্বল মোটা ভাত ও মোটা কাপড়, তাহাও আজকাল জুটে না। শ্রমজীবীর প্রাপ্য কতটুকু? লাভের অধিকাংশ যে কারখানাওয়ালার পকেটে ঢোকে, ইহা এক প্রকার পরস্বাপহরণ। ("The man who owns a machine and employs men to use it, is able, without labour, to entort profits.....He takes what has been produced by labour, and which belongs to the labourer".) কেহ হয় ত বলিবে আমি টাকা ফেলিয়াছি বলিয়াইত আজ লাভ হইতেছে—কিন্তু জিজ্ঞাস্য ঐ টাকা তাঁহার হাতে কোথা হইতে আসিল—এতভূমি তাঁহার কিরূপে হইল এবং তাহাতে শ্রম সংযোগ করিল কে?

কৃষী ওশিল্পী ধন উৎপাদন করে কিন্তু ধন তাহাদের নয়। কিন্তু মাঝে পড়িয়া দালাল, উকিল ও মহাজন তাহাদের অদৃষ্ট বেশ ফিরাইয়া ফেলে, তাহাদের ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্ন হয়।

আমাদের দেশের লোকে এই ভূমিকে ভূমি লক্ষ্মী আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, ভূমি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপন্ন ধান্য শস্যকে ধান্য ধন বলিয়া থাকে, গবাদি পশুকে গোধন বলে। কেবলমাত্র ভূমি পাইলেও আমাদের ধনাগম হয় না— ভূমির সঞ্চিত শ্রম সংযুক্ত হওয়া চাই। শ্রমের আবার বিশিষ্টতা আছে—যে শ্রম কাজের তাহাই আবশ্যক যাহা কাজের নয় তাহার দ্বারা কোন ফল হয় না। ঘরে বসিয়া সারাদিন ডন বৈঠক ও মুগুর ভাজিলে ধনাগম হয় না। শ্রম productive হওয়া চাই non productive শ্রম লইয়া কোন কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না। আবার শ্রমের বিপরীত দিক আছে যাহা উৎপন্ন করে না বরং সংহার করে যাহা কোন কিছু গড়িয়া তুলে না বরং ভাঙ্গিয়া ফেলে - যাহা produtive নয় বরং destructive কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাল মতে বুঝিয়া দেখা যাক্ বাদলায় চাষীরা মাথারঘাম পায় ফেলিয়া রোদে পুড়িয়া পাট চাষ করিয়া জলে দাঁড়াইয়া পাট কাচিয়া নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিল শরীরকে শরীর বলিয়া মনে করিল না— পাটের ব্যবসায় লাভ পাইল পাট ব্যাপারি, স্বদেশী, বিদেশী দালাল ও বেলদারগণ ও বিদেশী ব্যবসাদারগণ—কেন এমন হয় তা বেশ বুঝা যায়—পাটের বীজ জমিতে পড়িতে না পড়িতে সে ব্যাপারির নিকট দাদন লয় দালালের নিকট দাদন লয়, ক্ষেত বাঁধা রাখিয়া হয়ত মহাজনের নিকট ঋণ লয়। পাট তৈয়ারি হইলেই তাহাকে বেচিতেই হইবে। সে সম্পূর্ণ পরের হাতে মুঠার ভিতর তার লাভ হওয়া অসম্ভব তাহার অর্থবল থাকিলে এরূপ কখন হইতে পারিত না। জমি না হইলে ধনাগম হয় না আবার অর্থ না থাকিলে অর্থ আসে না।

ধন সম্পত্তিতে সকলের সমান অধিকার হয় না, কেন হয় না তাহার নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝা কঠিন হইলেও ইহা কিন্তু সাধারণ নিয়ম যে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা যে যত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তত জমির ও ধনের মালিক। সাধনা না হইলে শক্তি বারে না; শক্তি না জমিলে সম্পদ বাড়ে না। যে শক্তিমান সে স্থল জল শূন্য আকাশ সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিবে তাহাতে আর ভুল নাই কেহ নায়ক হইবে সাধারণে তাহার অনুগমন করিবে, কেহ রাজা জমিদার হইবে সাধারণে তাহার প্রজা হইবে—ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র হইয়া আসিতেছে —যে যতই বলুক এই ব্যবস্থার কোন দোষ নাই। দোষ ঢুকিয়াছে স্বার্থপরতায় তখন রাজার রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিতেন প্রজা রঞ্জনের জন্য লোকে তখন অর্থ সংগ্রহ করিত—ত্যাগের জন্য—সকলের দেশের কল্যাণের জন্য—ত্যাগের সন্তুষ্টি এখন কেহ নহে। এখন লোকে স্বস্ব ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু করে তাই দেশময় এত দুঃখ।

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট গৃহিণীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট। রাজাই রাজ্যের আদর্শ পুরুষ রাজা প্রজাকে সুনিয়মে চালাইতে না পারিলে রাজা প্রজার সংরক্ষণ ও পালন করিতে না পারিলে প্রজার কুল বিনষ্ট হয়। রাজার প্রজার সকলেরই কর্ত্তব্য আছে—কেবল প্রজা আইন কানুন মানিয়া চলিবে—এবং তাহাতে রাজা ঠিকমত চলিবে এরূপ আশা করা যায়। রাজাকেও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে।

রাজা অলস, উদাসীন, স্বার্থপর হইলে প্রজা নষ্ট হয়। রাজার ভোগ লালসা অতিমাত্রা বর্দ্ধিত হইলে রাজা কেবল আত্মসুখ রত হইলে প্রজা নষ্ট হয়—প্রজা ক্রমশঃ হীনবল ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। সংসারের যত যত দোষ আছে দারিদ্র সব চেয়ে বড়। দারিদ্রটা দোষ—উহাদের আপবাদ নহে—উহা ইহ জন্ম বা জন্মান্তরের কর্ম্ম ফল—আমরা যেমন অর্থ অর্জ্জন করি—তেমনি শ্রম বৃথা প্রযুক্ত হইলে বিপরীত ফল ভোগ হয়—উহাই দারিদ্র—উহা স্বতহয় কারণ গ্রন্থকার বলিতেছেন—

আধুনিক সমাজে পরের ধনে পোদ্দারিতেই অধিক অর্থাগম হয়। (At every exchange of product from hand to hand, at every movement of product from place to place, the nonproducer waees fat at the expense of the worker",)

শ্রমজীবীদের ঘাড়ের উপর এখন শাঁখের করাত চলিতেছে যে নিজেদের মধ্যে প্রতি যোগিতার ফলে তাহারা মনিব দিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যে দেশে যে সময়ে যে মূল্যের আহার্য্য বস্ত্রাদি না হইলে জীবন যাত্রা একবারে অসম্ভব,সেই দেশে সেই সময়ে শ্রমজীবীদের বেতনের হার উক্ত মূল্যের কাছাকাছি চলে (মার্কিণ শ্রমজীবীদের বেতন এই জন্য অত্যন্ত চড়া, ভারতবর্ষ ও চীনদেশের শ্রমজীবীদের বেতন এই হেতু এত অল্প। শ্রমজীবীর বেতন বাড়িলেই যে দুইপয়সার সংস্থান হইবে, ইহা মনে করা ভুল, জীবন যাত্রার উপকরণের মূল্য বাড়িলেই প্রভুর দল বেতন বাড়াইতে বাধ্য হন কেননা তাহা না হইলে লোক জোটে না। কিন্তু এই উচ্চ হারের বেতন চড়া দামের আহার্য্য বস্ত্রাদিতে খরচ হইয়া যায় বলিয়া মাহিনা বাড়ার অনুপাতে সঞ্চয় বাড়ে না।

("The tendency is allways for wages to fall to the subsistence level.....A rise in wages raises the price not the value—of the commodities produced, and labour is in just about the same position as before, having from its increased wages, to pay increased prices.")

গ্রন্থকার বলেন যে, জিনিষের কাটতির উপর সরবরাহ নির্ভর করে, এই কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু ইহাতে গলদ আছে। যাহা ভোগে আসিলে তৃপ্তি হয়, সমাজের অধিকাংশ

লোকে, দারিদ্রের পীড়নে তাহার কথা মনে স্থান দিতে পারে না। ঘটনাচক্রে তাহারা যে সকল খেলো জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়, কারখানাওয়ালারা তাহাই সরবরাহ করে। ইহাতে শ্রমজীবীদের যথার্থ অভাব মোচন সূচিত হয় না।

("The manufacturer is concerned principally in making a profit. He knows what goods the workers will be compelled to accepet.....not the things which they desire to possess and to consume. But those of the quality that their diminished purch asing power will alone enable them to have")

দারিদ্রের চির সহচর ইন্দ্রিয় দোষ ও পান দোষ, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দিনের মধ্যে পনের ষোল ঘণ্টা নাকে দড়ি দিয়া খাটিয়াও অভাব হইতে মুক্তিলাভ না করিলে, মানুষ ক্রমে নিরাশার ঝাকে ডুবিয়া যায়। তখন আপনাকে ভুলিবার জন্য সে স্মৃতি লোপ করণী সরায় আত্ম সমর্পণ করে ("The poor are intemperate because they are poor, not as a result of it.")

বড় বড় সহর ও সহর তলিতে যে বেশ্যা ও লম্পটের সংখ্যা অধিক, তাহার প্রধান কারণ অর্থাভাব—কামরিপু এই কারণে একটু ঝাজ লাগাইয়া দেয় মাত্র। দারিদ্রের ফলেই অধিকাংশ স্ত্রীলোক সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয় এবং পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ বলিয়াই অধিকাংশ পুরুষ "ফেলো কড়ি মাখো তেলের" ব্যবস্থা করে। লেখকের মতে, পুরোহিতের মতে সম্মুখে মন্ত্র পড়িলেই যে বিবাহ হয় তাহা নহে। পয়সার লোভে পরিণয়, কুলটা বৃত্তির নামান্তর।

("It may be that the prostitution is of an elephant character, a daily surrender to fresh terms offered and accepted; it may be that it is for the more parmanent—condition colled marriage

সমাজের অধিকাংশ দোষ ও দুঃখের আকর দারিদ্রকে দূর করিতে হইলে, প্রতিযোগিতার কাঁটাভরা ক্ষেত পরিষ্কার করিয়া উহাতে সাহচর্য্যের বীজ বপন করিতে হইবে।

(co-operation must kill competition,') এই ভাবে অনুমানিত হইলে, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে রেষারেষির অঙ্কুর লুপ্ত হইবে।

পুস্তকের শেষ ভাগে গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—connot the state which makes shells by the million make loaeus by the million? when the people will wright, the state will work alright—অর্থাৎ যে রাষ্ট্র এখন দেশের অর্থ ও জনবল করায়ত্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ গোলাগুলি তৈয়ারী করিতেছে, তাহার পক্ষে লক্ষ লক্ষ রুটি তৈয়ারী করিয়া দেশকে দারিদ্র রাক্ষসীর কবল হইতে রক্ষা করা কি এতই কঠিন? দেশের লোকে সদিচ্ছা প্রণোদিত হইলেই রাষ্ট্র ধর্ম্মপথে চলিতে বাধ্য হইবে।

যখন মানুষে কর্ত্তব্য পালনে আত্ম প্রাসাদ অনুভব করে না, যখন নিজের যাবতীয় অভাব মোচনে সমর্থ হইয়া সচ্ছন্দ অনুভব করে না, যখন মানুষ নিজেরও আত্মীয় স্বজনের স্বাস্থ্য, শান্তি ও সুখ বিধান করিতে পায় না তখন তাহারা প্রাণে প্রাণে বড়ই অসুখ করে, কত অশান্তি ভোগ করে এবং প্রকৃত সুখ না পাইয়া, আসল সুখে বঞ্চিত হইয়া ধার করা সুখে রত হয়। দারুণ যন্ত্রণার সময় যেমন চিকিৎসকগণ আফিম সেবন করাইয়া রাখে তেমনি দারুণ দুঃখ, নিদারুণ ব্যথা ভুলিবার জন্য লোকে মদ ও মেয়েমানুষের আশ্রয় লয়।

চীনাবাদাম।

ফলফুলের ভেষজগুণ।

চীনাবাদাম আমাদের দেশে সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহার নাম চীনাবাদাম কেন হইল, ইহার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত চীনদেশের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকাতে (Encyclopœdea Britanica) লিখিত আছে "it is a native of South America" অর্থাৎ ইহার আদিম নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। ইহার সংস্পর্শে চীনদেশের কোন উল্লেখ কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালে ইহা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের নানাস্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে এবং উহা তদ্দেশের একটি বিশেষ বাণিজ্য দ্রব্য। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান হইতে বিস্তর চিনাবাদাম ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইত। নারিকেল শস্যের ন্যায় চীনাবাদামের শস্য হইতেও বহুপরিমাণে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে লণ্ডন, মার্সেলস্ ও হামবার্গ নগরে বহু কলকারখানা এই তৈল প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। সে সকল দেশে চীনাবাদামের তৈল সাবান প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনাবাদাম হইতে তৈল বাহির করিয়া যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহা গৃহপালিত পশুর খাদ্য এবং নানাবিধ শস্য ও সব্‌জির ক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

রসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা জানা গিয়াছে যে ভারতে উৎপন্ন চীনাবাদামে নিম্নলিখিত উপাদান সমুদয় বর্ত্তমান থাকে।

প্রোটীন	শতকরা	... ...	২৭·৬ ভাগ
তৈল	,,	... ...	৪৪·৫ ,,
কার্ব্বোহাইড্রেট	,,	... ...	১৫·৭ ,,
ধাতব পদার্থ	,,	... ...	৪·৭ ,,
জল	,,	... ...	৭·৫ ,,

চীনাবাদামের খোল্‌কে রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতেও ঐ সমুদয় উপাদান নিম্নলিখিত পরিমানে বর্ত্তমান থাকে।

প্রোটীন	... ...	৪৪·৫ ভাগ
তৈল	... ...	৯·২ ,,
কার্ব্বোহাইড্রেট	... ...	২৩·৮ ,,
ধাতব পদার্থ	... ...	১২·৭ ,,
জল	... ...	৯·৮ ,,

উপরিলিখিত তালিকা দুইটী অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে বিজ্ঞানানুসারে চীনাবাদাম একটী অতিশয় পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য। বহুপরিমাণ তৈল উপাদান বর্ত্তমানহেতু উহা গুরুপাক হইয়া থাকে, কিন্তু খোল তদ্রূপ গুরুপাক হয় না। সমানভাগ চীনাবাদামের খোলের ময়দা এবং গমের আটা মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা রুটি প্রস্তুত করত আহার করিলে মধুমেহ গ্রস্ত (Diabetic) রোগীকে উপকৃত হইতে দেখা যায়। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতারও (Habitual constipation) উপকার হয়। ইহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ কিম্বা সোড়া বাইকার্ব্বনেট (Soda bicarb) মিশ্রিত করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা না করিলে পেট ফাঁপার সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের দেশে মধুমেহ রোগীর অভাব নাই, এই খাদ্যটী আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। দেশীয় ঘানিতে চীনবাদাম অনায়াসে পেসিত হইতে পারে এবং প্রয়োজনানুরূপ খোল তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডাক্তার শ্রীনবীন চন্দ্র দত্ত রায়বাহাদুর স্বাস্থসমাচার

অপরাজিতা ফুল।

পরিচয়। ইহা লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ভারতের সর্ব্বত্র সুলভ। পূর্ব্ব কালের আর্যগণ এই জাতীয় কয়েকটি ফুলকে "অস্ত্রপুষ্প" বলিয়া শক্তি পূজায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। তাহার মধ্যে অতসী আর অপরাজিতা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্বেত, নীল আর লীল মিশ্রিত শ্বেতাভ স্বরূপে তিন প্রকার। সাধারণতঃ নীল অপরাজিতাই সর্ব্বত্র সুলভ শ্বেত অপরাজীতাই কিন্তু ঔষধীয় কার্য্যের প্রধান অবলম্বন। এই উদ্ভিদ জাতীয় লতাটি হিন্দুর শিশু বৃদ্ধের পরিচিত। এই ফুলের গাছ লতাকারে অপর বৃক্ষ বা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়। ইহার বিশেষ পরিচয় বাহুল্য মাত্র।

ঈশ্বরের এমনি মহিমা, এমনি সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সুকৌশল যে জগতের প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ পৃথক পৃথক। তবে স্থান বিশেষে যে একটুকু আদটুকু সমতা পরিলক্ষিত হয়—উহা আমাদের অভিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। এই বিশ্বরাজ্যে এক আকারে দুই বস্তু নাই। আপাতদৃশ্যে জগত বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণতির সামঞ্জস্যে এই অপরাজিতা লতার সহিত সমতুল্যতা অপর কোন লতা মানবের দৃষ্টি পথে পড়ে নাই। কিন্তু বিন্ধ্য পর্ব্বতের সানুদেশে "তুরুরি" বলিয়া একরূপ বনজ লতাকে অপরাজিতার সহিত অনেকটা তুলনা করা যায়।

কাশীবাসের দ্বিতীয় বর্ষে বিন্ধ পর্ব্বত দর্শন সময়ে বৈশাখ মাসে পর্ব্বতের নিম্নাংশে মাতা শ্রীশ্রীবিন্ধ বাসিনীর মন্দিরের নিম্নে তুরুরি লতা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ফুল দেখি নাই। তাই মনে হইয়াছিল ইহা অপরাজীতা লতা বিশেষ। যাহা হউক ঔষধার্থে সর্ব্বত্র সুলভ অপরাজিতাই বর্ণনার লক্ষ্য।

ভাষাভেদে নাম। সংস্কৃতে—অপরাজিতা। হিন্দিতে কোয়েল, পাণ্ডরী, সুফনি। গুজরাটে—গরনী। কর্ণাটে—নিলিয় গিরিকর্ণিকা। তেলিগুতে—নীল গন্দুনা ও কহিয়া থাকে। ইংরেজিতে Magoria আর ল্যাটিনে clotoria trentula ক্লোটোরিয়া ট্রান্টুলা কহে।

একজন দেশীয় ডাক্তার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারি "মেজেরিয়ান" নামক ঔষধকে এই অপরাজিতা জাতীয় ঔষধ বলিয়া পরিচিত করেন। প্রকৃত কিন্তু তাহা নহে। মেজেরিয়ান ভারতীয় দ্রব্য নহে। এই ডাক্তার বাবুর বিশ্বাস মেজেরিয়ান আর অপরাজিতার শিকড় একই গুণকারক। যাহা হউক এই দুই দ্রব্য এক না হইলেও—গুণ, ক্রিয়া প্রায় এক। মেজেরিয়ানের গুণ শ্রেষ্ঠ পরিবর্ত্তক। অপরাজিতাও তাই। ইহার আর যতই গুণ থাকুক না কেন আমি ইহার দুই শক্তির পূর্ণ পক্ষপাতি। পরিবর্ত্তক আর ক্ষত শুষ্ক কারক।

ক্রিয়া। বিরেচক, পরিবর্ত্তক, পচন নিবারক। হিন্দি শালিগ্রাম নির্ঘণ্ট বলেন অপরাজিতা "ত্রিদোষং শীর্ষশুল দাহং কুষ্ঠশ্চ শুলকম্"—ত্রিদোষ (বাত পিত্ত কফ প্রকোপ) শিররোগ, কুষ্ঠ দাহ ও শূল ইত্যাদি আরোগ্য করে। উক্ত গ্রন্থ মতে ইহা নেত্র পীড়ারও ঔষধ। আমরা অপরাজিতার শ্লেষ্মাকারক পিত্ত নিঃসারক এবং পরাঙ্গপুষ্ট কীট নাশক গুণও উপলব্ধি করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ পল্লী "খড়দহ নিবাসিনী একটি ব্রাহ্মণ কন্যা শিষ্যবাড়ী থাকিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সহায় পিত্তলের বগুণার সুক্ষ্ম ধারে হাত কাটিয়া বিষম ক্ষত জন্মাইয়া ছিলেন। অযত্নেই হউক আর অভাবেই হউক কিম্বা শিষ্যগণকে বিরক্ত করিবেন না বলিয়াই হউক বেচারীর ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আঙ্গুলের এক পর্ব্ব পর্য্যন্ত পচিয়া গিয়াছিল। ঘটনা সূত্রে আমি তাহার শিষ্য মহাশয়দিগের বাড়ী একটী "ইরিসেপেলাস" চিকিৎসার জন্য উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার ক্ষত দেখিয়া অন্যত্র হইতে ঔষধ আনাইতে আমার দুই দিন দেরী হইয়া যায়। এই অবসরে একটি সাহা জাতীয় পল্লী কবিরাজ অপরাজিতার পাতা আর সামান্য কলি চুণ নারিকেল তৈল সহ কর্পূর মিশাইয়া ক্ষতে দিতে থাকে। আর "বিজতাড়কের" পাতা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়। ভগবানের প্রসাদে এক রাত্রিতে

গন্ধ আর পুঁযপড়া আরোগ্য হয়। ফুলাও পরে কমিয়া যায়। ইহা দেখিয়া আমি আর দ্বিতীয় দ্রব্য ব্যবহায় করিতে নিষেধ করি। ৩।৪ দিন উক্ত মলম ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয় পরিশেষে একটি সামান্য দাগ ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিহ্ন ছিল না।

তখন হইতে এই ঔষধে আমি বহু ক্ষত পীড়া আরোগ্য করিয়াছি। অপরাজিতার পাতার রসে কর্ত্তিতাংশ জোড়া দেওয়া যায়। ইহার পচন নিবারক শক্তি অতি উৎকৃষ্ট রক্ত রোধকও বটে। ইহার আর একটি অদ্ভুত গুণ আছে যথা—কাচে কিম্বা শিশি বোতলে হাত কাটিলে এবং কাচ কণা শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া উপদ্রব উপস্থিত করিলে অপাজিতা পাতার রস চুণ এবং দোক্তা পাতার সহিত পীড়িত স্থানে বান্ধিতে হয়। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা যায় এবং ক্ষত শুষ্ক হয়। আমি নিজেই ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।

কাচের ছিপি যুক্ত শিশি কোন কারণে ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ হস্ত কটিয়া ফেলিয়া ছিলাম। প্রথমে কসটিক ব্যবহার করিয়া বেদনা আরোগ্য করি কিন্তু শেষে আবার বেদনা হয় আর প্রদাহ হইয়া ক্ষত হইবার উপক্রম হয়। তখন শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস দিয়া আরোগ্য হই। এই লতার পাতার রস পিচকারি যোগে ব্যবহার করিলে নূতন প্রমেহ পীড়ার পুঁয পরা কম পড়ে। আবার স্ত্রী লোকের যোনী কুণ্ডয়ণ পীড়ায় ইহার ক্ষমতা অত্যাধিক। কতকগুলি পাতা গরম জলে ফেলিয়া ফাণ্ট অর্থাৎ পাঁচন প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ডুস কিম্বা পিচকারি ব্যবহার করিতে হয়। এমন কি ইহাতে প্রদর পীড়া পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে অপরাজিতার পাতা তাজা চুণে মাখিয়া দুই রগে, কপালের দুই পার্শ্বে লাগাইলে যন্ত্রণা কম পড়ে।

ইহার শিকড়ের রসে দাস্ত হয় এবং পরিবর্ত্তক গুণ প্রকাশ পায়। এই কারণ কোন কোন পল্লী কবিরাজ শিকড় ছেঁচিয়া ২০।২৫ ফোটা রস চুণের জল সহ খাইতে দিয়া রক্তাতিসার আর ক্রিমি ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকেন। উন্মাদ পীড়ায় ইহা মস্তকে ব্যবহার করা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে এই লতার নাম গন্ধ নাই। পরীক্ষা উচিত নহে কি।

ডাক্তার—শ্রীমক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
কাব্যবিনোদ—স্বাস্থসমাচার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগান—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া. পুঁই, বরবটি, বেগুণ, শাকালু, টেপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারী করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গামলা বদলাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মুলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায় ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা, প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বসাইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং

জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টী হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবনের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণের উপযুক্ত সময়। বর্ষা আরম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটী দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু সেগুণ, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন আবশ্যক।

সবজী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক রাখা এই সময় আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যাধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতে হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোঁয়াস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক কালুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষায় মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরেণ্টা বা মেহদী, ঝিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাষিক পত্র।

২১শ খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

রবার rubber.

(কৃষি-দর্পণ হইতে পুনরাবৃত্তি)

গাটাপার্চা—Guttapercha

গাটাপার্চা অর্থে গম বা গঁদ বৃক্ষ (gum tree বুঝায় গম উৎপাদনকারী বৃক্ষাদির নির্য্যাস হইতে রবারবৎ যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকেও সাধারণতঃ গাটাপার্চা বলে। ইহা অনেক সময় রবারের মত গুণ বিশিষ্ট। ইহার গুণ বৃক্ষাদির নির্য্যাসের ভাল মন্দের উপর নির্ভর করে। যে সকল বৃক্ষ লতার রসে ক্ষুচুক (Caoutchouc) অর্থাৎ রবারের ভাগ অধিক এবং রজন ও প্রটিভ (Rasin & protied) ভাগ অল্প তাহা হইতেই ভাল গটাপার্চা প্রস্তুত হয়।

নানাবিধ শিল্পদ্রব্য বিশেষতঃ ওয়াটারপ্রুফ (Waterproof) বস্ত্রাদি ও সমুদ্রগর্ভস্থ টেলিগ্রাফের তার (Cable) প্রস্তুত করিবার জন্য গাটাপার্চার প্রয়োজন হয়। নানা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে এই নির্য্যাস পাওয়া যায়, এবং দেখিতে, দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও তরল; ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শোধিত ও কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেই গাটাপার্চা প্রস্তুত হয়। মালয়, মালাক্কা প্রভৃতি ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটপর্ব্বত এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই নির্য্যাস উৎপাদনকারী কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে।

প্রকৃত গাটাপার্চার উদ্ভিদ, মালাক্কা, মালয় প্রভৃতি দেশে জন্মে এবং তদুৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও অধিক কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় ঐরূপ গুণবিশিষ্ট দুইজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে, ইহারা প্রকৃত গাটাপার্চ্চা অপেক্ষা গুণে কিছু নিকৃষ্ট এবং তজ্জন্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে

তাদৃশ উপযোগী না হইলেও, বিখ্যাত শিল্পবেত্তাগণের মতে দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহাদের সমস্ত দোষ তিরোহিত হইয়া নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে।

১। পাশন্তী বৃক্ষ—Isonandra acuminata, Syn-Dichopsis acuminata) মান্দ্রাজের ত্রিবাঙ্কুর, বাইনদ ও কুর্গের জঙ্গলে এবং অন্নমলি ও ঘাট পর্ব্বতদ্বয়ে স্বভাবতঃ এই গাছ প্রচুর জন্মে। ইহা এদেশে জন্মিলেও ৭০ বৎসর পূর্ব্বে কেহ ইহার ব্যবহার অবগত ছিল না, কেবল লাসেল ও কালেন নামক দুইজন সাহেবের চেষ্টায় ইহার যথার্থ গুণ জনসাধারণে জানিতে পারিয়াছে। গাছগুলি ৬০ হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে, বৃক্ষকাণ্ডে অস্ত্রাঘাত করিলে প্রচুর পরিমাণে ক্ষীরবৎ নির্য্যাস পাওয়া যায়, প্রকৃত গাটাপার্চ্চার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গাছ হইতে একবার নিস্যাস বাহির করিবার পর ১০ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় নির্য্যাস বাহির করা যায় এবং প্রতিবারে গাছের ৫।৬টী ক্ষতস্থান হইতে তিনপোয়া একসের আন্দাজ নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে। যদি সমগ্র বৃক্ষের স্থানে স্থানে আঘাত করা যায় তাহা হইলে তিনসেরেরও উপর নির্য্যাস পাওয়া যাইতে পারে। নূতন অবস্থায় ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক খণ্ডগুলি দেখিতে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ কিন্তু বড় বড় তালগুলি ঈষৎ রক্তবর্ণ।

সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্রের প্রলেপ অপেক্ষা যে স্থানে স্থায়ী আবরণ আবশ্যক তথায় ক্যাম্বিশ (Canvas) বা ঘন চটের উপর ইহার প্রলেপ লাগাইলে উহাকে বারিপাত নিবারণের উপযোগী করা যাইতে পারে এবং এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার ওয়াটারপ্রুফ বার্ণিসের (Waterproof varnish) জন্যও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। পক্ষী ও ক্ষুদ্রকায় জন্তু ধরিবার এবং কাষ্ঠ ও কাচ জুড়িবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টও কার্য্যসাধক আঠা আর দেখা যায় না। একতালা ঘরের মেজেতে ইহার দ্বারা সুন্দর সিমেণ্টের কাজও চলিতে পারে নির্য্যাস যদি উপায় বিশেষ দ্বারা উত্তমরূপে পরিস্কৃত করা যায়, তাহা হইলে মোটা জিনিসে আলকাতরা বা ঘন টার্পিণ বা রবারের প্রলেপের মতও ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু ইহার ব্যবহারের প্রধান অন্তরায় যে ইহা জলসংযোগে বিগলিত হয় ও উষ্ণ সংযোগে ফাটিয়া যায়, এজন্য দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন সাধক। ইহা অতিশয় লাভের ব্যবসায় এজন্য দেশীয় রাসায়নিক বর্গের ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২। টালি বৃক্ষ—Dichopis polyantha ইহা প্রকৃত গাটাপার্চ্চা জাতীয় উদ্ভিদ, চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। এই জাতীয় বৃক্ষগুলি ২৫।৩০ হস্তেরও অধিক উচ্চ হয়, ইহার নির্য্যাস হইতে উৎকৃষ্টজাতীয় গাটাপার্চ্চা প্রস্তুত হইতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত গাটা অপেক্ষা অনেক অধিক গুণবিশিষ্ট।

৩। টাবান মিরা—Dichopsis Gutta Syn. Palaquium Gutta. মালয় ভাষায় ইহার নাম "Taban Merah." মালয়উপদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে প্রকৃত

গাটার উদ্ভিদ জন্মে এবং সেইগুলি হইতেই শিল্পজগতের সমগ্র গাটাপার্চ্চার সংকুলান হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে "টাবান মিরাই" সর্ব্বপ্রধান এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় নির্য্যাস উৎপাদক। বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রদেশে এই সকল উদ্ভিদ সুন্দর জন্মিতে পারে, অন্ততঃ আমাদের এ বিষয়ে পরীক্ষা করিলে কোন ক্ষতি নাই। ইহা ব্যতীত উক্ত দেশ সমূহে নিম্নলিখিত কয়েকটী উদ্ভিদ হইতে কিছু নিকৃষ্ট জাতীয় গাটা উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটী সিংহলের অত্যন্ত সরস নিম্নভূমিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

Palaquium obovata,		
,, treubii.	Gutta Soosoo.	গাটাসুসু।
,, maingayi,	,, Taban Simpoo,	,, টাবান সিম্পু।
,, pustulata.	,, ,, Puteh ,,	,, পুটী।
Willughbeia firma.	,, Singgarip.	সিঙ্গারিপ।
Payena leerii.	,, Sundek	,, সন্দেক।
Ficus elastica.	,, Runbony.	ইণ্ডিয়া রবার।
Palaquium grandis	Kiri hembiliya.	কিরি হেম্বিলিয়া।

এই সমস্ত উদ্ভিদের চাষ আবাদ সমস্তই রবারের মত। মালয় প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক বিলাতী কোম্পানী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগিচায় ইহাদের চাষ করিতেছেন এবং আজকাল তাঁহাদের প্রচুর লাভও হইতেছে। পরিণত বয়স্ক বৃক্ষ প্রতি বৎসরে গড়ে ৭৮ সের গাটা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশীয় নানাজাতীয় গাব (Diospyros Sp.) গাছ হইতেও নিকৃষ্টজাতীয় গাটা উৎপন্ন হইতে পারে। ধীবরেরা বর্ষাকালে গাবের ফল কুট্টিত করিয়া জল মিশাইয়া জাল রং ও ওয়াটারপ্রুফ করিয়া লয়, এজন্য জাল সহজে পচিয়া যায় না। যদি গাবের রসে জল না মিশান যায় তবে জাল বড় কড়া হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপে গাব ফাটিয়া পৃথক হইয়া পড়ে। মেটে ঘরের মেজেতে গাবের আঠা মাখাইলে অনেকটা সিমেণ্টের মত দেখায় কিন্তু তাহা উত্তাপে ফাটিয়া যায়। যদি দ্রব্যান্তর সংযোগে গাবের এই দোষ নিরাকরণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে কালে ইহা প্রকৃত গাটার উপকল্পরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। সম্ভবতঃ আবলুশ ও ম্যাঙ্গোষ্টিন জাতীয় উদ্ভিদ হইতেও নিকৃষ্ট জাতীয় গাটা উৎপন্ন হইতে পারে।

বালাটা—Balata। ইহা নিকৃষ্টজাতীয় গাটাপার্চ্চা বিশেষ। দক্ষিণ আমেরিকার মাইমিউসপ্স গ্লবাসা (Mimusops globosa) নামক বৃক্ষ হইতে এই নির্য্যাস উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশীয় বকুল (Mimusopsa elengi) এই জাতীয় বৃক্ষবিশেষ। বকুল, মহুয়া, প্যালাকিয়ান প্রভৃতি উদ্ভিদগণ সাপোটেসি (Sapotaceœ) বর্গের অন্তর্গত।

কৃষক সমিতি

আমাদের রাজনৈতিক সভাসমিতি ও বক্তৃতার অভাব নাই। অনেক দিন যাবত ইহা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাদের লইয়া দেশ তাদের সহিত দলবদ্ধ হইয়াছে কে? বড় করিয়া ঘর বাঁধিয়াছি কিন্তু শূন্যে গৃহনির্ম্মানের ন্যায় ইহার ভিত্তি নাই ঘুমের ঘোরে এই আন্দোলনের কোন ভিত্তি আছে কিনা তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই। এখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং দেখিতেছি যে আমাদের রাজনৈতিক কর্ম্ম কেবল বক্তৃতার উপর ঝুলিতেছে। ইহার কোনই ভিত্তি নাই। ভিত্তি গঠন করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে তাহার আলোচনা হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী "সত্য" আশ্রয় করিতে উপদেশ দিতেছেন। বাস্তবিকই সত্যদ্বারা যে ঘরের ভিত্তি গঠিত হইবে তাহার ধ্বংশ নাই গৃহটাকে কি বুঝিব উহা "জাতি" ভারতবর্ষীয় জাতিসংঘ জাতিটার কিরূপে সংস্কার করিতে হইবে?

"সত্য" আশ্রয় সর্ব্বপ্রথম।

দ্বিতীয় শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত "সত্য" গ্রহণের মন্ত্রের অর্থ সহজে প্রচার হইবে না। শিক্ষার নানা শাখা যথা, সাধারণ শিক্ষা, কৃষিশিল্প, বাণিজ্যশিক্ষা প্রভৃতি। কর্ম্মক্ষেত্রে এইসব শিক্ষার প্রয়োজন। ইহার একটী ছাড়িলে জাতিরূপ দেহের একটী অঙ্গহীন থাকিবে এবং অন্যের নিকট বিকলাঙ্গ বলিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। সাধারণ শিক্ষা মস্তিষ্ক গঠন করে, কৃষি শিক্ষাদ্বারা মেরুদণ্ড, দুই পদে গঠিত হয়, শিল্পবাণিজ্য দুই হস্ত। সুতরাং কৃষি ব্যতীত দেহ গঠন সম্পূর্ণ হইতেই পারে না। ভারতবর্ষের প্রায় শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। অতএব এই কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি আমাদের কামনা না হইলে জাতি গঠনের চেষ্টা বৃথা। সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত মস্তকের বর্ত্তমান অবস্থা বামনের সহিত তুলনা করা যায়—সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র দেহের উপর এক বৃহৎ মস্তক, আমরা না বুঝিলেও অন্যজাতি ইহা দেখিয়া হাসে। আমাদের এখন প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, এই কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। এই সমিতির সভ্য গ্রামের প্রত্যেক কৃষক। সমিতি কৃষি শিক্ষা ও কৃষিউন্নতির ব্যবস্থা করিবে। এই সমিতি উত্তম বীজ, হালগরু, সার উচিতমূল্যে বিতরণ করিবে এবং কৃষকদিগের উৎপন্ন দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। যাহাদের পল্লিগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে তাহারা জানেন যে কিরূপে ধূর্ত্ত খরিদদারগণ কৃষকদিগকে ঠকাইয়া থাকে। জিনিষের দর খরিদদারের হাতে। আর যাহারা সম্বৎসর রক্তজল করিয়া ও অর্থব্যয় করিয়া একটা জিনিষ উৎপন্ন করিল তাহারা বলিতে পারিবেনা যে আমি তো এই জিনিষটা একবৎসর খাটিয়া তৈয়ারি করিলাম—আমার লাভ না হউক

আমার পেটের ভাতের খরচটা তো দাও! ধূর্ত্ত খরিদদার এত হিসাব নিকাষে যাইবে কেন? হিসাব করিলে তো অনেক দিতে হয়। সে বলিবে ওহে হয় ৩৲ টাকায় দাও না হয় চলিয়া যাই। খরিদারদের এক যোট। অন্য খরিদদারও ৩৲ টাকার অধিক দিবে না। কৃষকের যোট—নাই ধর্ম্মঘট—নাই। তাহারা জানেনা যে তাহাদের উৎপন্ন চাউল না পাইলে ক্রেতার আহার জুটিবে না, তাহাদের উৎপন্ন পাট না পাইলে পাট-কলের লাভ আসিবে না। আর তাহারা বুঝিলেই বা যোট করিবে কিরূপে তাহাদের দ্বারে যে মহাজনের ও জমীদারের পিয়াদা দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান। কিস্তি মত খাজনা না দিলে যে জমীদার তাহাদের ভিটামাটী উৎসন্ন করিয়া দিবে। তাহার পর আছেন মহাজন। মহাজন ৫০৲ টাকা দিয়া দুই বৎসরে ৫০৲ টাকা আদায় করিয়াছে, আরো ৫০৲ টাকা বাকি। কৃষক করে কি। এক বৎসরে সপরিবারে খাইল ২০০৲ আর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিল ১০০৲ টাকার। ইহা হইতেই তাহার খাজনা দিল, সামান্য বস্ত্র কিনিল এবং মাহাজনের শুদ দিল। সব সময়ে শুদের সব টাকা দিতে পারে না আসল বাড়িতে লাগিল। দুর্ব্বৎসর হইলেই তো কথাই নাই। মহাজনের শুদ কিম্বা আসল কিছুই আদায় হইল না। মহাজন আইনের আশ্রয়ে যাইয়া তিন বৎসর মধ্যে কৃষকের ভিটার প্রদীপ নিবাইয়া দিল। ইহা কল্পনা নয়। কৃষকগণ যাহাতে মহাজনের হাতে না পড়ে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণ-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা অতি উত্তম। কিন্তু কৃষকদিগের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। কৃষক উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য না পাইলে ঋণ দ্বারা তাহার ঋণভার বৃদ্ধিই হইবে। উপযুক্ত মূল্যে শষ্য বিক্রয় করিতে হইলে কৃষকদিগকে "যোট" করিতে হইবে। খাজনা বস্ত্র প্রভৃতি খরচের জন্য টাকা সঞ্চয় না করিয়া তো যোট চলে না। অতএব খরচ পত্রের জন্য কৃষকদিগকে কিছু কিছু অগ্রিম দিতে হইবে। তজ্জন্য ফণ্ড প্রয়োজন। এই ফণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে, কৃষকগণ শস্যের মূল্য হইতে টাকায় এক আনা কৃষক সমিতিতে গচ্ছিত রাখিতে হইবে। যদি ইহা করা যায় তবে দেখিবে দশ বৎসরে কি বৃহৎ ব্যাপার সাধন হয়। তখন ক্রেতাগণ নতশিরে কৃষকের সমীপে উপস্থিত হইবেন। বৃহৎ বৃহৎ হাটবাজারে এই কৃষক সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। এই সব সমিতির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় মহকুমায় সেণ্টাল সমিতি স্থাপন আবশ্যক। কৃষক সমিতি ও কৃষক ফণ্ড স্থাপন হইলে সাধারণ শিক্ষা স্বাস্থ্য উন্নতির ব্যবস্থা রাস্তা ঘাট প্রভৃতি যাবতীয় উন্নতি বিধান সহজ সাধ্য হইতে পারিবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দেশহিতৈষী স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী পুরুষদিগের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে এইরূপ কর্ম্মী পুরুষের অভাব হইবে না। আমাদের চালকগণ তাহাদিগকে আহ্বান করুণ। কর্ম্মী যুবকগণ দলে দলে আসিয়া উপদেশের জন্য চালকগণের সমীপে উপস্থিত হইবেন।

পল্লী চিত্র।

আমরা ত বলি পল্লিগ্রাম বাঙ্গালী জাতির মেদ, মজ্জা, বসা, অস্থি কিন্তু পল্লিগ্রামে এখন থাকে কে বলিতে পার? নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই এখন প্রধানতঃ পল্লিগ্রামে বাস করিয়া থাকেনঃ—

(১) যাহাদের সহরের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই অর্থাৎ চাকরি নাই, ওকালতি নাই, মাষ্টারী এডিটারী প্রভৃতি নাই, বড় দোকান নাই এবং বিলাতী সামগ্রীর ব্যবসায়-বাণিজ্য নাই।

(২) যাহাদের দশবিশ বিঘা, জমি আছে, চাস বাস করিয়া খায়, কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাদের গত্যন্তর নাই।

(৩) ছোট তালুকদার, তালুকই জীবনের সর্ব্বস্ব অথচ তালুকের আয় বেশী নয়, কুপোষ্যের পাল অধিক, আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া সংসার চালাইতে হইলে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পল্লিগ্রামে থাকিতে হয়।

(৪) অল্পবিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অতি কষ্টে টোল বা চতুষ্পাঠী, অথবা পৌরহিত্যের কাজ করিয়া কায়ক্লেশে দিন যাপন করেন।

(৫) বাজে ছাপ মারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং স্বয়ংসিদ্ধ কবিরাজ এমন অনেকই পল্লিগ্রামে আছেন।

(৬) পল্লিগ্রামের স্কুল মাষ্টার, পোষ্ট মাষ্টার, দারোগা বাবু, আর নায়েব মহাশয় ইহারাই হইলেন পল্লিগ্রামের এক রকম মাথা।

(৭) বিধবা অবিবা, পিসি বা মাসি বাপ খুড়ি বা জেঠাইএর আকারে নগর প্রবাসী বাবুর বাড়িতে উঁকি দিতেছেন আর চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিটায় প্রদীপ জ্বালিতেছেন।

(৮) মুসলমান নমঃশুদ্র প্রভৃতি জাতীয় কৃষক ছোট মুদীর বা মনোহারীর দোকানদার চোটার কারবারি মহাজন, রেলের পার্শ্বের দোকানদার মহকুমার মোক্তার, মোকদ্দমার তদ্বিরকারক ঠেঁটা ইহারাই গ্রামের মাতব্বর।

এই ত গেল মোটামুটি অধিবাসীদের পরিচয়। গ্রামে হয় কি? এই কয়টী কাজ প্রধানতঃ হইয়া থাকে।

(ক) দলাদলি অর্থাৎ কার ছেলের পইতেতে কার মায়ের শ্রাদ্ধে গ্রামের লোককে খাইতে যাইতে দিব না, কাহার সহিত কবে কোনকালে কি একটু মনবাদ ঘটিয়াছিল তাহার পাল্টা জবাব কেমন করিয়া দিব এই চিন্তাতেই এক দল লোক বিভোর হইয়া থাকে। দোষ না পাইলেও মিথ্যা দোষ বাহির করিয়া তাহারা দলাদলি বাধায়।

(খ) লম্পটের উপদ্রব। কাহার বাড়িতে বালবিধবা আছে, কাহার বাড়ীতে অল্প বয়সী ঝি বউ আছে তাহারা কখন কোন পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিতে যায় তখন এই মর্কটের দল মোয়াড়া আগলাইয়া থাকে। ইহাদের উপদ্রবে গ্রামে মেয়েছেলে লইয়া নিরাপদে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিধবাদের পক্ষে ত জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এ অত্যাচার গত দশ পনর বৎসরের মধ্যে পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িয়া উঠিতেছে। (গ) থিয়েটার ও গান বাজনার উপদ্রব হইয়াছে। ইহা একটা বিষম উপদ্রব হইয়াছে। এখন গান গাওয়াও শক্ত নয়, অভিনয় করাও শক্ত নয়, তাই যাহাকে তাহাকে ধর পাকড় করা হয় এবং থিয়েটার পার্টিতে যোগ না দিলে অতি মাত্রায় উৎপাৎ উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। কোন কোন গ্রামে আবার থিয়েটারের দল আকারান্তর প্রাপ্ত হয়, হয়ত গ্রামের কর্ত্তা বৈষ্ণব, কাজেই হরিসভা বা সঙ্কীর্ত্তনের দল তৈয়ার হয়। নিতান্ত থিয়েটার হইলে প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয় হয়। আর গ্রামের অশিক্ষিতা ও অর্দ্ধ-শিক্ষিতা ভাব প্রবল নারী সকল তাহা শুনিতে আসে এবং পরকালে জলাঞ্জলি দেয়। (ঘ) গ্রামের চূড়ান্ত কীর্ত্তি গাঁজার আড্ডা। আমাদের বালক কালে গাঁজার একটা প্রচলন ছিল না। এখন বহু গ্রামের ব্যক্ত ও গাঁজার আড্ডা হইয়াছে। অনেক সময় এই গাঁজার আড্ডা থিয়েটার ও হরিসভার আড্ডার সহিত একাঙ্গ হইয়া পড়ে।

এই ত গ্রাম, আবার আজ কাল গ্রামের মজা এই গ্রামের কাহারও গৃহে কেহ মরিলে সে শবদেহ ক্রোশেক পথ বা তাহার অধিক বহিয়া লইয়া যাইতে হইলে অমনি গ্রামের যুবক ও কর্ম্মঠগণের পত্নী সকল গর্ভবতী হইয়া পড়ে। শাস্ত্র আর কিছুতেই মানিতে হয় না, কেবল এই অবসরেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হয়।

অবশ্য ভাল গ্রাম যে নাই এমন কথা বলিনা, সকল গ্রামের সকল লোকই যে মন্দ তাহাও বলি না তবে মন্দ দলের প্রভাব যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এটুকু বলিবই। আমরা বালক কালে গ্রামে যাহা দেখিতাম এখন ত আর তাহা নাই; সে নিত্য কথকতা নাই, পাঠ নাই, টোল চতুষ্পাঠী পাঠশালা নাই, গ্রামের কল্যাণ কামনার জন্য গ্রাম চত্বরে বসিয়া পরামর্শও কেহ করে না। এখন গ্রামের মালিক গ্রামা পঞ্চায়েত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানা উপায়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপায়ও করেন এবং গ্রামে স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মামলাবাজি চালবাজি করিতে ছাড়েন না। গ্রামে আর একটী পাপ জন্মিয়াছে—কাহারও সহিত কাহারও শত্রুতা হইলে বা কাহারও প্রতি বিরক্তি বোধ হইলে দুই কর্ম্ম করা হয়,—প্রথম কর্ম্ম খবরের কাগজে চিঠী লেখা, খবরের কাগজের সম্পাদকগণ কাপির অভাবে চিঠী পাইলেই ছাপান আর মাসে মাসে বিপন্নও হন, দ্বিতীয় কর্ম্ম ঐ পঞ্চায়েতের মারফত বা দারোগার মারফত চুপি চুপি খবর পাঠান হয় যে অমুক ব্যক্তি রাজদ্রোহী বা এনার্কিষ্ট,

বোমাওলাদের সঙ্গে মিশিয়াছে অথবা ওথেলা না চলিলে ডাকাতির মাল রক্ষা করেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

আজ কালকার গ্রামের লোকদের আর একটী বড় গুণ আছে। নিজের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে বড় বন হইয়াছে, তুমি তোমার জমিতে বন কাটিতেছ আর তাহাকে যদি বল তুমিও কাট বা আমি পয়সা দিয়া কাটিয়া দিতেছি অমনি তিনি বলিবেন আমার বন আছে থাক আমি কাটিব না। পানা পুকুরে পানা জমিয়াছে। পেঁকো গন্ধ বাহির হইয়াছে, তুমি বলিলে আমার পুকুর কাটা হইতেছে আইস তোমার পুকুরটাও ঝালাইয়া দিই, অমনি কর্ত্তা বলিলেন না আমার যেমন পুকুর তেমনই থাকিবে। জমি বন বাদাড়ে পূর্ণ হইয়া আছে সাপ খোপের বাস হইয়া আছে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সে জমির কোন পাট হয় নাই, অথচ সেই জমির ভিতর দিয়া একটী নর্দ্দামা কাটাইয়া জলনিকাশের বন্দোবস্ত কর দেখি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত দেওয়ানি মামলা চলিবে। আর সেই জমির চারি পার্শ্বের রাঙ চিত্রের বেড়া হেলাইয়া কিসে প্রতিবেশীর আড়াই ইঞ্চি জমি লইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা বর্ষে বর্ষে রীতিমত করা হয়। আর এই সকল উচিত ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে বলিলেই অমনি-দলাদলি। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের নামে অতি ভয়ানক কুৎসা প্রচারিত হয়। পল্লীগ্রামে অন্য কোনও কর্ম্ম নাই, চাষ বাসের সময় একটু যা কর্ম্ম থাকে তাহার পর কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে হয় কাজেই লোকের দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এগ্রামের উন্নতি কেমন করিয়া করিবে? কে বা করিতে পারে? তাই গ্রাম গ্রাম বলিয়া আমরা বুকচাপড়াইয়া মরিলেও গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার পল্লিগ্রামের উন্নতি সাধন হয় নাই। হইবার কোনও উপায়ও দেখিতেছি না। যাহাদের দুপয়সা আছে বা কোন ক্রমে যাহারা দুপয়সা সঞ্চয় করিয়াছে তাহারা খাঁটি পাড়া গাঁ ছাড়িয়া মহকুমার বা জেলার সদরে অথবা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। শ্রীমান, বিদ্বান, মাত্রেই পাড়া গাঁয়ের বাস ছাড়িতেছে। আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লিগ্রাম ছাড়িতে হইলে গৃহস্থের চোখ দিয়া অশ্রুধারা পড়িত আর এখন পাড়া গাঁ ছাড়িতে পারিলে লোকে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাই ক্রমে পাড়া গাঁ কেবল কৃষকেরই বাসস্থান হইয়া পড়িতেছে! কৃষকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক তাই পল্লিগ্রামে মুসলমানদের প্রাধান্যই বাড়িতেছে। তাহাতে অল্প বিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগে গত দুই বৎসর ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে বহু গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। গ্রামের লোকের এমনিই স্থবিরতা হইয়াছে। যে তিনটী বাঁশ কাটিয়া তেকাটা করিয়া তিনটা কলসী বসাইয়া জল পরিস্কার করিয়াও লইতে পারে না। পুষ্করিণী পঙ্কে পূর্ণ চৈত্র মাসে সে পাঁক শুকাইয়া উঠে একটা তরল কিন্তু ত

কিমাকার পদার্থ তাহার উপরে থাকে। তাহা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, কেহই একটা কুপ খনন করাইবার আয়োজন করেন না। অথচ তাহার গৃহে গৃহিনীর অঙ্গে হাজার টাকার গয়না আছে কিন্তু কুড়ি টাকা খরচ করিয়া একটী কুয়া খুড়িবার প্রবৃত্তিও নাই চেষ্টাও নাই। যে দেশে দশ বা কুড়ি হাত মাটি খুড়িলেই জল বাহির হয় সে দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে একটু বৃষ্টি বন্ধ হইলেই জল ভাবে আর্ত্তনাদ উত্থিত হয়। ইহাতে আজব কথা। বাঁচিতে জানিলে বাঁচিতে শিখিলে এ জলাভাব কখনই ঘটিত না। কেবলই কি জড়াভাব জন্য জলাভাব ঘটিয়াছে ইহার ভিতর হিংসা বিদ্বেষ আছে, জ্ঞাতি বিবাদ আছে, দলাদলি আড়াআড়িও আছে।

—বাঙ্গালী

কৃষক-শিক্ষা

গত ১৭ই এপ্রিল, ১৯২০, রাজবাড়ী কৃষি, সমবায় ও পঞ্চায়েৎ সভায় ফরিদপুর জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, "কৃষক-শিক্ষা" নামে এই প্রবন্ধটী পড়েন। সাধারণতঃ কি কি উপায়ে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কৃষি, শিল্প সমবায়, স্বাস্থ্য, গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে তিনি সহজ ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। অনেকের অনুরোধে ইহা এখন ছাপাইয়া গ্রামের উন্নতি যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহাদিগকে পাঠান যাইতেছে। আমি আশা করি, এই প্রবন্ধে যে সকল উপায়ের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে উহা প্রচলন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত সকল বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। জে, এন, রায়, ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর। ফরিদপুর, ২৫শে জুন, ১৯২০।

আজ এই ভীষণ অন্নবিপ্লবের মধ্যে ভগবান যে আমাদিগকে ফেলিয়াছেন ইহার ভিতরও তাঁহার অসীম করুণা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এতদিন দেশের শিক্ষিত লোক বড় বড় আন্দোলন আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহাদের ছিল না; আজ তাঁহারা, দেশের যাহারা প্রকৃত মেরুদণ্ড, সেই কৃষকদের ও দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে যাহা করিতে হয়, সেই কৃষির কথা, ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজবাটীতে আজ এই যে সভা হইয়াছে, কৃষকদিগের কথা ভাবিবার জন্য এমন সরকারী ও বেসরকারী লোকের সভা আগে

কখনও হয় নাই; তাই বলিতেছিলাম এই নিরানন্দের দিনেও আমাদের আনন্দ করিবার কারণ আছে। এখন কি করিলে শতকরা ৯০ জন লোককে জাগাইয়া তুলিতে পারা যাইবে তাহাই প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে। দেশের গণ্যমান্য লোকগণ আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাদের অধিক সময় দিতেছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সাধের রসায়ন চর্চ্চা ফেলিয়া ভগ্ন শরীর লইয়া নানাস্থানে যাইয়া দেশের লোককে ডাকিতেছেন; সাড়া পাইতেছেন কিনা জানি না। সেদিন আমরা যখন তাঁহাকে রাজবাড়ীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম তিনি বড় দুঃখের সহিত বলিয়াছেন একটা লোককে শিখণ্ডির মত সকল জায়গায় দাঁড় করাইয়া ফল কি? ইহাতে মনে হয় তিনি তাঁহার ডাকের তেমন সাড়া পাইতেছেন না। আমাদের কাছে ও আজ তিনি আসিয়াছেন। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য আপনারা সফল করুণ।

স্বাস্থ্য ও আহারই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বঙ্গের Sanitary Commissioner সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়াই এত মৃত্যু ঘটিতেছে, ম্যালেরিয়াই বলুন রার ইনফ্লুয়েঞ্জাই বলুন, সব অসুখের কারণই পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়া। স্বাস্থ্য না থাকিলে কৃষিকার্য্য করিবে কে? আবার পূরা আহার না পাইলে স্বাস্থ্য থাকিবে কি করিয়া? আপনাদের নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কৃষকের হীন স্বাস্থ্যের জন্য কৃষি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; দেশ জলশূন্য ও ফলশূন্য হইয়া রহিয়াছে; জন্মভূমির এই দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী। কৃষকদিগের উপর যখন দেশের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে তখন তাহাদিগকে সকল বিষয়ে জাগাইতে হইবে। নিরক্ষর জনসাধারণকে কৃষি, শিল্প স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী বাহির করিতে হইবে।

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।—এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য আজকাল অনেক জেলাতে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে, অনেক জিনিষ তাহাতে থাকে বটে, সংবাদপত্রে সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হয়; কিন্তু প্রকৃত কাজ কি হইতেছে? যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রদর্শনী খোলা হয় তাহা মোটেই সফল হইতেছে না। সহরের উপর জেলার কয়জন কৃষকই বা আসে এবং যাহারা আসে তাহাদের মধ্যে কয়জনকেই বা শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রকৃত কাজ করিতে হইলে প্রত্যেক ইউনিয়নে সেই স্থানের উপযুক্ত অর্থাৎ সেই স্থানের কৃষক ও শিল্পিরা যে সকল ফসল বা শিল্প কাজ করিতে পারে কেবলমাত্র সেই সকল ফসল ও শিল্পের নমুনা ও উন্নতির উপায় দেখাইতে হইবে। আজকাল প্রদর্শনীতে যে সকল নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কৃষকেরা কোন উন্নত প্রণালী বা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত উৎপন্ন করে না, যেমন বরাবর করিয়া আসিতেছে সেইরূপ ভাবেই

করে। যে কুমড়াটা সব চেয়ে বড় হইয়াছে বা ক্ষেতের মধ্যে যে অল্প পরিমাণ পাট লম্বা হইয়াছে তাহার কিছু নমুনাই প্রদর্শনীতে আনে। এইরূপ নমুনার জন্য পুরস্কার দিলে কোন ফল হইবে না। প্রত্যেক রকম ফসল বুনিবার আগে ভাল করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে কি কি কারণে পুরস্কার দেওয়া হইবে; জিনিষের পরিমাণ ও গুণাগুণের উপরই পুরস্কার নির্ভর করিবে।

স্বাস্থ্য প্রদর্শনী।—কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খুলিতে হইবে। সম্প্রতি কলিকাতা Town Hallএ যে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে উহা যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে অস্বাস্থ্যকর স্থান কিরূপ অল্প ব্যয়ের চেষ্টায় আবার স্বাস্থ্যকর হইতে পারে। যে সকল রোগের দ্বারা দেশ জনশূন্য হইতেছে কতিপয় সাধারণ নিয়মপালন করিলে ঐ সকল রোগ নিবারিত হইতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার সাহেব ঐ সকল রোগ সম্বন্ধে সহজ ও সরল ভাষায় অনেক উপদেশ প্রচার করিতেছেন ও গ্রামে ২ ঐ সকল উপদেশ বিতরণ করা হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল উপদেশ ছেঁড়া কাগজের মত ফেলিয়া দিলে চলিবে না। কৃষকদিগকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহাদিগকে ঐ সকল উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বলিবার আগে নিজেদের কাজ করিয়া দেখাইতে হইবে।

কৃষিক্ষেত্রে ঃ—উন্নত কৃষির বিস্তারের জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র চাই, কয়েক জেলাতে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, উহাতে নানাবিধ পরীক্ষা হইতেছে। জেলার সকল কৃষক উহা দেখিতে পায় না। কৃষিক্ষেত্র বলিলেই যে ৫০০ শত বিঘা জমি লইয়া তারের বেড়া দিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া কলকারখানা বসাইয়া চাষ করিতে হইবে এমন নহে। আপনারা সকলেই আপনাদের গ্রামে কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য কৃষিক্ষেত্র করিতে পারেন। আপনাদের সকলেরই চাষের জমি আছে। দুই চার বিঘা জমি লইয়া যে বীজ ভাল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, যে রকমে ভাল করিয়া জমি চাষ দেওয়া যায়, কিম্বা জল সেচন করিলে ফসল কি রকম বাড়ে তাহা অনায়াসেই দেখাইতে পারেন; ইহাতে আপনারা উপস্থিত যে খরচ করিতেছেন তাহা অপেক্ষা বিশেষ যে অধিক খরচ পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষকদিগকে ডাকাইয়া ঐ বীজের ফলন কিম্বা চাষের রকম বা জল সেচনের উপকারিতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আপনারা উপস্থিত অনেকেই কৃষিবিভাগের অনুমোদিত ধান, পাট, আলু, তামাক ইত্যাদির বীজ লইয়া চাষ করিতেছেন কিন্তু কৃষককে শিক্ষা দিব ও দেশে উন্নত বীজের প্রচলন করিয়া ফসল বাড়াইব এই উদ্দেশ্য লইয়া সেইরূপ সুবন্দোবস্তের সহিত (Systematically) কাজ হইতেছে না। এই রাজবাড়ী মহকুমার আলুর চাষ আগে ছিল না। গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া কৃষি বিভাগ আলুর চাষ প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এই বিষয়ে কৃষি বিভাগ যে একটু সফলতা লাভ করিয়াছে আশা করি তাহা আপনারা স্বীকার করিবেন। আরও সফল

হইতে পারিত যদি সকলে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া আলুর চাষ করিতেন। এই রাজবাড়ীতে আমার বন্ধু জীতেন বাবু বিঘা প্রতি ৮৭ মণ ও বীরেশ্বর বাবু বিঘা প্রতি ৬০ মণ আলু পাইয়াছেন, আবার কোরকদীর রায় বাহাদুর রাধিকামোহন লাহিড়ী জমিতে জল দিয়া আলুর ফসল ২০ গুণ বেশী পাইয়াছেন। কিন্তু কয়জন কৃষককে এই সকল বিষয় দেখান বা বুঝান হইয়াছে? কৃষিবিভাগের পাট ও ধান যাঁহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা লাভবান হইয়াছেন কিন্তু সকলকে লাভবান করিবার সমবেত চেষ্টা তেমন হয় নাই। একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এই ফরিদপুর জেলায় মোটামুটী ৭,৫০,০০০ বিঘা জমিতে গত বৎসর পাটের চাষ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রায় ৭৫, ০০০ হাজার বিঘাতে কৃষি বিভাগের বোম্বাই পাট ছিল, এই ৭৫০০০ বিঘা হইতে এই জেলার পাট চাষিগণ কম পক্ষে তিন লক্ষ টাকা বেশী পাইয়াছে। উপস্থিত যে পরিমাণ জমিতে পাট হইতেছে উহার পরিমাণ না বাড়াইয়া কেবলমাত্র পাটের চাষেই এই জেলার আয় ১,৫০০০০০ টাকা বাড়ান যায়। চাই কেবল চেষ্টা।

কৃষি সমিতিঃ—কৃষকদের মধ্যে কৃষির বিস্তারের জন্য কৃষি বিভাগ গ্রামে গ্রামে কৃষি সমিতি খুলিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। যাহারা কৃষিকার্য্য করেন বা কৃষিকার্য্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগকে লইয়াই সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমিতির সভ্যগণ নিজেদের জমিতে কৃষি বিভাগের উপদেশ অনুসারে নানারূপ বীজ, সার লাঙ্গল ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিবেন ও পরীক্ষার ফলাফল নিকটবর্ত্তী কৃষকদিগকে দেখাইবেন।

গো-রক্ষণ ঃ—গবাদির স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল রাখা যায় সে বিষয়েও কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। দেশের ফলন বাড়াইবার জন্য চাষের জমি বাড়াইতে গিয়া গোচারণ ভূমি কমাইয়া দিলে চলিবে না বরং উহা বাড়াইতে হইবে। গরুর খাদ্য, গোয়ালঘর প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আদর্শ গোশালা স্থানে স্থানে করিতে হইবে। গো মড়কের সময় পশু চিকিৎসক দ্বারা টীকা দিবার প্রতি কৃষকদের শ্রদ্ধা বাড়াইতে হইবে।

সমবায় সমিতি ঃ—কৃষকেরা কিরূপ মহাজন প্রপীড়িত তাহা আপনাদিগকে বলিতে হইবে না। কম সুদে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সমবায় ঋণদান সমিতি কেবল যে কম সুদে টাকা দিবার জন্য স্থাপন করা হইয়াছে এ ধারনা তাহাদের মন হইতে তাড়াইতে হইবে। মিতব্যয়িতা একজন দশজনের জন্য, একজোট হইয়া কাজ করিবার, "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই শিক্ষা দেওয়াই সমিতির উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বুঝাইতে হইলে তাহাদের লইয়া কাজ করিতে হইযে। প্রত্যেক ইউনিয়নে যৌথ ব্যাঙ্ক খুলিতে হইবে। সম্প্রতি

রাজবাড়ীতে একটী Co Operative stores হইয়াছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে আপনারা যাহাতে এইরূপ stores হয় তাহার চেষ্টা করুন। দেশের উৎপন্ন ফসল একজোট হইয়া ক্রয় বিক্রয় করুন, দেশের টাকা দেশের লোকদিগকে দিন। কৃষকেরা এই পাট বুনেছে কত আশা, কত ভরসা, এই পাটের উপর তাহাদের আছে; কিন্তু পাট যখন উঠবে তখন দর যদি খুব কমও হয়, পেটের জ্বালায় সেই কম দরেই পাট বিদেশীকে বিক্রয় করিতে হইবে। সব আশা সব ভরসা তাহাদের ধুলিসাৎ হইবে এই কমদরে বিদেশীকে বা মধ্যস্থ ব্যক্তিকে বিক্রয় না করে, প্রত্যেক ইউনিয়নে কৃষকেরা যদি এমন একটি কারবার খোলে যে সেই কারবার পাট কিনিয়া রাখিবে, তখনকার বাজার দর কৃষকদের দেবে ও পরে পাটের দর যখন বাড়বে তখন সেই পাট বিক্রয় করবে, এতে যে লাভ হবে ইউনিয়নের কৃষকেরাই পাবে; কম বাজার দরে বিক্রয় করিলে তাহাদের কিছু লোকসান হবে না; আবার এই কারবারের লাভ থেকে গ্রামের রাস্তা, ঘাট, জল নিকাশের কাজ করা যেতে পারে। এই সকল উপায় কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যাত্রা ও ছড়া :—জন সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মধ্যে যাত্রা, ছড়া প্রভৃতির প্রচলন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আপনাদের কো-অপারেটিভের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বসু সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য কৃষকদের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্য "সমবায়" নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন, আবার বিশেষ আনন্দের কথা এই যে রাজবাড়ী Dramatic Union সেই নাটক খানির থিয়েটার আপনাদিগকে না দেখাইয়া ছাড়িবেন না এবং আমার এই আশা যে আপনারা আপনাদের ইউনিয়নে ফিরিয়া কৃষকদিগের মধ্যে সমবায়ের শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য ঐ নাটকের যাত্রার বন্দোবস্ত করিবেন।

কুটীর শিল্প :—কৃষি ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা বা শিল্পের প্রচলন করিতে হইবে! আপনাদের মধ্যে যাহারা অগ্রহায়ণ মাসের কৃষি কথা পত্রিকা পড়িয়াছেন তাহারা জানেন মাদারীপুর মহকুমার একজন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত কত কম মূলধন লইয়া ঘি মাখন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার হিসাব তিনি নিজেই দিয়াছেন। এই কাজের জন্য তাঁহার অন্য কাজের কোন ক্ষতি হইতেছে না। সকালে ২।৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া মাসিক ৩০।৪০৲ টাকা লাভ করিতেছেন। আপনাদের অনেকেই ঐরূপ ব্যবসা করিতে পারেন বা আপনাদের ইউনিয়নে প্রচলন করিতে পারেন। এ জেলায় বেত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা বিশেষ কোন কাজে লাগান হয় না। একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে এই বেত অনেকেরই আহার যোগাইতে পারে। গ্রামে এমন অনেক কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এ জেলায় ছেড়া কাপড় দিয়া গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু এই কাঁথা যে একদিন অনেকের আয়ের উপায় হইবে তাহা কেহ আশা করেন নাই কিন্তু

সম্প্রতি এই কাথা প্রস্তুত করিয়া রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের প্রায় ৫০টী স্ত্রীলোকের মাসিক ১০।১৫৲ টাকা আয় হইতেছে। ইহা করিতে বেশীদিনের চেষ্টা বা পরিশ্রমের আবশ্যক হয় নাই। চরকার প্রচলন করিতে হইবে; চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু অবসর সময়ে চরকায় সূতা কাটীয়া গামছা তোয়ালে প্রভৃতি অনায়াসে করা যাইতে পারে। অল্পদিনের চেষ্টাতেই ফরিদপুরের ২।৩ টি ভদ্রমহিলা এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কাটা সূতা হইতে যে গামছা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আপনারা এই প্রদর্শনীতে দেখিতে পাইবেন। এইরূপ কত প্রকার কাজের দ্বারা গৃহস্থের আয় বাড়ান যাইতে পারে। যিনি এই সকল কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন নামোল্লেখে তাঁহার আপত্তি থাকাতে তাহা করিলাম না কিন্তু তিনি আমাদের সকলেরই নমস্য।

নৈশ বিদ্যালয়ঃ—সরকার বাহাদুর কবে জন সাধারণের লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, সেই আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না; আপনারা একটু চেষ্টা করিলেই গ্রামের কৃষক ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইতে পারেন, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর চেষ্টায় অনেক স্থলেই নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে ও যাহাদিগকে আমরা হেয় বলিয়া জ্ঞান করি তাহাদের ছেলেরা বেশ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেছে।

আপনারা হয়ত বলিবেন যে গ্রামোন্নতির এই লম্বা ফর্দ্দ লইয়া আমরা কি করিব? টাকা কোথা হইতে আসিবে? তেমন প্রবল ইচ্ছা বা একটা কাজ করিবই এইরূপ আগ্রহ থাকিলে টাকার অভাব হয় না। অবশ্য আমি আপনাদের Aramy & Navy stores এর মত Co-Operative stores বা Town Hall Exhibition এর মত Exhibition করিতে বলিতেছি না। প্রবল ইচ্ছা থাকিলে যে টাকার অভাব হয় না এ কথা প্রমাণ করিয়া দিবার মত এই রাজবাড়ীতেই অনেক কাজ আছে। পাংশা ও বেলিয়াকান্দি স্কুলের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিবেন। যাঁহারা সাধারণের উপকারের জন্য এই সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা প্রত্যেক কাজেই দেখা যাইতেছে। টাকার অভাব তাঁহাদের গতি রোধ করিতে পারে নাই। আপনারা বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর নাম শুনিয়াছেন। তাঁহাদের মত আপনারা ইউনিয়ন হিতসাধন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করুন। স্বাস্থ্য, নীতি, কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে লোকদিগকে শিক্ষা দিন।

সরকারী কৃষিবিভাগের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে কেবলমাত্র এই বলিতে পারি যে কৃষিবিভাগের সকল শ্রেণীরই কর্ম্মচারী তাঁহাদের কার্য্যে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন; আপনারা আসুন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করুন; তাঁহারাও আপনাদিগকে সকল হিতকর কার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সরকারী বেসরকারী ভুলিয়া গিয়া এক সঙ্গে মিলিয়া কাজ করি, দেশের জন্য একটু পরিশ্রম ও

স্বার্থত্যাগ করি; এতদিন যে কৃষকদের হেয় বলিয়া কাছে আসিতে দিই নাই আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাদিগকে সমান আসনে বসাই। আবার দেশের শ্রী ফিরিয়া আসিবে, আবার বাংলা সুফলা শ্যামলা হইবে।

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল, এজি,
ডিষ্ট্রীক এগ্রিকালচার অফিসার, ফরিদপুর লিখিত।

বাঁকুড়ায় মহুয়া বা মোল গাছ।

মোল খুব বড় গাছ। ইহা বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বালুকাময় ডাঙ্গা এবং ডিহি জমিতে ও বেশ জন্মে। মোল গাছ বড় উপকারী। ইহার প্রত্যেক অংশ ব্যবহারে আসে। গাছের পাতা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফাল্গুন মাস হইতে ইহার নূতন পাতা জন্মিতে আরম্ভ হয় এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে সাদা ফুল দেখা দেয়। ফুল ফুটিবার পরেই পাপড়িগুলি মাটীতে পড়িয়া যায়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পরেই ইহারা পড়ে। সেই সময় জমি ঝিটাইয়া পরিষ্কার রাখিতে হয় যাহাতে ফুলগুলি সহজে সংগ্রহ করা যায়। মোল (ফুল) কাঁচা অবস্থায় অথবা সিদ্ধ করিয়া ও খাওয়া যায়। ইহা বাটিয়া চালের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া পিঠা তৈয়ার করা হয়। মোল ভাজিয়া, চালভাজা, লঙ্কা, লবণ সহিত একত্রে ঢেঁকিতে কুটিয়া নাড়ু তৈয়ার হয়। মোল ৪।৫ দিন জলে ভিজাইয়া পরে মদ তৈয়ার হয়। মোল শুকাইয়া বিলাতে চালান যায়। তথায় শূকরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। পাকাফল লোকেরা খায়। ইহার বীজকে কোঁচড়া বলে। উহা হইতে তৈল বাহির হয়। ইহা প্রদীপে ব্যবহার করাও চলে এবং রাঁধিবার জন্যও ব্যবহার করা যায়। মহুয়া গাছের ছাল হইতে রং তৈয়ার হয়। এই গাছের ছাল চিরিয়া একপ্রকার আটাও পাওয়া যায়।

ইহার কাণ্ড হইতে বেশ ভাল কাঠ হয়। সাধারণতঃ একটী গাছ হইতে ৫মণ হইতে ৮ মণ তাজা মোল উৎপন্ন হয়। ইহাই ৪ মণ শুষ্ক খাদ্যের সমান। এই জিলায় বিস্তর বালুকাময় ডাঙ্গা পতিত জমি আছে। এই সব জমিতে যদি মোল গাছ লাগান যায় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সময় লোকেরা ইহার ফুল ও ফল খাইয়া কিয়ৎ-পরিমাণে জীবন ধারণ করিতে পারে।

খুব সুখের বিষয় এই যে বাঁকুড়া জিলাবোর্ড রাস্তার দুইধারে মোল গাছ লাগাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সাধারণ লোকেও যদি মোলগাছ লাগান তাহা হইলে অভাবের সময়ও জেলাতে কিছু খাদ্যের সংস্থান হইবে। বাঁকুড়া জেলাবাসীর এই দিকে দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই হইতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
শ্রেণী নং
কলিকাতা।

বাঁকুড়ায় লাক্ষা বা "লা"র ব্যবসা

বাঁকুড়ার মত কৃষিপ্রধান জেলার যেখানে বৃষ্টির অভাবে ফসলের প্রায় ক্ষতি হয় সেখানে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না এরূপ কোন অতিরিক্ত ব্যবসা করা খুবই দরকারী। লোকেরা ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকল শ্রেণীর কৃষকেরা চাষের উপর কাপড় বোনা অতিরিক্ত গৃহ শিল্প স্বরূপ আরম্ভ করিয়াছে, কেহ বা কামার ও ছুতারের ব্যবসায় ধরিতেছে। কিন্তু এই জেলাতে পূর্ব্ব হইতেই একটি ব্যবসা আছে যাহা এইরূপ বৃষ্টি নিরপেক্ষ এবং যাহা খুব বিস্তারিত ভাবে অবলম্বন করা উচিত যথা লাক্ষার বা লার ব্যবসা। পূর্ব্বে লা এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল কিন্তু নানা কারণে, যাহার মধ্যে মূলের অস্থিরতাই প্রধান, ইহা এই কয় বৎসর হয় খুব কমিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী রাঁচি অঞ্চলে ইহা এখন ও একটি প্রধান ব্যবসা। যে সকল কারণে আমি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে ইহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করি তাহা এই

(১) লার চাষ এরূপ একটি ব্যবসা যাহা প্রত্যেক কৃষক সহজে শিখিতে পারে।

(২) এই ব্যবসার সফলতা বৃষ্টির পরিমাণ কি নিয়মিত সময়ের উপর নির্ভর করে না।

(৩) বর্ত্তমান সময়ে এই ব্যবসা অতিশয় লাভ জনক। প্রস্তুত গালার মূল্য ১৯১৯ সালের এপ্রিলে মণকরা ৭৫৲ হইতে ১৯২০ সালের জানুয়ারীতে মণকরা ২৬৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। ইহার বাজারে খুব টান আছে আমদানীর পরিমাণ অপেক্ষা গ্রাহক অনেক বেশী। কাঁচা লা এবং লার কাটির মূল্যও ঐ অনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছে।

(৪) লার পোকা জন্মাইবার জন্য এই জেলা বিশেষ উপযোগী, কেননা যে সকল গাছ হইতে ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে তাহা এখানে প্রচুর আছে যথা, পলাশ, কুল, এবং কুসুম। পাকুর, শাল এবং আশন গাছেও ইহাদিগকে জন্মান যায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। মেঝিয়া থানায় পলাশ বৃক্ষে এবং খাতরা ও রানিবান্ধ থানায় কুল বৃক্ষে এখনও বিস্তর লা জন্মায়। শিমলাপাল থানায় দুই রকম বৃক্ষই ব্যবহৃত হয়। জয়পুরে কুসুম বৃক্ষে লা জন্মায়।

লার চাষের জন্য আমি ধানের চাষ ছাড়িয়া দিতে বলি না কিন্তু আশে পাশে লার উপযোগী যেখানে গাছ পাওয়া যাইবে তথায় লার চাষ আনুষঙ্গিক ব্যবসা রূপে আরম্ভ করা উচিত। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যবসায়ে আছেন তাঁহারা গত ফসল হইতে আগামী ফসলের জন্য বীজ রাখিয়া দেন। যাঁহারা প্রথম ইহার চাষ করিবেন

তাঁহাদিগকে বীজ ক্রয় করিতে হইবে। এই জেলার অনেক স্থানে ইহা বিক্রয় হয়। লা যুক্ত গাছের সরু সরু ডাল আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় হয়। মানুষের মাথার পরিধির সমান মোটা একটী আঁটী ১৲ কি ১।০ অথবা বেশী দরে বিক্রয় হয়। যে গাছে নূতন লা জন্মাইতে হইবে, তাহার ডালের সহিত এই বীজ কাঠি বাঁধিয়া দিতে হয় অবশিষ্ট কার্য্য পোকারা করে। অনেক ব্যবসাদার আছেন যাঁহারা এই কাঁচা লার কাঠি পাওয়া মাত্র কলিকাতার বাজার অনুযায়ী উচিত মূল্যে কিনিয়া লইবেন।

পলাশ গাছে দুইবার ফসল পাওয়া যায়। (১) বৈশাখী—আশ্বিন মাসে লাগাইয়া কার্ত্তিক মাসে লা সংগ্রহ করিতে হয়। (২) রঙ্গিনি—আষাঢ় মাসে লাগাইয়া আশ্বিন মাসে লা সংগ্রহ করিতে হয়। কুল গাছে কেবল মাত্র একটি ফসল পাওয়া যায়—কার্ত্তিক মাসে লাগাইয়া বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে লার বীজ ধানের বীজ বা অন্যান্য বীজের ন্যায় বেশী দিন রাখা চলে না। লার ছোট ছোট পোকাগুলি বাসা হইতে দল বাঁধিয়া বাহির হইবার উপক্রম মাত্রই বীজ লা যে গাছে লা জন্মাইতে হইবে তাহার ডালের সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে এই জন্য বীজ লা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া যায় না।

আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে একজন লোক মাঝারী আকারের বারটী গাছে লার চাষ করিবার ভার সহজেই হইতে পারে এবং ঐ পরিমাণ বীজের মূল্য অনুমান ২৲ টাকার বেশী হইবে না। জমিদার সম্ভবতঃ ১৲ অথবা ১।০ টাকা খাজনা লইবেন। বারটী মাঝারী আকারের গাছ হইতে বৎসরের ৫০ সের বা ৬০ সের লা কাটি পাওয়া যাইবে ইহার মূল্য বর্ত্তমান মণকরা ৯০ টাকা দর হিসাবে আন্দাজ ১২৫৲ টাকা হইবে। এইরূপে সামান্য মূলধনে এবং সামান্য পরিশ্রমে এই ব্যবসা হইতে যথেষ্ট লাভ হয়। লার কাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বার্ণিশ, পালিশ, স্ফোরক দ্রব্য, গ্রামোফোন, রোতাম, শীল মোহর করিবার গালা, ইলেকট্রিকের ইনসিউলেটার, বা বিদ্যুতপরিচালক দ্রব্য এবং এরোপ্লেন বা উড়োকল বা ব্যোমযান এই সকল তৈয়ারী করিতে লা একটি প্রধান দ্রব্য। ইহা বলিতে গেলে কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই জন্মে। শ্যাম দেশে ও ভারত ও চীনের মধ্যবর্ত্তী দেশে অল্প পরিমাণ মাত্র জন্মে। সন১৩২৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে তিন কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকার লা রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে রপ্তানির মূল্য দুই কোটী ৫৬ লক্ষ্য টাকা ছিল। ভারতবর্ষেও গহনা এবং সৌখিন দ্রব্য তৈয়ারী কিম্বা সুন্দর করিবার জন্য ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়।

আমি এই জেলার সকল জমিদারগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন জঙ্গল একেবারে ধ্বংস করা বন্ধ করেন এবং তাঁহাদের প্রজাদিগকে এই ব্যবসা গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন। ইহাতে তাঁহাদের জঙ্গলের আয় বাড়িবে এবং প্রজাদের

সম্পদ অধিকতর হইবে। আমি পঞ্চায়েত মহাশয়গণকে বলি তাঁহারা যেন সর্ব্বসাধারণকে এই ব্যবসায়ের উপকারিতা জানাইয়া দেন। আমি বিশেষ ভাবে বাঁকুড়া জেলা কৃষি সমিতির সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন নিজেরা উদাহরণ স্বরূপ হইয়া অন্যকে পথ দেখান এবং উৎসাহিত করেন। জে, ভাস, সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা কৃষি সমিতি।

আমাদের কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা

মহাশয়!

গত বৈশাখ সংখ্যা "কৃষকে"—"চাষের উন্নতির অন্তরায়" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহা সাধারণের মধ্যে যত প্রচার হয় এবং সাধারণে তাঁহাদের অধিকার (rights) সম্বন্ধে যত জ্ঞানলাভ করিবেন ততই যে দেশের মঙ্গল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমিও একজন পল্লীগ্রাম বাসী কৃষির সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমার অল্প বিস্তর সম্বন্ধ আছে। এ কার্য্যে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি ভোগ করিয়া তৎসম্বন্ধে আপনার পত্রিকার সাহায্যে কিছু আলোচনা করিতে চাহি :—

১। মূলধনের অভাব
২। গোচর ভূমির অভাব
৩। একলপ্তে অধিক পরিমাণ জমির অভাব ও
৪। মজুরের অভাব।

মূলধন—সংগ্রহ করা যে বিশেষ কঠিন ব্যাপার তাহা পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার কৃষকে মূলধন শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল যে কো অপারেটীভ্ ক্রেডিট সোসাইটীই এ সমস্যা মীমাংসার একমাত্র উপায়। ধীরে ধীরে এই সবডিভিশনে (কালনা) প্রায় ৩০টী গ্রাম্য কো-অপারেটীভ্ সমিতি ও কালনায় একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলির দ্বারা যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কালনার সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তিনি সার্কেল অফিসার মহাশয় এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ সবডিভিশনস্থ প্রত্যেক গ্রামে কো-অপারেটীভ্ সোসাইটী স্থাপনের জন্য যেরূপ যত্ন লইতেছেন তাহাতে মনে হয় অল্প দিনের মধ্যেই কো-অপারেটীভ্ সোসাইটীর জন্য কালনা একটী প্রধান স্থান অধিকার করিবে।

এক্ষণে **গোচর ভূমির অভাব** সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। আমিই বাল্যকালে দেখিয়াছি আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন মাঠ হইতে গরু আসিত তখন গ্রামে বেশ একটা "সাড়া" পড়িয়া যাইত। প্রত্যেক সামান্য গৃহস্থও ২।৪ টী গাই গরু পালন করিতেন এবং বড় গৃহস্থগণের মধ্যে অনেকেরই ৪০।৫০টী গরু ছিল। মধ্যে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণ লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না শাস্ত্রীয় অনুশাসন

ব্যাধিগ্রস্থো জরাযুক্তো মহাব্যাধি নিপীড়িতঃ।
নরকে নীয়তে পাপো গবাং গ্রাসাপহারকাঃ॥
গোভূমিং স্বভূমিংকৃত্বা নরো ভাগ্য বিপর্য্যয়াৎ।
শ্রীহীনো বংশহীনশ্চ জায়তে ভুবি ভারতঃ॥

ভুলিয়া গিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিলেন অর্থাৎ উচ্চহারে খাজনা দিয়া সমস্ত গোচর ভূমি পাট আবাদের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। জমিদারগণও সে সুযোগ ত্যাগ করিলেন না বরং প্রতিবাদকারী গণকে রক্তচক্ষু দেখাইয়া নীরব করিলেন। আমার কয়েকটী আইন ব্যবসায়ী বন্ধুর পরামর্শও লইয়াছিলাম। তাঁহারা এক বাক্যে বলিলেন "গোচর ভূমি রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন আইন নাই" "গভর্ণমেণ্ট গোচর ভূমি বাদ দিয়া কোন মৌজায় কর ধার্য্য করেন নাই সুতরাং জমিদার কেন ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন" ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্যচ্ছটায় আমাকে নির্ব্বাক করিলেন।

আমিই একটাকায় ।৬ ষোল সের নির্জ্জল দুগ্ধ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি কিন্তু আজকাল ৵৫ পাঁচ সের দুগ্ধের আবশ্যক হইলেও সের প্রতি তিন চারি আনা মূল্য দিয়াও গোয়ালা বাড়ীর জল মিশ্রিত দুগ্ধ লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে গোচর ভূমি না থাকায় গোপালন একটী ব্যয় সাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে Cattle Trespass Act এর কল্যাণে খোঁয়াড়ের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পল্লীগ্রাম হইতে ধর্ম্মের ষাড় পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। লোকে চাষের জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় হেলে গরু ব্যতীত অন্য গরু পালন করিতে পারে না। ফলে দেশের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও জীবনী শক্তির হ্রাস হইতেছে, জমিতে আর সস্তায় গোবর সার দেওয়া হয় না এবং দুধ ছাড়ানমাত্র বাছুরকে কসাইয়ের হাতে অর্পণ করিতে হইতেছে। কাজেই গোবংশের ধ্বংশ অনিবার্য্য! আমাদের শিল্প নাই বানিজ্য নাই কৃষিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। এ হেন কৃষি প্রধান দেশে কৃষিবল গোজাতির সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। জমিদারগণও তাঁহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়াছেন প্রজার সুখ সচ্ছন্দের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই এখন উভয়ের স্বার্থ বিভিন্ন-মুখী হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বাক্য অবহেলা করিয়া গোচরভূমির উচ্ছেদ সাধন করার ফল ফলিতেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রকোপে পল্লীগ্রাম জন শূন্য হইয়া

পড়িয়াছে। পৃথীবি ব্যাপি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভারতবর্ষের যত লোক ক্ষয় হইয়াছে অন্য কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে প্রচুর ও উপযুক্ত আহারের অভাব জনিত দৌর্ব্বল্যই ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির লীলা ভূমি করিয়া তুলিয়াছে। লোকাভাবে ও পাট অবিক্রেয় হওয়ায় আবাদি জমি পর্য্যন্ত আবার পতিত ও জঙ্গলপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ ভাবে গোচরভূমির পুনঃ সংস্থাপন কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে—পল্লী ধন ধান্যও জলপূর্ণ হউক ইহাই সকলের ইচ্ছা। আমরা চাহি গভর্ণমেণ্টের আইন দ্বারা প্রত্যেক পল্লীগ্রামে গোভূমি সংরক্ষিত হউক এবং পল্লী পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসুক। আমাদের এ অরণ্যে রোদন দুঃখ জানাই বা কাকে শোনাই বা কে কর্ম্মবীর স্যার পি সি রায় যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন একদিন না একদিন এ সমস্যার মীমাংসা হইবেই। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুণ।

আমাদের তৃতীয় অসুবিধা "**একলপ্তে অধিক পরিমাণ জমির অভাব।**" আমাদের একটা চলিত কথায় বলে "আগে রোঁদ পরে খোঁদ" অর্থাৎ ফসল দিবার পূর্ব্বেই উহা রক্ষার জন্য বেড়াপ্রভৃতির Fencing ব্যবস্থা করা উচিৎ। আমি একজন সামান্য লোক গ্রামে আমার প্রায় ১০০/ বিঘা জমি আছে কিন্তু আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি মাঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রায় ৭০ কিতায় আমার ঐ জমিগুলি বিভক্ত। শুধু আমার বলিয়া নহে সকল লোকেরই এই অবস্থা। অনেকে হয়ত বলিবেন "ঘরের কাছেই কি সকল সুবিধা হয়। আসামে যাও, সুন্দর বনে যাও, বাঁকুড়ায় যাও একলপ্তে যত ইচ্ছা জমি পাইতে পারিবে।" অবশ্য যাঁহাদের অবস্থায় কুলায় তাঁহারা স্থানান্তরে যাইয়া সুবিধামত স্থানে কৃষিকার্য্য করিতে পারেন কিন্তু সকলের পক্ষে ত তাহা সম্ভব নহে। অধিকন্তু সকলেই যদি গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যান তাহা হইলে গ্রামের অবস্থা কি হইবে সেটাও ভাবিবার কথা। পক্ষান্তরে ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য পল্লীবাসীগণের মধ্যে অনেকেই সহরে বাস করিতেছেন বা বাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই ক্রমশঃ পল্লীর অবস্থা শোচনীয় হইতেছে।

অনেকের নিকটেই শুনিতে পাওয়া যায় যে অমেরিকা কৃষিকার্য্যে অদ্ভুত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাহাদের কৃষিকার্য্যে যে সকল সুবিধা আছে এবং আমাদের দেশে যে সমস্ত অসুবিধা আছে সে গুলিরও সম্যক আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেবল মাত্র আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞতা ও আলস্যই যে কৃষির অবনতির একমাত্র কারণ তাহা নহে। শুনিয়াছি আমেরিকায় কোন চাষিরই ১০০ একরের কম জমি নাই এবং ঐ জমি একই জায়গায় অর্থাৎ একই ঘেরের মধ্যে। ঐ জমির মধ্যেই তাহার বাস ভবন প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই আছে। এরূপ অবস্থায় উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদির বা জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদের দেশেও যদি জমীর

পুনরায় এইরূপ বিলি বন্দোবস্ত হয় যে প্রত্যেক চাষির যোত এক একলপ্তে হইবে তাহা হইলে আমেরিকার মত না হউক বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। তখন আমাদের দেশের কৃষকও নিজের যোতের মধ্যে কুয়া কাটিয়া বা অন্য কোন উপায়ে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে। একটা বলদে টানা জলোত্তলন যন্ত্র Bullock chain Pump রাখাও খুব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

গভর্ণমেণ্ট যতই সৎ উদ্দেশ্যে মোটা মাহিনার কর্ম্মচারি রাখিয়া কৃষি বিভাগ পোষণ করুণ না কেন তাহার দ্বারা পল্লীবাসী কৃষককুল কিছুমাত্র উপকৃত হইতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না। মাঝে মাঝে উক্ত কর্ম্মচারিগণ মফঃস্বলে পদার্পণ করিয়া তাহাদের আবশ্যকীয় রিপোর্ট লিখিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলে কৃষির কি উন্নতি হইতে পারে? কয়জন অফিসার প্রকৃত চাষির সহিত মিশিয়াছেন? আমার বিশ্বাস ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই "চাষার" সহিত মিশিয়া, প্রতিকার করিতে পারুণ আর নাই পারুণ, তাহাদের অভাব অভিযোগের কথাগুলা শোনাও আবশ্যক মনে করেন না।

গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত, চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্র ট্রেনে যাইতে যাইতে অনেক বারই দেখিয়াছি। দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিকই এটি আদর্শ ক্ষেত্র হইতেছে। শুধু আদর্শ দেখাইলেত হইবে না—যাহাতে কৃষকগণও তাহাদের আপন যোত ঐরূপে ঘিরিতে পারে, তাহার মধ্যেই ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানেই নিয়ত বাস করিয়া তাহার কষ্টোৎপন্ন ফসল রক্ষা করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা উচিৎ। আমার মনে হয় সুধিরামকে তাহার বাড়ীর পার্শ্বস্থিত সহরবাসী নিধিরামের এদো ডোবায় কেরাশিন ছড়াইবার পরামর্শ দিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়ান সম্ভব হইবে না প্রজা সত্বে Tenance Right আঘাত না লাগাইয়া উপযুক্ত আইন দ্বারা গভর্ণমেণ্ট কৃষকের যোত চুঁচুড়া আদর্শক্ষেত্রের মত স্থির করিয়া দিলে এবং দান বিক্রয়াদি দ্বারা যাহাতে উহা পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলে দেশের কৃষি ও স্বাস্থ্য উভয়েরই উন্নতি হওয়া সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞান বিশ্বাস মতে এই অভিযোগ পেশ করিলাম। দেশের নেতাগণ ইহার সম্যক আলোচনা ও প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন কি?

আমাদের চতুর্থ অভিযোগ মজুরের অভাব সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

ডাক্তার—শ্রীপ্রবোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সেক্রেটারী কালনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটীভ, ব্যাঙ্ক লিমিটেড॥

আলুর পালো।

সম্পাদক লিখিত।

কিছু দিন পূর্ব্বে "আলুর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলুর পালো সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু সে প্রবন্ধের সহিত পালোর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায় তদ্বিষয়ে অধিক কথা বলা আবশ্যক মনে করি নাই। কিন্তু বহু পাঠক এই পালো সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন;—কাজেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল।

আলুর পালো প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ। যে প্রণালীতে আরোরুটের গেঁড়ো পেষণ করিয়া পালো বাহির করিতে হয়, আলুর পালো প্রস্তুত করিবার পক্ষে সেই নিয়মই প্রশস্ত। যে আলু হইতে পালো প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাকে বারম্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার জলে বিধৌত করা আবশ্যক। সাবানের জলে ফেলিয়া আলুগুলিকে উত্তমরূপে রগড়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়। ধুইয়া আলুকে যত পরিষ্কার করিতে পারা যায়, পালো সেই পরিমাণে পরিষ্কার হয়। তদনন্তর কোন পেষণ-যন্ত্র সাহায্যে আলুগুলিকে উত্তমরূপে বাটিতে হইবে। ঘরোয়া প্রণালীতে যে আমি পালো প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহার জন্য কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য লই নাই। বাটনা বাটিবার শীল নোড়াতেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে শীল-নোড়া অত্যন্ত পরিষ্কার অথবা নূতন হওয়া আবশ্যক, নতুবা পালোর বর্ণ ময়লা হইবে। আলু বাটা হইয়া গেলে, মণ্ডকে একটী আয়তন বিশিষ্ট পাত্রে রাখিয়া, জলে গুলিতে হইবে এবং মোটা ছিদ্রবিশিষ্ট ছাকনি বা খেলো পাৎলা কাপড় দ্বারা তৎপর ছাকিয়া ফেলিতে হইবে। এই রূপে তৎপর ছাকিয়া ফেলিলে, স্থূলাংশ বা ছিবড়া ছাকনি বা কাপড়ে থাকিয়া যায়, আর সূক্ষ্মাংশ জলের সহিত নামিয়া নিম্নস্থিত পাত্রে গিয়া পড়ে। এইবার ছাকা জলকে কোন পাত্রে ২।৩ মিনিট কাল স্থির হইতে দিলে, সূক্ষ্মাংশ গিয়া তলায় জমিবে; তখন ভাসমান স্থূল পদার্থকে ধীরে ধীরে ঢালিয়া ফেলিতে হইবে। সূক্ষ্মাংশকে যতবার ধৌত করা যাইবে ও ধীরে ধীরে উপরিভাগের জল ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, পালো তত পরিষ্কার হইতে থাকিবে। স্বতন্ত্রীকৃত ছিবড়াগুলিও বারম্বার জল দিয়া কচলাইলে, উহা হইতে পালোর অংশ বাহির হইয়া আসিবে এবং সেই পালোকে পূর্ব্বোল্লিখিত মতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে। পালো-সমন্বিত ঘোলা জলকে অধিকক্ষণ স্থির হইতে দিলে; ছিবড়া ও পালো পূর্ব্ববৎ বিমিশ্রিত ভাবে থাকিয়া যাইবে; এজন্য এ বিষয়ে ২।১ মিনিটের অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে। পালো অতি গুরুভার সামগ্রী। ফলতঃ এই অল্পক্ষণ মধ্যেই থিতাইয়া পাত্রের তলায় গিয়া

পড়ে। পালো যেমন তলায় জমিবে, অমনি তাহাকে কাচ বা এনামেলের রেকাব বা থালিতে বিস্তৃত করিয়া রৌদ্রে দিতে হইবে। রৌদ্রে দিবার কালে প্রবল বাতাস বহিলে পালোতে ধূলারাশি পতিত হয়; তাহাতে পালোর বর্ণ ময়লা হয়। এরূপ ঝটিকা বা প্রবল বাতাসের বেগ থাকিলে আর্দ্র পালোকে গৃহ মধ্যে বিস্তৃত পাত্রে রাখিয়া, বাতাস দিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। রৌদ্রের অভাব থাকিলে উল্লিখিত প্রণালীতে গৃহমধ্যে পালো শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। বিস্তৃতভাবে ব্যবসায় হিসাবে বহু পরিমাণে পালো তৈয়ার করিতে হইলে, বিস্তৃত গৃহের আবশ্যক এবং তাহাতে কয়েকখানি বাতাসের কল (fly wheel) থাকা অতীব আবশ্যক। সকল সময়ে বাহিরের রৌদ্রে বা বাতাসের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বর্ষা বা শীতে রৌদ্রের প্রাখর্য্য থাকে না;—অনেক দিন সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না;—সে স্থলে গৃহমধ্যে অগ্নি-উত্তাপের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পালো অধিকক্ষণ ভিজা থাকিলে, ভৌতিক ক্রিয়াবশতঃ উহা বিবর্ণ হইয়া যায়; তা ছাড়া, উহাতে উত্তাপ জন্মিয়া পচন আরম্ভ হয়। পালো উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, এক দিকে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, অন্য দিকে উহার গুণেরও বিশেষ হ্রাস হইয়া থাকে।

ঢাকার অন্তর্গত লৌহজঙ্গ গ্রামে জনৈক ভদ্রলোক যে প্রণালীতে পালো প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভাষাতেই তাহা বিবৃত করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—"কতকগুলি গোল আলু ছাড়াইয়া সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid dil) বিমিশ্রিত জলে দিয়া, অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করি। তাহাতে একরূপ মণ্ডের মত হয়; কিন্তু তত্ত আটাযুক্ত হয় নাই। কিছুতে লাগাইলে উঠিয়া যায়। বর্ণও উজ্জ্বল হয় নাই ইত্যাদি।" আমরা উক্ত দ্রাবক অথবা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করি নাই; কেবল কাঁচা আলুকে উপরি লিখিত প্রণালীতে অর্থাৎ পেষণ করিয়া যথারীতিতে পালো বাহির করিয়াছিলাম। আলুকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, জলে গুলিয়াও পালো বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সিদ্ধ আলুকে জলে গুলিলে উহার সূক্ষ্মাংশ এত হালকা হইয়া যায় যে, জলে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিতে চায়, ফলতঃ থিতায় না। রাসায়নিক পদার্থ সংযোগে উহাকে থিতাইয়া লওয়া যাইতে পারে কি না, তাহা আমি পরীক্ষা করি নাই; সিদ্ধ আলুকে ১৫।১৬ ঘণ্টার অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে দিয়াছি; কিন্তু তথাপি উহা ভালরূপ থিতায় নাই। রসায়নের সাহায্য লইলে সিদ্ধ আলুর পালো স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সিদ্ধ ও কাঁচা আলুর পালোর মধ্যে গুণের যে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত। কাঁচা আলুর পালোর গুণবত্তা সম্বন্ধে আমি এখনও কোন কথা নির্ভয়ে বলিতে পারি না। কিন্তু এই কাঁচা আলুর পালোকে গরম জলে সুসিদ্ধ করিয়া নিজে পান করিয়া দেখিয়াছি, উহার আস্বাদন আরোরুটের

ন্যায়। পালোর গুরুত্ব হেতু অল্প পালোতেই দ্বিগুণ ত্রিগুণ আরোরুটের কার্য্য হয়। অর্দ্ধসের গরম জলে এক ভরি আলুর পালো যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আলুর পালোর আস্বাদন যে কিরূপ, তাহা কিরূপে বলিব? সহজ মানুষের মুখে রোগীর পথ্য আর কোন কালে ভাল লাগে?

আলুর পালো যদি রোগীর পথ্যোপযোগী হয় এবং শিশুর আহার্য্য হয়, তাহা হইলে বিশেষ লাভের কথা। আরোরুটের মূল্য অপেক্ষা আলুর মূল্য কম; আরোরুট অপেক্ষা আলুতে চিবড়ার অংশ কম ফলতঃ শ্বেতসার বা পালোর ভাগ অধিক। অতঃপর ইহাতে দেখিতে পাই, আরোরুট অপেক্ষা আলু সমধিক পুষ্টিকর—রোগী ভোগী সকলের আহার্য্য। আলুর পালোতে উত্তম পায়স ও মোহনভোগ বা হালুয়া প্রস্তুত হইতে পারে। আহারৌষধি পক্ষে এই পর্য্যন্ত। আলুর পালোর ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছন্দ দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার দ্বারা কৃত্রিম আইভরি হইতে পারে। কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্ম্মিত নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ জিনিষে অস্ত্র বা রঙ্গের কার্য্য হইতে পারে। আমার আরও মনে হয় যে, স্পিরীট চাঁচগালা ও আলুর পালো একত্র মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত গৃহসজ্জাতে লাগাইয়া পালিশ করিলে আইভরি সদৃশ শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল আভা উৎপন্ন হইতে পারে। শিরিষের সহিত পালো গুলিয়া, কোন দ্রব্যে লাগাইয়া যথানিয়মে বারম্বার পালিশ করিলেও, নকল-আইভরি উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

আলুর পালো প্রস্তুত করিবার পক্ষে ফাল্গুন হইতে জৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত প্রশস্ত কাল। কারণ, এই সময়ে আলুর মূল্য অতি সস্তা থাকে; তাহা ছাড়া, ঠিকা লোক জনেরও মজুরী কম থাকে। এই দুইটীর মধ্যে কোনটীই উপেক্ষণীয় নহে। অতঃপর, এ সময়ে রৌদ্রের প্রাখর্য্য অধিক, বায়ুমণ্ডলও সমধিক শুষ্ক; সুতরাং পালো শুকাইবার পক্ষে বড় সুবিধা হইয়া থাকে।

এতৎ সম্বন্ধে সবিশেষ পরীক্ষা হওয়া উচিত। অনুসন্ধিৎসু সুপাঠকবর্গ এবিষয়ে মনোযোগ করিলে কার্য্য-সিদ্ধ অতি সহজেই হইতে পারিবে।

শ্বেতসার বা পালো।

(অঙ্গার ৫, হাইড্রোজেন ১০, অক্সিজেন ৫)।—আমাদের উদ্ভিজ্জ আহারের মধ্যে শ্বেতসার বা পালো প্রধান জিনিস। প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যে শতকরা কত ভাগ শ্বেতসার আছে, তাহা নিম্নে মুদ্রিত তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে:—

শস্য	চাউল	গম	যই	যব	মকাই	জুয়ার	আলু	কড়াই
পালো	৭৭	৬৮	৬০	৭০	৭০	৭০	১৬	৬০

ভিন্ন ভিন্ন শস্যের পালো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট। নিম্নে কয়েক প্রকার পালোর চিত্র প্রদত্ত হইল। উদ্ভিদদিগের মূলে ও বীজেই সাধারণতঃ পালো সঞ্চিত থাকে।

পালোর চিত্র।

(কৃষি রসায়নে প্রকাশিত)

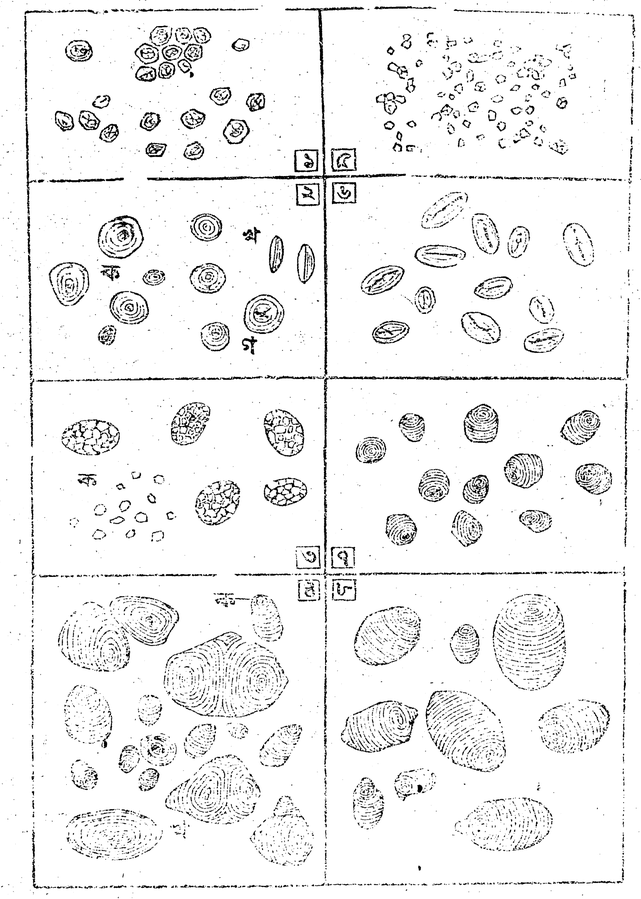

১। ভুট্টার পালো। ২। গমের পালো। ৩। যইর পালো, (ক) বিযুক্ত। ৪। আলুর পালো, (খ) যুক্ত। ৫। চাউলের বিযুক্ত পালো। যই ও চাউলের পালো দেখিতে একরূপ। ৬। শিমের পালো। ৭। র‍্যারোরুটের পালো। ৮। ক্যানার পালো।

বিশুদ্ধ পালোর কোন গন্ধ কিংবা স্বাদ নাই। ফুটন্ত জলে ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দ্রব হয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শর্করায় পরিণত না করিয়া, ইহাদ্বারা দ্রাবণ প্রস্তুত করা যায় না। ক্ষারের সহিত উত্তপ্ত করিলেও ইহা দ্রবণীয় হয়। ইহা লঘু পথ্য বলিয়া খ্যাত। মুখের অমৃত ইহাকে শর্করায় পরিণত করিতে পারে। জলে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ এসিড-সংযোগে উত্তাপ দিলে, পালো হইতে একরূপ স্বল্পমিষ্ট শর্করা (ডেক্সটোষ.) প্রস্তুত করা যায়। এই চিনিদ্বারা সুরা ও ভিনিগার প্রস্তুত হয়।

পালো প্রস্তুত করা বড় কঠিন নহে। বরিশাল জেলায় অনেক গৃহস্থ শটী হইতে পালো প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্থানীয় চিকিৎসকগণ এই পালো ব্যারামের সময়ে পথ্যরূপে ব্যবস্থা করেন। ইহা দ্বারা নানারূপ মিষ্টান্নও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত শটী তুলিয়া সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টী পাইয়া শটী গজাইলে তাহা হইতে অধিক পালো পাওয়া যায় না; কারণ, তখন পালো মুল হইতে গাছের নূতন বর্দ্ধনশীল অংশে পরিব্যাপ্ত হয়। শটীর বাকল ফেলিয়া প্রথমত জলে ধৌত করিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া লওয়া হয়। পরে এই কোটা শটী জলে চট্‌কাইয়া একটা চটে ছাকিয়া লইতে হয়। এই জল প্রায় ৩ ঘণ্টা কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে পাত্রের তলায় শুভ্র বর্ণের পালো জমা হইয়া পতিত হয়। তৎপরে পালোর উপরিস্থিত জল ফেলিয়া দিয়া, ইহা জল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। পালো পাত্রের তলে জমা হইলে উপরিস্থ জল পুনঃ ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ৭ বা ৮ বার ধৌত করিলে পরিষ্কৃত পালো প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভালরূপ ধৌত না করিলে শটীর তিক্ত রস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। কিঞ্চিৎ কষ্টিক সোডার দ্রাবণ যোগ করিলে সহজে এই পালো পরিষ্কৃত হইবে। তাহার পর ইহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়।

বিলাতে গম, যব, বকাই, চালল, আলু, এরোরুট প্রভৃতির পালো বাহির করা হয়। গম, যব প্রভৃতি, এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, পেষণ করা হয়। এই পেষিত গম বা যব জলে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাকিয়া লওয়া হয়। এই জল এক প্রকার কলের মধ্যে ঘুরাইলে জল ও পালো পৃথক হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এই কল দ্বারা পালো ছাকিয়া লইলে, শীঘ্র শীঘ্র ধৌত কার্য্য সমাধা হয়। তাহা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার পাত্রে রাখিয়া দিলে, পালো পাত্রের নীচে জমা হয়। তৎপরে জল ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় ইহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া, কষ্টিক সোডার ক্ষীণ দ্রাবণ যুক্ত করা হয়। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পালো পাত্রের তলে জমা হইলে, জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে দুই তিন বার জলে ধৌত করিলে, কষ্টিক সোডার ক্ষার চলিয়া যায়। অতঃপর ইহা শুষ্ক করিলেই বিশুদ্ধ পালো প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাউল হইতে পালো প্রস্তুত করা তত সহজ নহে। চাউল প্রথমত কষ্টিক সোডার ক্ষীণ দ্রাবণে এক দিন সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়, পরে ধৌত করিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করা হয়। পরে

এই পিষ্টকে পুনঃ ক্ষার-দ্রাবণ যোগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা জলে আন্দোলিত হয়। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত পালো জমাইয়া বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। নিম্নে লিখিত অন্য প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্রণালীমতে প্রথমতঃ চাউল এক দিন জলে সিক্ত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয়। পরে এই পিষ্টক জলে মিশ্রিত করিয়া, ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের দ্রাবণ যোগ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে, পালো ব্যতীত পিষ্টকের অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত হয়। তৎপরে পালো জমাইয়া জলে ধৌত করিয়া লইয়া পালো বাহির করা যায়।

আলুর পালো প্রস্তুত করিতে হইলে, আলুর ছাল ফেলিয়া ঢেকী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে পেষিয়া লইতে হইবে। পরে সালফিউরিক এসিডের দ্রাবণযুক্ত জলে ইহা মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইতে হয়। ঐ জল কোন পাত্রে রাখিলে, পূর্ব্বের ন্যায়, পালো এই পাত্রের তলায় জমা হয়। ইহার পর, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, কষ্টিক সোডা (অভাবে সোডা) মিশ্রিত জলদ্বারা ইহা ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে তৈলাদি পদার্থ দূরীকৃত হয়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কষ্টিক সোডা মিশ্রিত জল ও পরে পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত না করিলে, কোন পালোই বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

আলু (সুলভ হইলে), ভুট্টা ও জুয়ার হইতে পালো বাহির করা খুব লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে।

এরোরুট ও সিমুলিয়া আলুর মূল হইতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পালো বাহির করা যাইতে পারে। (কৃষি রসায়ন)।*

* কৃষি-রসায়ন পুস্তকখানি কৃষি-রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। পুস্তকখানি ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে প্রকাশিত। ইহাতে মনুষ্য গবাদি খাদ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থা আছে, সার ও সারের উপাদানের কথা আছে, মৃত্তিকা বিচার করিয়া তাহা কোন শস্যের উপযুক্ত অনুপযুক্ত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিবারণ বাবুর খাদ্যতত্ত্ব ও কৃষি-রসায়ন প্রত্যেক চাষী ও গৃহস্থের আবশ্যক ইহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। পুস্তক দুইখানি কৃষক আফিসে পাওয়া যায়। কৃঃ সঃ

শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল।

মহুয়া (Bassia latifolia.)

ভারতের বন ভূমিতে কত সম্পদ লুকান রহিয়াছে তাহার গননা করা যায় না। পাতা লতা ফলফুলে বন ভূমী পরিপূর্ণ—মানুষে ইহার প্রত্যেকটিকে কাজে লাগাইতে পারে।

ছোটনাগপুর ও সিংভুমের জঙ্গলে মহুয়া গাছ বহু পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ভারতবাসী অনেকের নিকট এই গাছ পরিচিত এবং আমরা ইহার ফুল ফল ব্যবহারে অভ্যস্থ। অরণ্য বাসী কোল, ভীল সাওতাল গণের মহুয়া ফুল একটি প্রধান আহার ইহা তাদের গবাদি পশুর খাদ্য। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ঘরে ধান চাউল অভাবে যখন খাদ্যভাব ঘটে, চাষ করিয়া ধান ঘরে আসিলে তবে আবার খাবার মিলিবে এমন সময় অরণ্যবাসীগণ মহুয়া গাছের দিকে তাকাইয়া থাকে।

মহুয়া ফুলের পাপড়ি মিষ্ঠ রসে পরিপূর্ণ, পাপড়িগুলি স্থূল ও রসে ভরা। ফুল ফুটিয়া উঠিলেই ঝরিয়া পড়ে। এই ফুল সংগ্রহের উদ্যোগ কত—গাছের তলদেশ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। প্রভাতে শত শত ছেলে মেয়ে স্ত্রীলোক আসিয়া মহুয়া ফুল কুড়াইতে থাকে। একটি ফুলের অপচয় না হয়; একজনের অধিকারের ফুল অপরে না লয় তাহার জন্য তাহারা কত সতর্ক। রাত জাগিয়া গাছতলায় এই জন্য পাহারায় ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। ইহা যে তাহাদের বর্ষ মাসের আহার; তাহাদের গরু বাছুরের খাদ্য প্রাণরক্ষার্থ তাহারা এই ফুল সংগ্রহ করে। ফুল ঘরে আনিয়া শুকাইয়া রাখে এবং আবশ্যক মত তাহা গুঁড়া করিয়া তাহাতে রুটি, পিঠা, চাপাটি তৈয়ারি করিয়া খায়। এক একটা বড় গাছ হইতে প্রত্যেক মরসুমে ৬মণ হইতে ৮মণ ফুল সংগ্রহ হইতে পারে। ইহার ফলও সংগ্রহ করা হয়। ফলের বীজ বাহির করিয়া শরিসার মত ঘানিতে ভাঙ্গিয়া লইলে তৈল পাওয়া যায়। ইহার রং টাট্‌কা অবস্থায় গাওয়া ঘৃতের মত আঘ্রাণও সুন্দর। অনেক সময় ইহা ঘৃতে ভাঁজাল দেওয়া হইয়া থাকে। বাসী তৈলে সুঘ্রাণ ত থাকেই না বরং দুর্গন্ধ হয়। ছোট নাগপুর, রাঁচি, সিংহভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এই তৈল ব্যবহার হয়।

কিন্তু ফলের অপেক্ষা ফুলের আবশ্যক অধিক সুতরাং আদরও অধিক। সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার ফুল এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল স্থানের অধিবাসী গণের মহুয়া ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইলে আনন্দ দেখে কে! উহা তাহারা কাঁচা খায়, সিদ্ধ করিয়া খায়, চাপেটী বানাইয়া খায় এবং গরু বাছুরকে খাওয়াইয়া অস্থি কঙ্কালময় দেহগুলি মাংসল করিয়া তুলে। যাহা হইতে এত বড় একটা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সেই সকল গাছের কিন্তু আদৌ যত্ন নাই। তাহারা অরণ্যে অযত্নে জন্মিতেছে এবং মাটি ও জল হাওয়ার গুণে বৃহদাতন হইয়া ফল ফুলে মানুষের উপকার সাধন করিতেছে। জমিদার গণ কিন্তু বড় নির্দ্দয়। তাহারা যথেচ্ছা এই সকল গাছ কাটিতে কুণ্ঠীত হয় না যখন তখন সামান্য লাভের আশায় কাঠের দামে এই সকল বিক্রয় করেন।

মহুয়ার ফুল বিদেশেও চালান হয় ইহার প্রধান গুণ যে ইহা দুই বৎসর থাকিলেও বিকৃত হয় না। বিদেশী বণিকগণ বিদেশী হাটে বাজারে শুকর পালকগণের নিকট বিক্রয় করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। শুকর পালকগণ শুকরকে মহুয়া ফুল খাওয়াইয়া তাহাদিগকে মাংসল করিয়া অপেক্ষা কৃত অধিক পয়সা রোজগার করে।

মহুয়া হইতে মদ প্রস্তুত হয়।

আরা, সাহাবাদ, আসাম, দার্জ্জিলিঙ্ যেখানে যেখানে ভাটিখানা আছে তথায় মহুয়া হইতে মদ প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা দেশে চাউল ও গুড় পচাইয়া সুরা প্রস্তুত করা হয়। বেহারে মহুয়া হইতে মদ প্রস্তুত হয়। মহুয়া ফুল শুষ্ক পেষণ করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ চূর্ণ দুই এক বার গরম জলে চট্‌কাইয়া ছাকিয়া লইয়া তাহাতে ইষ্ট নামক উদ্ভিদাণু সংযোগে সুরা প্রস্তুত হয়। ৪৯ ডিগ্রি তাপবিশিষ্ট স্থানে সুরা প্রস্তুতের অনুকুল। ঐ জল পরিশ্রুত করিলে তাহা হইতে সুরা পৃথক করা যায়। সুরা প্রস্তুতে ইহাই প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায়।

আরা ভাটি খানায় যে নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে—শুষ্ক ফুলগুলি ৪ দিন যাবত জলে ভিজাইয়া রাখা হইত এবং ঐ জল গাঁজিয়া উঠিলে (Fermented) তাহা চোলাই করিয়া সুরাসারে পরিণত করা হইত। ভাটি খানার অধ্যক্ষগণ বলিতেন যে ঐ মদ আইরিস হুইস্কি নামক মদের তুল্য। কিন্তু ইহার একটা মস্ত দোষ এই দেখা যাইত ইহার ধোঁয়া গন্ধ। ধোয়া ইহাতে থাকিবেই থাকিবে। ইটালি দেশ হইতে একজন বিশেষজ্ঞ আসিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে ইহাতে যে তৈল সারভাগ সংমিশ্রিত আছে তাহা হইতেই এই গন্ধের উৎপত্তি। এই তৈলভাগ পৃথক করিয়া দেখা গেল যে ইহার দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়াছে। বিশুদ্ধিকৃত সুরাসার কলিকাতায় কোন রসায়ন পরিক্ষকের নিকট পাঠান

হয় তিনি বলেন যে ইহা উৎকৃষ্ট সুরাসার বলিয়া গৃহিত হইতে পারে এবং গুণে গন্ধে বিলাতী সুরা সারের সঙ্গে তুলনায় কোন অংশে খারাপ নহে। ক্রমশঃ উহা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইতে পারিত কিন্তু আইনের নানা বিঘ্ন বাধায় তাহা হইতে পারে নাই। কলিকাতায় রম মদ্য প্রস্তুত কারীগণ উহা রম প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করিতেছে মাত্র।

সম্প্রতি হাইদ্রাবাদে মহুয়া লইয়া পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ইহা হইতে চিনি, মোটর স্পিরিট প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে পেট্রোল নামক খণিজ তৈলে এখন মোটর গাড়ী চালিত হয় কিন্তু মহুয়া স্পিরিটে ইহার অর্দ্ধেক খরচে মোটর চালিত হইতে পারে। কলিকাতার রসা ভাটি খানায় মহুয়া মোটর স্পিরিট তৈয়ারি হইবার আয়োজন হইতেছে। সস্তায় মোটরস্পিরিট মিলিলে কেবল যে মোটর গাড়ী চলিবার সুবিধা হইবে এমন নহে ইহাতে রেলগাড়ী, জলতোলা কল প্রভৃতি চলিতে পারিবে। সস্তায় ইঞ্জিন চালিত হইলে ভারতের অনেক ফল কারখানায় কার্য্য সুখকর হইবে ইহা কম আশার কথা নহে।

অভাব না হইলে অভাব পুরণের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। জার্ম্মান যুদ্ধের সময় কত শত অভাব আমাদের চোখের সামনে মাথা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পেট্রোলের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এসেটোন (Acetone) নামক পদার্থ হইতে মোটর চালন শক্তি পাওয়া যায়। কাঠ হইতে ইহাকে অতিকষ্টে পরিশ্রুত করা হইতেছে। একশত টন কাঠ হইতে এক টন মাত্র এসেটোন পাওয়া যায় এবং তাহার জন্য নিরতিশয় পরিশ্রম ও ব্যয় হয়। হাইদ্রাবাদের রাজস্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মহুয়াতে এসেটোনের সন্ধান দিলেন। নানা পরীক্ষাগারে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল এবং তাহার ফলে মহুয়া ফুল হইতে মোটর স্পিরিট তৈয়ারি হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহুয়া লে চিনিত আছেই অধিকন্তু এসেটিক-এসিড এবং কিছুমাত্রায় এসেটন আছে। মহুয়াকে সুরা সারে পরিণত করিয়া ভিনিগার দ্বারা পরিশ্রুত করিয়া তাহা হইতে এসেটিক এসিড প্রস্তুত করা যায় এবং দশটন ফুল হইতে ১ টন এসেটোন প্রস্তুত হইতে পারে। গাছ বজায় রহিল অথচ ফুল হইতে ঐ অত্যাবশ্যক পদার্থটি পাওয়া গেল ইহা কম লাভের কথা নহে। কেবল ফুল ব্যবহারে কি করা যায় তাহা দেখান হইল—বাকী ফল হইতে কি পাওয়া যায় দেখা যাউক ফল বিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায় এবং বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। তৈল খাওয়া চলে এবং তাহা হইতে অধিকন্তু সাবান, বাতি গ্লিসারিন এবং অন্য অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। যুদ্ধ বাঁধিবার হাইদ্রাবাদ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০,০০০ হাজার মণ মহুয়া বীজ য়ুরোপে রপ্তানি করা হইত উহার মূল্য ছিল মাত্র ১ লক্ষ টাকা। এখন কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই তৈলের অনেক কাজ

আছে। তুলা বীজের তৈলের সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া মার্গারিণ নামক একপ্রকার মাখন প্রস্তুত হইতেছে যাহা সস্তা বলিয়া য়ুরোপের সর্ব্বত্র আসল মাখনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইতেছে। ভারতেও উহা ঘৃত হিসাবে কিম্বা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহার হয়। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে ২৭,০০০ হইতে ৩০,০০০ টন মহুয়া বীজ রপ্তানি হইত এই রপ্তানি পণ্যের প্রায় বার আনা ভাগ সাবানাদি প্রস্তুতের জন্য লীভ বাকী বেলজিয়মে যাইত।

১৯১৩-১৪ সালে রপ্তানি তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়—

	টন	মূল্য
জার্ম্মানি	২৮, ৩০৪	৩০৯, ৭৯১ পাঃ
বেলজিয়ম	৪, ৪৩৯	৪৮, ৫৯৬ ,,
ফ্রান্স	৪২৫	৪, ৬৯৬ ,,
হলাণ্ড	৫০	৫৩১ ,,
ব্রীটিশ অধিকার		১৭ ,,

মহুয়া গাছগুলির প্রতি এক্ষণে সাধারণের এবং সরকারী অন্য বিভাগের দৃষ্টি পড়া আবশ্যক। মহুয়া হইতে এক্ষণে অপরিমিত মোটর স্পিরিট হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই মোটরস্পিরিটের সহিত বেনজোল ও ইথার সংযুক্ত হইলে আরও কত অসাধ্য সাধন হইবে তাহা বলা যায় না।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ভাদ্র মাস।

কৃষিক্ষেত্রে—যে সকল জমিতে শীতকালে ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতি পূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুন চাষী থেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিট্যাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীত কালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান ত্রতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীর টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী, তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়াও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান—বালসম (Balsam), জিনিয়া (Zinnia),কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major),আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং...

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড } ভাদ্র, ১৩২৭ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

বিল্ববৃক্ষ

(শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।)

বেল অতি উৎকৃষ্ট ফল। ইহার পুষ্টিকারীতা শক্তি অত্যন্ত অধিক। শুদ্ধ বেল ভক্ষণ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল দেহে বাঁচিয়া থাকা যাইতে পারে। পুরাণাদি শাস্ত্রে মুনিঋষিগণের কেবল ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণের কথা জানিতে পারা যায়। বোধ হয় এই প্রকার পুষ্টিকর ফলাদি তাহাদের আহার্থ নির্দ্ধারিত ছিল। বেল বহুপ্রকার রোগের মহৌষধ, বিল্ব বৃক্ষ দুই জাতীয় হয় (১) শ্রীফল বেল, (২) করেত বেল। শ্রীফল বেলই সুখাদ্য ও পুষ্টিকর বলিয়া আহারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। করেত বেল লোকে তত শ্রদ্ধার সহিত ভক্ষণ করে না বটে কিন্তু ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়।

বিল্ব বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে "বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে" নিম্নলিখিতানুযায়ী বর্ণিত আছে। "একদিন লক্ষ্মীদেবী মহাদেবের নিকট ভগবান নারায়ণকে পতি আশায় অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতেও মহাদেব সন্তুষ্ট না হওয়ায় তপস্যার কঠোরতা আরও বৃদ্ধি করিলেন। লক্ষ্মী দেবী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তপস্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিব, কিম্বা নারায়ণকে পতিলাভ করিব। এইরূপে তপস্যা কঠোরতম হইলেও দেহ চন্দ্রচূড় লক্ষ্মীর প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন না, তখন দেবী কমলা অনন্যোপায় হইয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে স্বীয় দক্ষিণ স্তন কর্ত্তন করত মহাদেবের চরণোদ্দেশে সমর্পণ করিলেন, প্রবল শোণিত প্রবাহ ও অশেষ যন্ত্রণা তাহার মহাব্রতে বাধা দিতে পারিল না, তিনি পুনরায় বামস্তন কর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। মহাদেব লক্ষ্মীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, এবার বিশ্বনাথের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুতগতি আসিয়া কমলাকে বলিলেন, "মা কমলে! ক্ষান্ত ক্ষান্ত হও, আমি তোমার

তপস্যার গুণে পরম প্রীত হইয়াছি, তোমার প্রার্থনা আমার অবিদিত নাই, অতএব বর প্রদান করিতেছি, তুমি ভগবান নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হও।" লক্ষ্মীদেবী মনোমত বর প্রাপ্ত হইয়া দেবাদিদেব গঙ্গাধরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য যোড়করে দণ্ডায়মান রহিলেন, লক্ষ্মীর কর্ত্তিত স্তন হইতে তখনও প্রবল বেগে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তদ্দর্শনে করুণ হৃদয় মহাদেবের দয়া প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিল, তিনি লক্ষ্মীকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা সিন্ধুসুতে! আশ্বস্ত হও' আমার বরে তুমি পূর্ব্ববৎ স্তন প্রাপ্ত হও, এবং তোমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক, আরও আমার বরে তোমার ঐ কর্ত্তিত স্তন হইতে শ্রীফল বিল্ব বৃক্ষ নামক পরম পবিত্র বৃক্ষের উৎপত্তি হউক'। তোমার এই কঠোর তপস্যার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ উক্ত বৃক্ষের ফল স্তনের আকার প্রাপ্ত হউক। এই বৃক্ষে আমি রুদ্র তেজ সঞ্চালিত করিলাম, উহা মানবগণের অশেষ কল্যান সাধন করিবে। যেখানে বিল্ব বৃক্ষ থাকিবে সেখানে আমি অবস্থান করিতেছি ইহা নিশ্চিত জানিও, উহার পত্র দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিলে অবশ্যই আমি তাহাকে চতুর্ব্বর্গের ফল প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান হইলেন, এই প্রকারে রুদ্র বলে বলী হইয়া লক্ষ্মী দেবীর দক্ষিণ স্তন হইতে বিল্ব বৃক্ষের উৎপত্তি হইল।"

বেল গাছের শিকড় অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে, এবং উহা হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ফেকড়ি বহির্গত হয়, এই শিকড়ের কিয়দংশের সহিত ঐ ফেকড়ি কর্ত্তন করিয়া লইয়া উদ্যানে রোপণ করিলে নূতন বৃক্ষ হয়, কিন্তু এই প্রকারে হঠাৎ ফেকড়ি তুলিয়া রোপণ করিলে অনেক সময় মরিয়া যায়। আমি নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া দুইটি গাছ রোপণ করিয়াছিলাম,এক্ষণে তাহা বেশ বর্দ্ধিত হইয়া ফলবান হইয়াছে।

যে স্থান হইতে ফেকড়ি উদ্ধৃত হইবে, সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া গুল কলমের ন্যায় উক্ত ফেকড়ির উভয় পার্শ্বস্থ শিকড়ের কতক অংশের চতুঃপার্শ্বস্থ ছাল তুলিয়া রস গমনাগমন বন্ধ করিতে হইবে। পরে মাটি চাপা দিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত জল সিঞ্চন করিলে তথা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বহির্গত হইবে, তখন সাবধানে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা নবজাত শিকড় সমেত উভয় পার্শ্ব কর্ত্তন করিয়া দিন কতক রাখিতে হইবে, যখন আর মরিবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না তখন তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে। বর্ষাকালে এইরূপ করিলেই ভাল হয়, তাহা হইলে জল সিঞ্চন ও করিতে হয় না, এবং মরিবারও ভয় থাকে না; আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে এইরূপ করিয়া আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে তুলিয়া রোপণ করিলেই ভাল হয়। বলা বাহুল্য যে এই প্রণালীতে যে দুইটি গাছ রোপণ করিয়াছি, তাহাদের ফল আদিম বৃক্ষ অথবা বীজোৎপন্ন বৃক্ষের ফল অপেক্ষা কিছু বড় আকারের হইয়াছে, এবং অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু ও উহাতে বীজের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে।

বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে সুপক্ক বেলের বীজ কোন ঝুরা মৃত্তিকা পূর্ণ গামলা বা টবে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হইবে, যখন ১০।১২ অঙ্গুলি চারা বর্দ্ধিত হইবে তখন স্থানান্তরে রোপণ করিবে, কিন্তু বীজ জাত চারায় উক্তরূপ কলম গাছ অপেক্ষা বিলম্বে ফল ধরে। দোঁয়াস মাটী বেল গাছের পক্ষে উপযোগী। যে স্থানে বর্ষার জল বসে কিম্বা নিম্নভূমিতে বেলের চারা রোপণ করিবে না, করিলে প্রায়ই মরিয়া যায়। চারা রোপণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে পচা খৈল ও পচা গোবরের সার মিশাইবে। শাখা প্রশাখা সহ অধিক পরিমাণে পত্র তুলিয়া লইলে গাছের অনিষ্ট হয়। চারা গাছ হইতে এইরূপে পত্র সংগৃহীত হইলে উহারা প্রায় মরিয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে গাছের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দিলে এবং আষাঢ় মাসে গোড়ায় আইল বান্ধিয়া বর্ষার জল খাওয়াইলে বৃক্ষের বিলক্ষণ তেজ থাকে। বৃক্ষের ফল শেষ হইয়া গেলে শুষ্ক, রুগ্ন ও পুরাতন কিছু ডাল পালা ছাঁটিয়া দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে আবার নূতন শাখা প্রশাখায় গাছটী পূর্ণ হইয়া উঠে এবং পরবৎসর ফলাধিক্য ও হইবে। যে বেলের আবরণ পাতলা, আঠা ও বীজ কম সেই বেলই ভাল। ঐ গুণ ছোট ও বড় উভয় জাতীয় বেলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, কোন কোন বেল গাছে বারমাসই ২।৪টী করিয়া ফল দেখিতে পাওয়া যায়' এইরূপ বারমাসী গাছ খুব বিরল। বেলের আকার সাধারণতঃ অর্দ্ধসের হইতে ৩।৪ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। কয়েত বেলের আকার খুব ছোট অর্দ্ধপোয়া বা এক পোয়ার বেশী দেখা যায় না। কচি বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইলে তাহাকে বেলশুঠ বলে, উহা ঔষধে লাগে। বেলের মোরব্বা এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে বেলের সরবৎ অতি উপাদেয় সুখাদ্য। সাধারণতঃ উদরাময় রোগে কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলে ও কোষ্ঠ কাঠিন্যে পাকা বেল খাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এই বৃক্ষের মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প, কাষ্ঠ, কোনটিই অকর্মণ্য নহে। প্রত্যেক অংশই এক এক অত্যাশ্চার্য্য রোগ নিবারক শক্তি ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত সেই বিশ্বেশ্বরের অশেষ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আমরা অন্ধ মানব চক্ষু থাকিতেও ইহার গুণাবলী দেখিয়াও দেখিতে পাই না। আমরা কেবল জানি যে বিল্ব পত্র অনেক দেব দেবীর অর্চ্চনা হয় এবং ইহার ফল খাইতে হয়। তদ্ভিন্ন ইহাতে যে কত কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য হয়। সে সম্বন্ধে কিছু মাত্র অনুসন্ধান করিয়া, অবশ্য যাঁহারা প্রথিত যশলব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাঁহারা বিল্ববৃক্ষের অশেষ গুণবিশিষ্ট অবগত আছেন। এসম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত বন্ধু বিহারী সেন গুপ্ত বিদ্যা বিনোদ মহাশয় "নন্দিনী" নামক পাক্ষিক পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অগ্রে ইহার মূলের গুণই বলিতেছি। দশমূল পাচনের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইহার মূল দশমূলের একটী প্রধান ও আদিপদ। ইহার গুণ ত্রিদোষ নাশক. আগ্নেয়, মৃদু বিরেচক। ইহার দ্বারা যকৃতের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।

সিকি তোলা বিল্ব মূলের ছাল ২৷৷০ আধাইটী গোল মরিচ সহ বাটিয়া সর্প দষ্ট রোগীকে সেবন করাও দষ্ট স্থানের উপর ৪ অঙ্গুল ব্যবধান করিয়া ৩টী কঠিন বন্ধনী দাও, অস্ত্র দ্বারা দষ্ট স্থান চিরিয়া উর্দ্ধ হইতে টিপিয়া রক্ত বাহির করিতে থাক, তৎপরে উক্তস্থান উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ কর, ইহার পৃষ্ঠে আইস শেওড়া বৃক্ষের মূলের ছাল ও বিল্ব মূলের ছাল একত্রে অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় বাটিয়া রাখ, এক্ষণে দংশিত স্থানে এই প্রলেপটী বেশ করিয়া দাও, রোগীর সমস্ত মস্তকটী মুড়াইয়াও এই প্রলেপটী দাও. এক্ষণে প্রতি ঘণ্টা অন্তর রিঠা ফলের ছাল ৵০ আনার মাত্রায় খাওয়াইতে থাক। কার্পাস পত্রের রস (রাম কার্পাস হইলেও ক্ষতি নাই) রোগীর সর্ব্বাঙ্গে অনবরত মাখাও, যতক্ষণ না রোগীর বেশ চৈতন্য হয় ততক্ষণ ঐ প্রক্রিয়া করিতে থাক। ২৷৩ ঘণ্টা পরে দেখিবে রোগী সুস্থ হইয়াছে। রোগীর ক্ষুধা হইলে তৎক্ষণাৎ দই ভাত মৎস্যের ঝোল খাইতে দিবে। বিষাক্ত সর্প ক্রোধিত হইয়া দংশন করিলেও প্রক্রিয়ায় রোগী বাঁচিয়া উঠে।

বিল্ব মূল চূর্ণ ধ্বজভঙ্গ রোগে উপকারক। শিমুল মূলের রস ১ তোলা চিনি ১০ রতি বিল্বমূল চূর্ণ ৵০ আনা একত্রে ২১ দিন প্রাতে সেবন কর, পুষ্টিকর পথ্য, তেজি ও জিতেন্দ্রিয় হও অবশ্যই ফল পাইবে।

বিল্ব মূলের ছাল ও তেজপত্র সমানভাগ জল দ্বারা বাঁটিয়া শীতল অবস্থায় কপালে প্রলেপ লও, উর্দ্ধশ্লেষ্মা জন্য শিরঃপীড়া এই প্রক্রিয়ায় ১সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হয়, ছাগীদুগ্ধ সর্ষপ তৈল ও ভীম রাজের রস সমপরিমাণ লইয়া একত্র মিশাও, প্রখর রৌদ্রে ৪ ঘণ্টা রাখ, মাখন গুড়া করিয়া মস্তকে মালিশ কর ও নাকে মধ্যে মধ্যে টিনিয়া নস্য লও, কপালের ক্রুর শ্লেষ্মা ইহাতে তরল হইয়া যাইবে। একটুকরা ঘৃটের ছাই আকন্দ আঠায় বেশ করিয়া ভিজাও, ছায়ায় শুষ্ককর, পরে উহাতে অত্যল্প কর্পূর মিশাইয়া একটী কাচপাত্রে যত্নে রাখ, এই নস্য উভয় নাসাপথে ২৷১ বার টানিয়ালও, যত ক্ষণ নাসিকা ধৌত করা নাযায় ততক্ষণ মূহুর্মূহু হাঁচি হইতে থাকিবে ও ক্রূর শ্লেষ্মা জনিত শিরঃপীড়া আরোগ্য হইবে।

বসন্ত রোগে বিল্ব কাষ্ঠের ছোপ বিশেষ উপকারী ইহারপ্রলেপে গুটি সকল যখন খুব পাকিয়া উঠে তখন শীতল জলে ইহার কাষ্ঠ চন্দনের ন্যায় ঘর্ষণ করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ছোপ দিলে ঘা শুকাইয়া যায়, যন্ত্রণার অনেক উপশম হয় এবং রোগ বীজাণু সকল ধ্বংস হইয়া যায়। যে কোন চর্ম্মরোগে ইহার এইরূপ বাহ্যিক প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়, এখন কি গলিত কুষ্ঠ ক্ষত ও দমিত হইতে পারে।

যিনি প্রত্যহ একটী ত্রিপত্র যুক্ত বিল্ব পত্র ভক্ষণ করেন, তিনি বহুবিধ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবি হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের তত বিশ্বাস কই? অসাধ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বিল্ব পত্র ভক্ষণে আরোগ্য হওয়ার কথা অনেক বিজ্ঞ লোকের মুখে শুনা যায়।

বিল্বপত্রের রস মৃদু বিরেচক। যে কোনরূপ জ্বর হউক না কেন ইহার রসের সহিত শিউলী পাতা অর্দ্ধছটাক মাত্রায় উপর্যুপরি ৫৷৭ দিন সেবন করিলে অবশ্যই জ্বর কমিয়া যায়।

যে কোনরূপ শোথরোগ হউক না কেন ইহার ১ তোলা রসের সহিত ১০রতি গোল মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২৷৩বার সেবন করিলে মল মূত্র নিঃসারিত হইয়া রোগ আরোগ্য হয়। এইরোগে লঙ্কার ঝাল বর্জ্জন করিয়া ৫৷৭ দিন কেবল ঘৃত ভাত খাইয়া থাকিতে হয়। পিপাসায় দুধ, অসহ্য পিপাসায় ডাবের জল অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। ইহার সহিত সিকিতোলা সোরা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

বাত রক্ত অর্থাৎ মহাব্যাধি রোগে বিল্বছাল ও তুলসীপত্র সমান ভাগে গোমূত্রে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর, অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ ভক্ষণ কর, আতপান্ন ভোজী হইয়া সাবধানে শুক্র রক্ষা কর। মৎস্য মাংস মদ্য, মৈথুন একেবারে পরিত্যজ্য একমাস মধ্যে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দেহ উজ্জ্বল হইবে।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির নাসা কর্ণ ও মুখাভ্যন্তরে বিল্বপত্রের রস গোল মরিচ চূর্ণ সহ প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

বিল্ব ও করঞ্জা বৃক্ষের মূলের ছালচূর্ণ, গোলমরিচ চূর্ণ,দারুচিনি চূর্ণ, শ্বেত চন্দন চূর্ণ, শুষ্ক গোলাপফুল চূর্ণ, সুপারি ভস্ম, উননের পোড়ামাটী চূর্ণ, সর্ব্বসমান চা খড়ি চূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ দন্ত মার্জ্জনা করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইয়া সুগন্ধ হইবে, ইহা জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে বহুবিধ মুখরোগ ভাল হয়।

শূল বেদনায় আদার রস সহ বেলছাল বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে শূলের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ উপশমিত হয়।

বিল্বগর্ভ ঘৃত একটী শাস্ত্রীয় ঔষধ। ইহাতে দীর্ঘ কালোৎপন্ন গ্রহণী আশ্চর্য্যরূপে উপশমিত হয়। কুক্ষিস্থ সর্ব্ববিধ পীড়া বিশেষতঃ উদরাময়, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা রোগ পর্য্যন্ত ইহাতে আরোগ্য হয়। গব্য ঘৃত /১ সের বেল শুঁঠ এক পোয়া, মসুর দাইল /২সের জল /৵৷৷৬সের শেষ /৪সের থাকিতে নামাইবে।

অগ্রে ঘৃত অগ্নিতে চড়াও, অত্যুষ্ণ হইলে অর্দ্ধছটাক বাটা হরিদ্রা অর্দ্ধ পোয়া জলে গুলিয়া ঘৃত নামাইয়া অল্প অল্প দিতে থাক, সমস্ত দেওয়া হইলে আবার ঘৃত অগ্নিতে চড়াও, এক্ষণে মসুরের কাথ /১ সের ঐ ঘৃতে ঢালিয়া জ্বাল দিতে থাক, কাথ মরিয়া যখন সামান্য মাত্র থাকিবে তখন পূর্ব্বোক্ত বেল শুঠ এক পোয়া জল সহ বাঁটিয়া ঘৃতে ঢালিয়া জ্বাল দিতে থাক, নীরস হইলে নামাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে, মাত্রা পূর্ণবয়স্ক অর্দ্ধ তোলা অনুপান আঁটি দুগ্ধ।

বিল্বাদি ঘৃত একটী শাস্ত্রীয়। শোথ সংযুক্ত গ্রহণী রোগে ইহা প্রয়োজন। গব্য ঘৃত

/১ সের, বেলশুঠ, চই, চিতামূল, আদা প্রত্যেক ।৷০ পোয়া জল /১ সের শেষ /।০ পোয়া। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা অনুপান ছাগাদুগ্ধ অর্দ্ধ ছটাক। প্রাতেই সেব্য।

বিল্ব তৈল একটী চমৎকার মর্দ্দন তৈল। সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনে অতিসার, গ্রহণী, সূতিকাগ্রস্ত রোগীর শরীর বেশ নিরাময় কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে।

প্রস্তুত প্রণালী। তিল তৈল /৪ সের ক্বাথার্থ বেলশুঠ /৬০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের আদার রস /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, গব্য দুগ্ধ /২ সের, কল্কার্থ ধাই ফুল বেলশুঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুণর্ণবা, শুঠ, পিপুল, দেবদারু, বচ, মোচরস, কটকী, তেজপত্র, বন যমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা মৃদু অগ্নিতে যথা নিয়মে পাক কর, তৈল পাক দৃষ্ট কর্ম্মা বৈদ্য দ্বারাই করান উচিত।

বিল্ব পঞ্চক।—জ্বরযুক্ত অতিসারে বমি উপদ্রব থাকিলে বিল্ব পঞ্চক প্রয়োগে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। শাল পানী, চাকুলে, শ্বেত বেড়েলা, বেলশুঠ, দাড়িম ফলের ত্বক সর্ব্ব ওজন সমষ্ঠি ২ তোলা জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

বিল্বাঞ্জন।—বিল্ব পত্র রস ৪ মাসা, সৈন্ধব লবণ ২ রত্তি, গব্যঘৃত ৪ বিন্দু তাম্র পাত্রে এই সমুদয় রাখিয়া কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, পরে ঘৃটের অগ্নিতে আধা উত্তপ্ত করিয়া স্ত্রীদুগ্ধ দ্বারা তরল কর, পালক দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চক্ষুর শোথ, রক্তস্রাব, বেদনা, অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়, প্রত্যহ ২।৩ বার দেওয়া আবশ্যক। বিল্বপত্র রস সম পরিমাণ কাঁজির সহ তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে সমপরিমিত সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তৈল মিশাইয়া চক্ষে দিলে নেত্রস্রাব নিবারিত হয়।

বিল্বাদি।—অতিসারে বমনোদ্রেক থাকিলে বেলশুঠ ও আমের আটীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অত্যল্প চিনি ও মধুর সহ পান করিলে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয়, উভয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা জল /॥০ সের শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

বিল্বাদি কষায়—বেলশুঠ, মুথা, ইন্দ্রজব, বলা, আতইচ মিলিত ২ তোলা জল /॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া, আম পিত্তাদি সারে সন্তোষ জনক ফল হয়।

বিল্বাদি চূর্ণ।—বেল, কয়েত বেল, শোনা, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বৃদ্ধদারক, লাঠা, করঞ্জা, সজিনা, প্রত্যেকের মুল ও শুঠ, ভেলার মুটী, পিপুল পিপুল, মুল, চই, পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, বন যমানী এই সমস্ত চুর্ণ ।০ আনা মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবনে উদরোগ ভাল হয়, অনুপান উষ্ণজল।

২য় বিল্বাদি চুর্ণ।—বেল শুঠ, মুথা, বড় এলাচ শ্বেত চন্দন, যোয়ান বন যোয়ান, তেউড়ি, চিতামুল, বিট্ লবণ, অশ্বগন্ধা, শ্বেত বেড়েলা, পেজুল, বংশ লোচন, শিলাজুত সমভাগে চুর্ণ।০ আনা মাত্রায় প্রত্যহ অর্দ্ধছটাক কাঁজির সহিত সেবা করিলে মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক রোগ সমস্ত দূর হয়, বাতব্যাধিতেও সুফল দর্শে।

বিল্ব পত্র ও কাল ধুতরার পত্র সমান ভাগে থেতো করিয়া নূতন হরিদ্রাক্ত নেকড়ায়

ভরিয়া পুটলী বদ্ধ কর, যে কোন পালা জ্বরে এই পুটলী হস্তে রাখিয়া শুকিলে ২ দিনে ভাল হয়। কাল ধুতুরার মূল ১ রতি ২৷৷টী গোল মরিচ সহ জ্বরের পালার দিন খাইতে হয়। এক দিন অন্তর দুই দিন অন্তর জ্বর, অমাবস্যা বা পূর্ণিমার জ্বর এমন কি মজ্জাগত পুরাতন জ্বর ও ঐ নস্যে আরোগ্য হয়, ২।১ দিনে ফল না হইলে ৫।৭ দিন দিবে, ইন্দুরে কামড়ান জ্বরও ইহাতে ভাল হয়। কুমুরে পোকায় কর মুখের লালা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া জ্বরের পালার দিন প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাসি মুখে কপালে ৩টী ফোটা লইতে হয়।

কাঁচা বেলের আঠায় রং গুলিয়া তদ্বারা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত ছবি রং করিলে ঠিক বার্ণিশের ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়।

স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত প্রদরের পীড়ায় প্রত্যহ ২।৩ বার সিকি তোলা বেলের আঠা, যজ্ঞডুমুরের রস ১ তোলার সহিত ভক্ষণে আরোগ্য হয়। ভুই আমলার গাছ চুর্ণ প্রত্যহ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় চেলুনীর জল আধছটাক সহ সেবন করিলে উদর রোগ এক সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইবে।

মুর্গী বা পক্ষির চাষ

(প্রকাশচন্দ্র সরকার এম, আর, এ, এস লিখিত।)

মুর্গীর বাসগৃহ—মুর্গীর ঘর ২।৩ তলা ও সামনে বারান্দাওয়ালা করিলে মন্দ হয় না কিন্তু বাঁসের ঘর সাড়ে তিন ফুট উচ্চ করিলেই বেশ হয়। মুর্গী অপেক্ষা ইহাদের ঘরের আয়তন বেশী হওয়া দরকার। পেকুর ঘর ইহাদের অপেক্ষা বড় হওয়া চাই। কিন্তু নির্ম্মল বায়ু সদাই চলাচলের বেশ সুব্যবস্থা থাকা চাই। মোরগ এবং মুর্গী অর্থাৎ নর ও মেদী পক্ষিগুলিকে সর্ব্বদা পৃথক রাখিবে এবং তেজস্কর নরের সহিত তেজস্কর দোষহীন মেদী পক্ষীর সংযোগ করিবে। পেকুর মধ্যে সচরাচর তিন জাতীয় পক্ষী দেখা যায়।

১। কাল নর ফোক্, ইহাদের সব পালক কাল বর্ণের হয় এবং আকৃতিতে ইহারা মাঝারি গঠনের হয়।

২। কেম্বিজ্।

৩। আমেরিকন্ ব্রোন্জ্। ইহারা খুব কষ্ট সহিষ্ণু এবং বৃহত্তম। টাকি বা পেকুর ছানাগুলি বড়ই কোমল এবং সুকুমার এবং সেই জন্য সামান্য শ্যাঁতা লাগিলেই রোগগ্রস্থ হইয়া অকালে প্রাণ হারায়; চারিটী বা পাঁচটী মেদীর সহিত একটি করিয়া নর পক্ষি সংযোগ প্রশস্ত; উত্তম এবং উর্ব্বর অর্থাৎ তেজস্কর ছানা পাইতে হইলে ৪।৫টী মেদী মুর্গীর সহিত একটি একটি করিয়া মর্দ্দা মোরগ সংযোগ করিবে। ব্যবসা

ও বাণিজ্যের জন্য পক্ষী পালন করিতে হইলে তাহাদের লক্ষণ আলোচনা করিতে হয় এবং ক্রমশঃ সকল জাতীর মুর্গীর নিদর্শন পাওয়া যাইবে। সাত সপ্তাহের পর এই জাতীয় নর ও মেদীকে পৃথক করিবে। আমাদের দেশী মুর্গী গুলাই খুব ভাল তা দিতে পারে; কোচীনগণ খুব ভাল ডিমে বসে; বিলাতী জাতীয় ভাল জাতীর উৎপত্তি কোচীন্ হইতে হইয়াছে। ইহারা খুব ভারি এবং পালক যুক্ত বলিয়া আমাদের দেশের বর্ষায় পীড়িত হইবার সম্ভাবনা বেশী এবং ডিমে বসিলে পায়ের দ্বারায় ডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলে; সেই জন্য দেখা যায় যে, দেশীয় মুরগী অপেক্ষা তা দিতে এবং ছানা পালনে কোন জাতীয় মুরগী তত উপযোগী নহে।

অপর বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে ডিম্ব ব্যবসায়ের কথা দুই চারিটা এই খানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ডিম্ব একটি পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী; ইহাতে অমলেট পুডিং, কেক, পেষ্ট, ভাজা, কারি প্রভৃতি অনেক প্রকার মুখরোচক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে পয়সায় ২।৩টা ডিম্ব বিক্রয় হইত এখন ৸০ বা ৸৵০ আনায় কুড়ি দরে মুর্গীর ডিম্ব বিক্রয় হইয়া থাকে। পুরাতন ডিম্ব অপেক্ষা টাটকা ডিম্বের মূল্য বেশী এবং বেশী উপকারী। রন্ধন-শালায় ব্যবহারের জন্য উর্ব্বর অপেক্ষা অনুর্ব্বর ডিম্বই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই কারণে পক্ষিশালা হইতে প্রত্যহ ডিম্ব আহরণ করিয়া তাহার উপর পেন্সিল দিয়া পাড়ার তারিখ লিখিয়া দিলে বসাইবার সময় বিশেষ সাহায্য হয়। ডিম্ব পাড়া হইতে খোদ্দের বা খাতক পর্য্যন্ত পঁহুছনাতক কোনও ডিম্ব ৩ হইতে ৫ দিন সময় অতিক্রম করা উচিত নহে। আমাদের দেশে রেল বা জাহাজে সস্তা শুল্কে ডিম্বাদি খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ বিধি নাই, সে দিকে আমাদের দেশের লোকের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। বসাইবার জন্য আমাদের দেশী মুরগীর মত কেহই তত উপযোগী নহে এবং তাহাদের ডিমও খুব উর্ব্বর। বিলাতীর মধ্যে খাঁটী ফেক্রল, এবং তাহাদের প্রথম সঙ্কর খুবই উপযোগী; খাদ্যের পক্ষে (tabl bird) এবং তাহাদের ডিম্বও খুব উর্ব্বর। দুই বৎসর বয়স্ক মুরগীর ডিমই বসাইবার খুবই উপযোগী; কলে বসান ডিম কদাচ যেন ৪।৫দিনের বাসী না হয় অর্থাৎ যতই টাটকা ডিম হয় ততই ভাল। তা দেওয়া ঘর বা ইন্‌কুবেটার ঘরের তাপ সদাই সমভাবে রক্ষা করা চাই এবং নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু সদাই ঘরে চলাচলের ব্যবস্থা থাকা চাই। কলে বসান ডিমগুলিকে দিনে দুইবার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং সপ্তম ও অষ্টম দিনে প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সপ্তম দিনে পরীক্ষার পর অনুর্ব্বর ডিমগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া দিবে; সেইগুলি বেশ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে মুরগীর কলে সদ্য ফোটা ছানাগুলিকে খুব যত্ন করিতে হয়। ডিম ফোটা ঘর শুষ্ক, বায়ু চলাচলক্ষম, এবং স্পন্দনহীন হওয়া উচিত। সচরাচর ২১ দিনে ছানা ফুটিয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাদের ২২ দিন পর্য্যন্ত কলে রাখিয়া পরে

"ধাইমাতে" স্থানান্তরিত করিবে। আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে ব্রুডার বা ধাইমার তত প্রয়োজন হয় না; শীতকালে ফোটা ছানার জন্য তাহা কথঞ্চিৎ প্রয়োজন হইতে পারে। ব্রুডার সপ্তাহে একবার পরিস্কার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ছানাগুলি ৪ সপ্তাহে দুইবার করিয়া পরিস্কার করিবে। প্রত্যেক কলের জন্য ২টা করিয়া ল্যাম্প বা আলো রাখিবে, কারণ একটী ভরা হইতে থাকিলে বা পরিস্কার করিলে অথবা বাতী কাটিতে হইলে অপরটী অবিচ্ছিন্ন জলিতে পারে। ডিম্বদাত্রী মুরগীর মধ্যে ওয়ান্‌ডোট, লেগ্‌হর্ণ, অর্পিঙ্গটন্, আল্‌কোনা, ব্ল্যাক্ লাব্রেসী, ল্যাঙ্‌শাম্ স্যামন্ ফেক্রল ব্ল্যাক্ মিনর্কা, সিল্‌ভার ক্যাম্পিন্, রেড সাসেক্‌স্, বার্ড প্লিমাউথ রক্ জাতীয়গুলি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

এই পর্য্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে গিনি ফাউল সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে এই বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহারা বড়ই ভ্রমণশীল এবং ডিম যথায় তথায় পড়ে। ইহাদের মাংস খুবই উত্তম এবং মুখরোচক। ইহাদের চরিবার জন্য খুব বেশী জমি (range) থাকা প্রয়োজন, ইহারা বড়ই কীট ভুক্ এবং অপর পক্ষীগণকে ঠোকরাইয়া বিরক্ত করে। ইহাদের ডিম্ব বসাইয়া ১৪ টি ছানা পাইয়াছি। ইহাদের ডিম্ব মুর্গীর পেটের তলে বসাইলে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং আমি ১৫টি ডিম্ব বসাইয়া ১৪টি ছানা ছানা পাইয়াছি। ইহাদের ছানাদের মুর্গীর ছানার ন্যায় পালন করিতে হয় এবং তদ্‌সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব। ইহাদের শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইতে হইলে বেশী পরিমাণ জান্তব ও উদ্ভিদ খাদ্য দিতে হয়। একটী নরের সহিত দুইটী মেদী সংযোগ করাই বিধি; ইহাদের ঘরে দাঁড় করিয়া দিতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশে ইহারা গাছের উপর থাকিয়া রাত্র কাটায়। ইহাদের ডিম্ব যাহাতে নিয়মিত ঘরের ভিতর পাড়ে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কুকুর, বেজী, খটাশ, ভাম, সর্প, বিড়াল, শিয়াল, খ্যাকশালী, বন বিড়াল প্রভৃতি জন্তুগণ ইহাদের বিশেষ শত্রু; ইহাদের হাত হইতে গৃহকর্ত্তা সদাই তাঁহার পক্ষিগণকে রক্ষা করিবেন।

জলচর পক্ষির মধ্যে রাজ হংস, পাতি হংস এবং সোয়ানই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সোয়ান জাতীয় বহুবিধ পাখী আছে কিন্তু মানব জগতে সাদা এবং কাল রংয়ের সোয়ানেরই বেশী আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কাল সোয়ান পক্ষি দেখিতে খুবই সুন্দর এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলই ইহাদের আদিম নিবাস স্থল বলিয়া প্রাণীতত্ত্ববিদগণ উল্লেখ করিয়াছেন। সাদা সোয়ানের পাথায় কুইল পেন প্রস্তুত হয়। পাশ্চাত্য দেশে কলে সোয়ানের ডিম্ব ফোটান হইয়া থাকে। রাজ হংস সোয়ান অপেক্ষা ছোট। রাজ হংস দুই জাতীয় হয়—টুলজ্ এবং এমডেন্। মিঃ লুই রাইট্ তাঁহার পুস্তকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। পাতী হাঁস চারি জাতীয়—১। এল্‌বরি (Aylesbury)। ২। রুয়েন (Rouens) ৩। পেকিং (Pekins)। ৪। ইণ্ডিয়ান রানার্স (Indian Runners)। ইহাদের জন্য ডোবা, তড়াগ,

নদী, বীল বা জলাশয় খুবই প্রয়োজন। একটী নরের সহিত ৪।৫টী মেদী সংযোগ করিলেই বেশ উর্ব্বর ডিম পাওয়া যাইতে পারে পেকিংজাতীয়গুলি চীন দেশ হইতেই প্রথম আমদানী হয় এবং রানার্সগুলি আমাদের দেশী পাতি হাঁস বৈ আর কিছুই নহে। মুরগী এবং হাঁসকে এক সঙ্গে এক ঘরে রাখিবে না। হাঁস ছানাকে প্রথম প্রথম ফোটার অব্যবহিত পরেই মুরগী ছানার মত খাইতে দিতে হয় এবং সেইরূপই পালন করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগকে উদ্ভিদ এবং জাগুব খাদ্য প্রচুর পরিমাণে দিলে ইহারা শীঘ্র বাড়ে এবং মোটা হয়। কাঁকর বা পাথর (Grit or Gravel) ইহাদের ব্যবহারের জন্য সদাই কাছে থাকা দরকার; বসাইবার জন্য যদি হাঁস পালন দরকার হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব বৎসরের তেজস্কর নরের সহিত পর বৎসর জাত হাঁসীর সংযোগ করিবে। ইহাদিগের জন্য চুন, কাঁকর, উদ্ভিদ্ খাদ্য এবং জল আবশ্যক। এই ব্যবসায়ে লাভ এবং সাফল্য লাভ করিতে হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যত্ন, নির্ম্মল জল, সুপাচ্য ও সস্তা খাদ্য সংগ্রহের দিকে ব্যবসায়ীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। এখন খাদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সর্ব্বাগ্রে আমাদের জানা উচিত যে মুরগীর দেহ কি কি উপাদানে গঠিত। ইহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং সামান্য পরিমাণ লৌহ আছে, হাড়ে লাইম ফস্‌ফেট বর্ত্তমান। ইহাদের দাঁত নাই কিন্তু ইহার কাজ খাদ্যথলী (crop), পাথুরি (gizzord) এবং অণ্ডকোষ (ovarium) দ্বারা সমাহিত হয়। খাদ্যে শরীর পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত করে, নষ্ট পেশাদিগের পুনঃ সংস্কার ও রক্ষণ করে, আন্তরিক উষ্মতা উৎপাদন করে এবং ডিম দ্বারা জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। গো খাদ্য সমাধানে আমি এই এই বিষয় বিস্তারিত রূপে মল্লিখিত গোপাল বান্ধব পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। পক্ষি খাদ্যে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি আছে—

১। প্রোটীড্ বা এলবুমিময়েড্ ঘটিত খাদ্যে নাইট্রোজেন্ অক্সিজেন্ হাইড্রো-কার্বন আছে এবং ইহার দ্বারা মাংস, রক্ত, চর্ম্ম, পেশী, হাড় এবং ডিম নির্ম্মানক উপাদান গুলি সংগৃহীত হয়। শতাংশ খাদ্যের মধ্য হইতে ১৩·৫ অংশ এই উপাদান গুলি সংগৃহীত হয়।

২। চর্ব্বি এবং তৈল দেহস্থ কার্বন হইতে উদ্ভুত হইয়া দেহের উত্তাপ এবং চর্ব্বি (দেহের এবং ডিমের) সংজনন করে; ইহা শতাংশ খাদ্য হইতে ৫·২অংশ মাত্র পাওয়া যায়।

৩। খাদ্যস্থ কার্বোহাইড্রেড্ কার্বন্ হাইড্রোজন্ এবং অক্সিজেনে পরিণত হইয়া তাপ সঞ্জাত করিয়া দেহকে রক্ষা করে। ইহা শতকরা ৫।৪৮ পরিমাণ পাওয়া যায়।

৪। ছাই হইতে লবণাক্ত সামগ্রী, ধাতব পদার্থ যেমন গন্ধক, চুণ, এল্‌ক্যালাইন

লবণ এবং ফস্‌ফরাসে পরিণত হইয়া যক্‌ফরাসে এবং চুণে হাড়, ডিমের আবরণ, গন্ধক হইতে পাখা; লবণ হইতে রক্ত এবং পরিপাক শক্তির সহায়তা জনক উপাদান গুলি শতকরা তিন অংশ মাত্র সংগৃহীত হয়।

৫। খোসা (fibre and husk) হইতে কিছুই দেহ রক্ষায় জন্য সংগৃহীত না হইলেও শতকরা নয় অংশ উপাদান ইহা হইতে আহৃত।

৬। জল হইতে ১৩·৫ অংশ মাত্র শতকরা গঠিত হয়।

এখন খাদ্য প্রস্তুতের পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে এই সঙ্কেতটি রাখা দরকার। এই হার বজায় রাখিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে প্রচুর ডিম পাইবার পক্ষে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। আমাদের দেশের মুসলমান ভ্রাতাগণের মনে এক ভুল ধারণা আছে যে মুর্গী পুষিলে আর তাহাদের খাইতে দিতে হয় না, তাহার যদৃচ্ছা চরিয়া নিজের উদর সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া লয়; ইহা সম্পূর্ণ ভুল; শীতকালে এবং সম্বৎসর অবিচ্ছিন্ন ডিম পাইবার বাসনা থাকিলে মুর্গিকে খাইতে দিতে হয়। ইহাদের খাদ্য উদ্ভিদ্ এবং জান্তব হওয়া উচিত। পোকা মাকড় ও উদ্ভিদ্ এবং মাংসযুক্ত খাবার দেওয়া প্রয়োজন। জই, গম, মকা, যব, ভাত, কড়াই, তিসি, মদচোলাই শস্য, আলু সিদ্ধ, শুষ্ক রুটীর টুকরা, লবণ, মৎস্য, ধান ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী গৃহপালিত পক্ষিগণকে খাদ্যরূপে দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবর গাদা এবং ছাই গাদা বাসস্থানের কিঞ্চিৎদূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। পক্ষিগণের নির্ম্মল জলের সহিত মধ্যে মধ্যে সামান্য লবণ এবং গন্ধক চূর্ণ দিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

দুধের বাজার—শিয়ালদহ বৈঠখানা বাজারের নিকট বৈঠকখানা লেনে দুগ্ধের বাজারের জন্য এক একার জমিও লওয়া হইতেছে। দুগ্ধের বাজার মিউনিসিপালিটির ব্যয়েই হইতেছে।

সোডা উপলক্ষে নানা কথা

প্রথম প্রস্তাব—সোডা ও পটাশ।

(শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ হইতে লিখিত।)

লবণ ব্যতীত দাল তরকারী প্রভৃতি বস্তুর ভালরূপ আস্বাদ হয় না। সে জন্য প্রতিদিন আমরা লবণ ব্যবহার করি। কিন্তু লবণ কি? লবণ প্রকৃত কি, একশত বৎসর পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না। ডেভি নামক একজন সাহেব ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নানারূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, লবণ একটী পদার্থ নহে, দুইটী পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুইটী পদার্থের নাম—(১) সোডিয়ম ও (২) ক্লোরিণ। সোডিয়ম এক প্রকার অতি কোমল ধাতু ইহাকে বাহিরে রাখিতে পারা যায় না। তাহা হইলে আপনা আপনি চূর্ণ হইয়া যায়। কেরোসিন তৈলের ভিতর ইহাকে রাখিতে হয়। ক্লোরিণ বায়ুর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ ইহাকেও অতি যত্নে রাখিতে হয়।

সোডা নামক এক প্রকার শুভ্র বর্ণের চূর্ণ এখন রাশি রাশি এদেশে আনীত হইতেছে। এ বস্তুও সোডিয়ম ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। কাচ প্রস্তুত করিতে, সাবান প্রস্তুত করিতে, কাপড় কাচিতে সোডা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ-রূপে ব্যবহারের নিমিত্তও অনেক সোডার প্রয়োজন হয়। যে সোডা এই সমুদয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সোডি কারবনেট বলে। লবণ যেরূপ সোডিয়ম ধাতু ও ক্লোরিণ গ্যাসের সংযোগে উৎপন্ন হয়, সোডিকার্ব্বনেটও সেইরূপ সোডিয়ম ধাতু, কার্ব্বন ও অক্সিজন নামক পদার্থের যোগে উৎপন্ন হয়। যে সাজি-মাটী দিয়া আমাদের দেশের লোক কাপড় কাচিয়া থাকে, তাহা একপ্রকার সোডা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

উদ্ভিদ পোড়াইলে যে ছাই হয়, সেই ছাই প্রধানতঃ হয় সোডা আর না হয় পটাশ ক্ষার। যে ভূমিতে লবণের ভাগ অধিক সেই ভূমিতে উৎপন্ন বৃক্ষের কাষ্ঠে সোডা অধিক থাকে; সুতরাং সে উদ্ভিদ পোড়াইলে যে ভস্ম হয়, তাহা প্রধানতঃ সোডা সমুদ্রকূলের ভূমিতে লবণ অধিক থাকে; সুতরাং সে স্থানের উদ্ভিদের ভস্মে সোডা; অধিক পরিমাণে থাকে। সমুদ্র হইতে দূরদেশে যে গাছ পালা হয়, তাহার ভস্মে পটাশ অধিক পরিমাণে থাকে। তেঁতুল কাষ্ঠ ও কলার বাসনার ভস্ম পটাশ ক্ষার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে উদ্ভিদে সোডা আছে, সেই উদ্ভিদ পোড়াইয়া আমাদের দেশে কোন কোন স্থানের লোকে সাজি মাটি প্রস্তুত করে। স্পেন দেশে এইরূপ উদ্ভিদ পোড়াইয়া সে কালে লোকে লক্ষ লক্ষ টাকার সোডা প্রস্তুত করিত। স্পেন দেশের লোক সেই সোডা নানা দেশে প্রেরণ করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিত।

রুষ ও কানাডা দেশে এখনও লোকে বন পোড়াইয়া পটাশ ক্ষার প্রস্তুত করে। সেই দেশ হইতে বিলাত প্রভৃতি নানাদেশে পটাশ ক্ষার আমদানি হয়।

পল্লীগ্রামে বন

আমাদের গ্রামসমূহ বনে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সে জন্য সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া ভূমির দোষ দূরীভূত হইতে পারে না। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ইহা একটী প্রধান কারণ; পূর্ব্বে লোকে এই বন কাটিয়া রন্ধনাদি করিত। খেজুর রস জ্বাল দিয়া গুড় করিবার নিমিত্ত শিউলিগণও বন কাটিয়া অনেক ভূমি পরিষ্কার করিত। এখন কোক কয়লা সুলভ হইয়াছে; সুতরাং রন্ধন করিবার নিমিত্ত এখন আর বড় লোকে বন কাটিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করে না। তাহার পর চারি দিকে পাটের কল হইয়া তাড়ি-ভক্ত লোকে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালি জাতি নির্ম্মূল হইয়া দেশের উপর ক্রমে এই সকল লোকের প্রভুত্ব হইতেছে। নানা-মটখটি ভোগ করিয়া খেজুর রস জ্বাল দিয়া গুড় করা অপেক্ষা এই সকল স্থানে তাড়ি প্রস্তুত করা কাজ এখন অধিক লাভ-জনক হইয়াছে; সুতরাং রস জ্বাল দিবার নিমিত্ত এখন আর বড় লোকে বন পরিষ্কার করে না। দূষিত ভূমির উপর বন পচিয়া ম্যালেরিয়া বিষে বায়ু পূর্ণ হইতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্রমে ক্রমে লোক জীর্ণ শীর্ণ হইয়া নির্ব্বংশ হইতেছে। পুত্র-সন্তানের সংখ্যা হ্রাস হইয়া কন্যা-সন্তানের সংখ্যা ঘরে ঘরে বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিত্যক্ত বাসভূমি জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া শৃগালের আবাস ভূমি হইতেছে।

আমার বিফল পরীক্ষা

এই বন কমাইবার উপায় কি নাই? ভূমি অতীব উর্ব্বরা যে একবার পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া রাখিলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় বনে পূর্ণ হইয়া যায়। এই বনের অধিকাংশ বড় বড় বৃক্ষের নিম্নে জন্মিয়া থাকে। গ্রামসমূহের মধ্যবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী ভূমিসমূহ লোকে আম কাঁটাল নারিকেল ও বাঁশ বাগানে পূর্ণ করিয়াছে। এই আম কাঁটাল, নারিকেল ও বাঁশ গাছের নিম্নে ভাট, শেওড়া বন্য ওল, প্রভৃতি নানাপ্রকার ছোট ছোট উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া ভূমি একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে। উপরে বড় বড় গাছের শাখা, নিম্নে ছোট ছোট উদ্ভিদ, এরূপ ভূমিতে সূর্য্য-কিরণ কখন প্রবেশ করিতে পারে না। এরূপ ভূমি মানব জীবনের প্রতিকূল নানারূপ বিষময় পদার্থে সর্ব্বদাই পূর্ণ হইয়া থাকে।

ভাট, শেওড়া, কাক-জঙ্ঘা, ওল, ঘেটকুল প্রভৃতি বন্য উদ্ভিদ মানুষের কোন কাজে লাগে না। তবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদের ভস্মে পটাশ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। আমি ভাবিলাম যে, বিদেশ হইতে এদেশে পটাশ আনীত হইতেছে। সেই পটাশ আমরা ক্রয় করিতেছি। তাহাতে আমাদের অর্থ বিদেশীদিগের হস্তে গিয়া পড়িতেছে। জঙ্গল কেবল ভূমি আচ্ছাদন করিয়া থাকে নহে, জলও জলজ

উদ্ভিদে পূর্ণ হইতেছে। এক প্রকার বিলাতী পানা দেখা দিয়াছে তাহা খাল, বিল, নদী নালা পূর্ণ করিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহা পুড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায় তাহাতে পটাসের মাত্রা প্রচুর আছে। পটাস আমাদের যে বহু পরিমাণেই চাই কিন্তু পটাস প্রাপ্তির জন্য তাদৃশ চেষ্টা নাই। এই সমুদয় জঙ্গল ও জলজ উদ্ভিদ পোড়াইয়া প্রচুর পরিমাণে পটাশ প্রস্তুত করিতে পারা যায় কি না? আর সেই পটাশ বেচিয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে কি না? যদি করিতে পারে, তাহা হইলে ভূমি পরিস্কৃত হইবে ও লোকের অর্থ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া আমি পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। আমার চেষ্টা কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হইল না। জলজ বড়পানা হইতে পটাস প্রাপ্তি ও লাভ হইতে পারে কিন্তু আমি দেখিলাম যে, এই সমুদয় বন্য গাছে অধিক পরিমাণে পটাশ নাই। যে সমুদয় বস্তু তাপে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ পদার্থসমূহ দ্বারা এই সমুদয় উদ্ভিদের দেহ গঠিত; সুতরাং বিফল মনোরথ হইয়া আমাকে এ পরীক্ষা ছাড়িয়া দিতে হইল তাহার পর ভাবিলাম যে, এই সমুদয় অকর্ম্মণ্য বন্য উদ্ভিদের পরিবর্ত্তে বৃক্ষ ছায়ায় কোনরূপ কাজের উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে পারা যায় কি না? অর্থাৎ এমন কোনরূপ উদ্ভিদ আছে কি, যাহাদের চাষ এই সকল বন্য উদ্ভিদের পরিবর্ত্তে করিলে লোকে অর্থলাভ করিতে পারে। অর্থলাভ হইলে লোকে বন্য উদ্ভিদ কাটিয়া এই সকল উদ্ভিদের চাষ করিবে। তাহাতে ভূমি অনেক পরিমাণে পরিস্কৃত হইবে ও লোক অর্থবান হইবে। বৃক্ষ ছায়ায় কাজের উদ্ভিদ বড় অধিক জন্মে না, সে ফসলও ভালরূপও হয় না। বন্য কটু-ওলের পরিবর্ত্তে মিষ্ট ওল, আদা ও হরিদ্রা এই তিনটী উদ্ভিদ এক প্রকার জন্মিতে পারে। এই কয়টী দ্রব্য লইয়া আমি পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। ফসল উৎপন্ন হইল। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে চাষ অপেক্ষা পাটের কলে কাজ করিয়া লোক অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে—এমন কি ধান পাট প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের চাষও ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে তুলনায় বৃক্ষছায়ায় ওল, আদা ও হরিদ্রার চাষে লাভ অতি সামান্য; সুতরাং আমার এ চেষ্টাও বিফল হইল। এইরূপ ভূমিতে কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী কোন দ্রব্যের চাষ হইতে পারে কি না, এখন সেই কথা ভাবিতেছি।

Orgauised work (দলবদ্ধ পরিশ্রম)

আমার শত শত চেষ্টা আপাতত বিফল হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ এইরূপ চিন্তা হইতে পরিণামে যে কত উপকার হয়, তাহার সীমা নাই। কিন্তু যে দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্প লোকেই এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকদিগের দোষ নাই। কি চিন্তা করিব, তাহাই তাঁহারা জানেন না! এই সমুদয় বিষয় লইয়া আমি আমার প্রায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। অনেক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া এখন বুঝিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে দলবদ্ধ

হইয়া পরিশ্রম না করিলে কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র এই সমুদয় কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ। সে জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভা লইয়া সামান্য একটী দল প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলাম। আর যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান সভায় আপন আপন নাম পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। অনেকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে বিজ্ঞান সভায় যাইয়া কাগজপত্র দেখিতে হয় এবং সভায় নিয়মাবলি জানিয়া তাহাতে যোগ দিতে হয়।

কিন্তু আমার কাজ কিছু অন্যরূপ। আমার কাজ এইরূপ—প্রথম নানারূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রে লোককে অল্পাধিক শিক্ষা প্রদান করা। দ্বিতীয় সেই জ্ঞান কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা। অর্থাৎ সেই জ্ঞানের সহায়তায় তিনটী বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করা। সেই তিনটী বিষয় এই—(১) দূরে সামান্য সামান্য পল্লীগ্রামে বসিয়া অল্প আয়াসে ও অল্প ব্যয়ে যাহাতে লোকে ভূ-তত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, রসায়ন, তাড়িত বিদ্যা প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ করিতে পায়ে, সেই চেষ্টা করা। (২) সেই জ্ঞানের সহায়তায় যাহাতে লোক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, সেই চেষ্টা করা। (৩) সেই জ্ঞানের সহায়তায় লোক যাহাতে রোগের কারণসমূহকে পরাজয় করিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে কালযাপন করিতে পারে, সেই চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য যে, এরূপ কাজ একজন মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া যে উপকার হয় নাই, তাহা নহে—বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। এই সম্বন্ধে লোকের মনে এখন চিন্তার উদয় হইয়াছে ও নানা বিষয় সম্বন্ধে লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে; কিন্তু এখন আমি বুঝিতেছি যে, দলবদ্ধ হইয়া পরিশ্রম না করিলে, কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, প্রবর্ত্তক চক্ষু বুজিলে এ কাজ আপাততঃ একেবারে লোপ পাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু কোন বিষয়ে দল বাঁধিতে আমি একেবারেই ভাল বাসি না। তাহা ব্যতীত দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কট করিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, কোনরূপ স্বার্থের নিমিত্ত ইনি এই কাজ করিতেছেন। ঘরের খাইয়া, বনের মহিষ তাড়াইয়া কে অপযশের ভাগী হইতে ইচ্ছা করে? কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এ কাজের নিমিত্ত চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের অবস্থা দিন দিন কি হইতেছে ও পরিণামে আরও কি হইবে, তাহা অনেকেই জানেন না। কিন্তু আমি তাহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে পারি না। যাহা হউক, যে বিষয় লইয়া আমি আলোচনা করিতেছি, সেই বিষয়ে অনেক লোককে ব্রতী করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। যাহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম আমি পরে জিজ্ঞাসা করিব। তবে এখন যদি

কেহ আপনার নাম ও ঠিকানা আমার উদ্দেশ্যে কৃষক অফিসে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন,তাহা হইলে সে বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইবেন, তাঁহাদের (১) ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক; (২) পরকালে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক (৩) সর্ব্বদা সত্য কথা বলা ও সত্যভাবে কাজ করা আবশ্যক; (৪) সম্পূর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক; (৫) হিংসা অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা মন হইতে একেবারে দূর করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক; (৬) জগতের হিতে বিশেষতঃ ভারতের হিতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের হিতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক; (৭) আমাদের নিকট হইতে যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিবেন, সেই জ্ঞানের যাহাতে চারিদিকে প্রচার হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। মোটামুটি এই করটি নিয়মের কথা এখন বলিলাম। কিন্তু এই কার্য্যে তিন শ্রেণী আছে,—সাধারণ শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী ও উচ্চ-শ্রেণী। যাহা হউক, দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত, বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের হিতের নিমিত্ত সাধারণ শ্রেণী বিষয়ে যে সমুদয় নিয়ম আবশ্যক, তাহার উল্লেখ করিলাম। কারণ নাস্তিক, মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর লোকের সহিত একসঙ্গে কাজ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না।

ফরাসী বিপ্লব

লবণের ন্যায় যে উজ্জ্বল ও শুভ্র সোডা এ দেশে আমদানী হয়, সে সোডা গাছ পোড়াইয়া এখন আর লোকে প্রস্তুত করে না। গাছ পোড়াইয়া যখন এ দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তখন ইহার মূল্য অনেক অধিক ছিল; সুতরাং সোডা হইতে প্রস্তুত কাচ ও সাবানের মূল্যও অনেক অধিক ছিল। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ফরাসী দেশের ভূস্বামীগণ সাধারণ লোকদিগকে এক প্রকার ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। বহুকাল তাঁহাদের অত্যাচার সহ্য করিয়া অবশেষে এই সাধারণ লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ভূস্বামী দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে এই সাধারণ লোকেরা আপনাদের রাজা ও রাণীকে হত্যা করিল। স্পেন, প্রশিয়া, অষ্ট্রীয়া রুষ, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজগণ ফরাসী জাতির সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ফরাসী দেশের আড়াই কোটি অধিবাসীগণ একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। আড়াই কোটি উন্মত্ত লোকের সহিত যুদ্ধে কে জয়লাভ করিতে পারে? সমুদয় পৃথিবী একদিকে, আর সামান্য ফরাসী জাতি এক দিকে, তথাপি কেহই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। তাহার পর মহাবীর নেপোলিয়নের আবির্ভাব হইল। তিনি ফরাসী দেশের সম্রাট হইলেন। তাঁহার সহিতও অন্যান্য জাতির বহু দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। অবশেষে ইংরেজ হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। সেই পরাজয়ে ফরাসী জাতির গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

ফরাসী জাতীর সহিত যখন অন্যান্য জাতির যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ইংরেজের রণতরী

ফরাসীদিগের রণতরী সমূহকে পরাজয় করিল। ফরাসীদিগের রণতরী কতক জলমগ্ন হইল, কতক ইংরেজের হস্তগত হইল। তাহার পর ইংরেজের রণতরীসমূহ ঘোর দর্পে পঞ্চ মহা সমুদ্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেশ মহাদেশ অধিকার করিতে লাগিল। মহাসমুদ্র পারে যাবতীয় ফরাসী অধিকৃত দেশ ইংরেজের হস্তে পতিত হইল। ভারত অপেক্ষা বৃহৎ কানাডা দেশ এই সময় ইংরেজ ফরাসীদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

সমুদ্র পারস্থিত ফরাসী অধিকৃত দেশসমূহ কেবল যে ইংরেজের হস্তে পতিত হইল, তাহা নহে। ইংরেজের রণতরীসমূহ ফরাসী সমুদ্রকূলে বিচরণ করিয়া ফরাসীদিগের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। সামান্য একখানি ফরাসী জেলে-ডিঙ্গিও মাছ ধরিবার নিমিত্ত সমুদ্রকূল হইতে যে একটু বাহিরে যাইবে, সে পথ পর্য্যন্তও রহিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল, সে জন্য ফরাসী দেশে নানারূপ বিভীষিকা ঘটিতে লাগিল। বিশেষতঃ যে সমুদয় দ্রব্য পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আনীত হইত, এখন সেই সমুদয় দ্রব্যের অভাবে লোকের বড়ই কষ্ট হইল। তাহা ব্যতীত, রণসজ্জার নিমিত্ত যে সমুদয় দ্রব্যের আবশ্যক, তাহার অভাবে ফরাসী জাতি একেবারে অন্ধকার দেখিল। এই ধর—জুতা প্রস্তুতের নিমিত্ত কষ-করা অনেক চামড়া বিদেশ হইতে ফরাসী দেশে আমদানী হইত। ইংরেজ সে আমদানী বন্ধ করিয়া দিলেন। জুতা অভাবে ফরাসীদিগের ঘোরতর ক্লেশ হইতে লাগিল। রণস্থলে সেণাগণ ঘাসের জুতা পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এখন উপায়? ফরাসী বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ভাবিতে বসিলেন। ভাবিয়া রাসায়নিক বিদ্যাবলে অতি সহজে চামড়া প্রস্তুতের উপায় তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন। সমুদয় পৃথিবী শত্রু। সমুদয় পৃথিবীর সহিত ফরাসী আজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইস্পাতের আবশ্যক। এত দিন বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করিয়া তাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিত। কিন্তু দুরন্ত ইংরেজ এখন বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ! এখন উপায় কি? বিনা ইস্পাতে অস্ত্র প্রস্তুত হয় না, বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিতে পারা যায় না! বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ভাবিতে বসিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিজ্ঞানবলে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বে ফরাসী জাতি লৌহ করিতে জানিত, ইস্পাত করিতে জানিত না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের বুদ্ধিবলে এখন তাঁহারা ইস্পাত প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিল। ইস্পাত ক্রয় করিবার নিমিত্ত বিদেশীয়দিগকে এতদিন যে টাকা তাঁহারা দিত, এখন হইতে সে টাকা আর দিতে হইবে না। তাহা ব্যতীত যুদ্ধসজ্জার নিমিত্ত ইস্পাতের অভাব তাহাদের হইবে না। তা বটে! কিন্তু সোরার কি হয়? বঙ্গদেশে সোরা প্রস্তুত হয়। সে বঙ্গদেশ ইংরেজের হাতে। ইংরেজ ফরাসীকে এখন সোরা বিক্রয় করিবে না। সোরা না হইলে বারুদ হয় না। হে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ! এখন সোরার জন্য উপায় কি? বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ

ভাবিতে বসিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজধানী পারিস নগরে গৃহস্থের বাড়ীতে মাটীর নিম্নে প্রোথিত গুদাম ঘরের প্রাচীর ও মেজেতে সামান্য ভাবে সোরা আছে। বটে! তবে হে পারিসের অধিবাসীগণ! কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও গুদাম ঘরের প্রাচীর চাঁচিয়া ও মেজে খুড়িয়া সোরা সম্বলিত মৃত্তিকা সংগ্রহ কর। ঘাগরা গুটাইয়া, পাগলিনীপ্রায় হইয়া বীর ললনাগণ প্রাচীর ও মেজে চাঁচিতে লাগিল, টুপি খুলিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া, ঝুড়ি করিয়া বীরগণ সেই সোরা সম্বলিত মাটি পথে জমা করিতে লাগিল। প্রতি বাড়ীর সম্মুখে এইরূপ রাশি রাশি মৃত্তিকা স্তূপাকার হইয়া রহিল। সরকারী গাড়ি আসিয়া সেই মাটি কারখানায় লইয়া গেল। সেই স্থানে সেই মাটি ধুইয়া তাহারা সোরা বাহির করিল। সেই সোর দিয়া বারুদ হইল। আর পায় কে? বন্দুক ঘাড়ে চৌদ্দলক্ষ ফরাসী যুবক স্পেন, সারডিনিয়া, প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতির শত্রুগণের বিপক্ষে ধাবিত হইল। চৌদ্দ লক্ষ ক্ষিপ্ত মানুষের সহিত যুদ্ধে কে আঁটিয়া উঠিতে পারে। স্পেন, প্রুসিয়া প্রভৃতি পরাস্ত মানিয়া বিরসবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তা হইল বটে; কিন্তু এখন চিনির কি হইবে? ফরাসী দেশে চিনি হয় না। ফরাসিয়া চিনির সন্ধান না পাইলেও জার্ম্মানি পাইয়াছে। তাহারা আলকাতরা পরিশ্রুত করিয়া যে চিনি প্রস্তুত করিতেছে, তাহার নাম শর্করীণ বা Saccharine ইহাকে জার্ম্মাণ sweetও বলে। ইহার জন্য ইক্ষু বা খর্জ্জুর বীট মূলের রসের প্রয়োজন হয় না।

বাঙ্গালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিসে হইবে?

গোসম্পদে বঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ প্রাণহীণ হইয়া পড়িয়াছে।
গোসম্পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালায় মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইবে।

(প্রচারক—শ্রীশচ্চীদানন্দ গীতারত্ন গোতীর্থ লিখিত।)

"যাবদীয় জীব জাতীর মধ্যে নরজাতির তুল্য জ্ঞানবান জাতি আমি সৃষ্টি করি নাই ইহা আমার প্রথম শক্তি।২য় শক্তি—নরজাতীর রক্ষার জন্য গাভীর মধ্যে ক্ষীরধারারূপে আমার অমিয় সত্বা স্থাপন করিয়াছি এই মিষ্টরসেই আমার সৃষ্টি স্থিতি; গো গণকে আমার সদৃশ জ্ঞান করিয়া যাঁহারা পালন করেন তাঁহারা বহু জ্ঞানীমধ্যে গণ্য। অহিংসা, ন্যায়, রতি শুদ্ধ, শুচি, আদি এবং পরোপকারগুণে গো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি মধ্যে কোন প্রাণী নাই, "ইহা আমার সদৃশ"—জ্ঞানীগণকে তাহা জানিবার শক্তি দিয়াছি। গো ও জ্ঞানবান্ মনুষ্যগণকে পূজা করিলেই, আমার পূজা সিদ্ধ হয়।" ঈশ্বর বাক্য।

মাতৃস্তন্য পানের পূর্ব্বেই "সূত্রময়ী দশা" সলিতার দ্বারা দুগ্ধ পান—এই জীবন যাত্রার আরম্ভ, আর শেষ অন্তিম সময়ে বিন্দু বিন্দু গাভী দুগ্ধ দিয়াই জীবন যাত্রার অবসান। এহেন গোমাতার জন্য কি বাংলার কাহারও প্রাণ কাঁদিবেনা?

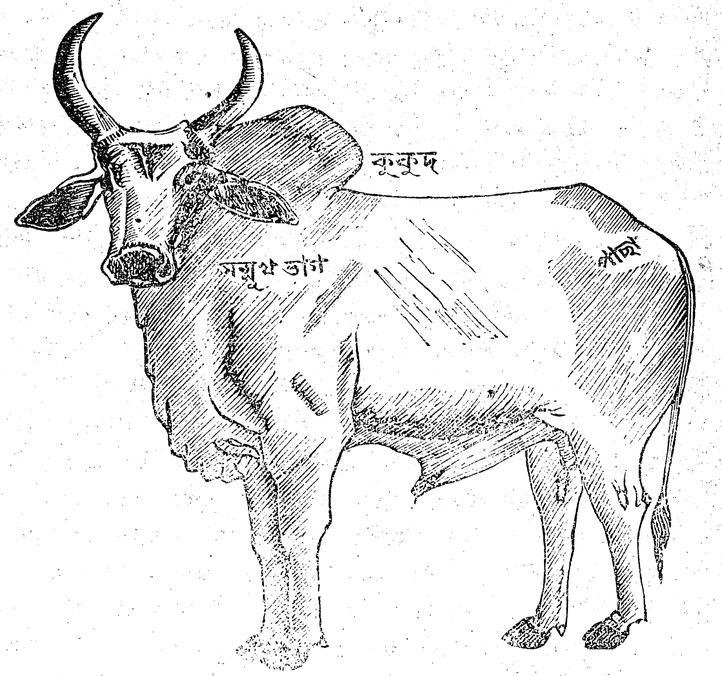

আদর্শ ষণ্ড

All India Cow Conference এর মহোৎসাহী মহোদয়গণ বিশ্বব্যাপী গোজাতীর উন্নতীর জন্য যেরূপ শ্রম ও উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন তজ্জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি অশেষবিধ ঋণে ঋণী। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালার গোজাতীর উন্নতীর জন্য কি উপায় করিতেছি?

আইন আকবরী পাঠে জানা যায়—এক আনায় একসের ঘৃত ও একপয়সায় একসের দুগ্ধ পাওয়া যাইত। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে দুই পয়সায় একসের খাঁটি দুগ্ধ একটাকায় আটসের ছানা পাওয়া যাইত। এখন বাঙ্গালা পয়স্বিণী শূন্য।

ইহার একমাত্র কারণ, "গোজাতির আন্তর্গণিক জনন"। যথা, ভাই ভগিণী মাতা পুত্র, পিতা কন্যায়, জননের নামই—আন্তর্গণিক জনন। এই অবনতি পঞ্চাশ পুরুষে প্রকাশ পায়। একবার প্রকাশ পাইলে আর অন্য বীজ সেক্তার জনন ভিন্ন

উন্নতির অন্য উপায় নাই। ইহা বৈজ্ঞানিক ধ্রুব সত্য কদাপি অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।

গোপালনে আমাদের ঔদাসিন্য দোষে যেরূপ গোজাতীর অবনতি হইয়াছে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার গাভীগণের যেরূপ দুগ্ধ দানের শক্তি ছিল আন্ত্যর্গণিক জননের দোষ সংশোধন না হইলে ক্রমশঃ আরও পঞ্চাশ পুরুষে গাভীগণের দুগ্ধবাহী শিরা সকল শুষ্ক হইয়া ক্ষীণ ও হীনদশার চরমে উপস্থিত হইবে। আন্ত্যর্গণিক জননের ও অকাল পরিপক্কতাদি মহৎদোষের কথা জ্ঞানী ও রাজ পুরুষগণ দেশকে তূর্য্যধ্বনি দ্বারা উদ্বেলিত করিয়া ঢেড়া দিয়া কেন যে প্রচার করেন না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।* ম্যালেরীয়াদি পীড়া সকলের জন্য আমাদের রাজা যতই ঔষধ ব্যবস্থা করুন না কেন? "নতু পথ্য বিহিনাণাম্ ভেষজানাম্ শতৈরপি"। ক্ষীরসার খাদ্যের অভাবে স্নায়বিক শুষ্কতা ও ম্যালেরীয়াদি পীড়া, (ভেজাল তৈল ঘৃতাদি দূর করিয়া) পবিত্র ঘৃত দুগ্ধাদি সুলভ মুল্যে প্রাপ্তির উপায় হইলে রাজশক্তির শত শত ধন্যবাদ কীর্ত্তন করিয়া মৃতপ্রায় প্রজাগণ পুনঃর্জীবিত হইবে। এক্ষণে আমাদের শোচণীয় অবস্থায় বারয়ারী আদিতে অর্থ নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্ব হইতে বারোয়ারীর অর্থ সকলে গোপালন Diary স্থাপন হইলে এতদিন দেশ গো রসে পূর্ণ হইত। বাঙ্গালা দেশে গোজাতির অধিক অবনতি হইয়াছে।

এক্ষণে সুবর্ণ সুযোগ বাঙ্গালা দেশের বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের অনুকম্পায় আমাদের সাধু গভর্ণমেণ্টের ভাণ্ডার হইতে বাঙ্গালাদেশের গোজাতির উন্নতির জন্য শত শত সৎ সাহায্য পাইতে পারিব।

আমাদের কর্ত্তব্য বর্ষে বর্ষে বারয়ারীতে গোগণের শ্রমজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের ঈশ্বর বৃত্তির টাকা আমরা ক্ষণিক আমোদের জন্য ব্যয় করি। গত কয়েক বর্ষে মেমারীআদি ষ্টেসনে যে সকল টাকা বারয়ারীতে ব্যয় হইয়া গেল এই টাকায় প্রাচীন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার, "গোপালন" (diary) ও দুগ্ধের ভাণ্ডার স্থাপন করিলে আমাদের স্থায়ী উপকার ও কতশত পুণ্য লাভ হইত। অযত্ন পালনে আমরা গোগণের এত হীন অবস্থা করিয়াছি। কিন্তু আশা করা যায় যে বৈজ্ঞানিক জননে শিঘ্র উন্নতি হইবে। সরকারী রেশমের শঙ্কর জনন দেখুন।

বাঙ্গালার গোজাতির এই চরম অবনতির সময়ে এক্ষণ শঙ্করী করণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। শঙ্কর জননের জন্য বাঙ্গালায় এখনও যে সকল প্রথম শ্রেণীর গাভী বঙ্গদেশে আছে তাহার সহিত যদি বিলাতী রক্তের প্রবাহ আনিতে চাহেন, পাট্‌না টেলর্ ব্রীডের ষণ্ড সংযোগ করুণ ইহাতে প্রথম শ্রেণীর উৎপাদন হইবে, বৎস্যগণ পিতৃসদৃশ বন্যভাবাপন্ন বলিষ্ঠ আয়তনেত্র ও দীর্ঘকায় হইবে এবং গাভীরও দুগ্ধ অধিক হইবে। ইহা বলিষ্ঠ ষণ্ড সংযোগের দৃষ্ট ফল। বোলপুরের মিক্‌সাহেব শঙ্কর জননের উত্তম ফল দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে এখনও স্থানে স্থানে দোআঁস্‌লা উৎপন্ন দুই চারিটি গো দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, কোনরূপে শঙ্কর জননেরই উন্নতি

পাইয়াছে। অনেক বাঙ্গালি বাবুরা পশ্চিমে থাকার জন্য স্নেহবশতঃ বাটির পালিত গাভী লইয়া যাওয়ায় পশ্চিমের বলিষ্ঠ ষণ্ডের সংযোগে দ্বিগুণ উন্নত বৎস ও দুগ্ধ অধিক হইয়াছে। ইহাও জ্ঞানের বিষয়।

বাঙ্গালা বারোবৎসরের মধ্যে গো-ধনে পূর্ণ করিতে চাহেন ত কয়েক শত ষণ্ড একবার মাত্র আনিলে ইহা হইতে লক্ষ লক্ষ ষণ্ড উৎপন্ন হইবে। কলিকাতার চিৎপুরে যে সকল পশ্চিম হইতে দুগ্ধ দানের জন্য গাভী আনা হয় তাহা দুগ্ধ অন্তে স্বল্প মূল্যে হত্যার জন্য চর্ম্ম জীবীগণকে দেওয়া হয়, এই স্বল্প মূল্যে অমৃত (দুগ্ধ) মহল (গাভী) ক্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোশালার কাঁচড়াপাড়া ও গো পালনের লিলুয়াষ্টেশনে যে স্থান প্রস্তুত রহিয়াছে এইস্থানে পয়স্বীণিগণকে রাখিয়া দিলে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে এবং ভবিষ্যতে তাহারা কাজে লাগিবে। বাঙ্গালার শত শত লোক দুগ্ধের চাষে লাগিয়া গেলে ও সমবেত চেষ্টায় এই কার্য্য হইলে দেশে অমৃত বর্ষণ হইবে।

গোকুল, গোবর্দ্ধন আদি ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানের গাভী সকল কলিকাতায় দুগ্ধ দানের জন্য আনিয়া চিৎপুর হইতে পাইকারগণ সর্ব্বত্র বিলিকরে; এই পয়স্বিণীগনের ফুকাদেওয়া অনেক চেষ্টায় কম হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের দুগ্ধ অন্তে আর কেহ রক্ষা করেনা—চর্ম্মজন্য ইহাদিগকে জীবন দিতে হয়। ঈশ্বরের অভিপ্রায় দুগ্ধ দানের জন্য গাভীর সৃষ্টি। অভিপ্রায় নষ্ট করিও না। বংশ বৃদ্ধির জন্য সুন্দরবনে হরিণী রক্ষার আইন আছে। যদ্যপি কেহ মাদা হরিণ মারে তাহাকে ৫০৲টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। এক্ষণে ন্যায় বিচার করিতে হইলে একটি গাভী বার বৎসরে ষোল শত মণ দুগ্ধ ও তাহার লক্ষণে কত বৎস্য দেয়; এই "অমৃত মহল" গাভীগণকে চারি হাত চর্ম্মের জন্য হত্যা করাতে যদ্যপি হরিণীর তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড ব্যবস্থা বিধান হয় তাহা হইলে এক দিনে গাভী হত্যা বন্ধ হয়।

কলিকাতায় অভিশপ্ত দুগ্ধ পান হইতে রক্ষার উপায় রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদ্যপি গাভী আনিবার সময় কিঞ্চিত মাত্র ভাড়া লইয়া ও পয়স্বিণীগণের পুনর্গমনের "প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা রাখেন",* আমাদের সাধু গভরর্ণমেণ্ট যদ্যপি কলিকাতার, ও বাঙ্গালার শত শত স্থানে গোপালন (Diary) স্থাপনের—অন্ততঃ পাটনার টেলার ব্রীড আদির ষণ্ড আনাইয়া গো রক্ষার জন্য উৎসাহ দেন এবং পর্ব্বতে সরকারী গোচারণ ও মহুয়ার চাষাদির ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে যথার্থ রাজশক্তির অভ্রান্ত ব্যবহার করা হয়। ইহা যুক্তি যুক্ত কথা—গোপালনে রাজশক্তি ও আমাদের কর্ত্তব্য গোপবেদ গ্রন্থে দেখুন।

চারিহাত চর্ম্মের জন্য প্রকৃতি মাতার গঠিত এহেন দুগ্ধ ভাণ্ডার নষ্ট করিতে অজ্ঞানগণকে নিরস্ত করা, আমাদিগের ন্যায়বান রাজশক্তির নীরব হইয়া থাকা কর্ত্তব্য কি? স্বাভাবিক উপায়ে শান্তি (মৃত্যু) চর্ম্মলাভ হইতে পারে কিন্তু চর্ম্মের জন্য গো বধ গর্হিত, চর্ম্মব্যবসায়ীগণের উত্তেজনায় তাহাও হইয়া থাকে। ইহার জন্য কঠিন

দণ্ড ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। গাভীগণের অবাধ হত্যায় দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। গাভীগণকে বাঁচিতে দাও, উত্তম ষণ্ড রক্ষা কর, গাভীগণের দুগ্ধ দায়িকা শক্তির সার্থকতা লাভ করিতে দাও। কোটি কোটি গোচর্ম্ম ভারত হইতে কেবলই লইয়া যাইতেছে, গোগণের এতাবৎ নিধনে এখন যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বর্দ্ধনের উপায় না করিলে ইহার পর কেবল ছবিতে গাভী ও টীনের ডিবায় দুগ্ধ পরিচয় থাকিবে।

দুগ্ধ ভাণ্ডার স্থাপন ও তাহার হিসাব

অনেকে বলেন ছোট ছোট গো-পালন প্রত্যেক ষ্টেসনে স্থাপন করিলে আয় হইবে—আমাদের মত ও তাহাই। বারোটি পশ্চিমের পয়স্বিণী ছয়সের হিসাবে দুগ্ধদিলে দুগ্ধেরমূল্য বারটাকা পাওয়া যায়, খোরাকী ছয়টাকা লাগে। "গাভীকে যাহা খাওয়ান হয় তাহার দ্বিগুণ মূল্যের দুগ্ধ পাওয়া যায়"। ১২টি গাভীর সংযোগের জন্য অন্ততঃ ১টী ষণ্ড পালন আবশ্যক। ঐ ষণ্ডের দ্বারা আরও অধিক ষণ্ড সংযোগ সম্ভব কিন্তু ষণ্ডকে যত জীরেন দেওয়া যায় ততই ভাল। ষণ্ডের খোরাক গাভী অপেক্ষা তেজস্কর ও বীর্য্য বর্দ্ধক হইবে। একটী ষণ্ডের জন্য প্রত্যহ অন্ততঃ ১৲ টাকা খরচ পড়ে। ১২টি গাভী ঐ ষণ্ডের দ্বারা বৎসরে অন্ততঃ ১২টি সবল, সুস্থ কায় সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। সুলক্ষণাক্রান্ত গোবৎসের মূল্য অনেক।

আমাদের দেশে অনেকে ভাল গাভীগণকে দুগ্ধদায়ী করিবার জন্য ও ভাল সন্তান উৎপাদন জন্য কুকের আড়াগড়ায় পাঠান। ষণ্ড সংযোগের জন্য ১৬৲ টাকা ফি দিতে হয়। যাদের ইচ্ছা আছে, টাকা আছে তাঁহাদের ইহা সহজ সাধ্য। সাধারণের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা আবশ্যক।

বিলাতে একটি ষণ্ড লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়া তাহা হইতে কত লক্ষ টাকার সুষ্ঠু সুন্দর সাবক উৎপন্ন করিয়া লওয়া হয়। যাজ্ঞবল্ক বৃষলক্ষণে বলিয়াছেন লক্ষণ যুক্ত বৃষ গোস্বামীকে লক্ষপতি করে ইহার অর্থ বৃষ লক্ষ টাকা নগদ আনিয়া না দিলে ও তাহার লক্ষণে যে সকল বংশ বৃদ্ধি হয় তাহার মূল্য লক্ষ হইতেও লক্ষ। ইংরাজী ককাটুল্ শব্দ হইতেই "ক্যেপিটেল" ধনবাচক শব্দ হইয়াছে। তাই আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন "ধনঞ্চ গোধনং ধান্যম্। স্বর্ণাদয়ো বৃথৈবহি ॥" এক্ষণে প্রচারক চাই। লিখিত নিয়মে কার্য্য করিলে অচিরে বাঙ্গালা গো-ধনে পূর্ণ হইবে।

ঈশ্বর বিত্তির টাকা সমস্তই ন্যায় ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে ব্যয় হয় ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা চলে না। আমরা জানি বারোয়ারি উপলক্ষে ঈশ্বরপূজা, কাঙ্গালি ভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্রাদি দান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় প্রভৃতি অনেক সদনুষ্ঠান হইয়া থাকে। নাচ, গান তামাসা আনুসঙ্গিক ব্যাপার। যাত্রা, কথকাদি ও সঙ্গিতে অনেক শিক্ষার বিষয় থাকে এবং তাহাতে লোক শিক্ষা যথেষ্ট হয়। আমোদ আহ্লাদও সমাজের চিরন্তন অঙ্গ। নিরবদ্দিন্ন কার্য্য লইয়া কেহ থাকিতে পারে না, আমার আহ্লাদ চাই। ইহাতে কাজে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিচার করিয়া বারোয়ারির ঈশ্বর বৃত্তির টাকার কতকাংশ গো পালনে নিয়োজিত হওয়া উচিত। কৃঃ সঃ

আমরা রাজার নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু আমরা গোগণের শ্রমজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের ঈশ্বর বৃত্তির টাকা নাচ, তামাসা আদিতে ব্যয় করিয়া অত্যন্ত অন্যায় ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতেছি। "কার্য্য করিয়া অপেক্ষাকর, ন্যায় বিচারক প্রভু আসিয়া কার্য্য দেখিয়া পুরস্কার দিবেন।"

কলিকাতায় স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্রাদির ঈশ্বর বৃত্তি পিজারা পোল, শ্রীকৃষ্ণ গোশালা আদির জন্য ব্যয় হয়। হ্যারিসন্ রোডে কয়েকটি ধর্ম্মশালায় যিনি ইচ্ছা করেন যাইয়া থাকিতে পারেন। পশ্চিমের বাজারে বাজারে আমি দেখিয়াছি বড় বড় লবণের ও গুড়ের চাপড়া স্থানে স্থানে ধরা আছে। গো-গণ যাইয়া ইচ্ছামত চাটিয়া দাতব্য চৌবাচ্ছার জল খাইতেছে। এই দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার মহাজন গণের করণীয়। আমিও ভট্টপল্লিতে জয়দেব বিদ্যাপতি কীর্ত্তন করিয়া আমার গোপালন অভিজ্ঞতার কথা বলায় শত শত পণ্ডিত মণ্ডলি সমস্বরে বলিলেন বাঙ্গালার ঈশ্বর বৃত্তির টাকা আটকাইবার ও গো-পালন স্থাপনের জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করিলাম। বারোয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষগণ আবাহন করিলে আমরা ছাত্র সহ যাইয়া গোপালন স্থাপন করিব।

গাভীগণের সমতুল্য পুংবৎস উত্তম ষণ্ডে পরিণত হয় না। উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর পুংবৎস বাছাই করিয়া লইয়া বাকীগুলি হলকর্ষণে ও ভার বহনে নিয়োগ করিতে হয় এবং তাহাদের সেইরূপে পালন করিতে হইবে। ঐ সকল কার্য্যে নিয়োগার্থ পশুগণকে অণ্ডচ্ছেদন দ্বারা আকৃতা করা বিধেয়। ইহাদিগকে বলদ করিতে পারিলে ইহাদের বল বীর্য্য সংরক্ষিত হইয়া ইহারা বিশেষ কর্ম্মঠ হয়।

কিন্তু ক্লিবকরায় অনেক বৎসতরের প্রাণ হানি ও ভ্যাললা (ভল্লাতক) খাওয়ানতে গৃহস্থের ধন প্রাণ উভয় হানি হইবার সম্ভাবনাও থাকে। বর্ত্তমান প্রথায় অণ্ডচ্ছেদন না করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঔষধাদির দ্বারায় হইলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়; ঐ টাকা গো শালার জন্য থাকিবে। কষ্টিক লাগাইলে শিং উঠে না ও ক্লিব না করাই ভাল। গো বিসর্জ্জন দোষের চয় বিনামূল্যে পাইবার জন্য চণ্ডালেরা বিষ আদি দিয়া অনেক প্রকারে গরু নষ্ট করে। ভাগাড়ে গরু পড়িলে তাহাতে সাধারণতঃ মুচীদের অধিকার থাকে। ভাগাড় জমা দিলে এ কজনের দায়িত্বে ভাগাড় থাকে এবং ভাগাড় হইতে একটা আয়ও হয়। ইহা একবারেই বন্ধ হইবে ও অনেক টাকা গো শালার জন্য থাকিবে। এই দুইটী উপায় অনেক দিনের চিন্তার ফল। পাঠক মাত্রেই আশ্চর্য্য হইবেন কিন্তু ইহা অতি সুন্দর উপায়।

পঞ্চাইতের গো পালন ও দুগ্ধের আয়—মুষ্টির আয়, ক্লীবকরণ নিবারণ আয়, ও বিষাদির দ্বারায় গো হত্যা নিবারণের আয় এবং বিবাহে অন্নপ্রাশনে এককালিন বার্ষিক দানে, স্থানে স্থানে বার্ষিক আয় দশ বারো হাজার টাকারও অধিক হইবে, ইহার সুক্ষ্মতত্ত্ব গো শরবেদ গ্রন্থে দেখুন।

গো পালন প্রচারকগণ পশু ও মনুষ্য উভয়ের পীড়ায় ঔষধ দিবেন, এবং গো গণের খাদ্য শস্যের বীজ কলমের চারা আদি কৃষক অফিস ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয় হইতে শাখা কার্য্যালয়ে যাইয়া বিলি হইবে। গোপালন হইতে জনহিতার্থ দাতব্য ঔষধ—গো এবং মনুষ্য উভয়ের ঔষধ—পাইলে অকাতরে ঘরে ঘরে মুষ্টি ও অনেক সাহায্য দিবে। গো সেবাই উত্তম শুচি ও স্বাস্থ্য; দুগ্ধ নবনীত ঘৃত দধি রসাল বিশুদ্ধ পথ্যে দেশের নরনারিগণ আয়ুষ্মানও বলবান হইবে।

(১) বারোয়ারী গো পালন পঞ্চাইতি গো পালন ইহা শত শত স্থানে অনায়াসে হইবে; ইহার সাতটি বিশিষ্ট উপায় পুস্তকে দেখুন। এক্ষণ গো চারণ ভূমিতে ধান্যক্ষেত্র হওয়ায় গো বিচরণ বিষয়ে কষ্ট নিবারণের উপায় এই যে,যে সকল রজাপথ হইয়াছে বাকরা হইবে, তাহা দুই ধারে চলত পথ বাদে অন্তত ২০ ফিট হিসাবে চওড়া হইবে. পূর্ব্বকালে অনেক গ্রামে ঐ রকম রাস্তাছিল। রাস্তার দুই ধারে গরু চরিতে পাইত। যে সকল গো চারণে ধান্য হইতেছে তাহার খড় গরুতে পায়। ঘর ছাওয়ানর জন্য টালির দেড় ফুট লম্বা ১ ইঞ্চি মোটা ছাচ দিব। ইহার শিক্ষা নিয়ম দৃষ্টি করিলেই সকলেই করিতে পারিবে। গ্রামে গ্রামে টালির ঘর করিলে অনেক ঘর অগ্নি ভয়ে রক্ষা হইবে, ইহা অতি সহজ। বাঙ্গালা দেশের মাটিতে সুন্দর টালি হয়।

মধুশ্রয়া বা মহুয়ার চাষ করিতে হইবে। পর্ব্বত গাত্রে বা পর্ব্বতের পাদদেশে পাহাড়িয়া জায়গায় মহুয়া গাছ সুন্দর জন্মিয়া থাকে। মধুশ্রয়া মহুয়া গরুর স্বাস্থ্যের ও তাহাদের দুগ্ধের বৃদ্ধির হেতু। গুণান্বিত খাদ্য গুলঞ্চ আদি পাঁচ প্রকার ঔষধি গুণপ্রদ গুল্ম লতা প্রতি গাছে গাছে রোপন ক্রমে, জলে জলজ উদ্ভিদ স্থলে ইক্ষু ঘাস কার্পাস বীজ আদিউৎপন্ন করিলে গোপালনের সুবিধা হয়। খাদ্য উপদেশ গ্রন্থে পাইবেন।

গোপালন ব্যাঙ্কের স্থাপন হইলে সেয়ার বিক্রি হইবে। ওয়ারলোনের মত লোকে টাকা জমা দিবে। আমাদের সাধু গভার্ণমেণ্ট কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে খাটাইবার জন্য বাংলাদেশকে দিতে পারেন। কৃষি ব্যাঙ্কের টাকা লইলেও দুগ্ধের চাষের খাটি দুধ সস্তাদরে দিলেও লাভ হইবে।

বারোয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষগণ, পঞ্চাইতগণ জমিদারগণ, স্কুলের শিক্ষকগণ, নিজ নিজ অধিকার মধ্যে কতগুলি ভাল গাভী আছে তাহার সন্ধান লইবেন এবং তাহাদের জন্য যেরূপ যণ্ড প্রয়োজন হইবে স্থির করিবেন। গো শালা স্থাপনের উপযোগী টালি এবং টালির ছাচ, বিচালি কাটা কল আদি ও গোপবেদ বা বঙ্গের কৃষি সংহিতা গ্রন্থ আবশ্যক হইলে পাঠাইতে পারা যাইবে। ইহাতে যে ভাবে গোপালনে ও ও কৃষি সাধনে দেশের কল্যাণ হইবে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট ভিটেরিনারী ডাক্তার নাবুকে লিখুন—গোসম্বন্ধে যে কোন যুক্তির জন্য উক্ত পশু চিকিৎসকগণকে পত্র লিখিবেন তাহার পোষ্ট কার্ড, বিনামূল্যে ডিষ্ট্রীক বোর্ড হইতে পাওয়া যায় সকলে সংগ্রহ করিয়া রাখুন।

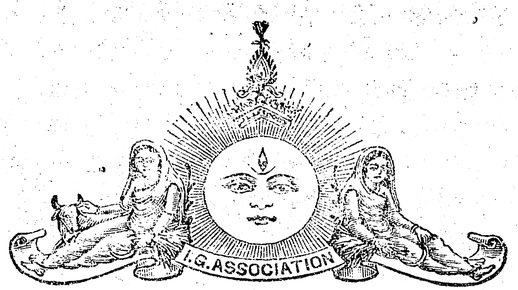

ভাদ্র, ১৩২৭ সাল

ফুলের চাষ

মানুষ যাহা খায় সুধু তাহাই তাহার আহার্য্য নহে—মানুষ চোখে যাহা দেখে, কানে যাহা শোনে, হস্ত পদাদি বা ত্বকদ্বারা যাহা স্পর্শ করে তাহাও তাহার আহার্য্য, তাহাও তাহার ভোগ্য। কেবল উদর পূরন করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, তাহাকে অন্য ইন্দ্রিয়গণের আহার যোগাইতে হয়। ফুল রূপে নয়ন রঞ্জন, ফুলের গন্ধে মন মুগ্ধ হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ইহা সুকোমল এবং সেই জন্য সুখ স্পর্শ। বাস্তবিক বৈষ্ণব কবিদের মত বলিতে ইচ্ছা হয় যে—ফুলের "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ তরে তার কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"।

এ হেন রূপগুণালঙ্কৃত ফুল কাহার বাঞ্ছনীয় নয়। বাঙ্গালা দেশের কথা বলি—বেল, যুঁই, চাঁপা, পদ্ম গন্ধরাজ, বকুল সেফালি ইহারা কেবল খণিকের জন্য গন্ধ ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া মাটির সহিত মিলাইয়া যায় না, গন্ধসারে ইহারা স্থায়ী গন্ধ রাখিয়া যায় এবং মানুষের সহিত উহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঘটায়।

বাঙলা ছাড়িয়া বেহারে গাজীয়াবাদে যাও গোলাপের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোলাপে ঘর দুয়ার সাজাও, দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর, পুষ্পশয্যায় উহাকে ব্যবহার কর, সদ্য সদ্য যতটা ভোগ করিতে পারা যায় তাহা করা হয়। তারপর গোলাপী আতর, গোলাপ জল ধনীর ভবনে ত স্থান পাইবেই এবং ইঙ্গিত পাইলেই গৃহস্থের বাটিতে ছুটিয়া যাইয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি করে। বেহারে, যুক্ত প্রদেশে চামেলীর শোভা অতুলনীয় বাঙলার তুলনায় এতদঞ্চলে উহার ফুল শতগুণ অধিক হয়। বাঙালায় আর একটা ফুলের গাছ আছে—যাহা বাঙলায় সেতা জায়গায় বনে জঙ্গলে জলা জমীর ধারে জন্মিয়া থাকে—ইহা কেতকী ফুল, কেঁয়া ফুল। এই ফুল হইতে কেওড়া প্রস্তুত হয়

এবং কেঁয়া ফুলের রেণু লইয়া বাঙলার লোকে পাপ্‌ড়ি খয়ের ও অন্য মশলা সংযোগে সুগন্ধ খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ কেঁয়া খয়ের বলা হয়। ইহা তাম্বুলের উৎকৃষ্ট মশলা এবং তাম্বুল চর্ব্বণকারীর অতি প্রিয় জিনিষ।

কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগান হইলে যেথান হইতে হগ্‌বাজারে ও অন্যান্য বাজারে ফুল যোগান যায়। এরূপ বাগান যে নাই এমন কথা আমরা বলি না কিন্তু ঠিক গোছান বাগান নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কেবল ফুল বেচিলে চলে না ফুলের সঙ্গে লতা পাতার বাহার না থাকিলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠেন। এই জন্য ফার্ণের পাতা, এসপারাগসের পাতা ও অন্য বাহারি পাতার আবশ্যক হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে নানাস্থানের জল-বায়ু বিভিন্ন, নানাবিধ গঠনেরও মৃত্তিকা আছে, সুতরাং এদেশে নানাবিধ পুষ্প জন্মিয়া থাকে—আর যে সকল পুষ্প জন্মে, তৎসমুদয়েরই প্রায় একটা সুঘ্রাণ আছে। সচরাচর যে সকল ফুলের গাছ আমরা সখ করিয়া বাগানে রোপণ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে বেল, যুই, চামেলী, নেওয়ার, গোলাপ, মালতী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, সেফালিকা, চম্পক বকুল ইত্যাদি প্রধান। এতদ্ব্যতীত খস্‌খস, চন্দন, কস্তরী, লেবু প্রভৃতি কাহারও ফুল, কাহারও বা ফল, ত্বক হইতে সুগন্ধ পাওয়া যায়। আবার বিলাতী বা বিদেশী অনেক গাছ আজকাল ফল, ফুল বা বাহারের জন্যও অনেকের বাগানে স্থান পাইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে হেলিপট্রোপ (Heliotrope) ভার্বিনা (Verbena), লেবেণ্ডার (Lavender), রোজমেরি (Rosemary) প্রভৃতির মধ্যে কাহারও পুষ্প, কাহারও পাতা অতি সুঘ্রাণযুক্ত। এই সকল গাছের বিস্তৃতভাবে আবাদ করিলে, তদ্দ্বারা নানাবিধ পুষ্পসার বা এসেন্স, নানাবিধ আতর ও অন্যান্য উপাদেয় সুগন্ধী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। গোলাপ এবং কেতকী হইতে গোলাপজল ও কেওড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিলে কতরকমের যে সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। শাল বনে শাল ফুলের গন্ধ যিনি উপভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন। দেশে এত রকমের সুগন্ধী পুষ্প জন্মে, এত রকমের সুবাসময় পাতার গাছ জন্মে, তথাপি এ দেশে সুগন্ধী দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কয়টী কারখানা আছে, আর কয় রকম ফুলেরই বা আবাদ হয়? সকলেই দেখি ব্যবসায় বাণিজ্যের নূতন নূতন পথ খুজিতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ের দিকে কাহাকেও লক্ষ্য করিতে দেখিতে পাই না। কলিকাতার সন্নিকটে বালিগঞ্জ, গড়ে ইত্যাদি দুই একটা গ্রামে বেল ও যুই ফুলের কিছু কিছু মালঞ্চ আছে, মধুপুর ও বৈদ্যনাথে কিছু কিছু গোলাপের মালঞ্চ আছে। উল্লিখিত স্থানের মালঞ্চ সমুহে যে ফুল জন্মে তাহা প্রতিদিন কলিকাতা সহরে চালান হয়। কলিকাতার মালিগণ বেল যুই খরিদ করতঃ মালা প্রস্তুত করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করে, বে-বাড়ীতে যোগান দেয় ইত্যাদি। আর যে গোলাপ ফুলের আমদানী হয়, তাহা সাহেব

মেমদিগের ব্যবহারার্থে ধর্ম্মতলার হগসাহেবের বাজারে (New market) বিক্রয় হয়। হগ সাহেবের বাজারে কত রকম ফুল, যে বিক্রয় হয় তাহা সংখ্যা করা যায় না। সাদা, লাল পদ্ম, লিলি জাতীয় নানা প্রকার ফুল, আইরিস্ লিলি, রজনি গন্ধা, দোলন চাঁপা, নারসিসস্ (narcissus) ইউকারিস্ লিলি যে মরসুমে যাহা পাওয়া যায় তাহাই উক্তবাজারের ফুলওয়ালারা আমদানী করে। শীতকালের মরসুমে যখন মরসুমী ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় তখন তাহাদের মধ্যে যে গুলি টেকসহি—ভার্বিনা সেণ্টোরিয়া প্রভৃতি বাজারে আসিয়া হাজির হয়। কাটা ফুল বিক্রয়ের একটা নিয়ম আছে—যে সকল ফুল, গাছ হইতে কটীয়া লইলে তাহার পাপড়ি সদ্যসদ্য ঝরিয়া পড়ে না—এমন কি ২৪ ঘণ্টা ৩৬ঘণ্টা ঠিক থাকে তাহাই বাজারে আনিয়া বিক্রয়ের সম্ভব হয়। বেল, মল্লিক যুই টগর গন্ধরাজ বিক্রয় হয় মালা গাঁথার জন্য, প্রায় সব ফুলেই মালা গাঁথা চলে কিন্তু সবফুলে তোড়া হয় না, গেলাস, ফুলদানি বা সাজি বা বাস্‌কেট সাজান চলে না। ফুলের মধ্যে অর্কিড ফুলের শোভা অতীব বিচিত্র এবং অর্কিডের ফুল ২।৪ দিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। অর্কিডের তোড়া অনেক দামে বিক্রয় হয়। সব অর্কিডের খুব মনোহর গন্ধ থাকে না কিন্তু এক একটার গন্ধ ভুবন মনোহর। কতকগুলি ফুল আছে যাহার দুটা একটা গেলাসে, ফুলদানিতে রাখিবার জন্য লোকে খরিদ করেন—যেমন ম্যাগলোনিয়া জাতীয় ফুল—ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ম্যাগনোলিয়া টেরোকার্পা, ম্যাংফস্‌কাটা ইত্যাদি। ম্যাংগুমলা—যাহাকে আমরা জহুরী চাঁপা বলি ইহাও গেলাসে সাজানর পক্ষে উত্তম ফুল—যেন মোমের মত পাপ্‌ড়ী—ঠিক যেন কেমেলিয়ার মত ফুল।

ঐ সকল ফুলের অন্য কোনরূপ ব্যবহার আপাততঃ দেখা যায় না,—তবে গাজীপুর ও জোয়ানপুরে যে গোলাপ, বেল ও যুই প্রভৃতির বিস্তৃত আবাদ হয়, তাহাতে, আতর, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতবড় দেশটার মধ্যে কেবল এই দুইটী স্থানে যে গোলাপ, যুঁই চামেলি ফুল জন্মে তাহা হইতেই এই সামান্য সুগন্ধী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশে জমির হার সুলভ, জনের মজুরী সুলভ, আব-হাওয়া ও মাটী আবাদের অনুকুল, তথাপি যে এ বিষয়ে লোকের কেন দৃষ্টি পড়ে না, ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহা হউক আজকাল সাধারণের কৃষিবিষয়ে মন আকৃষ্ট হওয়ায়, লোকে নানাদিকে নানা পন্থার অনুসন্ধান করিতেছে, সুতরাং অনুসন্ধিৎসুদিগকে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে নূতন নূতন পথ প্রদর্শন করা উচিত। ধান্য গোধূমাদির চাষবাসে সকলে নিযুক্ত হইলে, কৃষির অপরাপর বিভাগ কেবল যে পতিভাবে পড়িয়া থাকে তাহা নহে,—সকলে ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতেও পারে। এতদ্ব্যতীত মেঠো ফসলের চাষ আবাদে চাষীগণ যেমন সহজে সফলকাম হইতে পারে, ভদ্রলোকে কেন যে তেমন পারে না, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে, তবে সে সকল প্রদর্শন করা প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে

বলিয়া, তৎসম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। কৃষকগণ যে সকল বিষয়ে সহজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, যে সকল গাছের আবাদে সমধিক খরচ আছে, যে সকল ফসলের আবাদে সমধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়, শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে এইরূপ কৃষি বা উদ্যান কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। কৃষকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সুযুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে কৃষকদিগের কিছু ক্ষতি হয়। অন্যদিকে যাঁহারা উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীতাচরণ করেন তাহাদিগেরও লাভ হয় না।

গন্ধদ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ফুলের আবাদ করিতে হইলে, বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা বেহার বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ গ্রহণীয়। বাঙ্গালাদেশে বারিপাতের আধিক্য বশতঃ মৃত্তিকা অতিশয় আর্দ্র, আব-হাওয়া তদনুরূপ, একারণে তথাকার গাছের বৃদ্ধি সমধিক, তন্নিবন্ধন গাছের তাবৎ শক্তি গাছের অঙ্গপোষণেই ব্যয়িত হয়—অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহাই ফুলের পরিপুষ্টি সাধন করে। কিন্তু বেহার প্রভৃতি প্রদেশের বারিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প, জমি স্বাভাবিক গড়েন। এই দুই কারণে তথাকার আব-হাওয়া স্বতন্ত্র, মাটিও নীরস, ফলতঃ এখানকার গাছ তত অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে না। গাছের যে শক্তি অব্যবহৃতভাবে অবস্থিতি করে, তাহা পুষ্পোৎপাদনে নিয়োজিত হয়। আব-হাওয়ার এইরূপ তারতম্য হেতু নীরস প্রদেশের ফুলে গন্ধ যেমন অধিক, তেমনই ফুলও অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গলার পুষ্প সকল বড় হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে ফুটে না, তাহাতে তেমন অধিক পরিমাণে গন্ধ থাকে না। বেহারাঞ্চলে আবাদ করায় আর একটী বিশেষ লাভ এই যে, এদেশে লোকজনের মজুরী যত সুলভ, দুনিয়ার কোনদেশে বুঝি তেমন আর নাই। আবার এদেশের লোক যত কষ্ট সহিষ্ণু, অন্য দেশের লোক ততদূর নহে। এ সকল প্রাথমিক বিষয় উপেক্ষনীয় নহে।

নানাবিধ পুষ্প হইতে আতর বা অপরাপর গন্ধসার প্রস্তুত করা যে বিশেষ কঠিন কার্য্য তাহা নহে। তবে ইহা কিছু সময়সাপেক্ষ সুতরাং তাহার জন্য ধৈর্য্য আবশ্যক। ইহাতে একদিকে যেমন কিছুদিন অর্থাৎ দুই তিন বৎসর প্রথমতঃ অপেক্ষা করিতে হয়, যেমনি অন্যদিকে এ সকলের আবাদ করায় সমধিক লাভের আশা থাকে। ভদ্রলোকদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে, এই সকল লাভজনক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। দেশের মধ্যে এখনও লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পতিতাবস্থায় আছে। কিন্তু এই সকল পুষ্পক্ষেত্র বা মালঞ্চে পরিণত করিতে পারিলে, দেশের সমুহ কল্যাণ সংসাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা হইতে ভূস্বামীর খাজনা হিসাবে আয় বাড়িবে; দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি জনমজুরের উদরান্নের উপায় হইবে; তৃতীয়তঃ উদ্যোগী ব্যক্তির আয়ের পন্থা হইবে এবং চতুর্থতঃ ইহা দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধির একটা পথ উদ্ঘাটিত হইবে। এ সকল কথা ঠিক হইলেও, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পক্ষে একটা বিষম অন্তরায় আছে এবং সেই অন্তরায়—

অর্থাভাব। বিস্তৃতভাবে আবাদ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু সে পরিমাণ অর্থ অল্প আয়সম্পন্ন বা অল্প মূলধনবিশিষ্ট গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভবপর নহে। আর কায়ক্লেশে সম্ভবপর করিয়া লইলেও এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উদ্যান সংস্থাপনকালে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া—পরে আবার সেই উদ্যানকে, দুই তিন বৎসর খরচ যোগাইয়া রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন ইহা বিশেষ চিন্তার কথা। বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে দুই শ্রেণীর লোকের আবশ্যক,—প্রথম মূলধনী চাই; তাহার পরে মূলধনীর টাকা বজায় রাখিয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহী ব্যক্তির প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশসমূহে কোন উৎসাহী ব্যক্তি একটী কাজের সূচনা করিলে ধনীগণ অর্থ দ্বারা তাহাকে সাহায্য করেন, কিম্বা টাকা দিয়া সে কার্য্যের অংশীদার হইয়া থাকেন। এই প্রকার যৌথ কারবারের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই সাহেবদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাষ-আবাদ এত শীঘ্র উন্নতিলাভ করে। কিন্তু এদেশে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়, কারণ বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে কতকগুলি যৌথ কারবারের সূচনা হইল কিন্তু তাহার যে সব টিকিবে এরূপ আশা করা ভুল। তাই বলিয়া কি উদ্যম ত্যাগ করিতে হইবে?—মানুষ ঠেকিয়াই শেখে, হারিয়াই জেতে। তবে এ ক্ষেত্রে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ফুলের আবাদ ও গন্ধসারের কারখানা সংস্থাপন করিতে হইলে অর্থশালী উদ্যমশীল ব্যক্তির প্রয়োজন—অর্থ ও উদ্যম একই ব্যক্তির মধ্যে থাকা চাই এমন কিছু কথা নয়। কেবল টাকায় কোন কাজ হইবে না, কেবল উদ্যম ও উৎসাহেও কোন ফলোদয় হইবে না।

বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি

বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম যাহাতে নিশ্চিত ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা থাকা অতিমাত্র আবশ্যক। অনেক সময়েই অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইল না। দোষটা অবশ্য বীজ বিক্রেতার উপরই চাপান হয়। বস্তুতঃ কিন্তু বীজ বপন প্রণালীর দোষেই অধিকাংশ স্থলে বীজ হইতে চারা হয় না। বীজ হইতে চারা হওয়ার সফলতা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

১ম—বীজের উৎকৃষ্টতা;
২য়—জমির অবস্থা;
৩য়—ভূপৃষ্ঠ হইতে বীজ বপন স্থানের গভীরতা;
৪র্থ—উত্তাপ; ও
৫ম—জল।

নিম্নলিখিত বীজগুলি নিম্নলিখিত তাপাংশে অঙ্কুরিত হয়।—

	নিম্নতম তাপাংশ Fahrnhiet	উচ্চতম তাপাংশ F.	যে তাপাংশে সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।
গম	৪১	১০৫	৮৪
যব	৪১	১০৪	৮৪
মটর	৪৪	১০২	৮৪
ধান	৪৮	১১৫	৯৩
সীম	৪৯	১১১	৭৯
বিলাতী কদু	৫৪	১১৫	৯৫

বায়ুতে শুষ্ক নিম্নলিখিত বীজগুলি ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টায় নিজ নিজ ওজনের শতকরা যত অংশ জল শুষিয়া লয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

সরিষা	৮	যব	৪৯	সীম	৯৬
জোয়ার আদি	২৫	গাজর	৫১	মটর	১০৭
ধান	৪৪	রাই	৫৮	সুল্ল	১১৭
গম	৫৫	যই	৬০	বিট	১২৮
(Buckwheat) ফাপর	৪৭	ধুতুরা	৬০	শকাদি	১২৭

Clover (সুল্ল প্রভৃতি) বীজ যে অনেক সময় অঙ্কুরিত হয় না তাহার প্রধান কারণ অসময়ে বপন এবং তজ্জন্য উপযুক্ত জলীয় পদার্থের অভাব। কিন্তু বীজগুলি অগ্রে জলে ভিজাইয়া লইলে এই অসুবিধা দূর হয়। মিলেট বীজের অল্প জল আবশ্যক বলিয়া উহা গ্রীষ্ম কালেও বপন করিলে ক্ষতি হয় না। বিশুদ্ধ জলে কিন্তু বীজ ভিজাইলে একটু ক্ষতি হয়। প্রথমত বীজ হইতে ধুসরবর্ণ এক প্রকার পদার্থ জলে ধুইয়া যায়। ঐ জল উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ ধুসরবর্ণ পদার্থে যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থ আছে। ঐ পদার্থ ক্ষুদ্র চারার প্রকৃত প্রদত্ত পুষ্টিকারক উপাদান। বিশুদ্ধ জলে বীজ ভিজাইয়া লইলে তাহা হইতে যে সকল চারা হয়, সচরাচর অন্যান্য চারা হইতে দুর্ব্বল ও ফিকা রঙ্গের হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ জলে ভিজান বীজ অতি শীঘ্র শুষ্ক হয়। সুতরাং উহা শীঘ্রই পূর্ব্বাপেক্ষা শুষ্কতর হয়। এই হেতু শুষ্ক জমিতে বা বর্ষার অভাবে উক্ত বীজ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়।

উর্ব্বরা শক্তিশালী কোনও কোনও রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জলে বীজ ভিজাইয়া লইলে উক্ত দুই প্রকার অসুবিধাই দূর করা যায়। একদিকে উক্ত প্রকার জল বীজ হইতে অতি অল্প জিনিষই ধুইয়া ফেলে, অপর দিকে কিন্তু বীজের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় এবং চারা গাছগুলিও অপেক্ষাকৃত বলশালী ও ঘন সবুজবর্ণ হয়। অধিকন্তু লবণাক্ত পদার্থ বীজের গায়ে লাগিয়া থাকায় উহা সর্ব্বদাই ভিজা থাকে। এইরূপ করিয়া বীজ ভিজাইয়া লইলে আরও একটী উপকার হয়। এইরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন গাছে বীজের সংখ্যা অধিক হয় ও উৎপন্ন গাছের বীজে glutenএর ভাগ অধিক হয়।

যে অবস্থায় বায়ু, জল ও উত্তাপ যথেষ্ট ও উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে, সেই সেই অবস্থায় বপন করিলে সকল উৎকৃষ্ট বীজই অঙ্কুরিত হয়। যে সময়ে বপন করিলে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় ও উৎপন্ন চারা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় সেই সময়ই বীজ বপন ও চারা রোপণের প্রশস্ত সময়। ঐ সময় বায়ু ও জমি উপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপবিশিষ্ট

থাকা আবশ্যক। বীজের শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরোদ্গম হওয়া ও চারা গাছ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হওয়ার প্রধান সুবিধা এই যে ঐরূপ হইলে চারা গাছগুলি, কাঁটা গাছ, ঘাস প্রভৃতি ক্ষেত্রের জঞ্জাল অপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় কৃষকের ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়।

পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জলে ভিজান বীজ হইতে যে চারা গাছ হয় তাহারা অধিক তেজী হয় এবং প্রথম দুই সপ্তাহ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে কীটাদি হইতে উহাদের অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং শীঘ্রই উহারা কীটাক্রমণ কাল অতিক্রম করিয়া যায়।

প্রথম কয়েক সপ্তাহই চারা গাছগুলির বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনার কাল। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজ ভিজাইয়া লইয়া উহা সারবান করিলে এই লাভ হয় যে প্রথম প্রথম চারা গাছগুলির আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি সম্যক পরিপুষ্ট না হওয়ায় যখন উহারা উহাদের স্বীয় আবশ্যক পদার্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড হইতে সংগ্রহ করিতে পারে না তখন উক্ত সার থাকায় উহাদের বিশেষ উপকার হয়। অধিকন্তু প্রথমে সতেজ ও বলশালী হইলে সেই চারা নিশ্চয়ই পরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মুলা, এবং নাবী জাতীয় সীম সালগম, বীট, গাজর, পিয়াজ ও শলা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই, আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতি বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে. আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্লাদি—সুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে

না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতেও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এইমাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু - কল সমেত একটী পিয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর "যো" হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি, ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যকমত জল দিয়া, আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি; দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকেন না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙালাদেশের মাটি বড় রসা এইকারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড | আশ্বিন ও কার্ত্তিক। | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

ব্যবসায়ের ইঙ্গিত

[পশুপক্ষী পালন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার "কৃষকে" অনেক কথা লিখিয়াছেন। শ্বেতসার ও শর্করা সম্বন্ধে সম্প্রতি 'কৃষকে' একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে কিন্তু অনেকেই আরোও কিছু জানিতে চান তাই আমরা পত্রস্তর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। কৃঃ সঃ]

পশুপক্ষী পালন—গত মাসে যে Poultry and Cattle Breeding Farm ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে কয়েকজন পাঠকের নিকট হইতে কিছু অনুযোগ শুনিতে হইয়াছে। অনেকেই অনুযোগ করিয়াছিলেন যে,ইহা খুব বড় ব্যবসায়; ইহাতে প্রচুর মূলধন আবশ্যক। এই ব্যবসায়টি বিনা মূলধনে হইতে পারে না, স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহারা যত মূলধন আবশ্যক মনে করেন, গোড়াতেই তত মূলধন না হইলেও চলে; তবে তাহাতে প্রথম হইতে খুব বেশী পরিমাণে লাভেরও আশা নাই। যিনি অপেক্ষা করিতে জানেন, তিনি অল্পমূলধনে আরম্ভ করিয়া ক্রমে লাভের অংশ হইতে মূলধন বাড়াইতে পারেন। সে যাহা হউক খুব দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত চালাইতে পারিলে ইহা যে একটী বিলক্ষণ লাভজনক ব্যবসা, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্বেতসার হইতে আটা প্রস্তুত প্রণালী—ইতিমধ্যে জনকয়েক পাঠক, বাজারে লেবেল-আটা শিশির ভিতর যে আঠা পাওয়া যায়, তাহার প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন। আলু, চাউল, গম, প্রভৃতি হইতে শ্বেতসার কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি। এখন সেই শ্বেত সারকে কাজে লাগাইতে হইবে।

শ্বেতসার আমাদের খাদ্যের অন্যতম উপকরণ হইলেও, তাহা আরও অনেক কাজে লাগে। লেবেল আটা শিশির ভিতরের আঠাগুলির প্রধান উপকরণই এই শ্বেতসার। তবে অন্য জিনিসও আঠাস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে; যেমন বাবলা আঠা, আরবি গঁদ প্রভৃতি। বস্তুতঃ, এই গঁদই সাধারণ কার্য্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খাঁটি গঁদ হইলে,

তাহার সহিত জিওল আটা, সজনে আটা প্রভৃতির ভেজাল না থাকিলে, গঁদ ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ইহা ব্যবহার করিতে বিশেষ কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কেবল উপযুক্ত পরিমাণ জলে ভিজাইয়া লইলেই হইল। গঁদ ভিজাইয়া আঠা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে করিতে দু'চার দিন পরে উহার জল শুকাইয়া যায়; তখনও উহাতে বেশী মেহনত করিতে হয় না; আর একটু জল মিশাইয়া লইলেই হইল; এবং মধ্যে মধ্যে জল মিশাইয়া গঁদকে তরল অবস্থায় রাখিলে, অনন্ত কাল ধরিয়া উহার দ্বারা কাজ চলে। একেবারে অনেকটা গঁদ ভিজাইয়া লইলে, অধিক দিন যদি উহা ভিজা থাকে, তবে কিছু গন্ধ হইতে পারে; কিন্তু একেবারে অনেক গঁদ ভিজাইবার দরকারই হয় না। ব্যবহার করিতে করিতে যেমন আঠা কমিয়া আসে, তেমনি মধ্যে মধ্যে উহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে টাট্‌কা শুষ্ক গঁদ মিশাইয়া লইলেই হইল।

কিন্তু গঁদ ব্যবহারের কিছু অসুবিধাও আছে। গঁদ দিয়া জোড়া কাগজপত্রাদি সকল ঋতুতে সমান থাকে না। বর্ষাকালে আর্দ্র বায়ু হইতে জলীয় অংশ শোষণ করিয়া লইয়া গঁদ আবার নিজে আর্দ্র হইয়া যায়; তখন জোড় খুলিয়া গিয়া, জোড়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য শ্বেতসারের আঠার প্রয়োজন। শ্বেতসারের আঠায় এই অসুবিধাটুকু কম।

আলু, চাল, গম প্রভৃতি হইতে starch বা শ্বেতসার বাহির করিয়া লইতে হয়; কিন্তু এরারুট, সাবু প্রভৃতি পদার্থগুলি খাঁটি starch বা শ্বেতসার। কেবল আকারগত কিছু বৈষম্য আছে। এরারুট অল্প পরিমাণ ফুটন্ত জলে দিয়া নাড়িয়া লইলে জলের মত স্বচ্ছ একটী পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহা শিশু ও রোগীর পথ্য। সাগুকে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে, তবে এই জিনিষটি পাওয়া যায়। বার্লি সিদ্ধ করিলেও এরূপ একটা জিনিস উৎপন্ন হয়; কিন্তু বার্লি খাঁটি starch নহে।

ঐ গরম জলে ঘাঁটিয়া লওয়া জিনিসটি আঠাস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিছুদিন রাখিলে ইহা পচিয়া দুর্গন্ধ হইতে পারে; এবং বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বেশী পাতলা হইয়া যাইতে পারে। দুই চারি ফোটা লবঙ্গের তৈল মিশাইয়া লইলে প্রথম দোষটি অপসৃত হইতে পারে; এবং আঠাটি শিশির ভিতর পুরিয়া ছিপি আটিয়া রাখিলে, হাওয়া লাগিতে না দিলে, দ্বিতীয় দোষটি পরিহার করা যাইতে পারে। লবঙ্গের তৈল মিশাইয়া লইলে আর একটা সুবিধা এই যে, পচন নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে উহা শীঘ্র শুকাইয়া যায় না। এটা গেল মোটামুটি রকমের আঠা। এরারুটের সঙ্গে কিঞ্চিৎ (বার আনা এরারুটে সিকিভাগ) সূক্ষ্ম মিহি ময়দা মিশাইয়া লইয়া সিদ্ধ করিলে, এবং তাহার সহিত ঐরূপ দুই-চারি ফোঁটা লবঙ্গের তৈল মিশাইয়া লইলে, আরও একটু ভাল রকম আঠা প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল

স্থায়ীও হয়। কিন্তু ইহারা প্রকৃত আঠা নহে। চিরস্থায়ী আঠাও starch হইতে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রস্তুত প্রণালী স্বতন্ত্র। অর্থাৎ starch কে প্রথমে dextrin এ পরিণত করিতে হয়, এবং পরে তাহা হইতে আঠা তৈয়ার করিয়া লইতে হয়।

Starch হইতে ইয়োরোপে চিনি প্রস্তুত হয়; অন্ততঃ এক সময়ে হইত। নেপোলিয়ন যখন রুসিয়ার সহিত অন্য দেশের বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন রুসিয়ার চিনির অভাব উপস্থিত হইল। অভাব ঘটিতেই তাহা দূর করিবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল। ফলে, রুস বৈজ্ঞানিক এম, কারচফ (M. Kirchoff) starch হইতে চিনি প্রস্তুত করিলেন। এই চিনি ঠিক আকের চিনির মত দেখিতে না হইলেও, অনেকটা সেই রকম হইল বটে। তবে, আকের চিনি যত মিষ্ট, এ চিনি তত মিষ্ট হইল না। রুসিয়ায় গম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাহা হইতে starch বাহির করিয়া লইয়া, সেই starch হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া, রুসিয়ার চিনির অভাব মিটানো হইল। ক্রমে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা এই উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিতে শিখিল এবং সেই চিনি স্বনামে ও বেনামীতে (অর্থাৎ, আকের চিনির ভেজাল স্বরূপ) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

জল-মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবকের (dilute sclphuric acid) সহিত ক্রমে ক্রমে starch মিশাইয়া, মাঝামাঝি তাপ প্রয়োগ করিয়া starch-sugar বা শ্বেতসার চিনি প্রস্তুত করা হয়। Sulphuric acid এর অপেক্ষা oxalic acid (অক্‌জালিক য়্যাসিড) কিন্তু একার্য্যের পক্ষে বেশী উপযোগী। তবে অক্‌জালিক য়্যাসিডের দাম বেশী, সালফিউরিক য়্যাসিডের দাম কম। এই জন্য সালফিউরিক য়্যাসিড প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ফরাসীরা যে প্রণালীতে starch sugar প্রস্তুত করেন, তাহা এইরূপ—

প্রথমতঃ ১০ কিলোগ্রাম (10 kilogrammes) গন্ধক দ্রাবকের (যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'৮৪৮) সহিত ২০ কিলোগ্রাম জল ধীরে ধীরে মিশাইতে হয়। গন্ধক দ্রাবকের সঙ্গে জল ধীরে ধীরে না মিশাইলে বিপদ ঘটিতে পারে; কারণ, দ্রাবকে জল মিশাইবার সময় তাহা হইতে যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে—অসাবধান হইলে, তাহাতে হাত পা পুড়িয়া যাইতে পারে। এই মিশ্রটি ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিলে, উহা একটী সীসার পাত্রে স্থিত ১০০০ কিলোগ্রাম ফুটন্ত জলে ঢালিয়া দিতে হয়। পরে তাপ প্রয়োগ করিয়া উক্ত মিশ্র পদার্থ আরও খানিক ক্ষণ ফুটাইয়া লইতে হয়; এবং তাহা ক্রমাগত নাড়িতে বা ঘুঁটিতে হয়। এই সময়ে উহার সহিত ক্রমে ক্রমে ৪০০ কিলোগ্রাম starch মিশাইতে হয়। starch খুব অল্প অল্প করিয়া মিশানো উচিত, যেন ফুটন্ত দ্রাবকের ফেনা মরিয়া না যায়। অল্প পরিমাণে দিলে মিশ্রণের

সুবিধা হয়। জল-মিশ্রিত ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকের সহিত যেঁমন যেমন starch মিশানো হইতে থাকে, অমনি উহা সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে পরিণত হইতে থাকে। সমস্ত starch-টুকু মিশাইয়া লইবার পরও আট দশ মিনিট কাল ফুটানো উচিত। তখন ঐ তরল পদার্থ জলের ন্যায় স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে। তার পর পাত্রের তলা হইতে আগুন সরাইয়া লইয়া, অথবা, আগুনের উপর হইতে পাত্রটি স্থানান্তরিত করিয়া তরল পদার্থের সহিত চা-খড়ি-চূর্ণ মিশাইতে থাকিলে, বুদবুদ উঠিতে আরম্ভ করিবে। গন্ধক-দ্রাবক ও চা-খড়ির রাসায়নিক মিলনে মিলিত হইয়া তলায় থিতাইয়া পড়িবে। এইরূপে যখন বুদবুদ উঠা বন্ধ হইবে, তাহার পরও আরও কিছু চা-খড়ি মিশাইয়া লইলে, তরল পদার্থে গন্ধক দ্রাবকের অস্তিত্ব মাত্র থাকিবে না। তার পর ঐ তরল পদার্থ সাবধানে পাত্রান্তরে লইয়া গিয়া (ইহার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রাদি আছে) তাহাকে জান্তব কয়লার (হাড়, রক্ত ইত্যাদি পোড়া কয়লা) ভিতর দিয়া ফিল্‌টার করিয়া লইলে, বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ পাওয়া যাইবে। উহা অগ্নি তাপে ঘন করিয়া সিরাপরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে; আরও ঘন করিলে দুই এক দিনের মধ্যে উহা ক্রমে দানা বাঁধিবে। ঐ দানাই চিনির দানা।

প্রসঙ্গ ক্রমে starch হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবৃত হইল। কিন্তু ইহাই আমাদের প্রধান বক্তব্য নহে। আমাদের চাই dextrin (ডেকস্‌ট্রিন)। Starch এবং strrch sugar এর ঠিক মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই dextrin। জলমিশ্রিত গন্ধক দ্রাবকের সঙ্গে starchমিশাইবার সময়ে, starch চিনিতে পরিণত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, উহা dextrin এ পরিণত হয়। Starch কে চিনিতে পরিণত হইতে না দিয়া dextrin অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। তখন উহা দেখিতে এবং গুণে ও ব্যবহারে ঠিক গঁদের মত। এই আঠাবৎ পদার্থ ঘন করিয়া লইলেই শুষ্ক dextrin প্রস্তুত হইল। ডেকস্‌ট্রিনের বর্ণ শ্বেত, উহার স্বাদ ও গন্ধ নাই। Dextrin শীতল ও উষ্ণ উভয় অবস্থার জলে দ্রবণীয়।

Starch হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার মাঝামাঝি অবস্থা dextrin বটে, কিন্তু উহা হইতে dextrin প্রস্তুত করা হয় না; dextrin প্রস্তুত করিবার প্রণালী আলাদা। বার্লিকে পচাইলে অর্থাৎ germinate করিলে, malt নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। Malt কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৫০ কি ৪০০ ভাগ জল, ৭৭° হইতে ৮৬° ফারেনহীট তাপে উত্তপ্ত করিয়া, তাহার সহিত ৫ হইতে ১০ ভাগ শুষ্ক malt যোগ করিতে হয়। পরে তাপের পরিমাণ বাড়াইয়া ১৪০° করিতে হয়। এই তাপে ১০০ ভাগ starch উহার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খুব নাড়িতে হয় এবং তাপের পরিমাণ আরও কিছু বাড়াইয়া দিয়া ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিতে হয়। প্রথমে উহা চটচটে এবং দুগ্ধবৎ সাদা থাকে।

ক্রমে উহা জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া আসে॥ এই তরল পদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করিলেই, আগুনের উপর হইতে সরাইয়া লইতে হয়; নচেৎ উহা চিনিতে পরিণত হইয়া যাইবে। অনন্তর উহাকে ফিলটার করিয়া শুকাইয়া লইলে, উহা কঠিন ভঙ্গপ্রবণ dextrin এ পরিণত হইবে।

Dextrin প্রস্তুত করিবার অন্যান্য প্রণালী ও আছে। এখানে কেবল, dextrin জিনিষটা কি তাহা বুঝাইবার জন্যই এত কথা বলিতে হইল। সুতরাং একটা প্রণালীই যথেষ্ট হইবে। Dextrin অনেক কাজ লাগে। ক্যালিকো ছিট প্রস্তুত করিতে ইহা অপরিহার্য্য উপাদান। সেইজন্য dextrin স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তুত করা হয়, এবং বাজারে তাহার ক্রয়-বিক্রয় চলে। বাজারে লেবেল-আঁটা শিশিতে যে সব আঠা বেশ দামে বিক্রীত হয়, তাহার অন্যতম প্রধান উপাদান এই dextrin।

ফটোগ্রাফারদের ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট paste এই dextrin হইতে তৈয়ার হয়। কেরোসিনের টিনের এক-টীন জল ১০০°ফাঃ উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া তৎসহ ৫½ পাউণ্ড dextrin মিশাইতে হইবে। Dextrin জলে গলিয়া গেলে জল ঠাণ্ডা করিয়া উহার সহিত ৩০ ফোঁটা (minim) wintergreen তৈল ও ৩০ ফোটা (minim) লবঙ্গর তৈল মিশাইয়া উপযুক্ত শিশির ভিতর পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় কয়েকদিন রাখিয়া দিলে উহা জমিয়া যাইবে। শীঘ্র জমাইয়া লইতে হইলে বরফের ভিতর রাখা চলে। কিন্তু দুই এক সপ্তাহে আপনিই জমিয়া যায়। পচন নিবারণের জন্য wintergreen এবং লবঙ্গর তৈলের পরিবর্ত্তে formaldehype (ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়) সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করা চলে; কিন্তু তাহা হইলে আঠা জমিয়া যাইবে না, তরল থাকিবে। তাহাতে ফটোগ্রাফারদের অসুবিধা হয়।

আজ এই এক প্রকার formula দিলাম। এরূপ আরও অনেক formula আছে। দরকার হইলে পরে দেওয়া যাইতে পারিবে।

দুগ্ধচূর্ণ—শ্রীযুক্ত সবির মহাশয়ের দুগ্ধচূর্ণ প্রসঙ্গে "ইঙ্গিতে" পাঠকমহলে একটা মস্ত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গত মাস দুই তিন ধরিয়া প্রত্যহ৩।৪।৫খানি করিয়া পত্র পাইয়াছি। প্রবন্ধ মধ্যে সবির মহাশয়ের ঠিকানা থাকায়, তিনিও পত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছেন! সে জন্য এই প্রসঙ্গ এবার আবার উত্থাপন করিতে হইল। সবির মহাশয়ের কথিত গাছটির বাঙ্গলা নাম পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিতে না পারায়, কেহই উহা চিনিতে পারেন নাই। এবার আমরা উহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা একে একে প্রকাশ করিতেছি। ঐ গাছ আপনার বাড়ীর আনাচে কানাচে জন্মে। সবির মহাশয় যখন অনুগ্রহ করিয়া ঐ গাছের ডাল, পাতা, ফুল, ফল পাঠাইয়া দেন, তখন উহা দেখিয়া আমি, এবং আমার বন্ধু-বান্ধবেরা যাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন—আমরা উহা চিনিতে পারিলাম বটে, কিন্তু আমরা কেহই উহার

নাম জানিতাম না। পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, গ্রাম্য ভাষায় উহার নাম ঝুমকো টেপারী। উহা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। নামের সন্ধান পাইবার পর, কলিকাতার বাজারে যে সকল বেদের গাছ-গাছড়া বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদের নিকট হইতে কয়েক ঝাড় ঐ গাছ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত সবির মহাশয় শিবপুরের Royal Botanic Gardenএর অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে এই গাছের সম্বন্ধে আরও কিছু পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন; এবং তাঁহার পত্রের নকল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাও এইসঙ্গে ছাপিয়া দিতেছি; তাহা হইতে সম্ভবতঃ পাঠকগণের ঐ গাছ চিনিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

Royal Botanic Garden
Sibpur, Calcutta.
The 6th May, 1920.

To

K. A. Sabir, Esq., Sabir Cottage, Dacca.

Dear Sir,

I have to acknowledge receipt of your letter of 19th April, 1920 and of the specimen therein advised and to enclose herewith a note by Mr. Debbarman, on your specimen which has been identified by him as ABUTILON INDICUM, G. Don, for your information.

Yours Faithfully.
C. C. Calder,
Offtg. Supdt. R. B. Garden, Sibpur.

Note by Mr. Debbarman—

ABUTILON INDICUM. G. Don.
Bengali....." Potari" "পটারি"
Com English.....* (not given)

Leaves:—Yield a mucilaginous extract, used as a Demulcent, DECOCTION used in Bronchitis etc. INFUSION, prescribed in

in fevers as a Cooling medicine. COOKED and eaten in case of bleeding Piles.

Seeds:—Considered Laxative and Demulcent. Used in Pilies, Reckoned Aphrodisiac. Said to drive away thread worms.

Roots:—Useful in Stranguery and Hæmaturia. INFUSION used in fevers as a cooling medicine. Said to be useful in the trsatment of LEPROSY.

Twigs:—Boiled milk whisked with the *fibrous* twigs coagulates.

এই ইংরেজীটুকুর অনুবাদ এখানে অনাবশ্যক। আমাদের আলোচ্য বিষয় দুগ্ধচুর্ণ; আর Mr. Debbarman কেবল ঐ গাছের ঔষধার্থ ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। শেষাংশে তিনিও বলিয়াছেন যে, এই গাছের ডাল দিয়া দুধ ঘুঁটিলে দুধ ঘন হইয়া যায়।

একজন পাঠক আন্দাজে একটা গাছ ঠিক করিয়া লইয়া দুগ্ধ চুর্ণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু পারেন নাই তিনি যে ফলের চিত্র এবং গাছের নাম দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইল, গাছ নির্ণয়ে তাঁহার ভুল হয় নাই। স্থান বিশেষে ঐ গাছের নাম ঝাপি টেপারি হওয়া বিচিত্র নয়। এই ভদ্রলোকের অকৃতকার্য্যতার কথা জানাইয়া আমি সবির মহাশয়কে দুগ্ধ চুর্ণ করিবার প্রণালীটি আরও স্পষ্টভাবে লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি তাঁহার প্রস্তুত দুগ্ধ চুর্ণের নমুনা পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং নিম্নের প্রণালীটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

FULL DIRECTION.

Take 5 or 6 *fibrous* twigs (washed and cleaned) in 2½ or 3 Ft. in length, and stir or whisk the milk, while boiling on fire, and continue till the milk begins to curdle (thicken) and is at last reduced to dry powder. For three seers of milk, it will take nearly an hour. I have very often tried it with success and I taken it as food in making TEA or cooking PUDDING, CAKE, PIOSH, etc.

অর্থাৎ, আড়াই কি তিন ফিট মাপের পাঁচ ছয়টি ডাল ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লউন। তার পর দুধের কড়া উনানে চাপাইয়া, দুধ ঘুঁটিতে আরম্ভ করিলে, ঐ ডালগুলির দ্বারা ঘুটিতে থাকুন। ক্রমে দুধ ঘন হইয়া আসিবে; অবশেষে শুষ্ক ও চুর্ণে পরিণত হইবে। দুই তিন সের দুধ এইরূপে চুর্ণ করিতে এক ঘণ্টা আন্দাজ সময় লাগিবে।

বেদিয়াদিগের নিকট হইতে গাছ সংগ্রহ করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, উহার (আয়ুর্ব্বেদীয়) নাম নাগবলা। তার পর

দ্রব্যগুণাভিধানে পাইলাম, নাগবলার হিন্দী নাম গঙ্গেরন, গুলসফরী। উহাকে বাঙ্গলায় গোর কচাকুলে, পানসাঁড়া মহারাষ্ট্রে গাঙ্গেটী, গাঙ্গেধামন; কোকনে তুপকডী; কর্ণাটে বটগরুকে ও ল্যাটিনে Sida spinosa বলে।

নাগবলা এক জাতীয় গাছের চারিটি শ্রেণীর অন্তর্গত একটী। উহার অপর তিনটির নাম বলা, অতিবলা, মহাবলা।

ঔষধার্থ ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা লিখিত। ভারতবর্ষ, ১৩২৭।

চাষেরঈতি

জেলা বর্দ্ধমান, থানা রায়নার অধীন পাঁইটা গ্রাম ও তৎচতুর্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে গত ৫।৬ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরে গড়ে অর্দ্ধেকের অধিক ধান হয় না। কারণ যথাসময়ে বৃষ্টি পাত না হওয়া। ইহাতে চাষীদের যারপর নাই কষ্ট হইয়াছে। অসময়ে বৃষ্টি ছাড়া খড়্‌কে মারা ও গাঁজ হওয়া রোগ আছেই।

এবৎসরও যথাসময়ে বৃষ্টি হইল না। কতক দেশে গত ২রা শ্রাবণ ও কতক দেশে ইহারও পরে চাষোপযোগী জল হইয়াছে। চাষীরা প্রাণপণে চাষ আবাদ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সারিতে চেষ্টা করিয়াছে। কারণ রোপণ কার্য্য নামীতে হইলে ফসল কম হয়। এবার রোপণ কার্য্য নামীতে হইয়াছে ফসলও কম হইবে কিন্তু চাষের অনেক "ঈতি" জুটিয়াছে ও জুটিতেছে। প্রথমতঃ এ অঞ্চলে মজুরের বড়ই অভাব হইয়াছে মুনিষ বা মজুরদের বেতন দৈনিক ॥০ আনা ও দুইবেলা খাবার ও তেল জলপান। উপযুক্ত চাষা মুনিষ একান্তই দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ গত আষাঢ় মাহা হইতে এ অঞ্চলে গরুর "আওসা" রোগ (যাহা এসময়ে চাষের মাথায় বজ্রাঘাত তুল্য) হইতেছে। ইহাতে সমস্ত গ্রামবাসীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়াছে। যে চাষীর গরুর এই রোগ হইয়াছে তাহার যে চাষেরা কত ক্ষতি ও মনের ভাব যে কিরূপ তাহা অনুমেয়। সকলেই মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছে।

গ্রামবাসীরা এই রোগের ঔষধ স্বরূপ কারবলিক এসিড ও ফেনাইল ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে কেবল মাত্র ঘা ভাল করে।

অতএব বিনীত নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে যদি কোন মহাত্মা ভগবৎ কৃপায় এই ঈতি আওসা রোগের কোন উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ও রোগ হইলে, রোগ আশু আরাম কারক ঔষধ জ্ঞাত থাকেন তবে সংবাদ পত্রে লিখিয়া গ্রামবাসীদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। শ্রীগদাধর দত্ত শিক্ষক, পাঁইটা স্কুল জেলা বর্দ্ধমান। (এডুকেশন গেজেট)

বাঙ্গালার কৃষক

বাঙ্গার কৃষককুলের দুইটী প্রধান শত্রু, প্রথম দারিদ্র্য এবং দ্বিতীয় অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশে আপামর সাধারণ কষ্ট উপভোগ করে। দেশের জন সাধারণের সুখদুঃখ বা স্বার্থ ও অনর্থ যাহার সহিত বিজড়িত, সেদিকে কয়জনের দৃষ্টি পড়ে?

একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে যখন অনাবৃষ্টি হইল, তখন অনেকে দুর্ভাবনায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। একেই চারিদিকে খাদ্যশস্যাদি অগ্নিমুল্য, তাহার উপর অনাবৃষ্টি, ভাগ্য বিধাতা আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কি ঘোর কষ্ট ও অভাব সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমরা আকুল হইয়া পড়িলাম। আবার এই যে মেদিনীপুর, ঘাঁটাল, কাঁথি প্রভৃতি স্থান অতিবৃষ্টি ও বন্যার জলে ভাসিয়া গেল ক্ষেতের শস্য ক্ষেতেই পচিয়া নষ্ট হইল, তাহাতেও আমরা কি করিলাম? বড় জোর কাগজে একটু হা-হুতাশ করিলাম, না হয় বন্যাপীড়িত স্থানে সাহায্যের জন্য সরকারকে ও তথা দেশবাসীকে অনুরোধ করিলাম, হয় ত বা দুর্ভাবনার কথা তুলিয়া খুব একটা আন্দোলন করিলাম। বাস, ঐ পর্য্যন্ত! কিন্তু ইহার অধিক আমরা কখনও কিছু করিয়াছি কি? জগতের অন্য দেশেও ত অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি আছে, কিন্তু আর কোথাও কি এ দেশের মত দৈব আধিবশতঃ দুর্ভিক্ষ হয়? না, লোকে কেবল হা হুতাশ করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিলাম বলিয়া মনে করে?

ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেও অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়ম কেহ রোধ করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় উহার প্রকোপ নষ্ট হইতে পারে। অনাবৃষ্টি হইলে মানুষের চেষ্টায় জলের সংস্থান হয়, অতিবৃষ্টি হইলে মানুষের চেষ্টায় অতিরিক্ত জল নিকাশেরও উপায় উদ্ভাবিত হয়। য়ুরোপে বা আমেরিকায় বা ভারত ছাড়া কোনও সভ্য দেশে অনাবৃষ্টির ফলে শস্য হানি ঘটিয়াছে, এমন কথা শুনা যায় না। ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ এই যে, সে সকল দেশে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষীকুল সমবায় প্রথা বদ্ধ হইয়া কৃষির স্বার্থ সর্ব্বদা সংরক্ষণ করে। সেচের জলের জন্য তাহারা সমবায় প্রথায় কার্য্য করে, নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগ্রহ করে, সর্ব্বদা হাত জোড় করিয়া আকাশের কাছে জলের জন্য প্রার্থনা করে না। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন বা শস্যোৎপাদন ও সংগ্রহের জন্য তাহারা ঐ সমবায় প্রথায় নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করে।

আর আমাদের দেশে? মান্ধাতার আমলের প্রথায় কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে,

এই প্রথায় এখনও কৃষিকার্য্য চলিতেছে। কৃষককুল যে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবস্থায় এতকাল কাটাইয়া আসিয়াছে, এখনও সেইরূপ কাটাইতেছে। দেশের কৃষির ভার এখনও জীর্ণ কুটীরের জীর্ণ কৌপীনধারী অজ্ঞ নিরক্ষর কৃষকের উপর। তাহাদের সুখে দুঃখে দেশের লোকের সহানুভূতি আছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমবায় প্রথার উপকারিতা কি তাহারা বুঝে না, কেহ তাহাদিগকে বুঝায় না। অতি দরিদ্র তাহারা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নামই শুনিয়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে যে তাহারা আকাশের পানে হতাশের ন্যায় তাকাইয়া হা হুতাশ করিবে ও মান্ধাতার আমলের হল ও হেলে গরু সম্বল করিয়া চাষাবাস করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

সরকার ও যে তাহাদের অবস্থায় উন্নতিকল্পে অন্য সভ্যদেশের সরকারের ন্যায় প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। সরকারের একটা কৃষিবিভাগ [Agricultural department] আছে সত্য। কিন্তু এই বিভাগ দেশের কৃষির ও কৃষকের উন্নতি বিধানের জন্য কি করিয়াছেন ? অনেকে বলেন, এই বিভাগটা শ্বেত হস্তীর মত শোভার দ্রব্য, খায় অনেক, কাজ দেয় অতি অল্প। এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই বিভাগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু ইহাতে নিরক্ষর অজ্ঞ দরিদ্র দেশীয় কৃষককুলের কি উপকার হইয়াছে ? তাহাদের যেমন অবস্থা প্রথমে সেই অবস্থানুরূপ মান্ধাতার আমলের ব্যবস্থারই উন্নতি সাধন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আধুনিক কালোপযোগী বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। সরকারের কৃষি বিভাগে এই ভাবে কার্য্য হইতেছে কি ? এতদিন কৃষিবিভাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ একটীও কৃষক কি ইহার প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক কৃষি বিদ্যায় হাতে খড়ি পাইয়াছে ? আমাদের মনে হয়, একটীও পায় নাই ; তবে অনর্থক এই শ্বেত হস্তী পোষা হইতেছে কেন ? দেশে এই কৃষি বিভাগ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেও যেমন ভাবে এ দেশে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইত, এখনও সেইরূপ হইতেছে। পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই, তবে কিসের জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি ও পুষ্টি ? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি করিয়া জমীর পাট করিতে হয়,কিরূপ সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়,কিরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফসল (ফল, ফুল শস্য) আকারের বৃহৎ ও সংখ্যায় অধিক করিতে হয়,—এই সমস্ত শিখাইবার এখনও সময় আসে নাই। এখন যাহাতে কৃষক অনাবৃষ্টি হইলেও আকাশের জল ব্যতীত অন্য উপায়ে সেচের জল সহজে ও অল্পব্যয়ে প্রাপ্ত হয় এবং অতিবৃষ্টি বা বন্যা হইলেও স্বল্পকাল মধ্যে সহজে জল নিকাশ করিয়া শস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এমনই শিক্ষা কৃষককুলকে দিতে হইবে।

এই শিক্ষা দিতে হইলে সরকার ও দেশের লোককে একযোগে কাজ করিতে হইবে। সরকার ও দেশের লোক এমন চেষ্টা করিবেন, যাহাতে কৃষককুলেরম ধ্যে সমবায়সমিতি

সমূহের প্রতিষ্ঠা হয়। সমবায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ না করিলে বড় বড় কার্য্যানুষ্ঠান করা যায় না। য়ুরোপে ও অন্যান্য সভ্যদেশে আজকাল যত্র তত্র এইরূপ সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তথাকার কৃষক এ দেশের কৃষকের মত দরিদ্র নহে, তথাপি তথাকার সরকার তাহাদের প্রচুররূপে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এই সকল সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাতে সমিতিসমূহ কার্য্যক্ষম ও সফল হয়। সুতরাং অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির প্রকোপ নিবারণে সমর্থ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে ঐ সকল সমবায়-সমিতি সমর্থ হয় ; সুতরাং সে দেশের কৃষক অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিকে ভয় করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশের কৃষক অজ্ঞ, নিরক্ষর। সুতরাং তাহারা সমবায় প্রদ্ধতির মহিমা বুঝে না। কেহ তাহাদের সে মহিমা বুঝাইবার চেষ্টাও করে না। পরন্তু তাহারা অতি দরিদ্র। অহোরাত্র দারিদ্র্যের তাড়না, অত্যাচারী জমিদার নায়েবের অসহ্য অত্যাচার এবং সুদখোর রক্তপিপাসু মহাজনের তাগাদা তাহাদিগকে জড়ভরত করিয়া রাখে, তাহারা লোকের সাধুতায় বিশ্বাস করিতে সহজে সম্মত হয় না। ফলে যে বিশ্বাসের উপর সমবায়-পদ্ধতি নির্ভর করে, সেই বিশ্বাসের অভাবে উহাদের মধ্যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে এত বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। দারিদ্র্যের ফলেও সমবায়-সমিতি তিষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

সুতরাং সরকারকে এখন কৃষিবিভাগের বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা কৃষককে জমির পাট, বীজবপন, ফললোৎপাদন ও পুষ্টিসাধন কর্ম্ম না শিখাইয়া সর্ব্বাগ্রে সমবায়-পদ্ধতি অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখান এবং অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পর কৃষকরা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির কুফল নষ্ট করিতে শিখিলে তখন তাহাদিগকে অন্যান্য শিক্ষা দিলে চলিবে।

সত্য বটে, সরকার যৌথ ঋণদানসমিতি-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সত্য বটে, এই সকল সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষক মহাজনের অত্যাচার হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কিন্তু এই সকল সমিতির কার্য্যকারিতা কতটুকু ? এই সকল সমিতি কেবল ঋণদান করিতে পারে, রায়ৎকে সুদে টাকা ধার দিয়া তাহাকে কিছু সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত করিতে পারে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সমবায় বা যৌথ কার্য্য অন্যান্য দেশে ইহা অপেক্ষা যে অনেক অধিক উপকার সাধন করিয়াছে তাহা এদেশে সম্ভব হইয়াছে কি ?—যৌথ ঋণদানসমিতি-সমূহ বাঙ্গালার বন্যা নিবারণে অথবা বন্যাকষ্ট প্রতীকারে সমর্থ হইয়াছে কি ? সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত যৌথ ঋণদানসমিতি সমূহের কার্য্যের তালিকা বৃদ্ধি করা হউক। কৃষককুলের সমবায়ের স্থানে স্থানে এক একটি সমবায় সমিতি গঠিত হউক ; সরকারের যৌথ ঋণদান সমিতিগুলি ইহাদের কেন্দ্র হউক। এই সমস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে বৈজ্ঞানিক

উপায়ে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির প্রকোপ নিবারণের চেষ্টা সফল হইতে পারে। একের চেষ্টায় যাহা হয় না, পাঁচজনের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় তাহা সফল হইতে পারে।

আমাদের দেশের ধনবান ও অবস্থাপন্ন লোকগণেরও এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা সহরে বসিয়া দেখেন, র‍্যালির বাড়ীর চাল রপ্তানি, ডাফের বাড়ীর চা রপ্তানি, বার্ডের বাড়ীর পাট রপ্তানি। কিন্তু 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার' গর্ভ হইতে এই সকল দ্রব্য কি উপায়ে উৎপন্ন হয়, তাহার খবর তাঁহারা রাখেন কি না সন্দেহ।

পরিধানে টেনা ছাড়া নাই, চালে খড় নাই, পেটে অন্ন কখনও জোটে, কখনও বা জোটে না, ম্যালেরিয়ার জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার,—এমন যে দেশের কৃষক জলে ঝড়ে কাদায়, রোদের তাতে, হিমের রাতে কষ্ট পাইয়া তাঁহাদেরই জন্য ঐ চাল, চা, পাট চাষ করিতেছে, তাহার কি তাঁহারা খবর রাখেন? যদি রাখেন, তবে তাঁহাদেরই এই দরিদ্র ভাইদের সাহায্যে তাঁহারা অগ্রসর হন না কেন? তাঁহারাও শিক্ষিত, সকল দেশের সকল খবর রাখেন। তাঁহারা ত জানেন, আজকাল সকল সভ্যদেশেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমবায় প্রথায় সকল কাজ হইতেছে এবং তাহাতে কার্য্যের ফল সন্তোষজনক হইতেছে। তবে তাঁহারাই বা তাঁহাদের দেশের ভাইদের লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমবায় প্রথায় কার্য্য করিতে আগ্রহান্বিত হন না কেন? আজকাল তো বিস্তর জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী, লিমিটেড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইতেছে। উহাতে সেয়ার উঠিতে বিলম্ব হয় না। তবে কৃষকদের সমবায়সমিতি প্রতিষ্ঠাতেই বা টাকা উঠে না কেন? দেশে এমন মানুষ কি নাই, যিনি এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া পথ দেখাইয়া সকলের চক্ষু ফুটাইতে পারেন?—বসুমতী।

বসুমতী পত্রিকা বাঙালার দুর্দ্দশার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে তাহার কোন কথাই অতিরঞ্জিত নহে। বাঙালার চাষীরা চিরদিনই দীন হীন কাঙাল—তাহারা সমবায় নীতি শিখে নাই—তাহাদিগকে এই পথে চালাইবার লোকও নাই। আজ পাঠ চাষীরা দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যাহারা পাট কেনে তাহারা ইচ্ছামত কেনে কখন বা নিজেদের আবশ্যকমত পাট সংগ্রহ করিয়া লইয়া কেনা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে—তাহারা যখন ইচ্ছা নিজেদের ইচ্ছামত দরে কিনিতে পায়—ক্রেতাগণের একতা—আছে টাকা আছে তাই তাদের কথায় বাজার উঠে নামে। কিন্তু নিরন্ন চাষীর মাল ধরিয়া রাখিবার শক্তি নাই, তাহাকে উৎপন্ন শস্য বেচিতেই হইবে নতুবা তাহার খাওয়া পরা চলিবে না, জমিদারের খাজনা দেওয়া হইবে না, মহাজন ঘর রক্ষা করা হইবে না—নিস্বঃ বলিয়া তার এই বিপদ। খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য—চাষীরা সেই জন্য এখন অধিক পয়সা পাইতেছে বটে—কিন্তু জমিদার, মহাজন, দালাল, আড়তদারকে দিয়া তাহার বেশী কিছু উদ্বৃত্ত হয় না। জীবন ধারণের মত যাহা কিছু থাকে তাহা হইতে তাহাকে চারিগুণ অধিক মূল্যে আচ্ছাদন বস্ত্র কিনিতে হয়, সংসারের অন্যান্য ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়, হাল গরু ও কোদাল কাস্তে অতি দুর্ম্মূল্যে খরিদ করিতে হয় এবং কিছু অধিক টাকা এক সঙ্গে ঘরে আসিলে কিছু কিছু অপব্যয়ও হয়—সুতরাং তাদের দশা সেই সমানই থাকে।

আমাদের দেশে চাষের প্রথায় পরিবর্ত্তন ও উন্নতি নিশ্চই আবশ্যক। জমিতে জল প্রয়োগ, জল নিকাশের সুব্যবস্থা, সময়োচিত ও উপযু সার প্রদান দ্বারা ফল শস্যের উন্নতি, কর্ত্তব্য। উপযুক্ত কর্ষণ ও কারকিত ইহা আমাদের আবশ্য কর্ত্তব্য। উপযুক্ত জমি, উত্তম সার ও সুবীজের একত্র সমাবেশ চাই—ইহার কোনটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সুবীজের কথা আমরা সাধারণতঃ ভাবিনা—এত বড় সুবৃহৎ দেশে সুবীজ উৎপন্নের জন্য কয়টি ক্ষেত্র আছে? গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের চেষ্টা এইদিকে সম্যক নিয়োজিত হয় নাই। জমিদারগণ তাঁহাদের জমির উন্নতি ও চাষের উন্নতির বিষয়ে উদাসীন এবং অসহায় সুতরাং উৎসাহহীন। লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে এমতাবস্থায় সমবায় পদ্ধতিতে কার্য্যকরা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

ভারতে এমন পতিত জমি আছে যে যেখানে জলের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে আকের জন্য বা তুলার জন্য কিম্বা যব, গম, বৈ চাষের জন্য মটর লাঙ্গলের উপযোগী সুবৃহৎ ক্ষেত্র স্থাপন করা যাইতে পারে। বিস্তৃত ফলের বাগানের মধ্যেও ঐ লাঙ্গল চালান যায়। বাঙ্গলার মাটি মটর লাঙ্গল বা এমেরিকান অন্য কলের লাঙ্গল চালাইবার উপযোগী নহে—বাঙ্গলার নরম মাটিতে ঐ সকল লাঙ্গল চলিবে না। কলের লাঙ্গল বা উন্নত কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া কেহ যেন অযথা অর্থ নষ্ট না করেন। আমাদের সকল বিষয়ে আগ্রহ ও উদ্যোগ থাকা উচিত কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজে নামিতে হইবে কারণ অপব্যয় করিবার মত পয়সা আমাদের নাই।

আমরা কিন্তু সকলে একটা ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। কৃষির উন্নতি করিতে হইলেই মোটর চালিত লাঙ্গল, বীজ বনের কল শস্য আহরণের কল এ দেশে আমদানী করিতে হইবে ইহাই অনেকের উপদেশ। কাজে, কলকব্জা লাগাই কেন ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত, উদ্দেশ্য পরিশ্রম ও সময় বাঁচান। য়ুরোপ ও এমেরিকায় হাতে কাজ করিবার জন মজুর মিলে না তাই তাহাদিগকে কলের আশ্রয় লইতে হইয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের কাজের লোকের অভাব এখনও তত হয় নাই। ভারতের লোকে উপযুক্ত কাজ না পাইয়া ভারতের বাহিরে পূর্ব্ব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যাইয়া কুলিগিরি করিতেছে। প্রত্যেক কাজে কলকব্জা চলিলে যাহারা কর্ম্মচ্যুত হইবে তাহারা করিবে কি? বিলাতে এই অকেজো লোকের জন্য কত ভাবনা—খোরাকের (Unemployment Pension) ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টকে করিতে হয়। ইহা ছাড়া আর এক সমস্যা আছে—কলের লাঙ্গল (Motor tractors) চালাইবার জন্য বড় বড় ১।। হাজার একর পরিমিত একটি ক্ষেত্র চাই। কলের লাঙ্গল চালাইতে

হইলে অনেক চাষীর অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত ভাঙ্গিয়া এক করিতে হইবে—চাষীরা অগত্যা কেহ কেহ মূলধনীর অধীনে মজুরী করিবে—তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ হইবে—ইহা কতদূর বাঞ্ছনীয়! অবশ্য দেশের সাবেক ধরণের হাল, লাঙ্গলের সময়োচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, চাষের ছোট ছোট যন্ত্রাদিরও প্রচলন প্রয়োজন, জল তোলা ও জল নিকাশের জন্যও যন্ত্রাদির প্রচলন করিতে হইবে কিন্তু দেশে ঐ সকল যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও মেরামত হওয়া চাই। পরমুখাপেক্ষিতা সুখের হউক কোনকালেই প্রকৃত পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে।

বঙ্গের কৃষি-বিভাগ যে কোন কার্য্য করিতেছে না এ কথা ঠিক বলা চলে না। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ ভাল ধান ও পাট চাষের প্রবর্ত্তন জন্য চেষ্টা করিতেছে, যতদূর সম্ভব আলু চাষের বিস্তার জন্য আয়োজন করিতেছে,—যেখানে তুলা চাষ সম্ভব তথায় ভাল জাতীয় চাষের ব্যবস্থা হইতেছে—কিন্তু ইহা বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সম্যক ও সম্পূর্ণ চেষ্টা নয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দেশের লোক—প্রজা-জমিদারের সমবেত চেষ্টা না হইলে কেবল মাত্র কৃষি-বিভাগের দ্বারা কতকটা সাফল্যলাভ হওয়ার সম্ভাবনা ইহাও ভাবিবার কথা। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কার্য্যের ফলাফল বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ হয়—এবং সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রচার দ্বারা উহা সাধারণকে জ্ঞাত করা হয় কিন্তু তাহা কয়জনে পড়িতে পায় এবং সাধারণ চাষীর মধ্যে কয়জনই বা পড়িতে জানে। চাষীরা সামান্য কিছু শিক্ষা না পাইলে কোন সুবিধা জনক ব্যবস্থা হইবার আশা নাই। কিন্তু সাধারণে সেরূপ শিক্ষা বিস্তারের সে আয়োজন কৈ বা কবে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। দিনে চাষীরা নানা কাজে ব্যস্ত, রাত্রে একটু সময় আছে তখন তাদের শিখাবে কে? সেই জন্য বলিতে হয় যে আগে চাষীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হউক তারপর কোন বিশেষ বিশেষ বিভাগের ফলাফল জ্ঞাপনের দোষগুণ বিচার করা যাইবে।

গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের কৃষির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও তাহা সম্যক নহে একথা আমরা শতবার বলিব কারণ হাতে হাতিয়ারে চাষীগণকে নূতন প্রণালীতে নূতন ফল শস্যের চাষাবাদ শিখাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা না থাকারই মধ্যে। তাহার জন্য কয়জন পর্য্যটক আছে এবং কয়জন চাষীই বা নূতন কিছু শিখিয়াছে তাহা আমরা গণণা করিয়া পাই না। বাঙালায় প্রতি জেলায় জেলায় যখন কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপিত হইবে, যখন তাহার সঙ্গে এক একটি কৃষিবিদ্যালয় সংযুক্ত থাকিবে এবং সদর হইতে মহকুমায় যাইয়া চাষীগণকে নব নব পদ্ধতিতে অভ্যস্থ করিবার ব্যবস্থা হইবে তখন জানিব যে কিছু কাজ হইল। আসলকথা এই যে, সব কাজ গভর্ণমেণ্ট করিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কাজত আমাদের—আমাদের শতগুণ চেষ্টা চাই এবং যতদিন না কার্য্যসিদ্ধ হয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের ন্যায্য দাবী কখনই ছাড়িব না, এরূপ প্রতিজ্ঞাও থাকা চাই—নতুবা ক্রমাগত দুঃখের কাহিনী বাড়াইয়া কোন কালে কোন ফল হইবে না।

এমেরিকান ও বিলাতী মটর।

য়ুরোপ ও এমেরিকায় মটর চাষের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সম্পূর্ণ সার Complete Fertilioer অর্থাৎ যে সারে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস্, পটাস যথোপযুক্ত (মাত্রায় আছে) ব্যবহার করিয়া এবং বীজ নির্ব্বাচনদ্বারা ঐ ফল দাঁড়াইয়াছে।

Garden Pea Pisum Sativum.

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ



এমেরিকান বা য়ুরোপীয় টেলিগ্রাফ টেলিফোনজাতীয় মটর।

গুঁটি লম্বা ও চওড়া,দানা বড়।

উপরের খোসা পর্য্যন্ত মিষ্ট।

আমেরিকান বা বিলাতী মটরের শুঁটী সাধারণ দেশী মটর অপেক্ষা প্রায় তিন চারিগুণ বড়, খাইতে সুমিষ্ট, খোসা সমেত খাইতেও নরম, বীজ কাঁচা অবস্থায় কুলের আঁটির মত।

মৃত্তিকা—সারযুক্ত হাল্কা দোয়াঁস মাটি বিলাতী মটরের উপযোগী। যে কোন প্রকার সব্জীচাষ করা হউক না কেন, জমি লাঙ্গলাদি দিয়া উত্তমরূপ প্রস্তুত করা হইলে, ফসলের ফলন বেশী পরিমাণে হইবে সন্দেহ নাই। অতএব যখন যে কোন প্রকার চাষের আবশ্যক. মৃত্তিকা যতদূর পারা যায় ধূলির ন্যায় (ঢেলা বিহীন) করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সার—যে কোন প্রকার পুরাতন গোবর সারের সহিত অল্লাধিক পরিমাণে হাড় চূর্ণ ও ছাই মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে মটরচাষ ভাল হয়। ছাই ও কিঞ্চিৎ চূণ মিশ্রিত পুরাতন গোময় সারও দেওয়া যাইতে পারে। নূতন সার (অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণরূপে সারে পরিণত হয় নাই) প্রয়োগ করা উচিত নয়। মটর প্রভৃতির জন্য পটাস প্রধান সার প্রয়োজন। এক বিঘায় ১৮।২০ পাউণ্ড পটাস এবং সম পরিমাণ ফস্‌ফরাস প্রয়োগ করা বিধেয়। প্রথমাবস্থায় গাছ বাড়াইবার জন্য নাইট্রোজেনও চাই, তবে মাত্রায় সামান্য।

বপন প্রণালী—সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মৃত্তিকা রীতিমত প্রস্তুত হইলে, দুই তিন ইঞ্চি গভীর ও আবশ্যকানুযায়ী দীর্ঘ গর্ত্ত বা নালা কাটিতে হইবে। প্রত্যেক নালা পার্শ্ববর্ত্তী নালা হইতে মটর গাছের ছোট মাঝারি ও বড় হিসাবে তিন ফুট হইতে ছয় ফুট পর্য্যন্ত অন্তর থাকিবে। এইরূপে নালা প্রস্তুত হইলে, প্রতি নালার মধ্যস্থলে দুই বা তিন ইঞ্চি গভীর মৃত্তিকাতে মটর বীজ বসাইতে হইবে। প্রত্যেক খোপে দুই দুইটি করিয়া প্রত্যেক বীজটা এক ইঞ্চি পৃথক বসাইবে। একটী খোপের অন্তর আর একটী হইতে ৬ ইঞ্চি হওয়া চাই। দুই ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়। বীজ বপন করিয়া যাহাতে কাটবিড়াল পাখী প্রভৃতি বীজ খাইয়া না ফেলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে।

জলসিঞ্চন—মাটি শুষ্ক থাকিলে বীজ বপন করিয়াই জল দিতে হইবে। মাটি সরস থাকিবে অথচ সেঁতা বা অতিরিক্ত ভিজা হইবে না। মটর সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মটর গাছে বেশী জল দিবার আবশ্যক করে না। ইহা অনেকটা "তাত" (জলাভাব) সহ্য করিতে পারে।

অবশিষ্ট কার্য্য—গাছ বড় হইলে যষ্টি বা শাখা প্রশাখা গাছের অবলম্বস্বরূপ ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে পুতিয়া দিতে হয়। ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে তুলিয়া ফেলা ও গাছের মূলদেশে পার্শ্ব হইতে টানিয়া সামান্য মাটি চাপা দেওয়া ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই করিতে হয় না।

বিশেষ কার্য্য—বড় মটরশুঁটি উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা হইলে গাছে অল্পবিস্তর ফুল ধরিলে গাছের অগ্রভাগ (ডগা) অঙ্গুলি দ্বারা ছিঁড়িয়া দিতে হয়।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ।৫সের বীজ বপনের আবশ্যক হয়। সখের জন্য চাষ করিলে, পাতলা বীজ বপন করাই ভাল। দেশী ও ওলন্দা মাঠময় মটর ছড়াইয়া বোনা হয়। ইহাতে বীজ কিছু অধিক আবশ্যক হয়। কারণ এরূপ বুনিলে অনেক বীজ নষ্ট হয়। চষা ক্ষেতে বীজ বুনিয়া, পুনরায় চষিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয়। চষিয়া মৈ দেওয়া আবশ্যক।

দেশী মটর বা কলাই শুঁটী।

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক।



এমেরিকান ওয়াণ্ডার মটর এদেশে চাষ করিলা সেই বীজ উৎপন্ন মটর হইতে এই প্রকার ফসল জন্মিয়াছে শুঁটী ও দানা কিছু ছোট হইলেও ইহা ফলনে অধিকও আস্বাদে সুস্বাদু হইয়াছে কৃষকগণ ধান বা পাটের বিস্তৃত এটেল দোয়াস ক্ষেত্রে যে মটর চাষ করিয়া থাকে এটেল মাটির গুণে তাহাতে উৎপন্ন মটরগুলির দানা একটু শক্ত হয়। ঐ মটর শুষ্ক করিয়া দাউলরূপে ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেতের দাউল রন্ধনেও সহজে সুসিদ্ধ হয় না। কিন্তু বাগানের দোয়াস মাটিতে যে মটর চাষ হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত নরম এই জন্য ইহার শুটী কাঁচা অবস্থায় তরকারিতে ব্যবহৃত হয় কিম্বা দাউল করিলেও উৎকৃষ্ট হয় ও শীঘ্র গলিয়া যায়। বাগানে চাষ করিবার জন্য দেশী মটর যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—পাটনাই শাদা, লাল ও কোঁকড়ান ওলন্দা ও সবুজ—ইহার মধ্যে ওলন্দা মটরই উৎকৃষ্ট। ইহার বীজ কোঁকড়ান ও শুঁটী অত্যন্ত নরম—ইহার শুঁটী খোলাসুদ্ধ তরকারিতে দিলে গলিয়া যায়—ইহা প্রায় বিলাতী মটরের সমতুল্য। ছাই মিশ্রিত পুরাতন গোবর-সারই ইহার উৎকৃষ্টসার। হালকা দোয়াস মাটি না হইলে মটর চাষ ভাল হয় না। দেশী মটরের লতা ২০।২২ইঞ্চির অধিক হয় না। চাষের উন্নতি হেতু খুব লম্বা লতা ও বড় শুঁটী ও বড় দানা হয় বটে কিন্তু বিলাতীর অনুরূপ কখনই নহে। দেশী মটর ফলনে বিলাতী অপেক্ষা অধিক। এই জন্য আশা হয় যে বিলাতী ও দেশীর সঙ্কর উৎপাদিত বীজ হইতে ফলনে অধিক, বড় দানা, বড়

শুঁটি মটর জন্মিতে পারে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি চেষ্টা এদিকে কতকটা সফল হইয়াছে

দেশী মটর চাষে—বিঘা প্রতি দশ সের বীজ লাগে।

রোপণ প্রণালী—বিলাতীর অনুরূপ কিম্বা হাতে ছড়াইয়া বোনা হয়।

মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া ঘাস বাছিয়া দেওয়া ও আবশ্যকমত জল সেচন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই।

বিলাতি বা এমেরিকান মটরের গাছ কতগুলি ৪।৫ফিট লম্বা হয় যেমন টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, এমেরিকান গ্রাডস, ব্লুইম্পিরিয়াল, চাম্পিয়ান অব ইংলণ্ড প্রভৃতি।

কতক গুলির গাছ ২০ ইঞ্চ হইতে ২৪ ইঞ্চ হয় যেমন ডোয়ার্ফ চ্যাম্পিয়ান, প্রলিফিক্; প্রাইড অফ মারকেট ইত্যাদি।

আর কতকগুলির লতা আরও ছোট। ইহার লতা ১।১॥ ফুট ইহার অধিক নহে যেমন এমেরিকান ওয়াণ্ডার।

বিলাতী বা এমেরিকান মটর নালি কাটিয়া চাষ করিতে হয় এবং মটর লতা পাকাঁটি বা কঞ্চির বেড়ায় তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের চাষিরা যেমন পান ক্ষেতে পাঁকাটির বেড়া দেয় এই সকল লতার আশ্রয় জন্য সেই পাঁকাটীর বেড়া বুনিয়া দিলে বেশ সুবিধা হয়, কঞ্চিরও বেড়া মন্দ হয় না। এই রূপে মটর চাষে সুবিধা এই যে লতা পরস্পর জড়াইয়া গাছ হাপসাইয়া যায় না, গাছের গোড়া কারকিত মেরামত সহজে করা যায়, শুঁটি তোলা নির্ব্বিঘ্নে হয়, পায়ের চাপে লতা দলিত হয় না। নালা কাটিয়া সার ছড়াইলে নালাতে সার দিলেই চলে, ইহাতে সারের অপব্যবহার হয় না।

য়ুরোপে বা এমেরিকায় সবুজ মটরের চাষই সমধিক। সবুজ মটর বলিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার শুঁটি ও দানা সবুজ। শাদা ম্যায়োফ্যাট মটর আছে, তাহার দানা শাদা কিন্তু শুঁটি সবুজ। যেমন আমাদের দেশের শাদা পাটনাই মটর। ম্যারোফ্যাট মটরের গাছ ৪।৪॥০ ফিট লম্বা হয়।

শুঁটি খুব বড় না হইলেও মাঝারি রকমের, খাইতে বিশেষ সুস্বাদু। সুগার পী বা শাদা মটর আরও অনেক মটর আছে তাহাদের মিষ্টত্ব অধিক বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছে শর্করা মটর বা সুগার পী।

কৃষক ও জমিদার উভয়ের সম্বন্ধ

রায়ত পত্রিকা—এই পত্রিকাখানি, চাষের খবর ও চাষীর খবর জানিবার জন্য আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠকরি কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশী কিছু বিশেষ খবর আমরা ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিনা—পরন্তু এই পত্রিকা রায়তের পক্ষ হইয়া জমিদার ও অন্যান্য অনেককে যেরূপ তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করেন তাহা যেন বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন থাকায় বাঙালায় প্রজাগণের অনেকের জমিতে কায়েমী সত্ব আছে এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাসত্ব আইন করিয়া যাহাদের জমিতে কায়েমী সত্ব নাই তাহাদেরও জোত সত্ব জন্মান হেতু তাহাদিগের জমির জোত কেহ ছাড়াইতে পারে না। বাঙালায় চাষী নির্দ্দিষ্ট হারে জমির খাজনা দেয়, জমি ভোগ করে, জমিদার তাহার খাজনার হার সহজে বৃদ্ধি করিতে পারেন না। জমির উৎপন্ন শস্যের মূল্য এখন ১০গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু এই বৃদ্ধিহেতু জমিদার কখন একপয়সা অধিক খাজনা আদায় করেন না বা করিতে পারেন না। কোন কোন জমিদারীতে কিছু আত্তবাব আছে বটে কিন্তু তাহা থাকা সত্ত্বেও প্রজাগণ সেই জমি, জমা লইয়াছে। অধিকন্তু দেখা যায় যে জমিদারীতে আত্তবাব অধিক তাহার জমির হারও খুব কম। উদ্দেশ্য টাকায় জমির খাজনা সম্পূর্ণ না লইয়া অন্য রকমে তাহা পোষাইয়া লওয়া। ইহাতে যে কি গর্হিত অপরাধ তাহা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কোন কোন জমিদার প্রজা পীড়ক বটে কিন্তু তাই বলিয়া সকলকে দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তি যুক্ত নহে। পূর্ব্বকালে জমিদার গণ এবং রাজা জমির উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতেন—"ষষ্ঠাংশ বলীস অগ্রহিত।" এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি উৎপন্ন শস্যের ৬ ভাগের ১ ভাগের দাম কত? বিঘাপ্রতি ২।০ কিম্বা ১॥০ টাকার খাজনার অধিক নহে কি? ভাগ জোতেও অনেক জমি বিলি হয় এবং প্রজা সচ্ছন্দচিত্তে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক জমির মালিককে দেয়—কেন দেয়? ইহাতেও তাহার লাভ থাকে বলিয়া দেয়—ইহা সত্য নহে কি?

রায়ত তাহার জমার জমির কোন গাছ কাটিতে পারে না কিন্তু তাহার ফল ভোগ করে। এই সর্ত্তে যদি জমি লওয়া হয় তবে রায়ত সে সম্বন্ধ বজায় রাখিবে না কেন?

রায়ত চাষের জমির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, আইন এই রকম। আইন মন্দ কিসে? সকলে, ইচ্ছামত জমির পরিবর্ত্তন (Conversion of land) ঘটাইলে চাষের জমি থাকে কোথায়—আইনের আমরা উদ্দেশ্য বুঝিব না কেন? জমিতে পুষ্করিণী কাটা, পাকা ঘর দুয়ার নির্ম্মাণ প্রজা ইচ্ছামত করিতে না পাইলেও জমিদারের

অনুমতি লইয়া করিতে পায় এবং তাহার জন্য কিছু সেলামি দিতে হয়—কেন দিবে না, অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাহার ভোগারামের জন্য সে কিছু অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে কেন—আমরা এই কারণে অকারণ হৈ চৈ করি কেন? জমিদার প্রজা সাধারণের জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন তাহা সাধারণের, নিজস্ব কাহারও নহে। নিজস্ব একটি আবশ্যক হইলে কিছু অতি ব্যয় হইবেই ত।

আমাদের বিবেচনায় জমিদার ও প্রজার বিরোধ না বাঁধাইয়া বরং পরস্পরের সম্বন্ধ যাহাতে মধুর হয় তাহা করা উচিত। প্রজাকে জমিদার রক্ষা করিবে এবং জমিদার প্রজাকে রক্ষা করিবে এইত ভাল। প্রজার চাষ নষ্ট হইলে খাজনা আদায় হয় না কিন্তু জমিদারকে যে কোন প্রকারে হউক গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব যোগাইতে হয়—ইহার জন্য জমিদারকে সময়ে সময়ে ঋণ গ্রস্ত হইতে হয়। জমিদারের সত্ত্ব নষ্ট হইলে প্রজার সত্ত্ব থাকিবে কোথায়—সুতরাং জমিদার নিজের সত্ত্ব রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রজার সত্ত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। খাজনা অনাদায়ে অবশ্য প্রজাকে আইন সঙ্গত সুদ দিতে হয় কিন্তু তাহার হার কোন মতেই অত্যধিক নহে। অনেক সময় সুদ সহ খাজনা মকুব করিতে হয়। জমিদারের দায়িত্ব অনেক—শস্যহানি হইলে প্রজাকে বীজধান যোগাইতে হয়, তাহাদের তাহাদের হাল গরু কিনিয়া দিতে হয়, বাকী পড়া খাজনা দশ বৎসরে আদায় লইতে হয়, তাহাও সব আদায় হয় না। ভাল জমিদার দুর্দ্দিনে প্রজার খোরাক পর্য্যন্ত যোগান, আধিব্যাধি অন্নকষ্টের সাথি—প্রজারক্ষার্থ তাহাদের ঔষধ পথ্য ব্যবস্থা জমিদার করিতে বাধ্য হন। কেননা প্রজা থাকিলে তবেত জমিদারী, প্রজা না থাকিলে জমিদারী থাকে কোথায়!

জমিদার প্রজায় পিতাপুত্র সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ কত মধুর। জমিদার প্রজা একান্নবর্ত্তী পরিবার—এই ক্ষেত্র হইতে উভয়ের অন্ন সরবরাহ হয়—ক্ষেত্র রক্ষা জমিদার প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্য। জমিদার প্রজা শাসন করেন—সে স্নেহের শাসন—প্রজারক্ষার্থ প্রজার শাসন—বাপ যেমন ছেলেকে শাসন করে। শাসন কঠোর হইতে পারে কিন্তু কখন নির্ম্মম নহে—নির্ম্মম শাসন কখন ছিল না। এখন প্রজা এ সম্বন্ধ ভুলিতে বসিয়াছে—অন্যের প্ররোচনায় সে কেবল জমিদারের সহিত ঝগড়া করিবার জন্য আইনের ফাঁক খুঁজিতেছে। প্রজা তাহার ধর্ম্ম ভুলিয়াছে, জমিদার তার ধর্ম্ম বজায় রাখে কি প্রকারে? তাই এখন এত অত্যাচার অবিচারের দৃশ্য দেখিতে হয়। ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মটাই বড়, এই ধর্ম্মটাকে আমরা ছোট করিয়া দেখিতেছি। সবকাজ এখন আমরা স্বার্থের মাপকাটি দিয়া মাপিতেছি তাইত এত গোলমাল।

জমি জমার উন্নতি করিতে হইলে বরং এখন স্বতন্ত্র নিয়ম স্থাপন করা কর্ত্তব্য—জমি, কৃষাণ ও মূলধন এই তিনের অংশ সমান হওয়া উচিত। তাহা হইলে জমিদার নিজ নিজ জমি জমার উন্নতি সাধন করিবেন, ধনীর টাকা খাটাইবার একটু সুবিধা হইবে

এবং চাষী সময় মত সকল সুবিধা পাইলে সু প্রণালীমত চাষ করিতে পারিবে। উৎপন্ন ফসলের মাত্রা ২।৩।৪ গুণ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে সকলেই লাভবান হইবে। অভাবে চাষীকে ঋণ করিতেই হয়—এইপ্রকার ব্যবস্থা হইলে ঋণের জন্য উচ্চহারে সুদ দিবার আশঙ্কা তাহার আর থাকিবে না। অংশীদার গণের পরস্পর সম্বন্ধ পরস্পরে অনুভব করিলে, লাভালাভ বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে কেহ কোন বিবাদ বিসম্বাদের দিকে যাইবে না ইহা সুনিশ্চিত। যাহাতে আমরা এ যোগে, একত্রে কাজ করিতে পারি ইহাই আমাদের বর্ত্তমান যুগের চেষ্টা ও শিক্ষা হওয়া উচিত। বিচ্ছিন্ন হইলে সকলকেই বলহীন হইতে হইবে। দশজনে এক সঙ্গে পথ চলিলে বাঘ সহসা কাহাকেও আক্রমণ করিতে সাহস করে না কিন্তু দলভ্রষ্ট পথিকই যখন তখন বাঘের হাতে প্রাণ হারায়।

প্রজার জমিদারে বিরোধ করিয়া কাহার কবে ভাল হইয়াছে? এ বিরোধে উভয়ই উৎসন্ন যায় এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।

যাঁহারা প্রজাপীড়ক তাঁহাদিগের উৎপীড়ন সমবেত চেষ্টাদ্বারা বন্ধ করিতে হইবে। প্রজা একমত হইলে জমিদার তাহাদের ন্যায্যদাবী শুনিতে বাধ্য। প্রজাগণ অনেক সময় পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া আপনাদের ক্ষতি আপনারা করে ইহা সহযোগী ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এ সম্বন্ধে চারু মিহির কি বলিতেছেন শুনুন—

"কতদিন যাবৎ কলিকাতা হইতে "রায়ত" নামক একখানি সপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে সম্ভবতঃ অনেকেই জ্ঞাত আছেন উক্ত পত্রিকাখানি দ্বারা বঙ্গীয় রায়ত সম্প্রদায়ের উপকার কি অপকার হইতেছে এই পত্রে ইহাই আমার আলোচ্য বিষয়।

উপযুক্ত শিক্ষাই জাতি সমুহের উন্নতির প্রথম ও প্রধান সোপান। এ বিষয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বঙ্গদেশের মুসলমান অনেক পশ্চাৎপদ বিশেষতঃ কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার আদৌ বিস্তার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার অভাবেই কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। মানবের জীবন ধারণের উপযোগী দ্রব্য সম্ভার আহরণের একমাত্র উপায় কৃষককুল। সুতরাং এ জাতির উন্নতিকল্পে যত্নবান হওয়া সকলেরই উচিত। কিন্তু 'রায়ত' পত্রিকা তাহাদের জাতীয় উন্নতি পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার উক্ত পত্রিকা প্রচারদ্বারা প্রজা ও ভূম্যাধিকারীর মধ্যে বিরোধ স্থাপন করতঃ প্রজাদিগকে অবনতির চরমসীমায় পতিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। কাহার দোষে কৃষকগণের দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, সে বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় একেবারে নীরব, অথচ প্রজা ও ভূম্যাধিকারীর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করাই যেন তাঁহার পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক পক্ষে দেশের মহাজনগণই আমাদের রায়ত সম্প্রদায়ের প্রধান শত্রু।

কৃষকগণ জমি বেহাণ কট ইত্যাদিতে আবদ্ধ করিয়া মহাজনগণের নিকট হইতে অতি উচ্চ সুদে টাকা ধার করে; কালে পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে মহাজনগণ আদালত যোগে ডিক্রী, নীলাম ইত্যাদি দ্বারা জমিদারের নিকট হইতে অতি সহজে পত্তন গ্রহণে দখল করিতে থাকে। জমিদার সাপক্ষে থাকিলে সামান্য টাকা হইতে তাহাদের জোত জমি হস্তান্তরিত হওয়া সম্ভব হইত না। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, মহাজনগণ নগদ ৫৲ টাকা ধার দিয়া ৯০৲ টাকায় ৵০ দুই পাথি জমির সাফ কংওলা গ্রহণ করে এবং খাতকের সঙ্গে মৌখিক করার থাকে যে অমুক মাসে টাকা পরিশোধ করিলে তোমারই থাকিবে, কিন্তু দৈবক্রমে করার অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে মহাজনগণ উক্ত জমি মণিব সরকার হইতে পত্তন গ্রহণে ভোগ দখল করিতে থাকে। কোন মহাজন নগদ মাত্র ২৫৲ পঁচিশ টাকা উচ্চ সুদে ধার দিয়া কালক্রমে ২০০৲ দুই শত টাকা ডিগ্রী করিয়া প্রজার ৵০ দুই পাথি জমি নীলামে লইতেছে। বর্ত্তমান সময় এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

কোন কোন জমিদারের এলাকায় ফলবান ও সারবান বৃক্ষাদি রোপণ ভিন্ন জমিদারের বিনানুমতিতে প্রজার কর্ত্তন করিবার অধিকার নাই কিন্তু প্রজাগণ বর্ত্তমানে 'রায়ত' পত্রিকার উত্তেজনায় উক্ত বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া জমিদার কর্ত্তৃক সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতেছে। তাহাদের এরূপ দুর্গতি কাহার দোষে ঘটিতেছে—জমিদারের? না প্রজার? না, যাহারা এই অশিক্ষিত গরীব রায়তদিগকে উত্তেজিত করিতেছে তাহাদের? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এই কুকার্য্যের মূলে কে? অথচ উক্ত কাগজে রায়ত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জমিদার এবং তাঁহার কার্য্যকারকগণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অমূলক অভিযোগ উত্থাপিত হইতেছে। ঐ সমস্ত অনর্থক আবদারে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিয়া কার্য্য করিলে জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

* * * *

ভরসা করি, সহৃদয় গবর্ণর বাহাদুর বঙ্গের নির্ব্বোধ রায়ত সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করিবেন। ইতি শ্রীমুন্সী দেলোয়ার আলী খন্দকার, সাং বিন্নাফৈর; পোঃ সরিষাবাড়ী; ময়মনসিংহ।

মাকাল ফল

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

সাধারণতঃ অন্তঃসার শূন্য মানবের পরিচয় দিতে হইলে কবিরা পলাশ পুষ্প ও মাকাল ফলের তুলনা দিয়া থাকেন। কিন্তু কল্পনার চক্ষে ইহারা যেমনই প্রতিভাত হউক না কেন, কর্ম্মক্ষেত্রে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

মাকাল লতা জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার বীজ যে কোন সময়ে রোপণ করিলে লতা জন্মিয়া থাকে, এই লতা অন্য বৃক্ষের আশ্রয়ে উচ্চে উঠিয়া থাকে এবং বহু বিস্তৃত হয়। কোন কোন উচ্চ অট্টালিকার ছাদের রেলিংএর ধারে ইহা শোভাবর্দ্ধনার্থ স্থান পাইয়া থাকে। এই লতা বৎসরের সকল ঋতুতেই ফল প্রদান করে, এক একটী লতা ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং ফল প্রদান করে। এইজন্য ইহাকে উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহাকে "চির যুবতী" লতা বলে। ইহার ফল দেখিতে লাল ও সুগোল। আমাদের দেশে বনজঙ্গলে বাঁশের গাছে অযত্ন সম্ভূত অনেক গাছই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলের আকৃতির হিসাবে মাকাল দুই প্রকার, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। প্রথম শ্রেণীর লতায় যে ছোট ছোট ফল হয়, তাহার ভিতরে দুর্গন্ধ ময় একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লতায় বড় বেলের মত ফল হয় ও উহার আবরণ কণ্টক ময়। এই ফল সুপক্ক হইলে ভিতরের শাঁসও লাল বর্ণ ধারণ করে। উভয় ফলের ভিতরে বীজ থাকে। মাকাল ভারতের প্রায় সকল দেশের বন জঙ্গলে বা বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা সাধারণতঃ ইহাকে মাকাল বলিয়াই জানি, কিন্তু গ্রন্থ বিশেষে ইহা রাখাল শশা নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত নাম ইন্দ্র বারুণী ও বৃহৎ ইন্দ্রবারুণী। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় ইহার আরও কয়েকটী পর্য্যায় আছে।

সংস্কৃত ভিষক শাস্ত্রে এই উভয় বিধ ইন্দ্রবারুণী সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"ইন্দ্র বারুণিকা তিক্তা কটুতায় রেচণী।
গুল্ম পিণ্ডোদর শ্লেষ্ম ক্রিমি কুষ্ঠ জ্বরাপহঃ॥"

অর্থাৎ মাকাল ফল তিক্তরস কটুবিপাক, পাচক, লঘু ও বিরেচক, ইহা গুল্ম, পিণ্ডোউদর, শ্লেষ্মা, কৃমি কুষ্ঠ ও জ্বর রোগে বিবিধ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ঔষধ হিসাবে, মাকাল ফল কবিরাজদিগের বিশেষ আদরণীয়। কারণ ইহা দ্বারা নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। শুনাযায় ইহার বিষ নাশক ক্ষমতা আছে বলিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসায় এবং বিসূচিকারোগ গ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার হইয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহার পাতা পাঁচনে ব্যবহৃত হয়, এবং শিকড় বিবিধ রোগে ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। সুতরাং ঔষধের জন্যও যদি দুই একটী মাকাল লতা রোপণ করা হয়, তাহা হইলেও লাভ আছে।

শিমের চাষ

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

আমাদের দেশে শীতকালে শিম একটী অতি সুখাদ্য তরকারী। ইহার সংস্কৃত নাম শিম্বী, ইংরাজী নাম (Bean) বাঙ্গালা নাম শিম্ শেম, এই তরকারী পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। তবে দেশ ভেদে নানা জাতীয় শিম দৃষ্টীগোচর হয়।

শিম প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মিয়াই থাকে। কিন্তু দোঁয়াস ও বালি দোঁয়াস মাটিতেই ইহা ভাল জন্মে। পুরাতন গোবরের সার, পাতা পচা সার শিমের পক্ষে বিশেষ উপকারী। জাতি ভেদে ইহাদের চাষের প্রণালীও বিভিন্ন রূপ হয়। শিমের তরকারী কচি অবস্থায় সুস্বাদু। কিন্তু পাকিলে খাইতে তত সুস্বাদু হয় না। তবে সুপক্ক শিমের বীজকে ডানলা বা অন্য কোনরূপে পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন জাতীয় শিমের বীজের দাইলও সুস্বাদ হয় না। আবার ইহাদের অর্দ্ধ পক্ক বীজগুলি ভাজিয়া খাইতেও মন্দ নহে।

আমাদের দেশে খিয়া শিম, শাদা শিম, পুটিয়া শিম ও বাঘনলী শিম এই চারি জাতি শিম জন্মিয়া থাকে। ইহাদের চাষের প্রণালী একরূপ ও একই সময়ে বপন করিতে হয়।

চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে প্রথম বারিপাত হওয়ার পর যে স্থানে শিম গাছ রোপণ করিতে হইবে সেই স্থানে দেড় ফুট গভীর ও দেড় ফুট প্রশস্ত একটী গর্ত্ত করিতে হইবে তৎপরে উক্ত গর্ত্তে কিছু সার প্রদান করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্তটী ভরাট করিতে হইবে পরে তাহাতে ৮।১০টী (বীজ বেশ সুপুষ্ট রকমের) বপন করিয়া দিবে। এক সপ্তাহ কিম্বা মৃত্তিকার আর্দ্রতার পরিমাণানুসারে ১০।১২ দিন মধ্যেই অঙ্কুর দেখা যাইবে। অঙ্কুরিত হইবার অব্যবহিত পরে পশ্বাদির আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গর্ত্তের চতুঃপার্শ্বে বাঁশের কঞ্চি পুতিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে পশ্বাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে, এবং ঐ সকল কঞ্চির সাহায্যে উহারা উর্দ্ধ দিকে উঠিতে থাকিবে। গাছগুলি ১ ফুট উচ্চ হইলে উহার মধ্যে যে গাছগুলি সুস্থ ও সবল এইরূপ ৩।৪টী গাছ রাখিয়া বাকী গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর বাঁশের খুঁটী পুতিয়া উহার

উপরে মাচা করিয়া বা বাঁশের পালা বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মাচাটী এরূপ হওয়া দরকার যে গাছগুলি উপরে উঠিয়া যথেচ্ছা লতাইয়া যাইবার জন্য বিশেষ স্থান পায়। মাচা অল্প পরিসর বিশিষ্ট হইলে লতা ঘন হইয়া জড়াইয়া দাম বান্ধিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় আশানুযায়ী ফসল হইবে না। যাহারা কেবল সাংসারিক খরচের জন্য শিমের চাষ করিবেন, তাহাদের এই এক মাচাতেই যথেষ্ট শিম হইবে। কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ের জন্য শিম বপন করিবেন তাহারা এই প্রণালীতে অধিক পরিমাণে চাষ করিতে পারেন। কোন বড় গাছের তলায় শিমের বীজ বপন করিয়া উহার গাছগুলি উক্ত বৃক্ষে তুলিয়া দিলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ফল সংগ্রহ করিবার কিছু অসুবিধা ঘটে, এজন্য এদেশে প্রায়ই মাচা প্রস্তুত করিয়াই দেওয়া হয়। আবার যে গাছে তুলিয়া দেওয়া যায় তাহাকেও জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে এই কারণেও ঐ প্রথা খারাপ।

বীজ বপনের পর যদি মধ্যে মধ্যে বৃষ্টীপাত হয়, তবে আর জল দেওয়া আবশ্যক হয় না, নচেৎ মধ্যে মধ্যে জল দিতে হইবে। অঙ্কুরিত হইবার পরেও কিছুদিন জল সেচন করা আবশ্যক, কারণ মাটী সরস না থাকিলে গাছ মরিয়া যাইতে পারে, পরে বর্ষার জল পাইলে আর জল সেচনের আবশ্যকতা নাই। সময় সময় গাছের গোড়া নিড়াইয়া গোড়ার জঙ্গল উঠাইতে ও মাটী উস্কাইয়া দিতে হইবে, তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোনরূপ পাইটের আবশ্যক হয় না। বর্ষার সময় স্বভাবতঃই গাছগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে যখন গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইবে তখন একবার গাছের গোড়ায় তরল সার প্রদান করিতে পরিলে প্রচুর ফলন হইবে, ইহা আমার বিশেষ পরীক্ষিত। সাধারণতঃ কর্ত্তিক মাস হইতেই ফল ধারণ করিতে আরম্ভ করে, এবং মাঘ মাস পর্য্যন্ত বেশ ফল প্রদান করে, ভূমি সরস থাকিলে ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্তও ফলিয়া থাকে। এদেশে শিবরাত্রির পর আর হিন্দুলোকে শিম ভক্ষণ করে না।

এক বৎসর গাছ রাখিলে দুই বৎসরও ঐ গাছে ফল হইতে পারে। যদি এরূপ রাখার ইচ্ছা হয় তবে চৈত্র মাসে গাছগুলি এক কি দেড় হস্ত উচ্চ রাখিয়া অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা হইলে বৃষ্টীর জল পাইয়া পুনরায় উহা হইতে নূতন শাখা প্রশাখা উদীত হইয়া মাচা পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ইহাতে একবার বৈশাখ মাসে ও একবার ফুলের সময় দুইবার তরল সার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে ফলন কিছু কম হয়।

বীট, Beta, The Beet root.

উদ্যান তত্ত্ববিদ্—শ্রীশশীভূষণ সরার লিখিত।

ইহা চেনোপডিয়েসী Chenopadiaceæ সব্জী জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত। বীট বলিলে ইহা যে কি প্রকার সব্জী তাহা সকলে না বুঝিলেও, পালম, বীট পালম, পাল্‌কা শাক আমাদের নিকট পরিচিত। সাধারণতঃ লাল রঙের বীটই দেখিতে পাওয়া যাইত (beta vulgaris), ইহার শাক ও মূল খাইতে মিষ্ট বলিয়া লোকে ইহার চাষ আরম্ভ করিয়া ছিল। প্রথমে য়ুরোপে ইহার চাষ আরম্ভ হয়, এখন সমগ্র পৃথিবীতে ইহার চাষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় বীট যাহাকে লোকে বাঙলা বীট বলে তাহার পাতাই অধিক হয়। পাতা, ডাটা খাইতে সুমিষ্ট; ইহার মূলভাগ তাদৃশ পরিপুষ্ট হয় না কিন্তু যতটুক মূল পাওয়া যায় তাহাও সুস্বাদু ও মিষ্ট। এখন এদেশে বিলাতী বীটের প্রচুর চাষ হইতেছে। বীট ১২।১৩ প্রকারের আছে, তাহার মধ্যে যে প্রকার বীট ভারতে উৎপন্ন হয় তাহার মূল রক্তবর্ণ, ডাটা ও পাতার শিরায় রঙও লাল। ইহা খুব সুস্বাদ ; য়ুরোপ ময় এই বীটের চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

আগে যে বীট দেখিতে পাওয়া যাইত তাহা প্রায় লম্বা আকারের ছিল। উহা বর্ণ ভেদে শাদা ও লাল ; উহাদের মূল ভাগ মাটির উপর উঠিয়া থাকে না। এখন নানা আকারের ও বর্ণের বীট জন্মিতে দেখিতেছি—চাষ কারকিতের গুণে তাহাদের আকারের ও রঙের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন এক রকম চেপ্টা ও গোলবীট দেখা যায়, তাহাকে ইজিপ্‌সিয়ান বীট বলে—ইহার আকৃতি অবিকল সালগমের মত। ইহাদের বর্ণ লাল, তরকারি হিসাবে সকলেরই অতিশয় প্রিয়। হলদেও সাদা বর্ণের লম্বা বীটআছে।

কোন কোন প্রকার বীটের পাতা এত সুন্দর যদিও তাহার মূল তাদৃশ ভাল নহে, পাতার জন্য তাহারা ফুল বাগানের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। পাতা গাঢ় সবুজ বা হরিদ্রাভ সবুজ—শিরা সকল টক্‌টকে লাল। রাস্তার কেয়ারির ধারে ধারে সমান অন্তরে এক একটা গাছ থাকিলে বেশ শোভা হয়। ঘাস মাঠের মাঝে মাঝে এক একটা ঐ বীটের গ্রুপ থাকিলেও মন্দ দেখায় না। এই বীটের পাতা খাইতে সুস্বাদু—মূল তাদৃশ সুস্বাদু নহে। শর্করা জাতীয় বীট কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের—ইহার মূল বার ইঞ্চ লম্বা ও শাঁস শাদা হয়। মূল মাটি হইতে উপর উঠে না। এই জাতির দুইটি(species) বর্ণভেদ আছে —এক জাতির মূলের রঙ গোলাপি ও পাতার শিরা সকল লাল বর্ণের হয়এবং অপরের মূল শাদা ও পাতা সবুজ বর্ণের হয়। দুই জাতির চাষ একত্রেই হয় ও শর্করার পরিমাণ একই হইয়া থাকে।

উত্তম বীটের লক্ষণ—(১) মূলের ত্বক মসৃণ এবং আকর মোটা হইতে

ক্রমশঃ শরু ; ২ শাঁস শাদা ও শক্ত,সুগন্ধ,মূল অপেক্ষাকৃত ছোট ও পাতা বড় হইলে শর্করার পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে—(৩) ইহার ১½ হইতে ওজন ২½ আড়াই পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়, মূল অধিক লম্বা কিংবা ছোট হইলে শর্করার অংশ কম হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে সকল বীটের ওজন ৩০ পাউণ্ড হয়, তাহাতে জলের ভাগ অধিক ও শর্করার ভাগ কম থাকে, আবার ½ পালণ্ড ওজনের বীট, হয় অপক্ক নচেৎ অতি অল্প শর্করা যুক্ত। সঞ্চালিত বীট মূলের রসের অপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০৬ হইতে ১·০৭। ইংলণ্ডজাত বীট্ রসের গুরুত্ব কখন কখনও ১·০৭৮ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে শর্করার পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ থাকে। যে সকল বীট্‌রসের অপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০৬ভাগের কম,তাহাতে শর্করার পরিমাণ অত্যল্প থাকে। উত্তমরূপে কর্ষিত জমিতে বীট্‌মূল মাটির নিচেই জন্মিয়া থাকে ; কেবল পাতাগুলি বাহিরে থাকে।

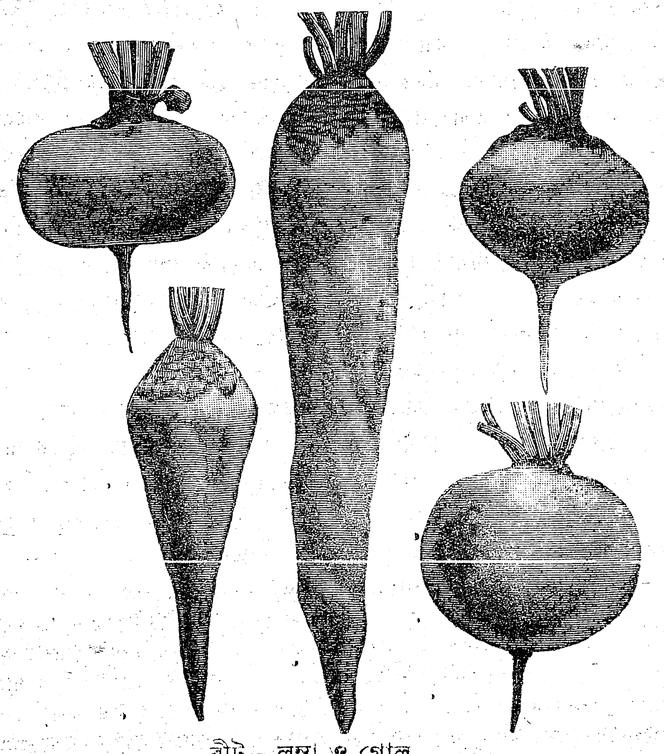

বীট—লম্বা ও গোল

বীটমূল কতকগুলি ছেট ছেট কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলিতে শর্করা ভিন্ন পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্ ও ক্যালসিয়ম ফসফেট থাকে ও কিছু পরিমাণে শ্বেতসার দ্রব অবস্থায় থাকে। ইহাতে যে শর্করা থাকে, তাহা ইক্ষু শর্করা, কিন্তু পটাসিয়ম্ সল্টের সহিত মিলিত থাকায়, ইক্ষু শর্করা অপেক্ষা ইহার মিষ্টতা কম হয়, কারণ ইক্ষু শর্করা হইতে পটাসিয়ম্ সল্ট পৃথক করা কষ্টসাধ্য। বীট মূলে শতকরা ৮৫ ভাগ জল, ১০ ভাগ শর্করা এবং ৫ ভাগ অন্যান্য পদার্থ থাকে।

এমেরিকায় এত উত্তম শর্করা বীট উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতে শর্করার ভাগ এত অধিক যে তথাকার সুগার ফ্যাকটরিতে উক্ত প্রকার ১০০ টন বীট মূল হইতে ১৮ টন চিনি জন্মিয়াছে।

বীট চাষে উৎকর্ষ—এই জাতীয় বীটের চাষের জন্য জমিকে ভালরূপ সারবান করা আবশ্যক। ফল মূলের মিষ্টত্ব বাড়াইতে হইলে পটাস প্রধান সার অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। গোময় মিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সারের সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ছাই ও চুণ সার মিশ্রিত না থাকিলে তৎসাহায্যে উৎপন্ন বীট সালগম প্রভৃতি তাদৃশ মিষ্ট ও সুস্বাদু হয় না। প্রত্যেক বিঘায় (১৪৪০০ বর্গ ফিট) যদি খৈল (নাইট্রোজেন প্রধান সার) একমণ, বোন সুপার (ফস্ফারাস্ সার) একমণ প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে পটাস সার (ছাই প্রভৃতি) দুই মণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। জমির অবস্থা বুঝিয়া সারের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে। সার অল্প হইলে চলিবে না। অধিক হইলে বা সারের অনুপাত ঠিক না হইলেও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। উপযুক্ত সার পাইলে বীট যেমন সতেজে বাড়িবে, তেমনি তাহাতে শর্করার ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। অনুপযুক্ত সারে মূল বৃদ্ধি হইলেও তাহাতে জলের মাত্রা অধিক ও শর্করার মাত্রা কম হইয়া থাকে।

এখন মানুষে কেবল বীটের তরকারি খাইয়া থাকে নহে। বীট খাইতে মিষ্ট—সুতরাং বুঝাগেল তাহাতে সমধিক পরিমাণে শর্করা আছে। মানুষ তখন বিচার করিতে বসিল কোন্ প্রকার বীটে শর্করার মাত্রা অধিক এবং কি প্রকারেই তাহাদের চাষাবাদ করা যায়। বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইল যে এল্‌বা জাতীয় বীট B. Alba হইতেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শর্করা প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

বীটের আর একটি সদ্ব্যবহার আছে—বীট গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য। এই জাতীয় অনেক প্রকার বীট আছে তাহার মধ্যে ভিলমরিনের সুগার বীট উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। ইহাতে শর্করার মাত্রা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে সুতরাং খাদ্য হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য আছে। ইহা খাওয়াইলে গবাদির শরীর পুষ্ট হয় এবং গাভীর দুধ বাড়ে। গো-খাদ্যে মূল্য যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে এবং ধান যব, জৈ প্রভৃতির খড় কাগজ ও অন্যান্য কার্য্যে যে পরিমাণে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে গবাদি খাদ্যের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। সুধু সুগার বীট কেন ম্যাঙ্গোল্ড ওরজেল জাতীয় বীটের আবাদ

করিয়া আমরা গবাদির প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারি। এই সকল, যে কোন রকম দোঁয়াস জমিতে জন্মিবে। সারবান জমি হইলে ইহার ফলন অধিক হয় ইহা বলা আবশ্যক। নাইট্রোজেন ও পটাস সার সংযোগে চাষ করিলে ফলন বিঘাপ্রতি সালগম অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। আমরা খৈল হইতে সহজে নাইট্রোজেন ও কলার খোলা পাতা ও বিলাতী পানা ভস্ম হইতে পটাস সংগ্রহ করিতে পারি। এগুলি খুব সহজ সাধ্য সার। উপযুক্ত সার সংযোগে চাষ করিলে বীটগুলি গ্রোস ওজনের শতকরা ৬।৭ ভাগ শর্করা যুক্ত হইবে ইহা নিশ্চিত। এমেরিকায় চাষীরা বলে যে নিয়মমত চাষাবাদ হইলে এক একরে (৩ বিঘায়) ১০ টন বা ২৭৫ মণ বীট উৎপন্ন হইতে পারে।

বীট হইতে আর একটি লাভজনক ব্যবসা চলিতে পারে—বীট হইতে সুরাসার প্রস্তুত হয়। যাহাতে শর্করা আছে তাহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত হওয়া সম্ভব—যেমন মহুয়া হইতে, আঙ্গুর হইতে সুরা হয়। ইক্ষু চিনি ও গুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতের কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

বীট হইতে সুরাসার প্রস্তুতের প্রণালী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ রায় এম এ বিগত ১৩২৫সালে ভারতবর্ষে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার নিম্নে প্রদত্ত হইল। যাঁহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী তাঁহারা একে একে না হউক দশে মিলিয়া কাজে অগ্রসর হইলে দেশের অনেক অভাব দূর হইতে পারে। কেবল আন্দোলন ও আলোচনা লইয়া থাকিলে হইবে না, কাজে হাত দেওয়া চাই।

বীট মূল হইতে সুরাসার প্রস্তুত প্রণালী—বিট হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার তিনটি উপায় আছে; তন্মধ্যে প্রথম দুইটি উপায় প্রশস্ত।

১ম। মূল পাতলা করিয়া কাটিয়া চাপ দ্বারা রস বাহির করিয়া তাহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা।

২য়। গরম জল দ্বারা ইহার শর্করা বাহির করিয়া লইয়া তাহা হইতে শর্করা প্রস্তুত করা।

৩। মূল হইতে চুয়াইয়া সুরাসার প্রস্তুত করা।

ক্ষেত্র হইতে লইয়া আসার পর বীটমূল গুলিকে ধুইয়া মাটি ও কাকর পরিষ্কার করিতে হয়। তাহার পর যন্ত্র দ্বারা পাতলা টুকরা করিয়া হাইড্রলিক্ প্রেসে চাপ দিয়া ইহার রস বাহির করা হয়। ভাল প্রেসে দুইজন লোক ও এক বালকে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০২,৬০০ পাউণ্ড রস বাহির করিতে পারে। কিন্তু আজকাল বীটচিনির কারখানায় প্রেসের পরিবর্ত্তে diffusion দ্বারা শর্করা বাহির করা হইয়া থাকে। কখন কখনও রোলার প্রেস ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা প্রতিদিন ৮১৫,০০০ পাউণ্ড বীট সঞ্চালিত হয়। রস বাহির করিয়া লওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ গো-মহিষাদির খাদ্যের জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় প্রণালীতে পাতলা টুকরা করিয়া কাটা বীটমূল লোহার কিম্বা কাঠের গামলায় রাখিয়া তদুপরি ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দিতে হয় এবং প্রতি ২২০০ পাউণ্ডে ৪৪ পাউণ্ড গন্ধক দ্রাবক মিশাইতে হয়। এই অবস্থায় একঘণ্টা রাখিয়া পরে ঐ জল দ্বিতীয় গামলায় আনিতে হয় ও তাহাতে নূতন বীট মূল দিয়া একঘণ্টা রাখিতে হয়। পরে তৃতীয় গামলায় ঐ জল আনিয়া আরও কতকটা বীটমূল তাহাতে দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এক ঘণ্টা রাখিতে হয়। এই প্রকারে যখন তৃতীয় গামলা হইতে জল বাহির করা হয়, তখন তাহার গুরুত্ব সঞ্চালিত রসের গুরুত্বের সহিত সমান হইয়া যায়। এইরূপে যখন মূল হইতে সমস্ত শর্করা বাহির হইয়া যায়, তখন সেগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং পর্য্যায়ক্রমে গামলার জল এক হইতে অন্যগামলায় চালান হয়, এবং নূতন বীটমূল দেওয়া হয়। তৃতীয় গামলা হইতে যখন জল বাহির হয়, তখন তাহার তাপপরিমাণে ৭১·১০ হইতে ৭৫·২০ ফ্যাঃ মধ্যে থাকে এবং ইহাকে ৮২৬ ফ্যাঃ তাপে পরিমাণে আনিয়া পচাইবার গামলায় চালাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে ইহাতে আরও কিছু পরিমাণে গন্ধক দ্রাবক মিশাইয়া দেওয়া হয়, প্রতি ১২২০ গ্যালন রসে ৫০ পাউণ্ডের অধিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীটের রসে পটাসিয়ম, সোডিয়ম্ ও ক্যালনিয়ম সল্ট আছে, এগুলি ক্ষার পদার্থ। সে জন্য এসিড দ্বারা এই গুলিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, এবং ইহার দ্বারা পচন ক্রিয়ার সাহায্য হয়। প্রতি ২২ গ্যালন রসে ১½ আউন্স ক্রমার্স ঈষ্ট মিশাইয়া ৬৮০ হইতে ৭৮০ফ্যাঃ তাপ পরিমাণে রাখিয়া পচিতে দেওয়া হয় এবং ৪ হইতে ৫ ঘণ্টার মধ্যেই পচন ক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। বীট রসের পচন ক্রিয়া অতি শীঘ্র হয় এবং ইহার উপরে যে ফেনা উঠে, তাহাতে পচাইবায় বিঘ্ন ঘটায়; সে জন্য কতকগুলি গামলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ তিনটি গামলা হইলে যথেষ্ট হয়। প্রথম গামলায় রস রাখার চার ঘণ্টা পরে তাহার অর্দ্ধেক অংশ দ্বিতীয় গামলায় রাখিয়া তাহাতে নূতন রস দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় গামলায় রস ৪ ঘণ্টা থাকার পর আবার যখন ফেনা হইয়া ফাঁপিয়া উঠে তখন ঐ রস কাটাইয়া তৃতীয় গামলায় রাখিয়া, পুনরায় নূতন রস দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। ইতিমধ্যে প্রথম গামলার রসে পচন ক্রিয়া শেষ হইয়া যায় ও প্রথম গামলায় তৃতীয় হইতে রস লইতে পারা যায়, এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে পচন ক্রিয়া তিনটি গামলায় চালাইতে পারা যায়। পচন ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে হইলে মধ্যে মধ্যে কিছু পরিমাণে ইষ্ট দিতে হয়।

তৃতীয় প্রণালিতে সুরাসার মূল হইতে প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে রস পৃথক করিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন হয় না। ৭৫০ গ্যালন জল ও ২২০০ পাউণ্ড বীট মূল ধরিতে পারে এরূপ বড় বড় গামলা লইয়া, তাহাতে ৪৪০ গ্যালন গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত জল রাখিয়া তাহাতে টুকরা করিয়া কাটা বীটমূল ছালার মধ্যে রাখিয়া ঐ জলে ডুবাইয়া দিতে হয়। জলের তাপ পরিমাণ ৭৭° হইতে ৮০০ ফ্যাঃ মধ্যে রাখিয়া কিছু পরিমাণ ঈষ্ট

মিলাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পচন ক্রিয়া শীঘ্র আরম্ভ হইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায়। পরে ছালাগুলি বাহির করিয়া লইয়া নূতন মাল পূর্ণ ছালা তাহাতে রাখা হয়, এবং তাহাতে ঈষ্ট না দেওয়া সত্বেও পচন ক্রিয়া শীঘ্র আরম্ভ হয়। এইরূপে একই জলে তিন-চারিবার বীটমূল পচাইতে পারা যায়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বীট মূলের মধ্যস্থিত শর্করা পচন ক্রিয়া দ্বারা সুরাসারে পরিণত হয়।

ছালার বীটমূল চুয়াইবার যন্ত্রে রাখিয়া চুয়াইয়া লইলেই সুসাসার পাওয়া যায়।

শর্করা, শস্য, ফল ও মূল হইতে কি উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মোটামুটি প্রণালী বর্ণনা দেওয়া গেল যদি কোন পাঠক এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভারতীয় কৃষি সমিতির সেক্রেটারির নিকট পত্র লিখুন।

বীট হইতে সুরা বা শর্করা যাহাই প্রস্তুত হউক বিটের উন্নতি আগে সেই জন্য বিটের জমি সারবান হওয়া প্রয়োজন। বীটের চাষে প্রায় একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড নাইট্রেজেন, ১৫০ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক এসিড্ এবং ২০০ পাঃ পটাস সার প্রয়োগ আবশ্যক। মাটি হালকা দোয়াস না হইলে মূলজ খন্দ সচ্ছন্দে বাড়িতে পারে না। গোবর একটি সাধারণ সার ইহা হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় কিন্তু মূলজ খন্দে অধিক মাত্রায় গোবর সার ব্যবহার যুক্তি যুক্ত নহে। ইহা মূলা বীট সালগমাদির মিষ্টত্ব ও স্বাদ তাদৃশ বাড়ায় না। এই সকল খন্দে নাইট্রোজেনের জন্য খৈল, পটাসের জন্য পর্য্যাপ্ত ছাই এবং ফস্‌ফারসের জন্য বন সুপার প্রদান করিতে হইবে। ঐ সকল সারের সহিত চুণ কিছু পরিমাণ মিশানও ভাল। গোয়ালের মিশ্রিত সারে উপকার পাওয়া যায় ইহাতে জমির প্রাকৃতিক গঠন আলগা করিয়া দেয় বলিয়া মূলজ খন্দের ইহা হিতকর। ইহাতে সারের সব উপাদান আছে। এই সার প্রদানে মাটির রসও রক্ষা হয়।

চাষীর দুঃখ ও তৎপ্রতীকার

দেশের অবস্থা

চতুর্দ্দিকে শিক্ষিত সমাজে আজ মহা আন্দোলন নানা ভাবে প্রকট হইতেছে। স্বরাজ শাসন, স্বদেশী, খিলাফত, শ্রমজীবী, আন্দোলন, প্রজার স্বত্বরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জাতীয় মর্য্যাদা, সেবাদি বিষয় লইয়া অল্প বিস্তর সবাই ব্যস্ত। যাহারা এই সব আন্দোলনে কদন যোগ দিতেন না সেই কৃষক কুল ও ব্যবসায়ীরাও, রোগ ও অভাবের তাড়নায় ও ন্যায্য স্বার্থে অন্যের কুহকে বা প্রভুত্বে ঘা খাইত হওয়ায়, আজ অত্যন্ত

বিচলিত। আমরা পল্লীবাসী, সাহসহীন অজ্ঞান কৃষক, আমরা উচ্চ বিষয়ের চর্চ্চার তাদৃশ অধিকারী নহি। বিশেষ বহু বিজ্ঞ দেশনায়কগণ সে বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহাদের সাধনা লব্ধ ফল আমরা পাইব। কিন্তু আমাদের ঘর সংসারের, জোৎ জমির ও চাষের ফসল বেচা কেনায় লাভালাভের কথা কহিবার আমরা পূর্ণ অধিকারী ও আমাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। দেশ দেশান্তরের পাঁচ ভাই একত্র হইয়া সেই সব বিষয়ের চর্চ্চা করিব ও আমাদের অভাব অভিযোগ দেশ নায়ক ও রাজ পুরুষ গণকে জানাইব,আর প্রাণপণে সবাই মিলিয়া তাহার প্রতিকার করিব, ইহাই আমাদের এই কৃষক সম্বিলনী ও সমিতির উদ্দেশ্য।

কৃষকের দুরবস্থা

আমরা সবাই চাষী—চাষ আমাদের প্রধান উপজীবীকা, চাষের ফসল কতক আমরা খাই আর কতক বেচিয়া অন্য সকল খরচ ও রাজা মহাজন দেখি। দেশের আবহাওয়া যদি ভাল হয়, ভাল ফসল ফলে, লেহ্যদামে উদ্বৃত্ত ফসল বেচিতে পাই ও আমাদের ক্ষুদ্র আয় যদি কেহ ভোগা মারিয়া না খায় তবে আমরা আর স্বর্গের সুখ চাহিনা—বড়ই সুখ শান্তিতে নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু এই দুটী পেটের ভাত, পরণের কাপড় তাও যুটে না। বহিঃ ও অন্তর্বাণিজ্যের শেষ মরে সাহেব মহাজনদের হাতে! বাঙ্গালীর হাতে বড় ব্যবসা প্রায় নাই, মাড়ওয়ারিদের হাতে কিছু আছে; আর শিল্প যেন বঙ্গদেশে ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন দেশ রক্ষা করিতে হইলে সব দিক দেখিয়া চলিতে হইবে। অনেক ভুল হইয়াছে আর ঠকিলে দেশের লোক বাঁচিবে না। চাষীর চাষের সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে কারণ অর্থাগমের ও উদর পুরণের এই ধ্রুব পথ এখনও আমাদের হাতে আছে। তার পর কৃষি বৃত্তির বেচা কেনার লাভ বাড়াইয়া দেশের সাধারণ লোকের অভাব মোচন ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত লাভে যাহাতে বাণিজ্য চলে তাহা করিতে হইবে। কৃষকও দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রীমান হইলে, জমিদারের রাজস্ব নিয়ম মত আদায় হইবে ও তাঁহাদেরও অবস্থা স্বচ্ছল হইবে। তাহার পর সর্ব্বপ্রযত্নে আপোষ মীমাংসায় সর্ব্বথা বিবাদ ভঞ্জন করিলে বৃথা অর্থের অপব্যয় কমিবে আর চির পরাধীন অন্ন বস্ত্রহীন আমাদের সাহেবী বিলাস সাজে না, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বিলাসব্যসন শূন্য হইতে হইবে। এইরূপ অপব্যয় নিবারণ ও আয় বৃদ্ধিতে জাতীয় পুঁজি বাড়িলে সমবায় পথে কুটীর শিল্প কলকারখানা ও বিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা আমাদের দুরবস্থা ঘুচিবে ও আমরা তখন স্বাস্থ্য শিক্ষাদিতে সহজেই অগ্রসর হইতে পারিব। শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষক সম্প্রদায়ের—দেশের শতকরা ৯৫জনের—বিশেষ উপকার। অবশ্য শ্রমের মূল্যও বাড়ান আবশ্যক। আপনিই তাহা হইতেছে। আর ক্ষেত্রের মজুরকে পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় খাদ্য সহ নগদ কিছু মজুরি

দিলে তাহাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। আর কোন্ চাষ কি পরিমাণ করিলে লাভ হইবে ও ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা, তাহার ব্যবস্থা শিক্ষিত সমাজকে করিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে কৃষক সমিতি সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সহায়তা চাহিয়াছেন। উপস্থিত একটী প্রধান কার্য্যে দেশীয় চাষী ও ব্যবসায়ীর ভীষণ ক্ষতি হইতেছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

পাট চাষের কথা

পাট বঙ্গদেশের একচেটিয়া চাষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাদ্রাজ অঞ্চলে সামান্য জন্মে অন্যান্য প্রদেশে পাট চাষের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাও বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নাই। এ অবস্থায় পাট বেচিয়া বঙ্গীয় কৃষকগণের বেশ দুই পয়সা লাভ পাইবার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অসহায় লক্ষীছাড়া চাষীদের অদৃষ্টে সেই সৌভাগ্য প্রায় ঘটিয়া উঠে না। পাটের বাজার দর চাষীদের পক্ষে যেরূপ অস্থির জগতে আর কোন বাজার তত অস্থির ও অনিশ্চিত কি না বলা যায় না। বৎসরের মধ্যে দুই একবার দু চার দিনের জন্য বিশেষ বুনানির সময় বোধ হয় কৃষকদিগকে পাটের আবাদের প্রতি মনোযোগী করিবার নিমিত্ত সাহেবেরা বেশী দরে পাট খরিদ করেন। লোভে পড়িয়া অধিক উৎপন্ন করিয়া যেমন বেশী পাট বাজারে চাষী ও পাইকারেরা আমদানী করে অমনি দর পড়ে, ইহাতে দেশীয় চাষী ও পাইকার মহাজনেরা সর্ব্বস্বান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘরের বাহির করিয়া সহরের বাজারে মাল আনিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই যে কোন কম মূল্যে বিক্রয় ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। বিশেষ বেশী জমিতে পাট বুনিয়া ভাতের অভাবে অন্য আয় না থাকায় বা চাষের রকম না থাকায় বেশী পাট উৎপাদক চাষীর ধরিয়া রাখা চলে না। চাষী ও কারবারী দেশীয় মহাজনের যে প্রতি বৎসর এইরূপে পাটের ফট্‌কা বাজিতে কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বলা যায় না। এই গরিব দেশীয়ের পর যাহারা পাটের কাজে লিপ্ত সেই প্রতিপত্তিশালী ধনা সাহেব কারবারী ও কলওয়ালারা সকলেই অনায়াসে অনাহুত ও অপরিমেয় অর্থ লাভ করেন, আর এই লাভ ক্ষুদ্র চাষীর ও দেশীয় মহাজন ও পাইকারের ঘাড় ভাঙ্গিয়াই হয়। সম্প্রতি সাহেবেরা দেশীয় কারবারির নিকট পাট খরিদ একরূপ বন্ধ করিয়াছেন। সাহেব কলওয়ালা ও বৈদেশিক বাণিজ্যিকরা সব এক যোট; তার উপর মধ্যবিত্তের কার্য্যও উহাদের হস্তে যাইতেছে, এ অবস্থায় নীলের ন্যায় যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। দেশীয়েরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উপবাসী ও উলঙ্গ হইতেছে ও সাহেব ব্যবসায়ীরা রাজা হইতেছে। মহামান্য লাট সাহেব এ সম্বন্ধে আমাদের বরেণ্য দেশহিতৈষী নেতাগণের অনুযোগে ঢাকায় যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, 'পাটের অত্যধিক দাম নির্দ্দেশ করিলে অন্যদেশে পাট চাষ বাড়িয়া বাঙ্গালার একচেটিয়া নষ্ট হইবে ও বেশী মাল বাজারে আমদানি করায় বাজার পড়িলে গবর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন।"

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ জে এন গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই সমবায় পদ্ধতিতে পাট ধরিয়া রাখিয়া নাওগাওয়ের গাঁজার মত এক হাতে এক দরে বেচিতে বলেন। পরলোকগত সার আবরণ সাইড বলিয়াছেন কলওয়ালারাও বড় মহাজনদের নিকট উচ্চ মূল্যে পাট খরিদ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপস্থিত এত করিয়া চাষী ও দেশীয় মহাজনদিগকে ঠকাইয়াও সাহেবদের তৃপ্তি হয় নাই। পাছে দেশীয় চাষী ও ব্যবসায়ীরা একযোগ হইলে লেহ্য দর পায় তজ্জন্য উহারা বিস্তৃত ক্ষেত্র লইয়া চাষ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আরও যাহা পাঠ ব্যবসায় বিষয়ে অবগত হইয়াছি তাহা এই যে আট ঘর সাহেব কারবারি—রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি এক জোট হইয়া কেনা বেচা করেন ও বাঙ্গালী মহাজনের নিকট সাক্ষাতে মাল কিনিতেও প্রায় চান না। শুনিতে পাই নাকি দেশীয় মহাজনদিগকে ইংরাজ দালালকে ধরিয়া তবে মাল বেচিতে হয় ও উহারা ইচ্ছামত দর নির্দ্দেশ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বাঙ্গালার পাট ব্যবসায়ে দরের উপর দেশীয়ের কোন হাত নাই, আর চাষীরাও মজুরি আদির মূল্য পায় না। এইজন্য মজুর অপেক্ষা চাষীর কেবল ক্ষতি ও লাঞ্ছনা হওয়ায় পাট চাষীর অবস্থা বিশেষ খারাপ হইতেছে। চাষ ব্যবসায়ে পাট দেশীয়ের কথামাত্র ঘরের কাজে লাগে না। ইহার শেষ গতি সাহেবের হাতে তাহারা একজোটে সব কাজ করেন। বড় মাড়ওয়ারী ও বাঙ্গালী ধনীরা যাহারা মাল ধরিয়া রাখিতে পারেন তাহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন সাহেবদের কাছে কাচা মালে বেশ দুপয়সা লাভ করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু অধুনা সকলেই বিষম ক্ষতিগ্রস্থ ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। শুনা যায় নাকি অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি দেশীয় ব্যবসায় ফেল হইয়াছে। দেশীয় মহাজন ও চাষীরা অনেকেই কেবল ঠকেও সাহেবদের জন্য বৃথা খাটিয়া মরে। দুই চারিজন অদৃষ্টক্রমে চড়া দামের বাজারে মালের আমদানি ঘটিয়া গেলে লাভ পায়। আর এই যে বৎসরে দুই একবার উচ্চ মূল্যে পাট বিক্রয় হয় ইহারই কল্পনায় সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রলুব্ধ চাষী ভাতের জমির অধিকাংশ পাটের জোড়া করিয়া বেশী খরচ ও অস্বাস্থ্যে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া অনর্থক বেশী পাট উৎপন্ন করে। ইহাতে বাঙ্গালী চাষীরা পাটের দাম বেশী পাইতেছে না। কিন্তু চাষীরা পাটের দাম বেশী পাইলে যে বাজারের কাটতি কমিবে এরূপ কথার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। ১৯০৯-১০ খৃঃ অব্দের তুলনায় ১৯১৩-১৪ খৃ অব্দে সম পরিমাণে চট ও কাচা পাট দ্বিগুণ দামে সাহেবেরা বিদেশে বিক্রয় করিয়াছে ও থলে দেড়গুণ দামে বিক্রয় হইয়াছে। ১৯০৯-১০ খৃঃ অব্দে কাচা পাট ২৯৮৪৩৩টন, ৪২৯৭০০২ পাউণ্ড দরে ও ১৯১৩-১৪ খৃঃ অঃ ২৯০৯৬৬ টন পাট ৭৮৪১১০১ পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইয়াছে। সস্তা মহার্ঘতার জন্য পাটের কাটতির কম বেশী দেখা যায় না। চাষীরা ন্যায় সঙ্গত উচ্চ মূল্যে বেচিলে কাটতি কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ইংরাজি ৯১০ সালের তুলনায় ১৩১৪ সালে সাহেবরা দ্বিগুণ দরে পাট বেচিয়াছেন ও লড়াইয়ের সময়ে চারি পাঁচ গুণ দরে বেচিয়াছেন। তাহাতে পাটের কাটতি কমে নাই বা বিকল্প আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু চাষীদের বোকা বোঝান হইতেছে ও এই সংহতি শূন্য হতভাগ্যদের প্রাপ্ত দর কমিতেছে। আরও দেখাইয়াছি চাষীরা দাম খুব কমাইলেও কাটতি বাড়ে না। দ্বিতীয়তঃ অন্যদেশে বিস্তৃত পাট চাষ হওয়া খুব অসম্ভব। এরূপ সস্তায় মজুরীতে অস্বাস্থ্যে রোদে-জলে ভুগিয়া সাহেব চাষী কেহই এ কাযে যাইবে না। মাটীর তারতম্যও যথেষ্ট। বাঙ্গালার এই পলিমাটীর মত মাটী অন্যত্র খুব বিরল। সাহেবরা এক এক কলে পুঁজির চতুর্গুণ লাভ করিলেও অর্থঃৎ ক্রেতার নিকট খুব উচ্চ মূল্যে কয় বৎসর বিক্রয় করাতেও কোন ক্ষতি হয় নাই, সুতরাং চাষীরা লেহ্য মূল্য পাইলে কোন ক্ষতিই হইতে পারে না। দেশীয় চাষী ও ব্যবসায়ী একত্র হইলে যদি আবশ্যক হয় বৈদেশিক ক্রেতাকে আমরাই সাক্ষাৎ মাল বেচিলে আমাদের উচ্চ মূল্য ঠিক রাখিয়াও বৈদেশিক ক্রেতাকে কমদরে মাল দিতে পারিব ও তহোতেই এই ভয়ের প্রকৃত নিরোধ হইবে। বঙ্গদেশে মোট জমি ১৬ কোটী বিঘা। কর্ষিত জমি ৮ কোটী বিঘা, কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ৪ কোটী বিঘা, ও নদী পর্ব্বতাদিতে জোড়ে কর্ষণ অযোগ্য জমি ৪ কোটী বিঘা। পাট প্রায় ১ কোটী বিঘা জমিতে উৎপন্ন হয়। ধানের ফলন গড়ে পাট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট মতে বাৎসরিক ধানের ফলন গড়ে ৪/ চারিমণ ও পাটের ৩৷৷০ সাড়ে তিনমণ। সমগ্র বঙ্গে ধান ভাল জন্মিলে ১০ দশ মণ প্রায়ই হয় কিন্তু পাট ৬/ মনের উপর অনেকস্থলে হয় না। ধান চাষের অপেক্ষা পাট চাষে জমির শক্তি কমে ও পাট চাষের জমিতে সার বেশী দিতে হয় ও নিড়ানও কাচানর খরচও যথেষ্ট বেশী। পূর্ব্বে ধানের দাম গড়ে কয় বৎসর ২৷৷ আড়াই টাকা মণ ছিল ও পাটের দাম চাষীরা ৬ টাকা হইতে ১৪ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছে। যাহারা বেশী পাট তৈয়ার করিত তাহারা ধান কিনিয়া খাইয়াও লাভবান হইত। এখন ধানের মণ গড়ে ৫৲ ও পাটের মণ উহার কম। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে পাট যেখানে বেশী উৎপন্ন হয় সেখানে এবার চাষীর ঘরে পূর্ব্ব বৎসরের বহু পাট মজুত আছে ও ২ হইতে ৪ টাকার বেশী দর অনেক সময় চাষীরা পাইতেছে না। অনেক বিশিষ্ট লোকের মত শতকরা চল্লিশ ভাগ অর্থাৎ কিছু কম অর্দ্ধেক পাট মজুত আছে। এই মজুদ মালের পরিমাণ মিলে ৩৮ লক্ষ গাইট বা ২ কোটী মণ। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের ঘরেও বিলাতের ডানডি আদি বাজারে মাল বেশী আছে। মজুদ মালের হিসাব ধরিয়া তবে আগামী বৎসরের কাটতিও উৎপন্নের পরিমাণ ঠিক হইবে। এজন্য জাগতিক বর্ত্তমান বাণিজ্যের অবস্থাও পূর্ব্বকার সাধারণ বাৎসরিক চাহিদার ও হিসাব দেখিতে হইবে। যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বকার গড় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কাঁচা ও পাকা

মালে মোট ৩ অর্থাৎ ২৲ কোটী মণ পাট ভারতের বাহির রপ্তানি হইয়াছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যাদি কার্য্যে আরও ১ এককোটী বা ১½ কোটী মন পাট বা চট দরকার হয়। অতএব ৪ চারি কোটী মণ মাল মোট সমগ্র জগতের কার্য্যে বড় জোর আবশ্যক হইতে পারে। ৮০ লক্ষ গাইট বা ৪কোটী মণ পাট ব্যবসায়ীরা ও পাটের কাটতির চূড়ান্ত সীমা বলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সমগ্র জগতের ব্যবসা ও কল যখন জোরে চলিয়াছিল তখনই এই পরিমাণ পাট বাৎসরিক কাটতি হইয়াছে। এখন বরং কিছু কম কাটিবার কথা। কারণ নানা বিপ্লবে ও বিলাতে শ্রমজীবীদের গোলযোগে কল ও ব্যবসায়ের কার্য্যে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছে ও আমদানি রপ্তানিও পূর্ব্বমত ঠিক হইতেছে না। এ অবস্থায় পূর্ব্ব কাটতির ৵০ বাদ দিলে মাত্র ৩৷৷০ কোটী মণ পাট বিক্রয় সম্ভাবনা। মজুদ যাহা আছে তাহাতে চাষীর পক্ষে বাজার নিম্নই হইবে এ অবস্থায় যদি আমরা ৪৷৷ কোটী মণ পাট পূর্ব্বমত আগামী বৎসর উৎপন্ন করি ও ঘরে পুরাতন মাল ন্যূন সংখ্যায় যদি দেড় কোটী মণ মজুদ থাকে তবে এই ৬ কোটী মণ মাল আগামী বৎসরে অর্থাৎ আগামী আশ্বিন মাস মধ্যে চাষী ঘরেও বাজার দাড়াইবে। যখন বড় জোর ৩৷৷কোটী মন মালের বাজারে কাটতি সম্ভব তখন আমরা ৬কোটী মণ মাল তৈয়ার করিলে ও অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুই দিন ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাশূন্য বঙ্গ ও অন্যত্র কাঙ্গাল হইয়া বেচিলে লেহ্য লাভজনক দর পাওয়া কি সম্ভব ?

বাঁচিবার উপায় কি ?

বাঁচিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ক্ষতির কারণগুলি সূক্ষ্মরূপে সংক্ষেপে পুনরালোচনা আবশ্যক। জাগতিক আবশ্যক বা মোট কাটতির তুলনায় দ্বিগুণ মাল বাজারে উপস্থিত করিতেছি ও সাধারণ বর্ত্তমান কাটতির দেড়া মাল উৎপাদন করিতেছি। এ বৎসর আমাদের অবশ্য চাষ খুব বাড় নাই বরং বৃষ্টির অভাবে ১১·৯ ভাগ কম জন্মিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের গোলযোগে ব্যবসা ও কলের কার্য্য বিশৃঙ্খল ও বহুল পরিমাণ কম হওয়ায় ক্রমে ক্রমে কাঁচা মাল ও চট আদি মাল বাজারে বহুল জমিয়া গিয়াছে। সাহেব কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদেরও ইহাতে চাষীর মত খুব ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ও উপক্রমও হইয়াছিল, কিন্তু একতার গুণে উহারা বাৎসরিক লোক শানের পরিবর্ত্তে পুঁজির চারি পাঁচ গুণ বেশী লাভ করিয়াছেন। ইহার কতকটা ক্রেতার ঘাড় ভাঙ্গিয়া ও কতকটা আমাদের দেশীয় চাষী ও ব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ করিয়াই হইয়াছে। উহারা একযোগে খরিদ ও কলের কার্য্য সাপ্তাহিক ৪।৫ দিন করিয়া বন্ধ দিয়া বাজার ক্রমে উঠাইয়া আজও ঠিক রাখিয়াছেন। উহারা বহির্বাণিজ্যের ও বাজারের কাটতি বুঝিয়া কাঁচা মাল খরিদ ও উৎপন্ন করেন। আর পাটের খরিদও এক যোটে ও স্বজাতীয় সাহেবদের হাত দিয়াই হয়। যুদ্ধের প্রভাবে জারমানির বাণিজ্য

নষ্ট হওয়ায় কেবল ভারতীয় ইংরাজ বণিক ও কল ওয়ালাদের হাতে একচেটে কলের কাজও বহির্বাণিজ্য আসিয়াছে। পি, সি, রায় মহাশয় এক এক কলে ২৫।২৬ লক্ষ টাকা লাভের কথা লিখিয়াছিলেন। কোন কোন কল আরও অধিক লাভ করিয়াছেন। কাজেই উহাদের একযোগে কাজ করিবার খুব সুবিধা বাড়িয়াছে। তাহার উপর ইমপিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতিতে শীঘ্র যে অন্য দেশের ক্রেতা পাটের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কেহ পারিবেন তাহার আশা নাই।

(১) অতএব আমাদের ঐ সহযোগীতার পথেই আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সাহেব কাচামাল ক্রেতা কলওয়ালা ও বহির্বাণিজ্যিকের ন্যায় আমাদের দেশীয় উৎপাদনকারী চাষী ও দেশীয় ব্যাপারী ও মহাজনদের এক যোট হইতে হইবে। কল বন্ধ দেওয়ার ন্যায় আবশ্যক বুঝিয়া চাষ আংশিক কমাইতে হইবে। চাষীদের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক ও ক্রয় বিক্রয় সমিতি করিয়া দিয়া তাহাদের টাকার অভাব ঘুচাইয়া বেচিবার গরজ কমাইয়া নিজ জাতীয় গ্রাম্য সমিতির ও কলিকাতার জাতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হাত দিয়া এক হাতে সাহেব কলওয়ালা ও ব্যাপারিকে মাল দিতে হইবে। অন্য পক্ষে পাটের খালি জমিতে ধান্য, ইক্ষু, তামাক, তুলা আদি লাভ জনক চাষ করিয়া আমাদের দেশীয়ের নিত্য ব্যবহার্য্য উৎপন্ন করিয়া দেশের অন্ন বস্ত্রাভাব সাক্ষাৎ মোচন ও পাট প্রভৃতি ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া বিদেশী মহাজনকে গরজ করিয়া যাহাতে না বেচিতে হয় ও বেশ লাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষ কমাইয়া সাহেবদের হাতের মজুত মাল নিঃশেষ না করিলে চাষীর স্থির অধিক দামে পাট বিক্রয়ের আর কোন উপায় নাই। তার পর দেশীয় চাষী ও মহাজন এক যোগে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে, সাহেবেরা আর কোনরূপেই ঠকাইয়া অসঙ্গত সস্তায় কাঁচা মাল লইয়া কোটীশ্বর হইয়া আমাদের মাথায় পা দিয়া চলিতে পারিবে না। আর এইরূপে দেশীয়ের বিভিন্ন স্তরে ধন বৃদ্ধিতে আমরা কল কারখানা প্রভৃতি অধিক টাকার স্বজাতির প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে, যে মূলধনের লাভ আজ সব বিদেশী মহাজন লইয়া আমাদিগকে অস্বাস্থ্য ও মহামারির নিত্য সংচর চির দরিদ্র কুলীর জাতি করিয়া কশে খাটিবার জন্য কই মাছ জেয়ান করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর চলিবে না।

(২) এখনই আমাদিগকে সাধ্যমত চাষী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জমিদার আদি ধনীদিগের সহ এক যোগ হইয়া যতগুলি সম্ভব স্থানে স্থানে কাগজের, পাটের ও চিনি আদির কল স্থাপন করিতে হইবে। পাটের ন্যায় চিনির বাজারেও আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। গুড়ের দর ৮৲১০৲ আর চিনির দর ৩৫৲।৪০৲ টাকা। দুইমণ গুড়ে এক মণ চিনি হয়। অতএব ১৬৲ টাকার মালে ৩৫৲ টাকায় চিনি ও আর ৪৲ টাকায় চিটা গুড় বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্ব প্রথায় পেতে দিয়া চিনি তৈয়ার ব্যবস্থা এখনি প্রচলন করা উচিত। তার পর কারখানা যত দূর হয় ভাল।

(৩) আলু প্রভৃতি খাদ্য ও তরকারী চাষ, তামাক, তুলা প্রভৃতি পন্য উৎপাদন করিয়া দেশে সুতাদি ও চুরুটের কারখানা স্থাপন করিতে পারিলেও বহু অর্থ দেশে থাকিয়া যায়। ইহাতে পতিত ডাঙ্গা জমিগুলির সদ্‌গতি হয়।

(৪) অন্নাভাব ও চাউলের মূল্যাধিক্য একটী বিশেষ সমস্যা। চাষীরা নিজের খোরাকী ধান নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধিক উৎপন্ন করিয়া উদ্বৃত্ত ধান্য মহার্ঘদরে বেচিয়া লাভবান হওয়া কৃষিকুলের তথা সাধারণ বাঙ্গালীর পরম কল্যাণের কথা। ভাতের জমি পাটে লাগাইয়া উপবাস করিয়া সাহেবদের দুয়ারে মাথায় পাট লইয়া কাঁদিয়া বেড়ান নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিতার কথা। অতএব আগামী বৎসর পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে যেখানে বেশী পাট চাষ হয় সেই সব স্থানে চাষীর অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাটের জমিতে ধান্য, তুলা, তামাক, আখ দেওয়া উচিত ও তৎপর বৎসর হইতে আবশ্যক মত এক তৃতীয়াংশ বা সিকি জমি কম করিতে হইবে। বীজ আদি সংগ্রহ ব্যাপার বঙ্গীয় কৃষক সমিতির স্থানীয় শাখা সমবায় পদ্ধতিতে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর বাজারের কাটতি বুঝিয়া কোন্ চাষ কি পরিমাণে করিলে চাষী লাভবান হইবে তাহা কৃষক সমিতি কর্ত্তৃপক্ষগণ (কৃষি ও ব্যবসায়ী—অভিজ্ঞগণ) প্রত্যেক চাষীকে জানাইয়া দিবেন।

(৫) দেশীয় কৃষি ও বানিজ্য বিষয়ে "কৃষকের" ন্যায় এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র স্বাস্থ্য, সমবায় কৃষি, বাণিজ্য, মৎস্য ও গৃহপালিত পশু পক্ষী প্রভৃতির চাষাদি বিষয়ে প্রচলিত বার্ত্তা লইয়া প্রত্যেক গ্রামে ও ব্যবসায়ীর গদিতে গদিতে যাওয়া উচিত। "কৃষক" কৃষি-সমিতি ও পল্লীসেবা নামে এইরূপ পত্র শীঘ্রই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পত্রিকা প্রচারার্থে এক কোম্পানি গঠিত হইতেছে। প্রতি সেয়ার বা অংশ পাঁচ টাকা হিসাবে ১ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া আরম্ভ হইবে। গ্রাহক ও উৎসাহীবর্গ ১৫ কলেজ স্কোয়ায় বঙ্গীয় কৃষি সমিতির সম্পাদকের নিকট এ বিষয় সকল বিবরণ জ্ঞাত হইবেন।

(৬) চাষীদের কার্য্যকরী কৃষিবিদ্যার সহ মানসিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান লাভের, সমবায়ের উপকার, হিন্দু মুসলমান ও ছোট বড় জাতি নির্ব্বিশেষ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিয় নিজের ও স্বদেশের ও সমাজের সকলের কল্যানের জন্য মনে প্রাণে ঐক্য করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য উপযুক্ত প্রচার ও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক পল্লী স্বায়ত্ব শাসনের নিম্ন স্তর ইউনিয়ন বোর্ড, কৃষক সমিতির শাখা, দেশের অন্যান্য হিতসাধন প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সমাজ, ও শিক্ষিত লোকদের একটী জীবন ব্রত করিয়া প্রচার ও প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য অবিলম্বে যত্ন করিতে হইবে। এই জন্য ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার বঙ্গীয় কৃষক সমিতির সম্পাদককে লিখিলে সকল প্রকার সহায়তা পাইবেন। হিন্দু মুসলমান ও ব্যবসায়ীর নেতাগণকে রক্ষক (Trustee) করিয়া পল্লীচর্য্যা ও কৃষির

উন্নতি প্রচারার্থ এই সমিতির যত্নে এক ধনভাণ্ডার স্থাপন হইতেছে। এ বিষয়ে সকল বিবরণ সমিতিতে জ্ঞাতব্য।

(৭) শিল্প ও বাণিজ্যপটু প্রবল সংহতি শক্তি যুক্ত বৈদেশিকদের হাতে পড়িয়া দেশীয়ের কোন প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত করা বড়ই সুকঠিন হইয়াছে। অবশ্য এপক্ষে নষ্ট ক্ষেত্র পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু উপস্থিত সহজও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিত পথে চলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। জল অভাবে ও অধিক জলে চাষের সমূহ ক্ষতি হইতেছে তাহার প্রতীকার রাজা ও প্রজা উভয়ে মিলিয়া করিতে হইবে। দেশের সিকি কর্ষণ যোগ্য পতিত জমি আবাদ করিতে হইবে। দুগ্ধ ও অন্য গৃহপালিত পশুপক্ষী ও মৎস্যাদি চাষ সর্ব্ব প্রযত্নে বাড়াইতে হইবে। ইহাতে দেশে খাদ্যাভাব দূর হইয়া অর্থাগম বাড়িবে। সমগ্র পশ্চাত্য দেশে বিশেষ জার্ম্মানিতে যে গৃহস্থের চাষ কম ছিল তাহার এইরূপ অবান্তর উপার্জ্জন পথ খুব প্রশস্ত ছিল। আমাদের দেশের সুখের দিনে মোগোল আমলে লোকের আয়ের অর্দ্ধেক, বস্ত্রশিল্পে লাভ হইত। দেশের সকল সম্প্রদায় আবশ্যক কুটীর ও গৃহ শিল্প চর্চ্চায় মন দিয়া তাহাদের নিরুপায় দরিদ্র গুলির যাহাতে বিশিষ্ট ধনাগম হয় ও অবকাশ সময় কাজে লাগে তাহাও বিশেষ চেষ্টা করা উচিত

(৮) বিলাস বর্জ্জন মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, সত্য ব্যবহার, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, সংঘবদ্ধতা, বিশেষ প্রত্যেকেরই ব্যয়ের অধিক আয় দাঁড় করান অত্যাবশ্যক।

শেষ নিবেদন

নানারূপে ক্ষতি গ্রস্থ হওয়ায় বেন্টেলী সাহেবের মতে উপবাসের রোগ মেলেরিয়া ও অন্যান্য মহামারি আজ সোণার বাঙ্গালার সাজান বাগানকে শুকাইয়া এই চির নির্য্যাতিত 'মা বাপ শূন্য' মূর্খ আত্মরক্ষা শক্তি হীন দেশের মেরুদণ্ড কৃষক কুলকে নিষ্মূল করিতেছে। বর্দ্ধমান বিভাগে মৃত্যু সংখ্যা জন্ম সংখ্যার দ্বিগুণ। আজ তাই সবিনয়ে করযোড়ে হে প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত অদ্বিতীয় ইংরাজ সম্রাট ও বঙ্গের ভাগ্য বিধাতা লাট সাহেব! তোমাদের চরণে নিবেদন করি—বিধাতা তোমাদের হাতে এই ভারতের ৩১কোটী তথা বঙ্গের ৪॥ কোটী নরনারীর ভার দিয়াছিলেন, কই, তোমরা ত দয়া করিয়া তাহাদের যত্ন যথাযথ লইলে না, তাই বুঝি তিনি অন্ন বস্ত্র হীন নিরুপায় সন্তান গুলিকে শান্তির রাজ্যে নিজের কোলে টানিয়া লইতেছেন। হায় এখনও কি পূর্ণ যত্ন লইবে না" হে, বণিক রাজ ইংরাজ জাতির বণিকগণ তোমাদের প্রতি নিবেদন, তোমাদের শোষণ পদ্ধতিতে যে আজ দীন নির্ব্বোধ ভারতবাসী মরণোন্মুখ। এইরূপ কৃষি ও কেরানীর জাতি তোমাদের ধনার্জ্জনের প্রধান সোপান ভারতবাসী মরিলে, তোমাদের কাটতি ও যোগানের কি ভীষণ ক্ষতি হইবে না? আমাদের চারিযুগের মনিব হে রাজা ও জমিদার বৃন্দ! প্রজারা আজও যে তোমাদের ভিন্ন অন্য অভিভাবক জানে না। তুচ্ছ করবৃদ্ধি ও আবওয়াবাদি

কারণে প্রজার সহ নিত্য বিরোধ তোমরা মামলা খরচে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছ আর এই ভেদের সুযোগে বিদেশী বণিক্ দেশের কোটী কোটী মুদ্রা সহজেই আত্মসাৎ করিতেছে। তোমরা তাহাদের দুঃখের দিনে বিলাস ও সহরের আমোদ আহ্লাদ ছাড়িয়া, দ্বেষহিংসা, স্বার্থ প্রতিপত্তি ভুলিয়া তোমাদের পুত্রবৎ প্রকৃতি পুঞ্জ আয়ের প্রধান সোপান কৃষকের ব্যথায় তাহাদের সহায় হইয়া স্বীয় স্বার্থ ও পরম পরামার্থ সাধনে ভূম্যধিকারী, দেশাধিপতি ও জমিদার নাম কি সার্থক করিবে না? সব শেষ বলি ভাই মাড়য়ারী ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী—তাই হিন্দু মুসলমান, ছোট বড় চাষী—তোমাদের সকলের চরণে নিবেদন—সাক্ষাৎ মৃত্যু জাতীয় ধ্বংশ এবং নাম ও বংশ লোপ সম্মুখে; স্বার্থ প্রতিদ্বন্দিতা ছাড়িয়া তোমরা সকলেই দেশ মাতার সুসন্তান ও ভাইয়ের ভাই হইয়া আবশ্যকীয় ত্যাগ ও সংযম সাধনে একযোট হইয়া আত্মরক্ষা করিবার কি চেষ্টা করিবে না? উদ্যোগীরাই লক্ষ্মীলাভ করে। অনুদ্যোগ নিতান্ত কাপুরুষতা ও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। ভয় করিও না, হতাশ হইও না। সময় অনুকূল, রাজজাতি আজ উদারভাবে আমাদের বলীয়ান করিয়া রাজ্যের বল ও গৌরব বাড়াইতে প্রস্তুত। বিলাতে চাষীকে বাড়াইবার জন্য নিম্নদর গভর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই সব সুবিধা করযোড়ে চাইব। যদি চাহিয়া না পাই তবে আত্ম প্রতীষ্ঠ হইয়া স্বীয় সমবায় ও সম্মিলন শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সেবক—শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার স্থিত কলিকাতা বঙ্গীয় কৃষক সমিতি।

"তৃণৈরহি গুণত্বমাপন্নৈ বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ।"

God helps those, who help themselves.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

দেশের কথা।

১৯১৮ অব্দে অনাহারে মৃত্যু—এসিয়ান রিভিউ পত্রে প্রচারিত হয় যে ১৯১৮ অব্দে ৩ কোটী ২০ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে অনাহারে মরে! এই অসম্ভব কথার প্রতিবাদ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ কথার প্রমাণ কি? ডাইরেক্টর অফ ইনফর্‌মেশন জানাইয়াছেন যে ১৯১৮ অব্দে সমগ্র ভারতে একজনও অনাহারে মরে নাই! অবশ্য অনাহারে মরিয়াছে বলিয়া সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট (প্রশংসাপত্র?) ব্যতীত অনাহারে মরা সাব্যস্ত হয় না। তবে যদি কোন বৎসরে বিশেষভাবে শস্যহানি হয় এবং সেই বৎসর যদি মোট মৃত্যুসংখ্যার অনৈসর্গিক বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা হইলে "স্বল্পাহার বা অনাহার প্রসূত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি" বলিয়া একটা অনুমান করা হয়ত খুবই অসঙ্গত হয় না। ১৯১৮ অব্দে ভারতের নানাস্থানে শস্যোৎপত্তি কম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর অনুপাত জনসংখ্যায় প্রত্যেক সহস্রে ৬২ দাঁড়াইয়াছিল। জ্বরে মৃত্যু হয় ১কোটি ১০লক্ষ। ১৯১০ অব্দে মৃত্যুসংখ্যা ৮৫ লক্ষ। ১৯১৮ অব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপের কথা সকলেরই মনে আছে।—এডুকেশন গেজেট।

চাউল রপ্তানী—গত অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা কিছু কম চাউল জন্মায় নাই। কিন্তু সরকার বাহাদুর ঐ সময় চাউল বিদেশে রপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়ায় এ বৎসর ৮.৯ টাকার নীচে দর আর নামে নাই। তাহার উপর বড় বড় সাহেব সওদাগরদিগের সুবিধার জন্য গত ৩।৪ ঠা জুন গামবাতা নামে একখানি জাহাজে চাউল রপ্তানী করিবার আদেশ দেন। সেই একখানি জাহাজেই পাঁচ ছয় হাজার টন চাউল বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। সাধারণে জানে চাউল বিদেশে যাইতেছে না। এই চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়ায় সরকার বাহাদুরের প্রভূত লাভ হইয়াছে। এই চাউলের উপর বেশী ট্যাক্স আদায় করিয়াছেন।

আবার শোনা যায়, এই মাসে কেবল মাত্র শাওয়ালেস কোম্পানীকে পাঁচ ছয় শত টন চাউল রপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও অনেক বড় কোম্পানী আছে; আর কাহাকেও না দিয়া কেবল মাত্র শাওয়ালেস কোম্পানীকে রপ্তানী করিতে দিবার অর্থ কি বোঝা যায় না। এমন যদি কথা হয় যে তাহারা যাহা প্রথমে পাঠাইতে চাহিয়াছিল তাহা সব পাঠান হয় নাই তাহা হইলে যতটুকু বাকী ছিল ততটুকুই পাঠাইতে দিতে পারেন, তাহার বেশী দেওয়া উচিত নয়। ওল্ড হার্ড টেবিল চাউল পাঠানোর কথা কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কি দেখিয়াছেন যে সেগুলি সব গতবারের ওল্ড হার্ড টেবিল চাউল? জুলাই মাস হইলেই নূতন চাউলকে ওল্ড হার্ড বলে, এ চাউল গত বৎসরের ওলড হার্ড

হওয়া প্রয়োজন। সাধারণে এখনও জানেন, বাঙ্গালা দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হয় না। কিন্তু মগরা-হাট হইতে এখনও চাউল রপ্তানী হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্য কি এতৎসম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়া গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব অবগত হইবেন ?—সঞ্জীবনী।

চাউল রপ্তানী।—গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিলাতে ১৩, ৭৫,০০০মণ এবং তাহার পরে ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে ৮১৫,০০০মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এসিয়া এবং আফ্রিকার নানাস্থানেও ভারত হইতে বহুল পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে।—এডুকেশন গেজেট।

চাউলের ব্যবসায়ে জাপানী—জাপানীরা বর্ম্মায় চাউলের ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ বলিয়া কয়েকমাস ধরিয়া গুজব রটিয়াছিল। এখন দেখিতেছি সত্যসত্যই জাপানীরা বর্ম্মা চাউলের ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ তাহারা জোসেফ হীপ এণ্ড সন্স কোম্পানীর চাউলের কল খরিদ করিয়াছে, তৎসঙ্গে কিছু জমিও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতে যেরূপ ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বর্ম্মা চাউলের ব্যবসা বিদেশীর হস্তগত হওয়া ভারতবাসীর বিশেষ আশঙ্কার কথা। চাউলের দর অদূর ভবিষ্যতে সুবিধা হইবার কোনই লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। বিদেশী কোম্পানী কখনই ভারতবাসীর দুঃখ কষ্ট দেখিয়া চাউলের দর কমাইবে না, অপিচ তাহারা চীন, জাপান, প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট চাউল সরবরাহ করিতে থাকিবে ঐ সমস্ত প্রদেশে চাউলের মূল্য স্বভাবতঃই ভারতের মূল্যের অপেক্ষা অনেক অধিক।—আনন্দপত্রিকা।

অন্ন নাই, অন্ন কই—বলিয়া অনবরত লোককে জানাইয়াই বা আমাদের বিশেষ লাভ কি ? কেবল চাউলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের খরচের মত চাউল রক্ষা করিতে হইবে এবং চাউলের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কোন সস্তা শস্য উৎপন্ন করা যায় কি না তাহা আমাদিগকে এখন বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে।—কৃঃ সঃ

শোগাম খাদ্য।—চাউল ভারতের প্রধান খাদ্য, কিন্তু চাউলের যেরূপ দর হইয়াছে তাহাতে দরিদ্রগণ উহা ক্রয় করিতে পারিতেছে না। জীবন ধারণ করা তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। সম্প্রতি সিংহলে "শোগাম"নামক একপ্রকার শস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাকার কুলী মজুরগণ এবং দরিদ্রগণ চাউলের পরিবর্ত্তে শোগাম খাইয়া থাকে। উহা শুষ্ক স্থানে অধিক পরিমাণে জন্মে সুতরাং উহা আমাদের দেশের পাহাড় অঞ্চলের শুষ্ক স্থানে জন্মে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।—প্রতিকার।

শোগাম শস্য—জোয়ার, বাজরা জাতীয় শস্য; ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম Sorghum Halipense, Sorghum vulgere বাঙলায় ইহার একটা নাম দে ধান। এ দেশে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়।——কৃঃ সঃ

প্রবল বন্যার—প্রভাবে তমলুকের প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ ও ৫ মাইল প্রশস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়াছে; ফলে, ১০৫ খানি গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে এবং ৩৫ বর্গমাইল স্থানের ধান্যক্ষেত্র ভাসিয়া গিয়াছে। সাত হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হওয়াতে ৩৫ হাজার লোক ঘরবাড়ীহীন হইয়াছে। বাঙ্গালার পোড়া অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে কে বলিবে ?—ঢাকাপ্রকাশ।

উড়িষ্যার ভীষণ জলপ্লাবন—কটকের সংবাদে প্রকাশ—জমসেদপুর, খোরকাই এবং সুবর্ণরেখা নদীর জল ফুলিয়া উঠিয়া যুগসালাইজি, টাউন রাণীকুবার এবং খুন্তানদীর কুলি বস্তি গুলি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক পল্লীগ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে এবং বন্যা সাক্চির রাস্তা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। খোরকাই নদীতে চারিটি শবদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

জয়পুর মহকুমার প্রায় সকল নদীর জলই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জল ক্রমেই বাড়িতেছিল। বৈতরণী নদীর দক্ষিণদিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অন্য সকল বাঁধও ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল।

বালেশ্বর জিলায় সুবর্ণরেখা নদীতেও বান ডাকিয়াছিল; কিন্তু দিন পরে জল অনেক কমিয়া যায়। ঐ সময় একদিন পুনর্ব্বার বান ডাকিবায় ফলে জেলাসোর, বার্ত্তা, নপা, বালিলাল এবং ভেগারী থানার এলাকাধীন অনেকগুলি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্ জলের নীচে ডুবিয়াছিল। নেপোর নিকটবর্ত্তী সেতুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু দারবুদি ছাড়া আর কোন বাঁধ ভাঙ্গে নাই। সমস্ত ফসলই নষ্ট হইয়াছে। ধান ক্ষেতের উপর বুকজল দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই ধানগাছগুলি সব জলের নীচে পড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পড়িয়াছে জলমগ্ন স্থানসমূহে চাউলের দর টাকায় সাড়ে তিন সের মাত্র।—ঢাকাপ্রকাশ।

সরিষার তৈলে বিষাক্ত ভেজাল—কলিকাতা কর্পোরেশন সকলকে সতর্ক হইবার জন্য জানাইতেছেন যে,—কলিকাতার বাজারে আবার পাকড়ার তৈল মিশ্রিত সরিষার তৈল বিক্রয় হইতেছে। পাকড়ার তৈলে প্রুসিক এসিড নামক এক প্রকার ঘোর অনিষ্টকর বিষাক্ত পদার্থ আছে। উহা ভক্ষণে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঐ তৈল অতি অল্প মাত্রায় মিশ্রিত থাকিলেও উহা মানুষের খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সাধারণে যেন বিশেষ সতর্কতার সহিত তৈল ক্রয় করেন। কলিকাতা হগসাহেবের বাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল পাওয়া যায়।" কিন্তু এই সঙ্গে আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, যে ভেজালের উপদ্রবে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া লোকের স্বাস্থ্য ও জীবন দিনে দিনে ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে, সেই ভেজাল নিবারণের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করার আবশ্যকতা গবর্ণমেণ্ট কি কোন কালেও উপলব্ধি করিবেন না ? কেবল শাসন-সংস্কার আইন এবং ভারত-রক্ষা আইন প্রণয়ন করিলেই কি গবর্ণমেণ্টের সব কর্ত্তব্য শেষ হইবে ?—মোসলেম-হিতৈষী।

বন্যাপীড়িত তমলুকবাসিগণের সাহায্যার্থ রায় শেঠ সুখলাল কর্ণানী বাহাদুর একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—রায়ত।

দান—উড়িষ্যার বন্যা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ দ্বারবঙ্গের মহারাজ বিহার উড়িষ্যার ছোট লাটের হস্তে দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।—বীরভূমবার্ত্তা।

সাহায্য দান—বরিশাল জেলার অন্নকষ্টপ্রপীড়িত নরনারীদিগের সাহায্যার্থ স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অর্থ দান করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। নোয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড তথায় অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের এবিষয় প্রণিধান করা একান্তই উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।—কাশীপুর-নিবাসী।

সদনুষ্ঠান—কলিকাতার বাবু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার, বাবু তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র বিপন্ন তমলুকবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতা হইতে ২ গাঁইট মিলের কাপড় ও নগদ এক হাজার টাকা লইয়া তমলুক যাত্রা করিয়াছিলেন।—বীরভূমবাসী।

বঙ্গের বাণিজ্য—যুদ্ধাবসানে বঙ্গদেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে, ১৯১৯-২০ সনে বঙ্গে-সমুদ্র-পথে ৯০২৬কোটি টাকার বাণিজ দ্রব্য আমদানী এবং ১৪০৭৮ কোটি টাকার রপ্তানি হইয়াছে।—সম্মিলনী।

কিন্তু বাংলা দেশের বাণিজ্য দেশীয় বাণিজ্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। বাংলার বা ভারতবর্ষের ব্যবসাবাণিজ্য বলিয়া সরকার যাহা উল্লেখ করেন তার পরিচালন করেন বিদেশীরা, আয় গ্রহণ করেন তাঁরাই, এবং এ বিষয়ে রাজসরকার তাঁদেরই রীতিমত সাহায্য করেন। ইহাই ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য। মূলে ইহা বিদেশী, নামে দেশী। যাহা হউক স্বাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদিগকে অপরের সাহায্য-নিরাপেক্ষ হইয়াই নামিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপায় নাই।—প্রবাসী।

কাগজের কল—শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে কাগজের নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভারতে প্রতি বৎসর ২২৪০০০০ মণ কাগজ ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসরই কাগজের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে যে কয়টি কাগজের কল আছে তাহাতে মাত্র ৭২০০০০ মণ কাগজ প্রস্তুত হয়। সুতরাং ভারতের কাগজের অভাব পূরণ করিতে অসমর্থ। মান্দ্রাজে ১০ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি। ভারতে যে কয়েকটি কাগজের কল আছে তাহার সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি করিলে, ভারতবর্ষ কাগজের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া পারিবে। শিক্ষাবিস্তারকামী ব্যক্তিগণের এই দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক।—সম্মিলনী।

প্রায় প্রত্যহই একটা না একটা 'লিমিটেড' কোম্পানী গঠিত হইয়া রেজেষ্টারী হইতেছে। জাহাজ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া শূকর পালনের কোম্পানি পর্য্যন্ত

হইয়াছে। কিন্তু একটাও নূতন কাগজের কল এদেশে হইল না। ইহার কারণ কি? কাগজের দর দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে কাগজের কল স্থাপিত হইলে কোম্পানির বিশেষ লাভ হইবার আশা আছে; তথাপি কেহই এই বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন না কেন?—জাগরণ।

ইটের ব্যবসা—মুর্শিদাবাদ হইতে এবার কলিকাতায় প্রচুর ইট যাইতেছে। দরও যথেষ্ট দিয়া কলিকাতায় বাটী নির্ম্মাণের ঠিকাদারগণ লইয়া যাইতেছেন। যে সমস্ত ইট ১২ টাকা ১৪ টাকা হাজার বিক্রয় হইত, তাহাই এখন ২৫ টাকা ৩০ টাকা হাজার বিক্রয় হইতেছে। ইট-ব্যবসায়ীগণের এবার যথেষ্ট লাভ হইবে। এতদিন বাঙ্গালীরাই ইট খরিদ বিক্রয় করিতেছিলেন। এইবার মাড়য়ারী প্রবেশ করিয়াছেন। কতক দিন হইল একজন মাড়য়ারী ইট খরিদ করিতে আসিয়াছেন। উচ্চ দরে খরিদ করিতে তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালীর ক্ষমতা কুলাইবে না। সব কাজেই মাড়য়ারী-হাত প্রসারিত হইয়াছে, অন্যে আর কিছু করিতে পারিবে না—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী।

ভারত হইতে গো-রপ্তানী—কেবল শস্য নহে, গরুও ভারত হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯০১ অব্দে তিন লক্ষ কুড়িটি গরু রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১২ অব্দে রপ্তানীর সংখ্যা ৫লক্ষ ৬ হাজার হইয়া উঠে। এই কৃষিপ্রধান দেশ হইতে এরূপভাবে গো-রপ্তানী হইলে কিরূপে কৃষিকার্য্য চলিবে?—বীরভূমবাসী।

নিজাম রাজ্যে গো-হত্যা—হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মুসলমান সমাজের মুকুটমণি। তিনি সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, ঈদ্‌বকরিদ উপলক্ষে বা অন্য কারণে তাঁহার রাজ্য মধ্যে গোহত্যা হইতে পারিবে না। তৎপরিবর্ত্তে ছাগ ও মেষ হত্যা করিতে হইবে। নিজাম বাহাদুরের এই কার্য্যে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা আশা করি, ভারতের সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। চারুমিহির।

গো-হত্যা বন্ধ—মধ্যপ্রদেশের সাগর মিউনিসিপ্যালিটি গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য মিউনিসিপ্যালিটির যে ছয় হাজার টাকা লোকসান হইবে উক্ত সহরের শ্রীযুক্ত এস, ডি, মিশ্র এবং কে, আর, খন্দেকার নাকি তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন বলিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য আমরা উক্ত মহাজনদ্বয়কে প্রশংসা করিতেছি।—বীরভূমবার্ত্তা।

গোহত্যা নিবারণ ও গোরপ্তানি বন্ধ না হইলে দুগ্ধ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইবে এবং চাষের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য—কুঃ সঃ।

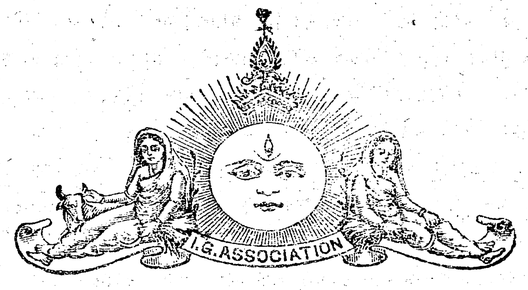

আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল

বঙ্গে কৃষি সভা

বঙ্গদেশীয় কৃষি বিভাগ সংক্রান্ত সভার সর্ব্ব প্রথম এইবার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কৃষি সভার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে কৃষি সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমিতির সহিত ইহার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে প্রাদেশিক কৃষি সমিতির সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। উল্লিখিত সভা এবং এই সমিতি সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন ধরণের। ইংলণ্ডে অবস্থিত কৃষি সমিতির অনুরূপ যে সকল ভারতীয় কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে—বর্ত্তমান প্রাদেশিক কৃষি সমিতি গুলির প্রয়োজন মত সংস্কার হইলে উহারা বঙ্গদেশীয় শীঘ্র সমিতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। এই যে সরকারী কৃষি সমিতি শুধু পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, উপরন্তু কৃষির উন্নতি কল্পে অর্থ সাহায্য করিতে যত্নবান হইবে।

কৃষিসভা—কিন্তু অন্য এক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে—পরামর্শ দান ব্যতীত ইহার আর কোনও বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য নাই। বঙ্গদেশ সংক্রান্ত কৃষি বিষয়ক প্রশ্নাবলীর বিজ্ঞান সম্মত মীমাংসা করিবার নিমিত্ত ইহা ইহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে এবং সেই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে ইহার ফলাফল জানাইবে। এই প্রদেশের প্রধান প্রধান কৃষিতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য। এতদ্ব্যতীত সরকারী ও বে সরকারী প্রত্যেক সাহায্যক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করিতে ইহা উৎসুক। ইহা বৎসরে

বৎসরে সভা সমিতি করিতে—দেশের প্রধান প্রধান জমিদার প্রতিনিধি, কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তির, পল্লীর উন্নতিকামী লোক এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণকে ইহা কৃষি বিষয়ক গবেষণার্থ সাদরে নিমন্ত্রণ করিবে এবং ইহার কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারণে তাহাদের মতামত গ্রহণ করিবে। এই নবগঠিত সভার এই সর্ব্ব প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন। এতদ্ব্যতীত ইহা মাসে মাসে তুলা বা পাটের চাষের সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত বৎসরে বৎসরে সমিতি গঠন করিবে। সেই সব সমিতিতে এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দানে সমর্থ উপযুক্ত লোকদিগের মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে ভারতীয় কৃষি সমিতির প্রাদেশিক শাখা এবং কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমাদের দেশের কৃষি-বিজ্ঞান উন্নতির উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছে বলিতে হইবে। উদ্যোগ আয়োজনের দিকটা আলোচনা করিলে এই কথা বলা চলে বটে কিন্তু ফলাফল এখন ভবিষ্যতগর্ভে নিহিত। নিম্নলিখিত ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই পর্য্যন্ত কি করিয়াছে তাহার সম্যক বিবরণ অবগত হইতে পারি।

গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কৃষিপ্রণালী পরিচালন পদ্ধতি বুঝিতে হইলে কৃষি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষির উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা ও আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু সেকেবল সাধারণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেই ঐ শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছিল—বাস্তবিকপক্ষে কৃষির উন্নতি হিসাবে কোনও ফল দর্শে নাই কিন্তু ইহা একেবারে বিফলে গিয়াছে এ কথা বলা যায় না। ইহা হইতে অন্ততঃ এই শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে যে সাধারণের মধ্যে কেবলমাত্র সমিতি গঠন করিয়া কোনও লাভ নাই কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে ঐ সমিতি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভ্যগণকে নির্দ্দিষ্ট কিছু কিছু কাজ দেওয়া উচিত। আগে তত্ত্বানুসন্ধান, পরে, অনুসন্ধান ফল প্রকাশ; আগে গবেষণা পরে মত প্রচার। ইহা সম্যক উপলব্ধি করিবার পর—তত্ত্বপরীক্ষার উন্নতি সাধন এবং তাহা হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সকলের প্রচার—এই উদ্দেশেই গবর্ণমেণ্টের কৃষি প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্জ্জন ভারতীয় কৃষি-সেবা-সমিতি স্থাপন করেন এবং কৃষি শাস্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে দক্ষ ব্যক্তিগণকে ইঁহার সভ্যশ্রেণী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর অবশ্য তত্ত্বানুসন্ধানের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট ছিল। পরে এই সমিতির জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধনের দিকে দৃষ্টিপড়ে। কৃষক তাহার কার্য্যের উপযোগী পদ্ধতির কোনও নূতনত্ব দেখিলে তাহা, কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে এবং ১৯১০ খৃঃ অব্দে এতদ্জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরিক্ষালব্ধ উন্নতি এবং কার্য্যাবলী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যে সকল কৃষক দেখিল যে এই পরিক্ষালব্ধ জ্ঞান সাহায্যে দেশের প্রধান উৎপন্ন শস্যের

বহুপরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে তখন তাহারা সেই ভাবেই নিজের চাষাবাদ করিতে লাগিল ; তাহার ফলে ভারতের স্থানে স্থানে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি কার্য্যের প্রচার হইতে লাগিল। কিন্তু এই প্রকার পারদর্শী কৃষকের সংখ্যা কত তাহা বুঝা যায় না—সাধারণে যে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাও বলা যায় না কিম্বা কৃষি জ্ঞান প্রচারার্থ গবর্ণমেণ্ট যে যথা কর্ত্তব্য করিয়াছেন তাহাও বলা চলে না ; যতটুকু হইয়াছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সর্ব্বপ্রথমে নানারূপ উৎকৃষ্ট বীজের উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—তৎপরে তাহা প্রচার হইয়াছিল—অর্থাৎ আগে গবেষণা পরে প্রকাশ—আমরাও এই নিয়মের অনুবর্ত্তন করিতে বলি। কিন্তু এখনও গবেষণা, জ্ঞান ও তাহার প্রচার সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক জেলায় জেলায় ও ইউনিয়নে কৃষি সঙ্ঘ ও পরিক্ষাক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা হওয়া উচিত তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য তাহার সহস্রাংশও করেন নাই।

হাড়ের গুঁড়া সার—কৃষকের অনেক গ্রাহক এবং ভারতীয় কৃষি সমিতির অনেক সভ্যগণের নিকট হইতে আমরা প্রতিনিয়ত পত্র পাইতেছি যে "আমরা পাটের জন্য, ধানের জন্য, আলুর জন্য, ফল বৃক্ষের জন্য, মালঞ্চে ফুলের গাছ, লতা, গুল্মের জন্য হাড়ের গুঁড়া সার ব্যবহার করিব কিনা, কি পরিমাণ ব্যবহার করিব, বা কি অবস্থায় ব্যবহার করিব, হাড় চূর্ণ করিবার উপায় কি. ইহা ব্যবহারে উপকারিতা বা কি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা সকলকে স্বতন্ত্র উত্তর না দিয়া হাড়ের গুঁড়ার উপকারিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিয়া সাধারণকে তাহা জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

কয়েকটি বিশেষ সার বৃক্ষাদির অবয়ব পরিপুষ্টি, তাহাদের ফল, ফুল প্রসবের সহায়তার জন্য নিয়ত আবশ্যক হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে বৃক্ষলতাদির আহরণ জন্য এই সমস্ত সার মৃত্তিকাতে অল্প বিস্তর সঞ্চিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সারবান মৃত্তিকা না হইলে বৃক্ষ লতাদির সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না। জমির সারবত্তা বজায় রাখিবার জন্য যে সারের যখন অভাব বোধ হয় তখন সেই সার জমিতে যোগাইতে হয় ; কখন বা জমিকে সম্পূর্ণ সারবান করিবার জন্য সব কয়টি অল্প বিস্তর যোগাইয়া জমিকে পূর্ণ মাত্রায় চাষের অনুকুল করিয়া লইতে হয়। এই বিশেষ সার কি তাহা বিচার আবশ্যক।

(১) নাইট্রোজেন প্রধান সার, ইহাতে বৃক্ষের অঙ্গ পুষ্টি হয়, এবং ডাল পাতার বৃদ্ধি সমধিক পরিমাণে হয়। সোরা, সোডিয়ম নাইট্রেট প্রভৃতি নাইটোজেন প্রধান সার।

(২) পটাস প্রধান সার—ইহা বৃক্ষের ফল ফুল ধারণের শক্তি বৃদ্ধি করে, অম্লস্বাদযুক্ত ফল সুমিষ্ট করে, গুটিধারি শস্যের পুষ্টি সাধনে ইহার বিশেষ প্রয়োজন।

উপযুক্ত পরিমাণ পটাস সার সংযোগে মটর ও সীমের চাষ করিলে সীম ও শুঁটীর সাতিশয় মিষ্ট আস্বাদ হয়। খনিজ পটাস আছে কিন্তু ছাই আমাদের সহজ প্রাপ্য পটাস সার।

(৩) চূণ প্রধান সার—ইহা স্বতন্ত্রভাবে সারের কার্য্য না করিলেও ইহার পরোক্ষ কার্য্য সাতিশয় ফলপ্রদ ; ইহাতে অম্লাক্ত জমির অম্লত্ব নষ্ট হয়, ভূমিস্থিত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থের পচন ক্রিয়ার বিশেষ সহায়তা হয় এবং ইহা অনেক মিশ্র সারকে যৌগিক অবস্থা হইতে বিমুক্ত করিয়া বৃক্ষাদির গ্রহনীয় অবস্থায় আনে।

(৪) ফস্‌ফরাস—হাড় হইতে আমরা ফস্‌ফরাস্ সার প্রাপ্ত হই, ইহাতে উদ্ভিদের এবং বৃক্ষলতাদির ফল, ফুল, মূল বৃদ্ধির সহায়তা করে।

ইহা লইয়াই আমাদের বিচার। আমরা দেখিতে পাই হাড় সহজে গলিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায় না। হাড়কে পিষিয়া ময়দার মত চূর্ণ করিলেও তাহা গলিয়া মাটির সহিত মিশিয়া দ্রব অবস্থায় বৃক্ষলতাদির গ্রহণোপযোগী হইতে অন্য সার অপেক্ষা অনেক অধিক সময় লাগে।

ইহাতে ফসলের আশু কোন উপকার না হইলেও এই সার প্রয়োগে জমির সারবত্তা ২।৩বৎসর কাল বজায় থাকে এবং ফসলের শস্য প্রসব কার্য্যের সহায়তা করে। এই কারণে ধান, পাট বা আকে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে প্রয়োগ করা বিধেয়। ফলের গাছে প্রয়োগ করিলে ৩।৪ বৎসর যাবত উপকার পাওয়া যায়। এই জন্য ফলের বাগানে ইহা বিশেষ ভাবে উপযোগী।

সলফিউরিক এসিড সংযুক্ত হাড়ের গুড়া যাহা আমরা বন সুপার বলিয়া জানি তাহা প্রয়োগে কথঞ্চিৎ আশুফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে প্রয়োগ করিলে ফসলের সময় কার্য্যকারী হয়। এই জন্য আলুতে, আকেতে, ভালচাষী অন্য সারের সহিত বন সুপার প্রদান করে। যে কোন শস্যের বা ফলমূলের চাষ কর না, জমির অবস্থা ও অভাব বুঝিয়া অভাব পূর্ণ করিতে হইবে—উদ্ভিদকে সম্পূর্ণ আহার দিতে হইবে, সারটি সম্পূর্ণ সার হইবে—তাহাতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে। নাইট্রোজেন সারের জন্য আমরা এমোনিয়া, বা সোরা বা খৈল, পটাস সারের জন্য কলাগাছা বা বিলাতি পানাভস্ম, ফস্ফরাস সারের জন্য বন সুপার বা হাড়ের গুড়া ব্যবহার করিতে বলি। গোময় একটি সম্পূর্ণ সার ইহাতে এই কয়টি পদার্থই আছে, তবে মাত্রায় অল্প সেই জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার আবশ্যক। অথবা আর এক কাজ করিলে আরও সুবিধা হয়। গোময় সারে জমি তৈয়ারি করিয়া লইয়া, অভাব বুঝিয়া অন্য সার প্রয়োগ করিলে সুবিধা জনক ফল পাওয়া যায়। গোময় সার, হাড়ের গুঁড়া বা অন্য জান্তব বা উদ্ভিজ্জ সারের সঙ্গে কিছুহাড়চূর্ণ মিশাইয়া লইলে বিশেষ লাভ পাওয়া যায়।

হাড় সার প্রয়োগে উপকারিতা—

১। ফসল ও গাছের ফল শীঘ্র পাকাইয়া তুলে

২। গাছের ফুল, ফল, মূল প্রসবের শক্তি বৃদ্ধি করে

৩। স্কন্দ, মূল, ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধিকরে

৪। ফস্ফরাস ও চুণ সার ব্যবহারে ক্ষেত্রজ খন্দে ও ফল, ফুল গাছে পোকার উপদ্রব কতকটা প্রশমিত হয়। পটাস ব্যবহারেও কতকটা এই রূপ ফল দর্শে।

৫। সরস জমিতে ইহার কার্য্য সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কোন সারই রস সংযুক্ত না হইলে গলে না। জলই জমিতে রস যোগায়।

হাড় সারের পরিমাণ—ধানের ক্ষেতে, আকের ক্ষেতে, আলুর ক্ষেতে, পাটের ক্ষেতে অন্য সারের সহিত প্রতি বিঘায় আধমণ হইতে ১মণ পর্য্যন্ত। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক গাছের আয়তন বুঝিয়া আধসের হইতে আড়াই সের হাড় প্রয়োগের নিয়ম—প্রথম বর্ষারম্ভেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি কথঞ্চিত সরস হইলেই চষিয়া, মৈ দিয়া ঢেলাশূন্য করিয়া সমান ভাবে হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়া পুনর্ব্বার চাষ মৈ দিয়া জমির সহিত সার মিলাইয়া জমির রস রক্ষা করিতে হয়। চাষ মৈ দেওয়ার কারণ সার জমির মাটির সহিত সমান ভাবে মিশ্রিত হয় এবং জমির রসে রসে হাড়সারের পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যে কোন শস্য বা মূল খন্দ, বা আক রোপণ কালে আবার জমি চষিতে হয় এবং জমিতে অন্যান্য সার প্রয়োগ করিতে হয়।

হাড়ের গুঁড়া প্রস্তুত প্রণালী—গরম জলে সিদ্ধ করিয়া হাড় চূর্ণ করিলে হাড় সহজে চূর্ণ হয়; গোময় জলে ভিজাইয়া রাখিলে কাজটা আরও সহজে হয়। গোময় জলে হাড় ভিজিবার কালে কিয়ৎ পরিমাণে চুণ মিশ্রিত করিলে হাড় গুলি শীঘ্র নরম হইয়া আসে। ঐ প্রকারে প্রস্তুত হাড় ঢেকিতে বা মুগুর দ্বারা পিটিয়া চূর্ণ করা চলে।

সার ও সারের প্রয়োগ বিধি জানিতে হইলে আমরা সকলকে কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত কৃষি রসায়ন গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—দাম বাধান ১৷৷, আবাধান ১।০ কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

কংগ্রেস—কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার বিশেষ অধিবেশন বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া এক সপ্তাহ কাল মধ্যে শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে ভারতে কর্ম্মকথা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারত যে কত পরাধীন, কতটা পরমুখাপেক্ষী তাহা সাধারণে বিশেষ রূপে অনুভব করিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাসভার সভাপতি—হইয়াছিলেন পাঞ্জাবনিবাসীশ্রীযুত লালা লাজপত রায়। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি সভাপতির কার্য্য অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। সভায় Co—operation and

non—co—Operation (সহযোগিতা ও সহযোগিতা বর্জ্জন) লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া আমরা কোন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা চাই লোকে স্বদেশ প্রাণ হউক। দেশের কল্যাণই রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি হইতেছে, ম্যালেরিয়া মহামারিতে পল্লীসমূহ উৎসন্ন যাইতেছে, অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে পল্লীবাসী আজ জীর্ণ শীর্ণ, মৃত্যুকবলে পতিত, আর সহরে বসিয়া আমরা দেশ হিতৈষণার তুফান তুলিয়াছি। আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে হইবে; যাদের দেশ, যাদের লইয়া দেশ, তাদের আগে বাঁচাও।

মহাসভা—সকলকে সাবলম্বন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলিতেছেন—যে কোন উপায়ে আমাদিগকে সাবলম্বী হইতে হইবে—ন্যায় পন্থা আনয়ন। প্রথম চেষ্টা আমাদের, সংসারের সমাজের ও দেশের উপযোগী হওয়া। অনুপযুক্তের সহযোগীতা নিস্ফল ও নিরর্থক। অনুপযুক্তের সহযোগিতা কেহ চায় না। ভারতের কৃষক সহযোগিতা চায়—অসহায় সে, সহযোগিতা ভিন্ন সে বাঁচিতে পারে না—দেশবাসীর সহযোগিতা, নেতৃবর্গের ও রাজার সকলের সহযোগিতা চায়। সে সহযোগিতা কিন্তু কাঙ্গালের মুষ্টিভিক্ষা পাবার মত নহে—ভারতের পল্লীবাসী, কৃষককুল আজ নির্ভরতার কাঙ্গাল—সে চায় পরামুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন ভাবে তাহার ঘর সামলাইতে, পল্লী ও সমাজ রক্ষা করিতে—রাজা ও নেতৃবৃন্দ তাহার সহায় হউন এই তার প্রার্থনা, জাতিটাকে মানুষ করিয়া তোলা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে মতামত লইয়া বিরোধ করিবার এ সময় নয়, পথের ভালমন্দ লইয়া বিচার করিতে হয় কর কিন্তু বিচার করিতে করিতে যেন জীবনাবসান হয় না। আমরা বার বার বলিব—দেখ যেন পল্লী সমাজ ও কৃষককুলকে ভুলিও না। লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেস মহাসভা হইতে এই সাবলম্বন মহামন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এই মন্ত্রের দীক্ষাগুরু—তিনি পল্লী বাসীর বন্ধু এবং কৃষককুলের পরমাত্মীয় তাই আমরা তাঁহাকে সম্মান করি। রাজনীতি যদি কেবল ভুয়া গলাবাজির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমরা বলি সে নীতি আমাদের কোন কাজে লাগিবে না—যাহাতে দেশ আত্মরক্ষা করিতে শিখে সেই নীতিই পল্লী সমাজ আজ অবলম্বন করিতে চাহিতেছে। লালা লাজপৎ রায়ের কথায় বুঝা যায় যে তিনি কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী নহেন—তিনি চান আত্মনির্ভরতা, তিনি চান কর্ম্ম। এরূপ নিরপেক্ষ লোক মহাসভায় সভাপতি হইবার উপযুক্ত।

পথের বিচার—লইয়া বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্ত রঞ্জন দাশ, সার আশুতোষ চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ দেশ প্রেমিক অনেক ভাল কথা ও সত্য কথা বলিয়াছেন। তাঁরা স্বদেশ প্রাণ তাই তাঁদের গুরুতর ভাবনার অবসর নিশ্চই আছে, তাঁহারা না ভাবিলে ভাবিবে, কে? দেশবাসী অনেকে আজ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নেতাদিগের মুখ পানে চাহিয়া আছে,—তাহাদিগকে

কর্ত্তব্য পথ দেখান নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে—যাহা করিলে তাহারা প্রাণে বাচিবে, দুবেলা খাইতে পাইবে এবং সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে তাহাদের সাম্‌নে এমন কর্ম্ম এখনি ধরিতে হইবে। প্রকৃত রাজনীতির চর্চ্চা পল্লীভূমিতেই সর্ব্বাগ্রে সুরু হওয়া আবশ্যক। সমবায় মতে চাষ, সমবায় নীতির গুণে চাষের ঈতি হইতে আত্মরক্ষা, দেশের জন্য ফল শস্য উৎপাদন ও রক্ষা, দেশে অনুকুল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন, দেশের খাদ্য পরিধেয়ের অভাব বিমোচন যদি রাজনীতি না হয় তবে সে নীতি যতই মনোহর হউক আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। দেশের কৃষক বলিতেছে যে তাহাদিগকে কথায় আর কতদিন ভুলাইয়া রাখা চলিবে তাহারা এখন কাজ চায়।

কৃষক সমিতি কংগ্রেসে—মহাসভায় বঙ্গীয় কৃষক সমিতির একদিন অধিবেশন হইয়াছিল। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ঐ দিনে সভাপতি হইয়াছিলেন। চাষীর দুঃখ দারিদ্রের কারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতিকার করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। মহা সভায় অনেকে চাষীর দুঃখের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। সভাপতি ও অন্যান্য অনেকে অনেক আশার কথা শুনাইয়াছেন। এই আন্দোলনের ফল কি দাড়াইবে তাহা বলা যায় না। তবে এখন নেতৃবর্গ দেশের লোকের মর্ম্ম কথা শুনিতে ও আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ইহা প্রকৃত আশার কথা বটে।

ভারতের গো রক্ষা কংগ্রেসে—মণ্ডপে গো-রক্ষিণী সভার অধিবেশনও হইয়াছিল। মাড়ওয়ারি সম্প্রদায় ইহার প্রধান উদ্যোগী। অবাধ হত্যা হেতু ভারতের গো বংশ নির্ম্মুল হইতে বসিয়াছে। সভার তরফ হইতে মিউনিসিপালিটির সকলকে অবাধে গো হত্যা নিবারণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কয়েকটি মিউনিসিপালিটি তাহাদের এলাকার গো ও গোবৎসাদি হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গো-রক্ষণী সভার কার্য্য পরিচালন জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ হইতেছে। মহাসভায় আলোচনার ফলে অনেকে এখন দৃঢ় ভাবে গো-রক্ষার প্রকৃত উপায় চিন্তা করিতেছেন। মুসলমানগণেরও এই কার্য্যে সহানুভূতি আছে। সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় এখন বকরিদে গো-হত্যা বন্ধ করিয়াছেন। ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া এখন গো-রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন, গো-বংশ ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়া, দুগ্ধ মাখন ঘৃত প্রভৃতি গব্য দ্রব্যের অভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, সকলে গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতে খাদ্য শস্যের উচ্চ মূল্য—ইহার কারণ নির্ণয় জন্য সম্প্রতি একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছে। এই সভায় অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে, কয়েকজন কয়েকটি সার কথা বলিয়াছেন।

১। ভারতে যে অনুপাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে সেই অনুপাতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইতেছে না—চাষের জমি বাড়াইতে হইবে। আমরা বলি সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃষ্ট ও

উন্নত প্রণালীতে চাষ দ্বারা বিঘাপ্রতি খাদ্য শস্যের ফলন বিঘাপ্রতি বাড়াইতে হইবে।

২। দেশের অভাব সত্ত্বেও খাদ্য শস্যের ইচ্ছামত ও অবাধ রপ্তানি।

৩। খাদ্য শস্যের মূল্য বিদেশী বণিক্‌দ্বারা বাড়িয়া থাকে। বর্দ্ধিত মূল্যের অর্দ্ধেক টাকাও চাষীর ঘরে যায় না।

৪। দালাল ও ফড়িয়াগণ এই মূল্য বৃদ্ধির হেতু। তাহারা মহাজনের নিকট টাকা লইয়া চাষীগণকে অসময়ে অর্থ সাহায্য করে এবং শস্য তৈয়ারি হইলে খরিদের জন্য দাদন দেয়। এই সময় শস্যের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় অথবা শস্য উৎপন্নকালে যে বাজার দর থাকিবে সেই দর ধার্য্য হয়। এইরূপে দেশের শস্য পরহস্তগত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নিশ্চিতই উচ্চমূল্যে খরিদ করিতেই হইবে। ইহাতে মহাজন গণের লাভ যথেষ্ট হয়, দালাল ও ফরিয়ার লাভ কম হয় না কিন্তু চাষীর ও সাধারণের সমূহ লোকসান।

তমলুক মহকুমায় বন্যা

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য্য—কংসাবতী বৃষ্টির প্রাবল্যে ক্রমশঃ খরস্রোতা ও ভীষণা হইতে ভীষণতরা হইয়া ময়না কালা গোণ্ডা গ্রামের নিকট দোবাধি ভাঙ্গিয়া বিশাল জলরাশি আসিয়া তমলুক খোজার বাঁধে আটকাইয়া থাকে। কিন্তু খোজার বাঁধ জীর্ণ হেতু দুই একদিন পরে আরও জলের উচ্চতা হেতু হঠাৎ দুই তিন যায়গায় ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ জলরাশি তমলুকে প্রবেশ করে বর্ত্তমান ৮ই শ্রাবণ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বহুগ্রাম জলমগ্ন ছিল। বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থ সেবাশ্রম ও যথাসাধ্য করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন।

খোজার বাঁধের পশ্চিম দিকে ৩।৪ হাত ও পূর্ব্বদিকে ৮।৯ হাত জল হইবে। রাস্তা ঘাট ছিন্ন ভিন্ন গ্রামে গ্রামে রাস্তায় রাস্তায় বহু হানা পড়িয়াছে, যাতায়াতের কষ্টের অবধি নাই। কাঁচাবাড়ী ডুবিয়া দুই তিন হাত জল দাড়াইয়াছে এ কারণ ইক্ষু, পাট ও নানাপ্রকার শাক সব্জী নষ্ট হইয়াছে ও ধান্য ফসল মাত্রেই একবারে নষ্ট হইয়াছে ধানের মণ ৫৷৷৵০ আনা হইতে ৫৸৵০ আনা পর্য্যন্ত এবার তাহা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, দীন দরিদ্রের অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। এই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে কত সঙ্গতিপন্ন লোকের বাস তাহাও চিন্তা করুন। এইরূপ অবস্থার উপর প্রজা কিরূপে রাজকর দিতে সক্ষম হইবে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবিদিত নাই, কিন্তু খাজনা না দিলে রাজা ছাড়েন না যেন তেন প্রকারেণ নালিশ রুজু করিয়া খাজনা আদায় করিবেন তাই বলি এইরূপ অবস্থার উপর দয়াবান প্রজাহিতকর রাজা বাহাদুর এই বৎসরের খাজনা কি রেহাই (ছাড়) দিবেন না?

পাবনায় কৃষিক্ষেত্র—পাবনা জেলার কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতেছে এবং ইহার জন্য পাবনা জেলার অন্তর্গত চাঁদমারীর নিকট একটী স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহার ইমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য এককালীন ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উহার জমি ইত্যাদি ক্রয় করিতে যাহা লাগিবে তাহা পাবনার ডিঃ বোর্ড দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদিগের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রায় রমণীমোহন দাস বাহাদুরের বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় পাবনাতে এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইল।

* * *

দেশের এই দুঃখ কষ্টের সময় কৃষিশিল্পের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়। ইহাতে সাধারণের প্রভূত উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আরও সুখের বিষয় এই যে আমাদের পাবনার জমিদার বর্গ কৃষির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী জমিদারদ্বয় ইতঃমধ্যে প্রজার উন্নতিকল্পে পাবনার ডিঃ এগ্রিকালচার অফিসারের পরামর্শে চাঁদপুরে একটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য ম্যাজিষ্টেট সাহেব ইহার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। আমরা উক্ত জমিদার দ্বয়ের সাধু উদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। জমিদারবর্গ প্রজার উন্নতিকল্পে এইরূপ বদ্ধপরিকর হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। উপাসনা।

দেশীচিনি—চিনি মিছিরি ইত্যাদির দর যে প্রকারে চড়িয়া গিয়াছে তাহাতে এই সুযোগে দেশে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে গুড় হইতে দেশী চিনি প্রস্তুত হয় তাহার চেষ্টা করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। যশোহর কোটচাঁদপুর ইত্যাদি স্থানে যাহারা চিনি প্রস্তুত করিত তাহারা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। সম্প্রতি আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে ঐ সমস্ত স্থানের ব্যবসায়ীগণ আবার চিনি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানে চিনি প্রস্তুত করিয়া যে মাতগুড় অবশিষ্ট থাকে তাহা জাল দিয়া 'চিটা' প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে উক্ত চিটাগুড়ের দ্বারা তামাক মাখার কার্য্য চলিয়া থাকে। উক্ত চিটার দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্পিরিটও গ্লিসারিণ প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশের রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ যদি এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়া যাহাতে বিদেশ হইতে স্পিরিট ও গ্লিসারিণ আমদানির প্রয়োজন না হয়—এই পরিমাণে দেশে উহার প্রস্তুত করিতে পারেন তবে দেশের একটী প্রকৃত অভাব দূরীভূত হয়।—হিতবাদী

বাগানের মাসিক কার্য্য

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান—বাঁধাকপি ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতী সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁস জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া, ন্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটী দিয়া বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফল ফল প্রসব করে।

কৃষিক্ষেত্রে—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এ মাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশু খাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোলড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া

দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালীপূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিমে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী গোলাপ খুব ঘেসিয়া ছাটীতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাটিবার সঙ্গে গোড়া খুড়িয়া আবশ্যকমত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভূষা কলিকাতায় বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্রসারে এক প্যাকেট ভূষা যথেষ্ট, ভূষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছের ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা

সূত্র (Fiber)

কৃষকে ইতিপূর্ব্বে কতিপয় সূত্র উপাদানকারী উদ্ভিদের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনাটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রধান কয়েকটি পাট, শণ, ধঞ্চে প্রভৃতি উদ্ভিদের পরিচয় আবশ্যক। ইহা কৃষিদর্শন হইতে সঙ্কলিত।

পাট—Jute.

দুই জাতীয় পাট সাধারণত দেখা যায়—

(১) নালিতা পাট Corchorus capsularis.

(২) দেশীপাট „ olitorius.

পূর্ব্বে এদেশে পাটের আদর বড় ছিল না, পরন্তু যেদিন হইতে পাশ্চাত্যেরা যন্ত্রবলে বস্ত্রবয়নের উপায় আবিষ্কার করিল এবং পাটের সূতার শুভ্রতা, স্বল্পমূল্যতা ও চিক্কণতা বুঝিল সেইদিন হইতেই ইহার আদর বাড়িল। দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাট বাণিজ্যার্থ সর্ব্বপ্রথম বিদেশে প্রেরিত হইয়া বিদেশীয় শুভদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। তাহার পূর্ব্বে শন ও ধঞ্চের চাষই প্রচলিত ছিল, পাট অতি সামান্য উৎপন্ন হইত। যাহা হউক বিগত ৭৫ বৎসরের মধ্যে পাট, শন ও ধঞ্চেকে এরূপ স্থানচ্যুত করিয়াছে, যে আজকাল প্রতিবৎসর ভারতের নানাস্থান হইতে ৪৷৷০।৫ কোটী মণ উৎপন্ন হইতেছে। এই পাটের উৎপাদনে আমাদের লাভ হউক বা না হউক ইহা গৌনভাবে য়ুরোপের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। পাটের প্রধান দোষ অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। যদি আমরা পাট বিক্রয় করিয়া টাকাটা ঘরে রাখিতে পারিতাম এবং পাট প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় না করিতাম তাহা হইলে ইহার চাষ লাভের ব্যাপার বটে, কিন্তু

যে পাট অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, আমরা ৮৲ বা ১২৲ টাকা মণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া তৎপ্রস্তুত দ্রব্যাদি পুনরায় দুই তিন শত টাকা মণ দরে ক্রয় করিতেছি, সুতরাং ইহার চাষে পরিশ্রমমাত্র সার; আবার ইহার উপর পাটের চাষে জলবায়ু দূষিত হইয়া দেশ ম্যালেরিয়া রোগপূর্ণ করিতেছে, ধান্যের ক্ষেত্র পরিমাণ কমাইয়া খাদ্য শস্যের মহার্ঘতা ও দুর্ভিক্ষের সহায়তা করিতেছে। ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

পাট ভারতবর্ষের মধ্যে মুম্বই, মান্দ্রাজ, আসাম, কুচবিহার, নেপাল, উত্তর ভারতের পূর্ব্বাংশ ও অন্যান্য প্রদেশে অল্পবিস্তর জন্মিলেও একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও প্রচুর উৎপন্ন হয় না। অন্যান্য জাতীয় সূত্র অপেক্ষা পাটের সূত্র উৎপাদনে পরিশ্রম ও সময় অল্প লাগে, উৎপন্নের পরিমাণও অধিক, ইহার উৎকৃষ্ট অংশ রেসমের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যশালী সুতরাং নানাবিধ বস্ত্র শিল্প ও ক্যাম্বিশ, আসন, গালিচা প্রভৃতি এবং গোড়ার অপরিষ্কৃত মলিন অংশ (যাহাকে ছাঁট বলা যায়) কাগজ ও বোরা প্রস্তুতের জন্য প্রচুর ব্যবহার হওয়া ও অন্যান্য সূত্র হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্য বলিয়া শিল্পজগতে পাটের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজত্ব, এজন্য পৃথিবীর সকল বাণিজ্যজীবী জাতিই বাঙ্গালীর দ্বারস্থ। পাটের চাষে বঙ্গের যেমন অপকার তেমনি কতকটা লাভও আছে কারণ পাটে আমাদের বিস্তর টাকা খাটিতেছে আর পাটই বঙ্গের অদ্বিতীয় বাণিজ্যোপকরণ সুতরাং ইহার চাষে অনাদরও করা যায় না। যদি পাটের একমাত্র দোষ অল্পদিন স্থায়ীত্ব কোন উপায়ে অপহৃত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পাটের মূল্য ও আদর আরও অধিক বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু অধুনা এরূপ কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। পাট পশম সূত্রের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া জার্ম্মানিতে বহু পাট রপ্তানি হইত। যুদ্ধের সময় রপ্তানি স্থগিত ছিল। এখন আবার ইংরাজ বণিকের হাত দিয়া উহা জর্ম্মনিতে যাইতেছে।

আমেরিকানরা গত ৪০ বৎসর ধরিয়া পাটের চাষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তদ্ব্যতীত জাপান, চীন, ইণ্ডুচীন অষ্ট্রেলিয়া, জাভা ভারতসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, মিশর, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও ইহার চাষের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু চাষ কোথাও বিশেষ সফল হয় নাই, কেবলমাত্র গোদাবরী নদীর উপকূলগত ভূমিতে সুন্দর জন্মিতেছে এবং তথায় ইহার চাষ দিনং বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে বিদেশীরাও বড় নিশ্চিন্ত নহে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে এমন অনেক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে যাহাদের সূত্র পাট অপেক্ষাও শুভ্র, চিক্কণ ও দৃঢ়। ভবিষ্যতে পাটের পরিণামের কথা বলা যায় না।

জাতিভেদ—C. olitorius এবং C. capsularis নামক দুইজাতীয় উদ্ভিদ হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত জাতীর ডাটা লালবর্ণ, উচ্চভূমিতে

ভাল জন্মে, মূল সূক্ষ্মাগ্র ও দীর্ঘ, ফলকোষ দীর্ঘাকার ও অভ্যন্তর ৫ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের ডাঁটা সবুজবর্ণ, মূল কিছু স্থূল, ফলকোষ ও তাহার অভ্যন্তর ভাগ অবিভক্ত; এই শেষোক্ত জাতীয় পাট উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের জলাভূমিতে জন্মে। এই দুই প্রকার আবার উন্নত প্রণালীমত কর্ষিত ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দেশভেদে নানাজাতিতে পরিণত হইয়াছে; যথা উত্তরবঙ্গে দেউতী, সিরাজগঞ্জে কাকিয়া বোম্বাই ও সিরাজগঞ্জী; পাবনা, রাজসাহীতে তোষা, ২৪ পরগণা, যশোহরে দেশী; ঢাকা ময়মনসিংহ, নারাণগঞ্জ ও ত্রিপুরাজিলায় বরাণ ও বর্পাট; ফরিদপুর, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জে দেওড়া ও আমুনে ইত্যাদি। দেওড়াপাট সাধারণতঃ বোরা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। ইহাদের মধ্যে কাকিয়া বোম্বাই, বরাণ ও বর্পাট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সিরাজগঞ্জী ও বরাণ উচ্চ ভূমিতেই জন্মে। কাহারও কাহারও মতে C. olitorius জাতীয় পাট সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সাধারণতঃ অন্যান্য সূত্র উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সকল যেরূপ চেষ্টা করিলে ২।৩ বৎসরকাল জীবিত থাকে, পাট তদ্রূপ নহে, ইহা একবৎসরের মধ্যেই ফলপাকের পর মরিয়া যায়।

বীজরক্ষা—নিকৃষ্ট জাতীয় বীজবপন বা যে ভূমি পাটের আদৌ উপযুক্ত নহে তাহাতে চাষ করিলে পাটের অপকৃষ্টতা ঘটিয়া থাকে। এজন্য উৎকৃষ্টজাতীয় পাট চাষ করিয়া বীজের নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া সতেজ ভাল গাছগুলি রাখিলে বা ক্ষেত্রের এককোণে কতকগুলি বীজ ছিটাইয়া তাহাই বীজের নিমিত্ত রক্ষা করিলে বীজ উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে।

সার—সাধারণতঃ বিনাসারেই পাটের চাষ হইয়া থাকে কিন্তু পাট উত্তম ও প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে হইলে সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিঘাপ্রতি ৬০।৭০মণ গোবর হইলে যথেষ্ট। পাট চাষের প্রণালী কৃষকে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

পাট বপনের পূর্ব্বে শন, ধঞ্চে বা অপর কোন শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ জমিতে চাষ করিলে বিনাসারে পাট উৎপন্ন হইতে পারে; ধঞ্চে বা ভূরা পচা (Green Manured) জমিতেও পাট ভাল জন্মে।

পাটের জমি—এদেশে পাটের এরূপ বিপুল চাষ যে লোকে সকল প্রকার ভূমিতেই ইহার চাষ করিয়া থাকে ইহাতে পাট জন্মে সত্য কিন্তু ফলন ও উত্তমতার বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দোয়াসমাটী, নদীর পুরাতন চর বা উচ্চ এটেল মাটীতে পাট ভালরূপ জন্মে; ইহার মধ্যে এটেল অধিক দোয়াশ মাটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভাবে ভাদোই ধান্যের জমিতেও পাট জন্মিতে পারে।

চাষ—পাটের জমিতে সাধারণতঃ ২।৩টা লাঙ্গল দিয়া বীজবপন করা হইয়া থাকে কিন্তু তাহা ঠিক নহে; জমি অন্ততঃ ৫।৭বার উত্তমরূপ কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকাচূর্ণ করিতে হইবে পরে, ২।১টা বৃষ্টিতে মাটী ভিজিয়া সরস হইলে আর একবার ক্ষেত্রকর্ষণ করতঃ

বীজ ছিটাইয়া পাটাদ্বারা চালিয়া সমতল করিয়া দিতে হইবে। বীজ ভাল হইলে ২।৪ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইবে; বিঘাপ্রতি ৪।৫ সের যথেষ্ট। বীজবপনের সময় বিঘাপ্রতি আধমণ আন্দাজ সোরাচূর্ণ ছিটাইয়া দিলে ফলন অধিক হয়, গাছে পোকা লাগিতে পারে না এবং যদিও লাগে তথাপি গাছের বা আঁশের কোন ক্ষতি হয় না। সোরা ছিটাইবার ১মাস পরে ক্ষেত্রটী একবার 'বিদে" দিলেই গাছ তেজের সহিত বাড়িতে থাকিবে। এসময়ে গবাদি পশুর আক্রমণ হইতে গাছ রক্ষা করা. মাঝে ২ নিড়াইয়া জঙ্গল পরিষ্কার ও মাটী আল্গা এবং যদি গাছ অত্যন্ত ঘন হইয়া থাকে তাহা উঠাইয়া পাতলা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের পরস্পর ব্যবধান ৫।৬ ইঞ্চ হইলেই ফলন অধিক হয়, ইহা অপেক্ষা ঘন হইলে ফলনের কমী হয়, এবং যাহাতে জমিতে কোনরূপে জঙ্গল জন্মিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই নিয়মগুলির পালনের উপর পাটের উত্তমতা নির্ভর করে। গাছগুলি হস্তপ্রমাণ দীর্ঘ হইয়া উঠিলে আর কোন পাইটের আবশ্যক হয় না, তখন বর্ষার জলে গাছ সতেজে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রস্তুত প্রণালী—ভূমি বিশেষের উর্ব্বরতা এবং উচ্চতা ও নিম্নতা অনুযায়ী ও অগ্রপশ্চাৎ বপন নিবন্ধন ৪।৫ মাসের মধ্যে গাছগুলি ৩।৪ হস্ত হইতে ৭।৮ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; কোথাও ১২।১৪ হস্ত দীর্ঘ হয় এরূপ শুনা গিয়াছে। গাছে প্রচুর পরিমণ ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলেই পাট সূত্রোপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে. তখন অস্ত্রদ্বারা মূলের উপরিভাগ হইতে কর্ত্তন করিয়া ৫০বা ১০০টী একত্র শিথিল বন্ধকরতঃ মাথা ছাটিয়া উপরে কোন ভার দ্রব্য চাপা দিয়া ভাসা জলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে হইবে। ৭ হইতে ১০।১২ দিবসের মধ্যে গাছের বন্ধনভাগ পচিয়া সূত্র বাহির করিবার উপযোগী হইয়া উঠে। ঔজ্জ্বল্য ও কোমলতার জন্য পাটের মূল্য অধিক হয় এজন্য অত্যাধিক পচিলে (undue decompnsition) সূত্র দৃঢ় হইলেও ঔজ্জ্বল্য আদৌ থাকেনা, সুতরাং এই সময় প্রত্যহ দুইবেলা নিমজ্জিত গাছগুলি পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং যথোপযুক্ত পচিবার পর কালবিলম্ব না করিয়া জল হইতে উঠাইয়া আটীগুলি খুলিয়া ধীরেং গোড়া হইতে আশ ছাড়াইয়া পাকাটী পৃথককরতঃ জলে কাচিয়া শুকাইয়া লইলেই বাজারের বিক্রয়োপযোগী পাট প্রস্তুত হইবে। পচানকালে একটু সতর্ক থাকিলে এবং সামান্য যত্ন করিয়া পাটের পচা ছাল ও অন্যান্য আবর্জ্জনারাশি নির্ম্মলজলে উত্তমরূপ কাচিয়া লইলেই পাট অতিশয় শুভ্র, চিক্কণ ও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। পাঠ যতই পরিষ্কার কাচা হউক না কেন গোড়ার আধহাত তিনপোয়া আন্দাজ অংশ অত্যন্ত মলিন হয়, এই অংশ কাটিয়া লইয়া উপরের শুভ্র অংশই বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। আমেরিকা ও এদেশীয় পাটকলওয়ালারা এই ছাট বোরা প্রস্তুতের জন্য অল্পমূলে ক্রয় করিয়া থাকেন। বোরা ব্যতীত ইহা হইতে একপ্রকার হুইস্কী (Whisky) মদ ও

কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দিয়াশালাই আমদানীর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাল্যকালে আমরা গন্ধকদ্রব্যে পাটকাটী ডুবাইয়া দীপশলাকা প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। পাটের বীজোৎপন্ন তৈলে দরিদ্র লোকের দীপকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে সুতরাং দেখিতে গেলে পাটের কোন অংশ বাদ যায় না।

বিঘাপ্রতি পাটের ফলন ৬ হইতে ৭ মণ, এক বিঘার পাটে খরচবাদে অতি কম ২০৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হয়। একবিঘা জমীতে কেহ ৪সের কেহবা ১৫সের বীজ ছিটাইবার ব্যবস্থা দেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে, সকল বীজই যে অঙ্কুরিত হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, আবার অধিক পরিমাণ বীজবপিত হইলে অত্যন্ত ঘন জন্মে অনেক উঠাইয়া ফেলিতে হয়; এজন্য বিঘা প্রতি ৬।৭ সের বীজই যথেষ্ট, ইহাতে সকল বীজ অঙ্কুরিত না হইলেও যাহা জন্মিবে তাহা পাতলা ও পরস্পর সমান্তরাল জন্মিয়া ফলন অধিক হইয়া থাকে।

শুভ্র চিক্কণ পাট তিসির সুতায় এবং জর্ম্মনী ও ইংলণ্ডে নানাপ্রকার র‍্যাপার ও আলোয়ানের সুতায় মিশাইবার জন্য ব্যবহার হয়, এজন্য আজকালকার আমদানী শীতবস্ত্র সকল অল্পদিন স্থায়ী হইতেছে কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল খাঁটী উণী র‍্যাপার আমদানী হইত তাহাতে পাট মিশাল না থাকায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত।

অনেকের মতে যদি গাছগুলি দীর্ঘকাল জলে নিমজ্জিত না করিয়া ২।৩ দিবসের মধ্যেই পরিষ্কৃত ও শুভ্র অবস্থায় সূত্র বল্কভাগ হইতে পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে পাট দীর্ঘস্থায়ী হয়; কিন্তু এপর্য্যন্ত এরূপ কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

ম্যালেরিয়ার কারণ ও মৎস্যাভাব—পাট পচাইবার সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, অনেকস্থানে ইহা ম্যালেরিয়ার একটী নিদান। যথায় পাট কাচিবার দ্বিতীয় বন্দোবস্ত নাই, সে সকল স্থানে ঐ জল পান ও ব্যবহারে কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ বিশেষ প্রবল হয়; পাট পচান জলের দুর্গন্ধে বিদ্যমান মৎস্য পলাইয়া যায় এজন্য মৎস্যাভাব ঘটে।

কাহালগাঁ, ফরেদপুরগঞ্জ, আত্রাই, ডোমারহাট, বগুড়া, নিলফামারি, কুরীগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, মৈমনসিংহ, নারাণগঞ্জ, চাঁদপুর, মাদারিপুর, খুলনা, চিৎপুর, হাটখোলা প্রভৃতি এদেশীয় ছোট বড় পাটের মোকাম। এ সকল স্থানে লক্ষ লক্ষ টাকার পাটের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; বিদেশী মোকামের মধ্যে আয়র্লণ্ডের ডণ্ডী (Dundy) সহরই সর্ব্ব প্রধান।

বর্ণিত দুইজাতি ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকজাতীয় পাট বন্য অবস্থায় জন্মে, এগুলি হইতে ব্যবসায়োপযোগী সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

তিতাপাট—C. acutangularis. ইহাকে নালিতা বলে, পশ্চিমে ইহার নাম দেওর শুক্তা; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে। নালিতা শুষ্ক ভাজিয়া তৈল লবণ

সংযোগ ব্যতিত অন্নের সহিত প্রথম কয়েগ্রাস খাইলে আম অতি শীঘ্র নির্ব্বত্ত ও আমজনিত বেদনার অন্ত উপকার হয়; শরৎকালে পর্য্যুষিত নালিতার জল শর্করাসহ সেবনে পিত্ত ও দাহ যন্ত্রনা প্রশমিত ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

জঙ্গলী পাট—C. fascicularis. ইহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বর্ষাকালে জন্মে, শীতকালে বীজ পরিপক্ক হয়।

C. trilocularis. ইহা ত্রিহুত অঞ্চলে বন্য অবস্থায় জন্মে, শীতকালে ফল পরিপক্ক হয়।

C. fuscus. ইহা আমেরিকার একজাতীয় বন্য পাট।

অন্য সূত্র উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সূত্র পাট, শন, তিসি মুর্ব্বা, ভাঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় সূতার পরীবর্ত্তে বা সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য ব্যবহার হয়।

শন—Crotolaria Juncea.

শতবর্ষ পূর্ব্বে পাট অপেক্ষা শনের অধিক আদর ছিল এবং পরিমাণেও প্রচুর উৎপন্ন হইত কিন্তু আজকালকার মত তখন দেশ রোগপুর্ণ ছিল না। পাট অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট সুতরাং নানাজাতীয় সূত্রে বেমালুম মিশ্রিত হইতে পারে বলিয়া আজকাল পাটের অধিক আদর হইয়াছে। যাহা হউক প্রণালী বিশেষ অবলম্বনে শন উত্তমরূপ প্রস্তুত করিতে পারিলে পাটের ন্যায় কোমল, চিক্কণ ও শুভ্র হয় এবং বিবিধ বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্ত হইতে পারে। মুন্বয় পাট অপেক্ষা শনের মূল্য অধিক, পরিমাণেও প্রচুর জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেশোৎপন্ন শন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার শুভ্র ও সুকোমল প্রস্তুত হয় বলিয়া মুম্বয়ে শন অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। করোমাণ্ডাল Coromandal) উপকূল প্রদেশে শন সূত্রের নামান্তর "গোণী" (Goni) সম্ভবতঃ এই সূত্র নির্ম্মিত বোরা হইতেই বর্ত্তমান গানিব্যাগ (Gunnybag) নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ শনসূত্র নির্ম্মিত উপবীত ধারণ করিবেন ইহাই মনুর আদেশ, সুতরাং এতদ্দারা শনের পবিত্রতা, স্বাস্থ্য প্রদত্ত ও দৃঢ়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে। শনের সূতা হইতে বোরা, কাগজ, টোয়াইন সূতা মাছধরার জাল, কাছী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখনও বিহার অঞ্চলে পাট অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও সুন্দর এক প্রকার বোরা প্রস্তুত হয়; ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিহুতের দুরিয়া নামক স্থানের কৃষকেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শনসূত্র প্রস্তুত করে। আমরা ইহা হইতে উৎকৃষ্টজাতীয় (Russian dock) এর ন্যায় ক্যাম্বিশবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারি। দাক্ষিণাত্যে শনের গাছ দুগ্ধবর্দ্ধনের জন্য নবপ্রসূতা গাভীকে খাওয়াইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাতে দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় এবং গোপশু অত্যন্ত প্রিয়।

উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সকলপ্রকার ভূমিতে শন উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় শনসূত্র উৎপাদন করিতে হইলে উর্ব্বরা মধ্যম এটেল বা দোয়াস মৃত্তিকা সবিশেষ উপযোগী এবং নিম্ন অপেক্ষা উচ্চ ভূমিতেই ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে সার প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহাতে ফলন অধিক হয়।

বঙ্গদেশে বর্ষাকালে এবং মুম্বই ও দাক্ষিণাত্যে শীতের প্রারম্ভে ইহার চাষ হইয়া থাকে ইহার চাষে জল অপেক্ষা সারের প্রয়োজন অধিক। দাক্ষিণাত্যের কৃষকেরা বর্ষার শেষে ইহার চাষ করে বলিয়া চিকণ মাটী (Clayey soil) মনোনীত করে। প্রতি বিঘায় ৪।৫ সের বীজ আবশ্যক ও বিঘাপ্রতি ৪।৫ মণ সূত্র উৎপন্ন হয়। শন "বগা" ও "কুশ" ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত জাতীয় গাছ বড় অধিক দীর্ঘ হয় না এবং উৎপন্ন শন অতি উৎকৃষ্ট দৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন হয়, অপর জাতীয় গাছ অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সূত্র অপেক্ষাকৃত মলিন ও স্বল্পবলী হয়।

বৈশাখ মাসে ভূমি উত্তমরূপ কর্ষণ ও চুর্ণ করতঃ জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বর্ষণ আরম্ভ হইলে আর একবার কর্ষণ করিয়া পাটের ন্যায় ঘনভাবে বীজ ছিটাইয়া বপন করতে হয় ও পাটা মারিয়া জমিসমতল করিতে হইবে; বিজ অঙ্কুরিত হইবার পর গাছ ধীরে ২ বাড়িতে থাকিবে তখন গবাদি পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন পাইঠের আবশ্যক হয় না, কারণ ইহা এত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় যে অভ্যন্তরস্থ জঙ্গল আওতায় মরিয়া যায় বা বাড়িবার অবসর পায় না; ৪।৫ মাসের মধ্যে গাছগুলি ৬।৭ হস্ত দীর্ঘ হয়।

তিসির সূতার সহিত মিশ খায় এরূপ সুক্ষ্ম চিক্কণ ও কোমল সূত্র প্রয়োজন হইলে যখন গাছগুলি পুষ্পময় হইয়া উঠে তখনি উৎপাটন করা উচিৎ; যদি অধিক ফল ধরিতে দেওয়া হয় বা ফলপাকা পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে রাখা যায় তাহা হইলে সূত্র কর্কশ হইলেও অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা রসারশী কাছী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে যখন ফুল উঠিয়া গিয়া ফল ধরিতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ ফলের যখন সম্পূর্ণ অপক্কাবস্থা তখন গাছ উঠাইয়া থাকে, ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র উৎপন্ন হয়। শনের গাছ পাটের ন্যায় কর্ত্তন না করিয়া সমূলে উৎপাটন করাই নিয়ম। কেহ কেহ গাছ উঠাইয়াই আটী বাঁধিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক ও পশ্চাৎ ৫।৭ দিবসকাল জলে নিমজ্জিত করিয়া সূত্র বাহির করা হইয়া থাকে। অধিক পচিলে সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় ও মলবলী হয়, এজন্য মাঝে২ পচিল কিনা পরীক্ষা করা আবশ্যক; পরে উঠাইয়া ডাটাগুলি ২।৩ভাগে ভাঙ্গিয়া ধীরে২ সূত্রগুলি ডাঁটা হইতে পৃথক করিয়া নির্ম্মল জলে কাচিয়া উত্তমরূপ শুষ্ক ও আছড়া দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইলেই উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয়। অনেকের মতে ছায়ায় শুষ্ক করিলে সূতা ভাল হয়। গাছগুলি প্রবহমান নদীর জল অভাবে নির্ম্মলজলে নিমজ্জিত করা উচিৎ কেহ২ বলেন লবনাক্ত জলে নিমজ্জন ও বন করিলে সূত্র অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয় কিন্তু ইহা পরীক্ষণীয়, কারণ আমাদের দেশে

অধিকাংশ শনই অলবনাক্ত জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল গাছ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিককাল রাখা যায়, তাহাদিশকে পচাইতে অধিকদিন আবশ্যক হয়, ইহাতে সূতা কড়া হইলেও শক্ত হইয়া থাকে। শন নির্ম্মিত কাছী জলে অধিকদিন স্থায়ী হয়।

বঙ্গদেশে শন ৫৲।৬৲ দরে বিক্রয় হয় কিন্তু বিলাতে উৎকৃষ্ট শনের মূল্য টন ৪০ হইতে ৫০ পাউণ্ড; রাসায়নিক দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহা রূপান্তরিত হইলে তিসির সূতার সহিত ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন হয়; এরূপ শন টন প্রতি ৮০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হয়। ভাঙ্গের সুতার ইহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

শনজাতীয় বিবিধ গাছ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জাতি হইতে উল্লিখিতবৎ সূতা বাহির হয়।

Crotolaria tenuifolia জব্বলপুর অঞ্চলে জন্মে।

„ retusa বিল ঝনঝন।

„ sericea syn atasi পিপুল-ঝনঝন, ঘণ্টারবা; গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়; এই অতসীপুষ্প দেবীপূজায় লাগে।

সংক্ষিপ্ত দ্রব্যগুণ—শন ঈষৎ কষায় তিক্তরস, কফ, বায়ু, অজীর্ণ, জ্বর ও রক্ত দোশনাশক এবং বমনকারক।

ধঞ্চে—Sesbania cannabina Syn. aculeata

পাট শন অপেক্ষা নিম্নভূমিতে ধঞ্চে জন্মে; ক্ষেত্র বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় না এবং মূল অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া ভূমির গভীর ভাগ হইতে রস আকর্ষণে সমর্থ হয়, সুতরাং গ্রীষ্মের জলাভাবে ইহার বৃদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সর্ব্বপ্রকার ভূমিতে ইহা জন্মে কিন্তু দোয়াশ জমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধঞ্চে রক্ত ও সবুজবর্ণ ডাটাভেদে দুই প্রকার, এঁটেল মাটীতে সবুজজাতি ভাল জন্মে। চৈত্র বৈশাখমাসে সামান্য বর্ষণ হইলে তুমি কর্ষণ ও মৃত্তিকা চুর্ণ করিয়া বীজ ছিলাইয়া মই দিয়া সমতল করিতে হইবে। বৈশাখের সামান্য বৃষ্টিতেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; জ্যৈষ্ঠে বিশেষ বর্ষণ না হইলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় না এবং পরবর্ত্তী বর্ষার জলের সহিত গাছ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এসময়ে অন্য কোন পাইটের আবশ্যক করে না কারণ গাছ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় বলিয়া ক্ষেত্রমধ্যস্থ আগাছা উহার আওতায় মরিয়া যায় বা বাড়িতে পারে না, বিশেষতঃ ধঞ্চের পরিত্যক্ত রসের গুণে জমিতে আগাছা পুনরায় জন্মিতে পারে না। গাছগুলি ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ ও পুষ্পপরিপূর্ণ হইলেই সূত্রোপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে; এই সময় গাছগুলি উঠাইয়া পাট শন প্রস্তুত

প্রণালীমত জলে পচাইয়া সূত্র বাহির করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে রাখিয়া বীজ পরিপক্ক হইবার পরও গাছ উঠাইয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহাতে সূতার কোন ক্ষতি হয় না। ধঞ্চের সূতা যদিও অপেক্ষাকৃত মলিন, খসখসে ও মোটা তথাপি ইহা অত্যন্ত দৃঢ়বলী (টনকো) এবং পাট, শন অপেক্ষা অধিকদিন জলসহনশীল। উদ্ভিদসূত্র সমূহের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সংকোচশীল। বপনার্থ বিঘাপ্রতি ৪।৫সের বীজ আবশ্যক হয় এবং বিঘাপ্রতি ৩।৪ মণ সূতা পাওয়া যায়। ধঞ্চের সূতা হইতে দড়ী কাছী এবং উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে; পূর্ব্বে ধীবরেরা ইহার সূতা হইতে শন অপেক্ষাও দৃঢ়তর জাল বয়ন করিত। ধঞ্চের কয়লা অত্যন্ত লঘু, বারুদ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সূতার মূল্য পাটাদি অপেক্ষা অনেক সুলভ।

কাঁচা সারের (Green manure) জন্য ধঞ্চে গাছ বিশেষ উপযোগী। চৈত্রমাসে বীজ বপন করিলে আষাড়মাসের মধ্যেই গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠে, তখন গাছ গোড়াশুদ্ধ কাটিয়া বা সমূলে উৎপাটনকরতঃ ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিলে শ্রাবণ, ভাদ্রের বর্ষা ও রৌদ্রের প্রভাবে পচিয়া মিশ্রিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। তৎপরে আশ্বিনমাসে জমিতে ভালরূপ লাঙ্গল দিয়া মৃত্তিকাচুর্ণ করিয়া কার্ত্তিকমাসে যে কোন শস্য বপন করা যাইবে তাহাই অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল ও প্রচুর ফলশালী হইবে। যে সকল ভূমি একেবারে নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে তাহা অল্পদিনের মধ্যে এইরূপে পুনরায় উর্ব্বরা হইয়া উঠে। পাবনা, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জিলাতে ভুরার (Panicnm bhoora) চাষ করিয়াও ভূমি এইরূপে উর্ব্বরা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে শন ধঞ্চের সূতা হইতেই যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইত; কিন্তু ধীরে ধীরে শতবৎসরের মধ্যে অপরিমিত পাটের চাষ বৃদ্ধি পাওয়াতে, লোকে ধঞ্চের সূতার নাম ও ব্যবহার পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গিয়াছে। স্থূল বন্ধনাদি কার্য্যের জন্য ধঞ্চের ন্যায় সুলভমূল্য অথচ দৃঢ়সূত্র পাওয়া দুর্ঘট। ধঞ্চে শিম্বীজাতীয় (Leguminosœ) উদ্ভিদ যথায় জন্মে স্বভাব গুণে তথাকার ভূমি নাইট্রোজনে (Nitrogen) পূর্ণকরতঃ উর্ব্বরা করিয়া তুলে, সুতরাং সে ভূমিতে অন্যান্য শস্য বিনাসারে জন্মিলেও ফসলের বিশেষ জমী হয় না। স্বভাবতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষা অপেক্ষা শীতকালে নাইট্রোজন অধিক সঞ্চিত হয় কারণ শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদকে এই সময় অধিক বলী হইতে দেখা যায়। ধঞ্চে গাছ ৩।৪ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকে, এজন্য ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে জন্মাইলে বেড়ার কাজ করে এবং পত্রাদি অহরহ পতিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহার বীজোৎপন্ন তৈলে অতি সুলতে দরিদ্রের দীপকার্য্য সমাধা হইতে পারে, খৈল গোমহিষাদির ভক্ষ্য। অনেক সময় দেখা যায় লাক্ষাকীটে ধঞ্চে গাছ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে অথচ গাছ মরে নাই, লাক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য, নিম্নবঙ্গে যদি ধঞ্চের গায়ে ইহার চাষ সফল হয়, তবে উহা একটী লাভের ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার কারণ—পূর্ব্বকালে বর্ষায় শন ধঞ্চের চাষ হইত, এখন পাট জন্মে; পূর্ব্বে দেশ রোগশূন্য ছিল এখন ম্যালেরিয়াদি রোগে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে যে চাষের এই ব্যতিক্রমই ইহার কারণ নয়? পূর্ব্ব পুরুষেরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা পাটের সুতা হয় একথা অবশ্যই জানিতেন তথাপি কি জন্য পাট ছাড়িয়া শন ধঞ্চের চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ইদানীং আলোচনার বিষয় হওয়া উচিৎ। বর্ষাকালে বঙ্গদেশে জলমগ্ন থাকায় জলবায়ু স্বতঃই দূষিত হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ সেই দোষণাশার্থ শন, ধঞ্চের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; হয়ত পাটের সে গুণ নাই বরং অপকারিতাই অধিক দেখা যায়। রোগনিদান তত্ত্বে ও উদ্ভিদ শাস্ত্রে দেখা যায় যে সময়ে সময়ে উদ্ভিদবিশেষ বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া দেশ বিশেষ রোগপূর্ণ করিয়া ফেলে হয়ত সেই কারণেই ধঞ্চে অপেক্ষা পাটের চাষে দেশে রোগবহুল্য ঘটিয়াছে।

কাঠশোলা—Sesbania paludosa ধঞ্চে জাতীয় এই উদ্ভিদ অনেক স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জলা ও জঙ্গলময় স্থানে প্রচুর জন্মে। এই গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয়। চাষ করিলে এই উদ্ভিদেরত উন্নতি হইতে পারে।

পাটের কথা

ময়মনসিংহ জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাটই সর্ব্বপ্রধান। এ জেলার কৃষকেরা ধানও পাটই সাধারণতঃ আবাদ করিয়া থাকে। অনেকেই নিজ সংসারের প্রয়োজনোপযোগী ধান আবাদ করিয়া অবশিষ্ট ভূমিতে পাটের চাষ করে। পাটের মূল্য দ্বারাই তাহারেদ সারা বৎসরের সমস্ত ব্যয় চালাইয়া থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর লোক কৃষক শ্রেণীর অর্থের উপরেই সাধারণতঃ নিভর করেন। যে বৎসর পাটের মূল্য কমিয়া যায়, সে বৎসর ময়মনসিংহের শুধু কৃষক শ্রেণীর লোকমাত্র দুরাবস্থায় পতিত হয়, তাহা নহে. ময়মনসিংহের সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এই বৎসর চাউল কাপড় ছাতা জুতা কাগজ, লোহা গুড় চিনি ইত্যাদি সাংসারিক প্রয়োজনের সকল জিনিষের মূল্যের বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ত্রিগুণ ত্রিগুণ এবং কোথায় বা চতুর্গুণ মাত্রায় উঠিয়াছে। অথচ ময়মসিংহের প্রধান সম্বল পাটের মূল্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে জেলার এ সর্ব্বশ্রেণীর লোকই কিরূপ কষ্টে

পতিত হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। সকল জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে অথচ পাটের মূল্যই কেন কমিতেছে তাহা এক প্রহেলিকা বিশেষ। সরকার পক্ষ হইতে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিসম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় সকল দেশেই বেশী টাকা ব্যবহার করিতে হইয়াছে বলিয়া এবং তাহা বাজারে রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্যই জিনিষ কিনিতে বেশী টাকা দিতে হয়। এই কথা সত্য হইলে পাটের মূল্য বৃদ্ধ না হইয়া কেন কমিয়া যাইতেছে তাহার কৈফিয়ৎ সরকার পক্ষ দিতেছেন না।

যুদ্ধের সময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশের পাট বিক্রয়ের কর্ত্তৃত্ব (control) নিজ হস্তে লইয়াছিলেন। বিদেশেব কোন্ রাজ্যের লোক কত পাট ক্রয় করিতে পারিবে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ বিদেশের বণিকগণ এ দেশে আসিয়া নিজ ইচ্ছামত পাট ক্রয় করিতে পারেন না। সুতরাং এ দেশের কতকগুলি পাট ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ পাটের কলওয়ালা নিজ ইচ্ছামত পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতেছেন। এ দেশের কৃষকগণ চির দরিদ্র। তাহারা পাট বিক্রয় না করিয়া পারে না। পাট প্রস্তুত হওয়া মাত্রই তাহা তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে হয়। অথচ পাট হইতে যে সকল জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহার মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধিহেতু যে লাভ, তাহা পাট আবাদকারী কৃষকের হস্তে আসিতেছে না। পাটের কলওয়ালা ও পাটের বণিকগণ তাহা লুঠিয়া লইতেছেন।

কৃষক একমণ পাট ৮।১০ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। অথচ সেই একমণ পাটের দ্বারায় কলওয়ালাগণ কি পরিমাণ লাভ করিতেছে তাহা তাঁহাদের কলের লভ্যাংশ অর্থাৎ ডিভিডেণ্ডের হার দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কলওয়ালাগণ প্রতি বৎসরে প্রতি একশত টাকায় ১০০৲ ২০০৲। ৩০০৲ ৪০০৲ টাকা পরিমাণ লাভ করিতে ছন। গত এক বৎসরে হুগলি জুটমিল একশত টাকা মুল ধনে ৪০০ চারিশত, টাকা নিউসেণ্ট্রাল জুটমিল ৩৩০৲ টাকা, গ্যাঞ্জেস্ জুটমিল ৩০০৲ টাকা, কিনিসন্ ২৭৫৲ টাকা, গোন্দলপাড়া জুটমিল ২১৬৲, বজবজ জুটমিল ২১৫৲ টাকা, ডেলটা জুটমিল ২০৫৲ টাকা কানকানারা জুটমিল ২০০৲ টাকা লরেন্স জুটলিল ২০০৲ নৈহাটি জুটমিল ২০০৲ টাকা নর্থব্রুক জুটমিল ২০০৲ টাকা, ষ্টাণ্ডার্ড জুটমিল ২০০৲, টাকা লাভ করিয়াছেন।

কৃষকগণ সারা বৎসর শরীরের রক্ত জল করিয়া যে জিনিষ উৎপাদন করে, তাহাদ্বারা তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হয় না। এমমণ পাটের মূল্য দ্বারা আধমণ চাউল কিনিতে হয়। আর আমাদের গবর্ণমেণ্টের এমনই ব্যবস্থা যে সেই জিনিষ কিনিয়া কলওয়ালাগণ প্রতি বৎসর একশত টাকায় চারিশত টাকা লাভ করিতেছে এবং লাভের অর্থ দ্বারা রাজার ন্যায় জাঁক জমকের সহিত নানা বিলাস দ্রব্যে সজ্জিত

ম্যালেরিয়ার কারণ—পূর্ব্বকালে বর্ষায় শন ধঞ্চের চাষ হইত, এখন পাট জন্মে; পূর্ব্বে দেশ রোগশূন্য ছিল এখন ম্যালেরিয়াদি রোগে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে যে চাষের এই ব্যতিক্রমই ইহার কারণ নয়? পূর্ব্ব পুরুষেরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা পাটের সুতা হয় একথা অবশ্যই জানিতেন তথাপি কি জন্য পাট ছাড়িয়া শন ধঞ্চের চাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ইদানীং আলোচনার বিষয় হওয়া উচিৎ। বর্ষাকালে বঙ্গদেশে জলমগ্ন থাকায় জলবায়ু স্বতঃই দূষিত হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ সেই দোষণাশার্থ শন, ধঞ্চের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; হয়ত পাটের সে গুণ নাই বরং অপকারিতাই অধিক দেখা যায়। রোগনিদান তত্ত্বে ও উদ্ভিদ শাস্ত্রে দেখা যায় যে সময়ে সময়ে উদ্ভিদবিশেষ বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া দেশ বিশেষ রোগপূর্ণ করিয়া ফেলে হয়ত সেই কারণেই ধঞ্চে অপেক্ষা পাটের চাষে দেশে রোগবহুল্য ঘটিয়াছে।

কাঠশোলা—Sesbania paludosa ধঞ্চে জাতীয় এই উদ্ভিদ অনেক স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জলা ও জঙ্গলময় স্থানে প্রচুর জন্মে। এই গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয়। চাষ করিলে এই উদ্ভিদেরত উন্নতি হইতে পারে।

পাটের কথা

ময়মনসিংহ জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাটই সর্ব্বপ্রধান। এ জেলার কৃষকেরা ধানও পাটই সাধারণতঃ আবাদ করিয়া থাকে। অনেকেই নিজ সংসারের প্রয়োজনোপযোগী ধান আবাদ করিয়া অবশিষ্ট ভূমিতে পাটের চাষ করে। পাটের মূল্য দ্বারাই তাহারেদ সারা বৎসরের সমস্ত ব্যয় চালাইয়া থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর লোক কৃষক শ্রেণীর অর্থের উপরেই সাধারণতঃ নির্ভর করেন। যে বৎসর পাটের মূল্য কমিয়া যায়, সে বৎসর ময়মনসিংহের শুধু কৃষক শ্রেণীর লোকমাত্র দুরাবস্থায় পতিত হয়, তাহা নহে. ময়মনসিংহের সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এই বৎসর চাউল কাপড় ছাতা জুতা কাগজ, ধোঁহা গুড় চিনি ইত্যাদি সাংসারিক প্রয়োজনের সকল জিনিষের মূল্যের বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ত্রিগুণ ত্রিগুণ এবং কোথায় বা চতুর্গুণ মাত্রায় উঠিয়াছে। অথচ ময়মসিংহের প্রধান সম্বল পাটের মূল্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে জেলার এ সর্ব্বশ্রেণীর লোকই কিরূপ কষ্টে

পতিত হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। সকল জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে অথচ পাটের মূল্যই কেন কমিতেছে তাহা এক প্রহেলিকা বিশেষ। সরকার পক্ষ হইতে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিসম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় সকল দেশেই বেশী টাকা ব্যবহার করিতে হইয়াছে বলিয়া এবং তাহা বাজারে রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্যই জিনিষ কিনিতে বেশী টাকা দিতে হয়। এই কথা সত্য হইলে পাটের মূল্য বৃদ্ধ না হইয়া কেন কমিয়া যাইতেছে তাহার কৈফিয়ৎ সরকার পক্ষ দিতেছেন না।

যুদ্ধের সময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশের পাট বিক্রয়ের কর্ত্তৃত্ব (control) নিজ হস্তে লইয়াছিলেন। বিদেশের কোন্ রাজ্যের লোক কত পাট ক্রয় করিতে পারিবে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ বিদেশের বণিকগণ এ দেশে আসিয়া নিজ ইচ্ছামত পাট ক্রয় করিতে পারেন না। সুতরাং এ দেশের কতকগুলি পাট ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ পাটের কলওয়ালা নিজ ইচ্ছামত পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতেছেন। এ দেশের কৃষকগণ চির দরিদ্র। তাহারা পাট বিক্রয় না করিয়া পারে না। পাট প্রস্তুত হওয়া মাত্রই তাহা তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে হয়। অথচ পাট হইতে যে সকল জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহার মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধিহেতু যে লাভ, তাহা পাট আবাদকারী কৃষকের হস্তে আসিতেছে না। পাটের কলওয়ালা ও পাটের বণিকগণ তাহা লুঠিয়া লইতেছেন।

কৃষক একমণ পাট ৮।১০ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। অথচ সেই একমণ পাটের দ্বারায় কলওয়ালাগণ কি পরিমাণ লাভ করিতেছে তাহা তাঁহাদের কলের লভ্যাংশ অর্থাৎ ডিভিডেণ্ডের হার দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কলওয়ালাগণ প্রতি বৎসরে প্রতি একশত টাকায় ১০০৲ ২০০৲। ৩০০৲ ৪০০৲ টাকা পরিমাণ লাভ করিতেছন। গত এক বৎসরে হুগলি জুটমিল একশত টাকা মূল ধনে ৪০০ চারিশত, টাকা নিউসেণ্ট্রাল জুটমিল ৩৩০৲ টাকা, গ্যাঞ্জেস্ জুটমিল ৩০০৲ টাকা, কিনিসন্ ২৭৫৲ টাকা, গোন্দলপাড়া জুটমিল ২১৬৲, বজবজ জুটমিল ২১৫৲ টাকা, ডেলটা জুটমিল ২০৫৲ টাকা কান্‌কানারা জুটমিল ২০০৲ টাকা লরেন্স জুটলিল ২০০৲ নৈহাটি জুটমিল ২০০৲ টাকা নর্থব্রুক জুটমিল ২০০৲ টাকা, ষ্টাণ্ডার্ড জুটমিল ২০০৲, টাকা লাভ করিয়াছেন।

কৃষকগণ সারা বৎসর শরীরের রক্ত জল করিয়া যে জিনিষ উৎপাদন করে, তাহাদ্বারা তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হয় না। এমমন পাটের মূল্য দ্বারা আধমণ চাউল কিনিতে হয়। আর আমাদের গবর্ণমেণ্টের এমনই ব্যবস্থা যে সেই জিনিষ কিনিয়া কলওয়ালাগণ প্রতি বৎসর একশত টাকায় চারিশত টাকা লাভ করিতেছে এবং লাভের অর্থ দ্বারা রাজার ন্যায় জাঁক জমকের সহিত নানা বিলাস দ্রব্যে সজ্জিত

হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। আমাদের দেশের জমিদারগণকে ভূমির মালিক বলা হইয়া থাকে। যে এক বিঘা জমিতে কৃষক আটমণ পাট পাইয়া থাকে, সেই জমির জন্য জমিদার সাধারণতঃ ১৷৷০ টাকা ২৲ টাকা বার্ষিক খাজনা গ্রহণ করেন। জমিদার যদি ঐ খাজনার পরিমাণ আট আনা বৃদ্ধি করিয়া দেন তাহাহইলে গবর্ণমেণ্টের আইন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কৃষকের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ প্রতিকারপরায়ন হন। কোনও মহাজন একশত টাকায় প্রতি বৎসরে ২৫৲ টাকা সুদ আদায় করিলে গবরমেণ্টের করুণহৃদয় তাহাতে বিগলিত হইয়া যায়। সাধারণ লোকের নিকট হইতে মহাজনগণ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আইন সংশোধনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। অথচ বিদেশের লোকের নিকট এদেশের কৃষকগণ পাট বিক্রয় করিয়া যে প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারিত কৃত্রিম উপায়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে কলওয়ালাগণের হস্তগত হইতে দিতে গবরমেণ্ট দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

এই ব্যবস্থাকে আমরা কি নামে অভিহিত করিব তাহা খুজিয়া পাওয়া যায় না। অন্য কোনও স্বাধীন দেশে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কৃষকগণ নিজ পরিশ্রম দ্বারা একটী জিনিষ উৎপাদন করিতেছে। সেই জিনিষ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশীয়েরা আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতেছে। সেই অর্থের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র কৃষকের হস্তে আসিতেছে। অবশিষ্ট উনচল্লিশ ভাগ অর্থ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসাদারের হস্তগত হইয়া তাহার বিলাস ব্যসনে ব্যয়িত হইতেছে; যে সমস্ত ব্যবসাদার বৎসরে শতকরা ৬৲ ছয় টাকা লাভ হইলেই সন্তুষ্ট হইবার কথা, সে বৎসরে শতকরা ৩০০৲ এমন কি ৪০০৲ টাকা পরিমাণ লাভ করিতেছে; কৃষকগণ এদিকে আধপেট খাইয়া পশুর ন্যায় কোনরূপে জীবন যাপন করিতেছে। এদৃশ্যের অন্য কোথাও দৃষ্টান্ত আছে কিনা জানি না। বুঝি ইংরেজ কলওয়ালাগণ আমাদের রাজার স্থানীয় ও রাজবংশ বলিয়া ইহা সম্ভব। কিন্তু হংসশ্রেণীকে বাঁচাইয়া না রাখিলে পরে আর কে স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিবে?—("চারুমিহির")

রাস্না বা অর্কিড।

(ছাত্রদিগের জন্য)

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত।

তোমরা কি বলিতে পার কেন ফুল দেখিলে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়? কেন মন প্রফুল্ল হয়? কি বালক, কি যুবক. কি বৃদ্ধ ফুল সকলেরই প্রিয় এবং পূজার পবিত্র উপকরণ। কি ধনীর সুরম্য অট্টালিকায় কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ফুল সর্ব্বত্র সমানভাবে আদৃত। পৃথিবীতে অনেক রকমের ফুল পাওয়া যায়। প্রায় সকল ফুলই সুন্দর; কিন্তু আমার মনে হয় রাস্না ফুলের চেয়ে সুন্দর ফুল বুঝি আর নাই। সভ্য জগতে রাস্না গৌরবের স্থান লাভ করিয়াছে কতকগুলি রাস্না ফুল বড়ই মনোহর এবং তাহাদের সাদৃশ্য প্রাণিজগৎ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। কোনটী দেখিতে

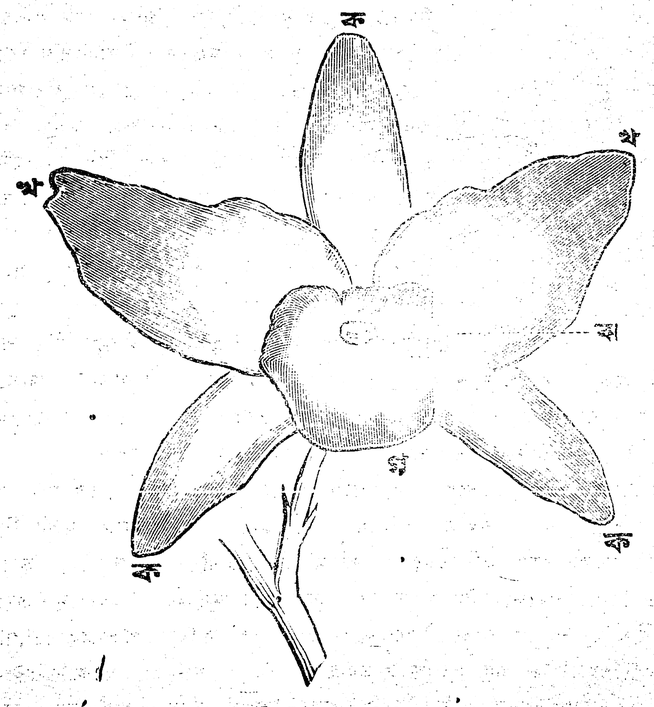

ডেণ্ড্রোবিয়ম নোবিলি ফুল।

প্রজাপতির মত,কোনটী দেখিতে মৌমাছির মত,কোনটী বা হংসের মত আকৃতি, বর্ণ ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট। এই ফুল যেমন একদিকে নয়নানন্দদায়ক পক্ষান্তরে আবার তেমনই নির্ম্মলতার অসাধারণ শক্তি ও মহিমা কীর্ত্তন করিতেই যেন জগতের চারিদিকে রহিয়াছে।

তোমরা সাধারণতঃ রাস্না বলিতে সুন্দর রং ও গন্ধযুক্ত একপ্রকার ফুল বুঝিয়া থাক। যদি ঐ ফুল সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে উহার গঠন, প্রকৃতি, আবাসস্থান ও চাষ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

কি কৌশলে তাহারা বাঁচিয়া থাকে ও বড় হয় ও সংখ্যায় বাড়িতে থাকে এবং ঈশ্বরের কি অদ্ভুত ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া সর্ব্বশেষে এমন চমৎকার বর্ণের ফুল উৎপাদন করে তাহা বেশ ভালরূপ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। রাস্না পৃথিবীর নানাস্থানে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মাঠে বনে বা পাহাড়ে সহজ প্রাপ্য যে সকল মনোহর রাস্না জন্মিয়া থাকে সেগুলির গঠন ও শ্রেণী ভাগ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিব।

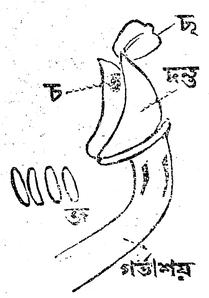

ডেণ্ড্রোবিয়ম নোবিলি ফুল।

বিষয়টীকে দুরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করিও না তাহা হইলে তোমাদের সকল উৎসাহ ও উদ্যম ব্যর্থ হইবে।

বিদ্যালয়ে সচরাচর অতি নীরস ভাষায় শুষ্ক লতাপাতার ব্যাবচ্ছেদ সাহায্যে যে উদ্ভিদ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার ফলে শিক্ষার্থীগণ উদ্ভিদ বিষয়টীকে রসহীন ও কঠিন মনে করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু আমার মনে হয় এই শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি বেশ সরল ও মিষ্ট কথায় বিবৃত করা যাইতে পারে এবং শুষ্ক লতা পাতার পরিবর্ত্তে সদ্যঃ প্রস্ফুটীত ফুলের উজ্জ্বল রং ও সৌরভে আমোদিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কৌতুলচ্ছলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লতা পাতা ও ফুলের পরীক্ষা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে উদ্ভিদের বিষয় অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। এইরূপভাবে অনুশালন করিলে দেখা যাইবে বিষয়টী অপ্রীতিকর হওয়া দূরে থাকুক বরং অত্যন্ত আমোদ জনক।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইলে তোমাদিগকে অবশ্য অবশ্য এমন কতকগুলি শব্দ শিখিতে হইবে যাহার অর্থ না জানিলেই চলিবে না। যে কোনও নূতন বিদ্যা শিখিতে গেলেই এরূপ করিতে হয়। জ্যামিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত, ভূগোল প্রভৃতি শিখিতেও তোমাদিগকে অনেক নূতন কথার অর্থ জানিতে হইয়াছে। এছাড়া সূক্ষ্মদর্শী হইতে অভ্যাস করিতে হইবে কারণ তাহা না হইলে বিভিন্নপ্রকারের লতা,গাছ, ফুল, প্রভৃতির মধ্যে প্রধানতঃ কি প্রভেদ তাহা বুঝা বা মনে রাখা খুকঠিন হইবে।

তোমরা সকলেই জান যে 'গাছের ৫টী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে; যথা—মূল, কাণ্ড,

পাতা, ফুল ও ফল; প্রথম ৩টী শব্দের প্রচলিত অর্থ সকলেই জান। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা ফল বলিতে সকল রকমের ফলই বুঝিয়া থাকেন। ফল বলিলে কেবল যে পেয়ারা পেঁপে, আম, জাম প্রভৃতি বোঝেন এমন নহে, যব, ধান, নারিকেল, শুপারি প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যই ঐ নামেই অভিহিত করেন; প্রায় সমস্ত ফলের মধ্যে বীজ থাকে। সেই বীজ রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। ফুলই গাছের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে এবং ফল জন্মাইবার জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তাহা সমস্তই ফুলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

ফুলের ভিন্ন ২ অংশের ভিন্ন ২ নাম আছে কিন্তু সচরাচর লোকে তাহা জানে না। সুতরাং তোমাকে ঐ নামগুলি শিখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় ভালরূপ শিক্ষার জন্য এস আমরা একটী লেবু ফুল লইয়া পরীক্ষা করি (১ম চিত্র) ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে সবুজ বর্ণের একটী স্থূল পদার্থ দেখিতে পাইবে ইহার নাম "গর্ভকেশর"। ঐ সবুজবর্ণ বস্তুটীর নীচের অংশ ঈষৎ স্থূল ও গোলাকার এবং উপরে অংশটী দেখিতে আলপিনের মাথার মত এবং আটাল ও চক্‌চকে। ঐ নীচের স্থূল অংশটীর নাম "গর্ভকোষ" এবং উপরের আলপিনের মাথার মত অংশটীর নাম "গর্ভমুখ"। গর্ভকোষ এবং গর্ভমুখের মধ্যবর্ত্তী সূত্রাকার অংশটীকে গর্ভদণ্ড কহে (গ গ)। হয়ত তোমরা মনে করিতেছ গর্ভকোষটী একটী নিরেট জিনিষ। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কচি বীজ মনে করিবে কিন্তু বাস্তবিক ইহা বীজ নহে। গর্ভকোষের ভিতরটী ফাঁপা এবং উহাতে কতকগুলি খুব ছোট ছোট ডিম্বের মত (১ম খ চিত্র) এবং এইগুলি বড় হইলে বীজ হয়। গর্ভকোষ জিনিষটী একটী কৌটার মত এবং উহার মধ্যে বীজিগুলি অবস্থিত থাকে। উহা স্বয়ং বীজ নহে। ডিম্বাণু বড় হইয়া বীজ হয় বটে কিন্তু সকল ডিম্বাণু বীজ পরিণত হয় না। ডিম্বাণুর বীজেতে পরিণত পরাগের গর্ভমুখে পতিত হওয়ার উপর নির্ভর করে। ইহাদের আশ্চর্য্যজনক কার্য্য আমরা পরে বিবৃত করিব।

লক্ষ্য করিয়া দেখ ১০।১২টী সাদা সূত্রাকার পদার্থ গর্ভকেশরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এই গুলিকে "পরাগকেশর" কহে। ইহাদের প্রত্যেকের উপরিভাগে একটী কুলিয়া হল্‌দে রঙের ক্ষুদ্র কৌটার মত পদার্থ আছে ইহাকে "পরাগ-কোষ" কহে (১ম খ ঘ)। পরাগ কোষ ফাঁপা এবং তাহার ভিতর হইতে একরূপ হল্‌দে রঙের গুঁড়া নিসৃত হয় এই গুঁড়াগুলিকে "পরাগ বা রেণু" কহে। পরাগকোষকে বেষ্টন করিয়া ৪।৫টী সাদা পুরু বড় বড় পত্র আছে। এই গুলিকে পাপড়ি কহে। সচরাচর ফুলের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য পাপড়ির উপর নির্ভর করে। পাপড়িগুলির পাদদেশ হইতে মধু নিঃসৃত হয়। এই মিষ্ট বস্তুই মধুমক্ষিকারা তাহাদের নিজের খাদ্যের জন্য সংগ্রহ করে এবং কখন কখন আমরা সুযোগ পাইলে তাহাদের চাক ভাঙ্গিয়া অপহরণ

করি। ফুলটী বাহিরের দিক হইতে দেখিলে তোমাদের মনে হইবে পাপড়িগুলি একটী ছোট সবুজ "বাটীর" মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই সবুজ পদার্থটীকে "বৃতি" কহে। অনেক ফুলের বৃতি পাপড়িগুলির মত পৃথক পৃথক এবং বিস্তৃত। নেবু ফুলে ৪।৫টী বৃতিপত্র সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া বাটীর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই বৃতি



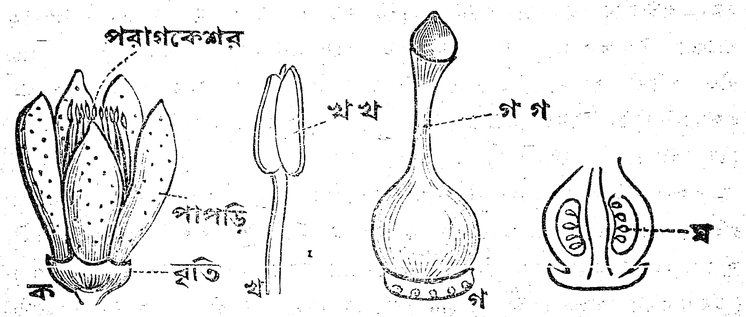

লেবুফুল ও তাহার অঙ্গাবলি।

পত্রের সংখ্যা, বাটীর অগ্রভাগে যে সংকীর্ণ দাঁত আছে তাহা দেখিয়া নিরূপণ করা যায়। বৃতি ও পাপড়ি ফুলের শোভা বর্দ্ধন করা ছাড়া ও অন্য অনেক কার্য্য করে। প্রধানতঃ ইহারা ফুলের কোমল অঙ্গগুলিকে শীত, রৌদ্র বা বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে।

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সকল ফুলেরই উপরি লিখিত চারিটী অবয়ব আছে। অবশ্য এ সকল অবয়বের গঠন বিন্যাস প্রণালী ও রঙ ও সাজান প্রণালী সব ফুলে এক রকম নহে। তবে মোটামুটি সকল প্রকারের ফুল একই ভাবে গড়া বলা যাইতে পারে। ফুলের নিম্নদেশে বৃতি থাকে; উহা কুঁড়ি অবস্থায় পাপড়ি ও অন্যান্য অবয়ব গুলিকে ঢাকিয়া বিবিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করে। বৃত্তির অভ্যন্তরে সুন্দর পাপড়িগুলি অবস্থিত থাকে। পাপড়িগুলির ভিতরে পরাগ বহনকারী সুতার মত পদার্থগুলি থাকে। আর সকলের মধ্যে বীজ বহনকারী কৌটাটী থাকে।

নেবু ফুলের সহিত রান্না ফুলের কি পার্থক্য আছে মনোযোগের সহিত দেখ। ডেণ্ড্রোবিয়ম নোবিলি নামক রান্না জাতীয় ফুল প্রায় সকল বাগানেই পাওয়া যায় এবং এই ফুলগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। তোমরা ইহার একটী ফুল আন। ইহার গোলাকার পাপড়িটী (২য় গ) প্রথমেই দর্শকের চিত্তাকর্ষন করে। এই পাপড়িটীকে "নিম্নদল" কহে। অপর দুইটি পাপড়ি ডিম্বাকৃতি এবং প্রসারিত (২য় খ)। বাকী তিনটি পত্র এই শেষোক্ত পত্রের আকৃতির ও বর্ণের; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে এই ফুলে নেবু ফুলের মত বৃতি নাই, কেবল পাপড়ি আছে। কিন্তু আমি বলিতেছি ইহাতে বৃতি ও পাপড়ি দুইই বর্ত্তমান। প্রথম দৃষ্টিতে কোন্‌গুলি বৃতি, ও কোন্‌গুলি পাপড়ি হয়ত ঠিক করিতে পারিবে না কারণ তাহারা দেখিতে একই রকমের। বিশেষতঃ প্রকাণ্ড গোলাকার নিম্নদলটি যে কি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু বাহিরের দিক্ হইতে মনোযোগ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে সমগ্র পত্রের সংখ্যা ছয়টী মাত্র, তিনটী পত্র অপর তিনটীর মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বাহিরের গুলি (২য় ক ক ক) বৃতি ও ভিতরের গুলি (২য় খ খ গ) পাপড়ি। এই ফুলের অপরূপ আকৃতিতে তোমাদের যে ধাঁধা লাগিয়াছিল তাহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল ইহার নিম্নদলটির আকার ও গঠন অসঙ্গত এবং ইহার বৃতি ও পাপড়িগুলির আকার বিন্যাস প্রণালী অদ্ভুত ও অসাধারণ।

তোমরা দেখিয়াছ নেবু ফুলে বৃতি ও পাপড়ির পরবর্ত্তী অবয়ব পরাগ কেশর এবং তাহার পর গর্ভকেশর। এই দুই সারি পুষ্পাঙ্গের রান্না ফুলে খুঁজিয়া বাহির কর। তোমরা বলিবে এই দুই সারি পদার্থ ইহাতে কৈ? একটি মাত্র মোটা "দণ্ড" (২য় ঘ) ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। এই দণ্ডটী যে পরাগ কেশর ও গর্ভকেশর মিলিত হইয়া গঠিত, হয়ত তাহা তোমরা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তোমাদের ভ্রম দূর হইবে। এই দণ্ডের উপর একটা সাদা রঙ্গের ছোট ঢাকনি আছে। এই ঢাকনির ঠিক নীচে এবং নিম্নদলের ঠিক বিপরীত দিকে উজ্জ্বল আটাযুক্ত একটী স্থান আছে, ইহা গর্ভমুখ (২য় চিত্র)। তোমরা দেখিতে পাইবে দণ্ডটী বৃতির

নীচে ও কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে এই নীচের অংশটুকু সবৃন্ত। ইহাই গর্ভকেশর। গর্ভকেশরটী আড়াআড়িভাবে ছেদন করিলে দেখিতে পাইবে ইহার ভিতর ফাঁপা, এবং অসংখ্য ডিম্বাণু তিন পংক্তিতে সাজান রহিয়াছে।

এখন দণ্ডের মাথার উপরে ঢাকনিটী খুলিয়া দেখ ছোট ছোট জোড়া জোড়া হলদে (২য় জ চিত্র) রঙের পিণ্ডাকার পদার্থ দেখা যাইতেছে। এইগুলি কি? ইহার কিয়দংশ জলে দুই অঙ্গুলে রগড়াইয়া ভাল অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে ইহাতে অসংখ্য পরাগ এক সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পিণ্ডাকার পদার্থগুলি পরাগরেণুর সমষ্টি মাত্র। তোমরা জান পরাগরেণু পরাগকেশরের মাথায় থাকে এই ফুলে পরাগ কেশরগুলি কৈ? তাহার বদলে মাত্র একটী দণ্ড দেখিতেছ। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে রাস্নাফুলে পরাগকেশরের সূত্রাকার নিম্ন অংশগুলি লোপ পাইয়াছে এবং পরাগগুলি গর্ভকেশরের মাথায় উপর সংস্থাপিত হইয়াছে অথবা মনে করিতে পার যে দণ্ডটী পরাগ কেশর ও গর্ভকেশর মিলিত হইয়া গঠিত। রাস্না জাতির সকল ফুলেরই পরাগপিণ্ড, দণ্ড, নিম্নদল বা পাপড়ি ও বৃতিগুলি একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফুলে ভিন্ন ভিন্ন অংশের রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সবগুলিতেই গর্ভকেশর এবং পরাগকেশর সংযুক্ত হইয়া দণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা দ্বারাই রাস্না জাতিকে অন্য অন্য জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক করা যায়। যখনই তোমরা পরীক্ষা করিতে করিতে কোন একটী ফুলে এইরূপ দণ্ড বিদ্যমান দেখিবে সেই ফুলটীকে রাস্না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পার। দণ্ডই রাস্না জতির প্রধান বিশেষত্ব ইহা তোমরা মনে রাখিও।

চিনি।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।

চিনির অভাবে সমগ্র জগৎ বর্ত্তমানে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। এ জন্য বৈজ্ঞানিকগণ চিনির প্রশ্ন সমাধান করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে মার্কিণ-যুক্ত রাজ্যের রসায়ন বিভাগ হইতে অঙ্কুরিত যব বা অন্য শস্যের ক্রিয়াদ্বারা শ্বেতসার হইতে যে চিনি পাওয়া যায় তাহা বাণিজ্যোপযোগী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসায়নবিদগণ এই চিনির বিষয় অবগত ছিলেন কিন্তু উহা বাণিজ্যোপযোগী করিবার পক্ষে কেহই সক্ষম হন নাই। আমাদের ভারতবর্ষেও বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ ছিল এবং এক্ষণেও অনেক আছে কিন্তু সেগুলি বাণিজ্যোপযোগী নহে বলিয়া তাহা

দ্বারা আমরা ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইতে পারি নাই। চিনির অভাবের সময় মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ঐ প্রকার চিনি বাণিজ্যোপযোগী হওয়ায় সমগ্র জগৎ যে সম্যক উপকৃত হইলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐরূপ চিনির মধুর ন্যায় আস্বাদ বলিয়া পাইতে সুস্বাদু সে কারণ খাইবার খরিদ্দারগণ উহা অধিক মূল্য দিয়াও লইতে অনিচ্ছুক হইবেন না। বোধ হয় চিনির বিশেষ অভাব না হইলে হয়ত ঐরূপ চিনি যে কখন বাণিজ্যোপযোগী হইত তাহা আশা করা যাইত না এবং চিনির খরচ কমাইবার জন্য আইন হওয়ায় উক্ত প্রকারে অঙ্কুরিত যব বা অন্য শস্যের ক্রিয়া দ্বারা শ্বেতসার হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি এবং মাল মসলার আমদানী করিবার জন্য যুক্ত-রাজ্যের সমধিক উদ্যোগী হইয়াছেন। আলু এবং ধান্য যবাদি শস্য যাহাতে শ্বেতসার আছে এবং যাহা হইতে বিয়ার প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুত করা যায় তাহা হইতে উক্তরূপ চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যখন প্রধান আহার্য্যের জন্য আমরা ব্যাকুল—তখন শস্যাদি মদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার না করিয়া প্রয়োজনীয় আহার্য্য প্রস্তুতের জন্যই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সাধারণ স্বাস্থ্যবান মনুষ্যের কতক পরিমাণ চিনির ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং চিনির যেরূপ অভাব জন্মিয়াছে—এই অভাব অচিরে দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে। মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয় চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে সেই সমস্ত উপায় অনেক দূর পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইবে। সে কারণ মদ্য প্রস্তুতের ভাটি খানাগুলি চিনির কারখানায় পরিণত করিতে পারিলে ভাল হয়। মদের ভাটীখানায় যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলি ত প্রায় সমস্তই চাই এবং সেওয়ার প্রধানতঃ রস বাষ্পে পরিণত করিবার জন্য বড় বড় আধার কতকগুলি হইলে উক্ত প্রকার ভাটিখানায় চিনি প্রস্তুত হইতে পারিবে। ভাটীখানায় ঐরূপ চিনির রস দেখিতে খেজুর বৃক্ষের চিনির রসের ন্যায় দেখা যায়। ইক্ষু চিনি যে সমস্ত কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয় ভাটিখানার চিনি সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, ভাটীখানার চিনির মিষ্টতা ইক্ষু চিনি অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শুধু খাইবার জন্য কেন, ইহা পাকের কার্য্যের জন্যও বেশ ব্যবহৃত হইতে পারে। হয় ত উহা হইতে সহজে মিছরি প্রস্তুত হইতে পারিবে না কেহ মনে করিতে পারেন—কিন্তু অপর সমস্ত বিষয়ে যে উহা সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ চিনি হইতে মিছরীও হইতে পারিবে। এক্ষণে মার্কিণ যুক্তরাজ্য হইতে মিছরি ও সিরাপ প্রস্তুতের জন্য এবং চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ভাটিখানার চিনির রপ্তানি হইতেছে। এক্ষণে যুক্তরাজ্য এরূপ চিনির এক পাউণ্ড পরিমাণের মূল্য ৭ হইতে ৯ সেণ্ট মাত্র। সুতরাং মূল্য বেশকম। কেবল বর্ত্তমানে বড় বড় দোকানদারগণ এরূপ চিনির ব্যবসায় করিলেও উহা খুচরা দোকানদারগণ বা গৃহকর্ত্তৃগণ অদ্যাবধি বিশেষ

ভাবে ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু চিনির যেরূপ অভাব চলিতেছে গৃহকর্ত্তৃগণ তাহা যে শীঘ্রই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং গৃহকর্ত্তৃগণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেই খুচরা দোকানদারগণ উহা আমদানি করিতে বাধ্য হইবেন। সে সময় অবশ্য মূল্য বাড়িয়া উঠিবে। কিন্তু মূল্য বাড়িলেই বর্ত্তমানে সাধারণ চিনির যে মূল্য বাড়িয়াছে ইহার তুলনায় যে উহা অনেক কম থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা মার্কিণ যুক্তরাজ্যের আবিষ্কারের কথা শুনিয়া স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের দেশেও যে আবিষ্কারের কত মালমসলা রহিয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই। যে যে বস্তু হইতে মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে সেই সেই বস্তু হইতে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমাদের বড়ই গরম দেশ সুতরাং এ দেশে মদ্যের ব্যবহার আদৌ প্রয়োজন নাই। সে কারণ আমাদের আর্য্যঋষিগণ মদ্যের ব্যবহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মন সর্ব্বদা নিষিদ্ধ কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। অধিকাংশ মনুষ্য প্রবৃত্তিমার্গ পরিচালিত হয়েন। তাহার উপর আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। সেজন্য এত গরম দেশেও ধান্যেশ্বরী এবং তাড়ির প্রচলন আছে। শুধু বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া তাড়ি বা ধান্যেশ্বরী প্রচলন হইতে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বিরত করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। এজন্য যদি আমাদের সরকার বাহাদুর তাড়ি ফাটিবার বিরুদ্ধে কোন আইন জারি দ্বারা চিনির উপাদান রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে এদেশে লোক নেশার হাত হইতে রক্ষা পাইবে নচেৎ নহে। যদি তাড়ি না ফাটিয়া শিউলিগণ রস কাটিয়া তাহা হইতে গুড় প্রস্তুত করে—উক্ত গুড়ের গাদ ফাটাইয়া তাহা হইতে সহজে চিনি হইতে পারে। অবশ্য তারপুরে যেরূপ দুধ গঙ্গাজলে গুড়ের গাদ কাটাইয়া চিনি হয় তাহা তত পরিষ্কার হয় না। কিন্তু হাড়ের কয়লা দ্বারা পরিষ্কার করিলে তাহা হইতে অতি সুন্দর চিনি হইতে পারে। যাভাদ্বীপে যেরূপ ইক্ষুরস জন্মে এখানে সেরূপ জন্মিতে পারে না এবং ইক্ষুদণ্ডে যেরূপ চিনি জন্মে সেরূপ খেজুর তাল বা নারিকেল হইতে জন্মিবে না বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা মার্কিণ যুক্তরাজ্যের আবিষ্কার হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের দেশে কতকগুলি তাল গাছ আছে তাহাতে ফল জন্মে না। চাষীগণ তাহাকে রাঁড়া তালগাছ বলিয়া থাকে। ঐ তালগাছ কাটিলে যথেষ্ট রস পাওয়া যাইতে পারে এবং ঐ রস হইতে সুন্দর মিছরি এবং চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে কেহ কখন এই গুলিকে বাণিজ্যোপযোগী করিবার চেষ্টা করেন নাই। যেমন টেষ্টটিউবে (test tube) কোন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দেখাইলে তাহা দেশের আপাত উপকারে আইসে না সেইরূপ এগুলি হয় বলিলে আমাদের কিছু লাভ নাই। যৌথভাবে আমরা কয়েক জন যদ্যপি খেজুর এবং তালগাছ অনেকগুলি জমা করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে কাটাইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিয়া বৈজ্ঞানিক-

ভাবে গাদ কাটাইয়া লইতে পারি তাহা হইলে শুধু আমাদের ভারতবর্ষ কেন, আমাদের রাজার দেশ শুধু ইংলণ্ড কেন সমগ্র এসিয়া ইয়ুরেপে আফ্রিকা এবং অ্যামেরিকাকে চিনি সরবরাহ করিয়া আমরা চিনির ব্যবসায়ে জগতের যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাংলার মধ্যে নদীয়া ও যশোহর জেলায় বহুতর খেজুর গাছ পাওয়া যাইতে পারে এবং বর্দ্ধমান জেলায় বহুতর তালগাছ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ঐ দুই একটি জেলায় একটী ধযথ কারবারের কয়েকটী মোকাম বসাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগের সাহায্যে আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ইয়ুরোপে এবং আমেরিকা হইতে আমদানি করিয়া এবং আমেরিকার কয়েকটী চিনি প্রস্তুতের কার্য্যদক্ষ রসায়নবিদ্‌কে আনাইয়া যদি কোন কোম্পানি স্থাপিত হইতে পারে তাহা হইলে এ দেশের কেন, সমগ্র জগতের বিশেষ উপকার করা হইবে। বর্ত্তমানে অতি অল্পদিনের মধ্যে বহুতর যৌথ কারবারের কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এদেশে যে এক্ষণে মূলধনের বিশেষ অভাব হইবে একথা বলা যায় না। তবে কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য লোক ডিরেক্টার-হওয়া আবশ্যক এবং সেই ডিরেক্টার গুলি কাজের লোক হওয়া চাই। তাহা হইলেই সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে এবং মূলধন সহজেই সংগ্রহ হইবে। মূলধন সংগ্রহ হইতে হইতেই মার্কিণ দেশীয় অন্ততঃ একজন বিশেষ সুপণ্ডিত রসায়নবিদ্‌কে নিযুক্ত করা আবশ্যক। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আবশ্যকীয় উপযুক্ত উত্তম এবং বিশেষ কার্য্যকরী যন্ত্রাদির আমদানি করাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার এলাকাধীন শ্রীনগর নামক একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ছিল। এক্ষণে সেই গ্রামটী জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উক্ত জঙ্গলের মধ্যে যথেষ্ট খেজুর গাছ পড়িয়া আছে। সেই সমস্ত খেজুর গাছ আমার বোধ হয় অতি সামান্য মূল্যে জমা পাওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয় সেইগুলি প্রথমতঃ জমা লইয়া মার্কিণ বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে কার্য্য আরম্ভ করিলে মার্কিণ দেশীয় ভাটি খানার চিনি অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল চিনি প্রস্তুত হইয়া জগতের বাজার হইতে ঐরূপ ভাটিখানার চিনি যে অচিরে তাড়াইয়া দিতে পারিবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

(১৯২১)

(টাউনহলের দক্ষিণস্থিত ময়দানে)

পৃষ্ঠপোষিত—অনারেবল শ্রুর মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১, বাঙ্গালা ৩রা ফাল্গুন ১৩২৭ সাল অপরাহ্ণ ২টার সময় খোলা হইবে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা ৯ই ফাল্গুন ২টার সময় বন্ধ হইবে। উদ্দেশ্য :—বর্দ্ধমান জেলার কৃষি এবং শিল্পের ক্রমোৎকর্ষ সাধন।

বিনামূল্যে দ্রব্য প্রদর্শন,—কৃষি এবং শিল্পব্যবসায়িগণ সত্বর স্ব স্ব দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য আবেদন করুন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য নানাবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে। উন্নত প্রণালীতে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য বিশিষ্ট পুরস্কার। দ্রব্য অবাধে বিক্রয় করিতে পারিবেন, অধ্যবসায়িগণ এবং ভদ্র মহিলাগণ এখন হইতে কারুকার্য্য অথবা অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন—তাঁহাদের দ্রব্য সাদরে গৃহীত হইবে। যে সকল প্রদর্শক নিজ দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে থাকিতে না পারিবেন, তাঁহারা সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইবেন। প্রদর্শদীর দরমার বেড়ার বাহিরের দিকে নিম্নলিখিত হারে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন ৯বর্গ ফুট ৵০ আনা ১ বর্গ গজ—১৲ টাকা; ২বর্গগজ ১৷৷০টাকা, নীচের দিকে মাটী হইতে ৪ফুট পর্য্যন্ত এবং উপরের দিকে—৮ফুটের উপর হইতে ইহার অর্দ্ধেক দর দিলেই চলিবে। অষ্ট প্রহর পুলিস পাহারা থাকিবে সুতরাং বিজ্ঞাপন নষ্ট হইবার ভয় নাই। এই মহদনুষ্ঠান সফল করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। সকলে নিজ ক্ষমতানুযায়ী অর্থ সাহায্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা আপনার মহকুমার হাকিমের নিকট প্রেরণ করিলে তাঁহার স্বাক্ষরিত রসিদ প্রাপ্ত হইবেন। প্রদর্শনীতে বিনামূল্যে প্রবেশ—সকলে আসিয়া দেখিবেন।

৩রা ফাল্গুন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং ৯ই ফাল্গুন ২ঘটিকার সময় প্রদর্শনী শেষ হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে ৮টা হইতে ৫৷৷০ পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে এবং সর্ব্বসাধারণ বিনামূল্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন—তবে ৫ই ও ৬ই ফাল্গুন বেলা ১টা হইতে ৫৷৷০টা পর্য্যন্ত ভদ্র মহিলাগণের দর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—ঐ দুই তারিখে ঐ সময়ে অপর দর্শককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। অনারেবল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের সার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই প্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষক এবং জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর এই প্রদর্শনীর কার্য্যকারীর সমিতির সভাপতি। কার্য্যকারী সমিতি জেলার মহামান্য মহোদয়গণ লইয়া গঠিত। এই সমিতি এক সাধারণ সমিতির তত্ত্বাধানে প্রদর্শনী বিষয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছে। উল্লিখিত সাধারণ সমিতি বর্দ্ধমান জেলার সর্ব্ব সাধারণের সভায় সঙ্ঘঠিত। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য—বর্দ্ধমান জেলার কৃষি এবং শিল্পের ক্রমোন্নতি সাধন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের একই প্রকার দ্রব্য এবং সকল স্থানের নানা প্রকার দ্রব্যের বহুল সমাবেশ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যেক শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া তাহার জন্য পারিতোষিক দান এই সকল উপায় দ্বারা এই উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে এবং সরকারী কৃষি এবং অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ উন্নত প্রণালী দেখাইয়া এবং সে বিষয় বক্তৃতা দ্বারা এই ভিত্তিস্থাপনে সাহায্য করিবেন। আশা করা যায় যে, এই উদ্দেশ্যের সহিত মহানুভব এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সহানুভূতি আছে। সুতরাং কার্য্যকরী সমিতি সাহস করিয়া সকলেরই নিকট হইতে অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য

প্রার্থী হইয়া এই পত্র প্রচার করিতেছেন। প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার দ্রব্যের বহুল সমাবেশ এবং কৃষি শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রদর্শনীতে সমাগম এই সকল বিষয়েই সমিতি সকলের নিকট সাহায্যপ্রার্থী। যে সকল দ্রব্য এই জেলাতে উৎপন্ন অথবা প্রস্তুত হয়, অথবা হইবার উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রদর্শনী-সমিতির সেক্রেটারী।

বর্দ্ধমান ৫ই নভেম্বর ১৯২০

বিদেশে গো-ধন রপ্তানী

ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক সর্ব্বনেশে আদেশ করিয়াছেন,—ভারত হইতে ভারতের গোধন এক্ষণে অবাধে রপ্তানী করা চলিবে। একেই ত এদেশে গবী এবং বৃষের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া উঠিয়াছে, গবাদির হত্যাও অবিরাম চলিতেছে,—তাহার উপর যদি এদেশ হইতে গবাদি অবাধে বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে, তাহা হইলে, এদেশের গবী বৃষাদির অবস্থা অচিরকালেই কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার ফলে, এদেশের উত্তম জাতীয় গবী এবং বৃষ ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতে থাকিবে। তাহার ফলে এদেশে দুগ্ধ ঘৃতাদির পরিমাণ আরও কমিয়া আসিবে; কৃষিকার্য্যেও ব্যাঘাত ঘটিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এমন আদেশ কেন করিলেন?

ভারত গবর্ণমেণ্ট,—এগ্রিকালচার বোর্ডের সব-কমিটির পরামর্শ মতেই এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। এই সব কমিটি ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর দেশ হইতে বিদেশে গো-রপ্তানীর কড়াকড়ি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টও এগ্রিকালচার বোর্ডের সব-কমিটির এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, ভারত হইতে অবাধে গো-রপ্তানির আদেশ দিলেন। মাড়োয়ারী এসোসিয়েসন এগ্রিকালচার বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। এসোশিয়েশন বলিয়াছেন,—এদেশ হইতে গবাদি বিদেশে রপ্তানি হইতে

দেওয়া ত দূরের কথা, এদেশে গবাদির উৎপত্তি এবং পুষ্টির উন্নতি বিধানেই বরং গবরমেণ্টের বিশেষ মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এদেশে গবাদির সংখ্যা যে পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে, সে পরিমাণে সংখ্যাবর্দ্ধনের চেষ্টা হইতেছে না! ইহার ব্যবস্থা বিধানে গবরমেণ্টের মনোযোগী হওয়া উচিত।

মাড়োয়ারী এসোসিয়েসন বলিয়াছেন, এগ্রিকালচার বোর্ডের সবকমিটি এদেশে গবাদির উন্নতিবিধান ব্যবস্থার জন্যও ভারত গবরমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন; ভারত গবরমেণ্ট কিন্তু সে পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া গবাদির রপ্তানীর বাধনই খসাইয়া দিলেন। মাড়োয়ারি এসোসিয়েশনের ন্যায় ভারতের লক্ষ লক্ষ হিন্দু, ভারত গবরমেণ্টের এই ভয়ঙ্কর আদেশের ঘোর বিরোধী। ভারত গবরমেণ্ট এই আদেশ প্রত্যাহারের, এদেশে গবাদির হত্যাহ্রাসের এবং এদেশের গবাদির সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হউন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।—হিতবাদী।

কৃষিক সং
শ্রেণী সং

দুর্ম্মূল্যতার তদন্ত

কলিকাতায় কমিশন

খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, গত সপ্তাহের বুধবার বেলা ১২টার সময় রাইটার্স বিল্‌ডিং;' বাড়ীর কমিটীরুমে তাহার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে ইহারা উপস্থিত ছিলেন, অনরেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায়, সভাপতি; অনরেবল রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, অনরেবল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, অনরেবল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং অনরেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সদস্য শ্রীযুক্ত এন জি বসাক সেক্রেটারী।

এদিনের প্রথম সাক্ষী মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ওঙ্কারমল শফ্‌। ইনি বলেন "আমি একজন বণিক এবং মহাজন। যুদ্ধের সময়ে কলিকাতায় যে পরিমাণ কাপড় ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী আছে বটে; কিন্তু ঐ বেশীর পরিমাণ শতকরা পচিশের অধিক নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে যে পরিমাণ কাপড় এখানে আমদানি হইত, এখন তাহার শতকরা ৫০ পরিমাণ অর্থাৎ আধাআধি রকম

কাপড় আসিতেছে। ইংলণ্ডের অপেক্ষা কলিকাতায় কাপড়ের দর টাকায় প্রায় চারি আনা রকম কম। বোম্বাই কাপড়ের দর ইংলণ্ড অপেক্ষা শতকরা মাত্র ২।৩ পরিমাণ কম; তবে সে সব কাপড় উৎকৃষ্ট। বোম্বাইএ আমার মনে হয়, এক পাউণ্ড কাপড় তৈয়ারি করিতে খরচা পড়ে ১/০ এক টাকা এক আনা; বাজারে তাহা বিক্রয় হয় ১৸৶০ এক টাকা পনের আনা হইতে ২৲ দুই টাকা দরে। খুচরা বিক্রেতারা লাভ করিতে পারে না; কলওয়ালারাই লাভ করিয়া থাকে। ভারতের এবং অন্যান্য স্থানের কলকারখানাওয়ালারা টাকায় টাকা লাভ করিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে সাড়ে পনের কোটী টেকোয় কাজ চলিতেছে; ইহার মধ্যে ভারতে চলিতেছে প্রায় ৭০ সত্তর লক্ষ। আরও দুই কোটি টেকো বসাইতে পারিলে ভারতের টান যোগান হইতে পারে।"

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন,—"তাহা হইলে, আপনি বলিতেছেন যে, ভারতের কল কারখানা সমূহ হইতে ভারতের প্রয়োজনমত কাপড় উৎপন্ন হয় না?

উত্তরে সাক্ষী বলেন—আমার মনে হয়, ভারতের কল কারখানা সমূহ হইতে যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে ভারতের মাত্র শতকরা ৪০ চল্লিশ জনের কাপড় সরবরাহ হইতে পারে। কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয়, তাহা দুই কোটি টেকো চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট।"

সাক্ষী অতঃপর বলেন—ভারতের কারখানা সমূহে বৎসরে প্রায় বিশ লক্ষ গাইট তুলা কাটিয়া থাকে; ভারতের হাতের তাঁত সমূহে বৎসরে তুলা কাটিয়া থাকে সাড়ে চারি লক্ষ গাইট। ভারতবর্ষ হইতে জাপানে প্রায় ১৪।১৫ লক্ষ গাইট এবং ইউরোপে ২।৩ লক্ষ গাইট তুলা চালান গিয়া থাকে।

সভাপতি জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি কি বিদেশে তুলা রপ্তানী বন্ধ করিতে বলেন?"

উত্তর—"না, এখন নয়।"

প্রশ্ন,—"এখন কাপড়ের যে চড়া দর রহিয়াছে, তাহা কমাইবার উপায় কি?

উত্তর—যাহাতে কাপড় আরও বেশী পরিমাণে তৈয়ারি হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলকারখানা সমূহকে মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে হইবে।

সাক্ষী পুনরায় বলেন—"যুদ্ধের পূর্ব্বে কাঁচা তুলার যে দর ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৩০।৩৫ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি বঙ্গদেশে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় চালাইবার পক্ষপাতী নহি; কারণ, এই কাপড় তেমন টেকসই নহে। যদি ভাল রকম কাপড় তৈয়ারি হয়, আর কলকারখানা ওয়ালারা একশত টাকায় একশত টাকা লাভ না

করিয়া, তাহার স্থানে শতকরা মাত্র ১০।১৫ টাকা লাভ করে, তাহা হইলেই গরীব লোকের সুবিধা হইবে।

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর—এখন ত' কাপড়ের বাজার নামিতেছে।

সাক্ষী শেষে বলেন—"ইংলণ্ডের কলওয়ালারা দর বাড়াইয়াছে, ফলে বাটার সুবিধা হইলেও, ভারতের লোকেরা তাহার কোন সুবিধাই পাইতেছে না।"

মাড়োয়ারী ট্রেডস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রামকুমার জালান এদিনের দ্বিতীয় সাক্ষী। তিনি বলেন,—"আমি কাপড়ের দালালি করি। মূল্য বৃদ্ধির কারণ,—(১) মাল বেশী নাই; (২) যাহা আছে, তাহাও রেলের গাড়ীর অভাবে আবশ্যক মত চালান দেওয়া চলিতেছে না, রেল কর্ত্তৃপক্ষ ইহার একটা খুব সুবিধা লইতেছেন; (৩) গরুচালান বেশী হইতেছে এবং গো-হত্যাও বেশী হইতেছে, ফলে মফস্বলে আর তেমন গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না, তাহার পর গরু কমিতেছে বলিয়া আর জমিতে তেমন সার পড়ে না। এজন্য ফসলও কম হইতেছে। আর এক কথা,—যুদ্ধের সময় গবরমেণ্ট খুব বেশী দাম দিয়া জিনিস খরিদ করিয়াছেন; তাহাই প্রথমে বাজার চড়িবার মূল কারণ। ব্যবসায়ীরা এখন সেই চড়া দর না পাইলে জিনিস ছাড়িতেছে না। পৃথিবীর সকল স্থানেরই বাজার চড়িয়াছে; ভারতের বাজার কিরূপে না চড়িয়া পারে? গবরমেণ্ট খুব টাকা ছাড়িয়াছেন; ইহাও কতকটা বাজার বৃদ্ধির কারণ। টাকায় স্বচ্ছলতা কমাইয়া দিলে বাজার নরম হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতের বাজারে কাপড়ের যে দর, মাঞ্চেষ্টারের দর তাহা অপেক্ষা শত করা ১০৲ টাকা হইতে ২৫৲ পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত বেশী। চাউলের মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ,—যুদ্ধের সময় এবং তাহার পরেও কিছুদিন গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল বিদেশে চালান দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ধান চাউলের উপর যে শাসন করিয়াছিলেন তাহাতে ফল ভাল হয় নাই। ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির কারণ,—প্রচুর পরিমাণে গরু হত্যা করা হইতেছে এবং প্রচুর পরিমাণ বিদেশে চালান যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট নিজে হাতে লইয়াও কাপড়ের বাজার সম্বন্ধে কিছুই সুবিধা করিতে পারিবেন না; কেন না যে কারণে এইরূপ বাজার চড়িয়াছে, তাহার উপর গবরমেণ্টের কোন হাত নাই। চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধে গবরমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন, ইহাই অভিপ্রেত। গবরমেণ্ট বিদেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিউন, ব্রহ্মদেশ হইতেও যাহাতে বিদেশে চাউল রপ্তানী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন; গম রপ্তানীর যে নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা বাহাল রাখা হউক,—যতদিন না খাদ্যদ্রব্যের দর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতেছে, ততদিন এইরূপ ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। দুধ এবং তাহা হইতে প্রস্তুত ঘি ও মাখন সম্বন্ধেও এই কথা। যাহাতে ভারতে গো-হত্যা রহিত হইতে পারে এবং যাহাতে ভারত হইতে বিদেশে গরু চালান হইতে না পারে,

এমন আইন প্রবর্ত্তনের জন্য গবরমেণ্টকে ধরিতে হইবে। কাঁচা তুলা রপ্তানী বন্ধ করিয়া বিশেষ ফল হইবে না; কারণ, ভারতের কলসমূহ এই দরে তুলা কিনিয়াও তাহাদের যতদূর সাধ্য কাজ চালাইতেছে এবং খুবই লাভ করিতেছে। মফস্বলে গবর্ণমেণ্টের হেপাজতে উচিত মূল্যে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। ব্যাপারীরা যাহাতে মোটা লাভ খাইতে না পারে, তাহার সুব্যবস্থার পক্ষে গবরমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমরা শুনিয়াছি অক্টোবর হইতে গবর্ণমেণ্ট গম রপ্তানীর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। ইহার ফলে বাজার আবার চড়িয়া যাইবে। গুজবের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাজারে মণকরা আট আনা হিসাবে দর চড়িয়া গিয়াছে। আমরা গত তিন বৎসর হইতে ভারতে কল বসাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া আমাদের চেষ্টা সফল হইতেছে না।"

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘাঁ এদিন সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাহার পর সোমবার পর্য্যন্ত বৈঠক মুলতবী রাখা হয়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার পুনরায় বৈঠক বসিলে প্রথমেই শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ইনি বঙ্গীয় কৃষক-সমিতির সেক্রেটারী। সাক্ষী বলেন,—"যুদ্ধের সময় নানা দেশে নানা রকম ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, চাষ আবাদ, কল-কারখানার কাজ কর্ম্ম সবই নষ্ট হইয়াছে বা কমিয়া গিয়াছে; তাহা ছাড়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে জিনিষ পত্র চালানের অসুবিধা হইয়াছে; বাটার বাজার কৃত্রিম ভাবে ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে; যুদ্ধের প্রথম আমলে অনেক মাল মজুত করা হইয়াছিল; ব্যবসাদারেরা এবং খুচরা বিক্রেতারা বেশী লাভ করিতেছে; বর্ত্তমানে কৃষি ও শিল্পজাত সকল জিনিষেরই খরচা বাড়িয়াছে; তাহার উপর এখন সকলেরই একটা বেশী বেশী লাভ করিবার ঝোঁক হইয়াছে,—এই সবই দুর্ম্মূল্যতার মূল কারণ। আমি চাউল রপ্তানী নিষেধের পক্ষপাতী নহি।"

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন—"কৃষিজীবীদেরও কিছু টাকা প্রয়োজন; এই কারণেই আমি চাউল রপ্তানী নিষেধের পক্ষপাতী নহি। আমাদের যত প্রয়োজন তত ফসল না হউক তথাপি বঙ্গদেশে যে চারি আনা রকম আবাদের উপযোগী জমি পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবাদ হইলে, সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে। কৃষক শ্রেণীর অবস্থা বড়ই খারাপ। বর্দ্ধমান বিভাগের বড় বড় কৃষিজীবীদের বিস্তর ধান, গোলায় বাঁধা আছে; কিন্তু দরিদ্র সাধারণ কৃষকদের কিছুই নাই।"

সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন—"আমি এই জন্য চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে চাহি না যে তাহা হইলে কৃষকেরা নিজের ইচ্ছাতেই পতিত জমি সকলের আবাদ আরম্ভ করিবে। 'কৃষকদের অপেক্ষা এখন মজুরদের অবস্থা ভাল' হইয়াছে। আমাদের অঞ্চলে

চাষীরা কোন কালেই বড়লোক নহে। পূর্ব্বে ধান চাউল রপ্তানি হইত না। এখন কয়েক বৎসর হইতে ধান-চাউল চালান যাইতেছে। আমি এখন এই জন্য ধান-চাউল রপ্তানী করিতে বলিতেছি যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন চাষীদের অভাব অনেক বাড়িয়াছে।"

এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ও ওয়েজ আর্ণার ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী এদিন শেষকালে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; তিনি বলেন "আমি ইঞ্জিনিয়ারীভের জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া থাকি। টাকার বিনিময় মূল্য কমিয়া গিয়াছে ইহাই হইল জিনিষপত্রের দুর্ম্মূল্যতার কারণ। চাউলের দাম যে এত বেশী চড়িয়াছে তাহার কারণ,—বঙ্গদেশ হইতে চাউল রপ্তানী। আর এক কারণ—কেহ কেহ বেশী মাত্রায় লাভ করিয়া থাকে।"

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন,—"যত চাউল উৎপন্ন হয় তাহার দুই আনা রকম সম্বন্ধে ঐরূপ লাভের কথা বেশ বলা চলে। কাপড়েও এই রকম লাভের কারবার চলিতেছে। তবে স্বদেশী কলের কাপড় লইয়াই এইরূপ কারবার বেশী চলে; এদেশে যত কাপড় বিক্রয় হয়, স্বদেশী কলের কাপড় তাহার পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র; বাকী চারিভাগ আসে মাঞ্চেষ্টার হইতে।

সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন,—"আমার মতে, সারা ভারতের জন্য একটা লাভ নিবারণের আইন হওয়া উচিত। ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় চালাইলে বিশেষ ফল হইবে না।"

রায় মহেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন,—"সমগ্র ভারতের জন্য যত কাপড় প্রয়োজন ভারতের কল-কারখানা সমূহ হইতে তত কাপড় এখন উৎপন্ন হয় না।"

আরও কয়েকজন সাক্ষীর এজাহার লইবার পর এদিনের মত বৈঠক বন্ধ হইয়াছিল।

কমিশনের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

কমিশনের ফল কিছুই দাঁড়াইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এখানে সব কথার ভাসা ভাসা আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। উপস্থিত সঙ্কটের প্রতিকার না হইলে দেশ রক্ষা হওয়া কঠিন। কৃঃ সঃ

মৎস্যাভাব

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

আমাদের বঙ্গদেশে নদী মাতৃক, এবং বাঙ্গালায় খাল বিলাদি যত অধিক আছে অন্যত্র আছে কনা সন্দেহ। এজন্য এদেশে পূর্ব্বে মাছের অভাব ছিল না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই মাছ খাইয়া থাকে। তজ্জন্য অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণকে কিছু হীন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ফলতঃ বাঙ্গালায় আর সে দিন নাই, নদী, নালা, খাল, বিলাদি হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে। কত শুষ্কডাঙ্গা হইয়া জমীতে পরিণত হইতেছে, সুতরাং বঙ্গে মাছ আর সুলভ নহে। মৎস্যাভাবে বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্যেরও অভাব হইতেছে। মাছ আমাদের একটী পুষ্টিকর খাদ্য। বিশেষতঃ যাহারা মাংসভোজী নহেন, তাহাদের পক্ষে মাছই প্রধান খাদ্য। এ বিষয়ের বহুল আলোচনা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই যুগ বিপ্লবকারী বৈজ্ঞানিক কালেও ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহের যথোচিত আলোচনা হইতেছে না। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, আলকাতরা বিশ্লেষণ করিয়া কত প্রকার সিরাপ ও এসেন্স প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জটিল তত্ত্বে মনোনিবেশ করা অপেক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র, মাছ, শাক, ডাইল, তৈল প্রভৃতির আলোচনা একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য এই সমস্তের সম্যক তত্ত্ব আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি, অথচ ইহারাই আমাদের নিত্য পরিপোষক।

দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়, দেশের সাধারণের অবস্থা এমনই হীন যে সংসারের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারে না, এবং দারিদ্র্য হেতু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিক মূল্যে ক্রয়ও করিতে পারে না। তাহারা অপূর্ণ আহারে শীর্ণ, বস্ত্রাভাবে কাতর, কাজেই তাহারা রোগ নিবারণ করিয়া উঠিতে পারে না। দরিদ্র কৃষক সঞ্চয় করিতে পারে না। আজকাল মৎস্য এরূপ দুর্ম্মূল্য ও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে যে চারি আনার মৎস্যেও একটী পরিবারের এক বেলার তরকারি হয় না, পূর্ব্বে এক আনার মাছে একটী বৃহৎ পরিবারের এক বেলা চলিত। সুতরাং আমাদের নিত্য খাদ্য এই মৎস্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ করি, মৎস্যের উন্নতিবিধান করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আবশ্যক।

(১) মৎস্যচারি জলাশয় যাহাতে প্রকৃত অবস্থায় থাকে।

(২) মৎস্য ধরিবার বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং অসময়ে যেন মৎস্য ধরা না হয়।

(৩) মৎস্য বংশ বৃদ্ধি করণ।

মৎস্যচারি জলাশয় প্রকৃত অবস্থায় আজ কাল আর থাকিতেছে না। পাট চাষের

বাহুল্য হেতু আষাঢ় মাস নাগাদ আশ্বিন পর্য্যন্ত অধিকাংশ ডোবা পুষ্করিণী খাল বিলাদিতে পাট পচান হইতেছে। আবার চৈত্র বৈশাখ মাসে ঐ সকল জলাশয়ে শণ পচান হয়, বৎসরে দুইবার পাট ও শণ পচানতে জলে কস ধরিয়া বিস্তর মাছ মরিয়া ভাসিতে থাকে। অনেক স্থলে নদীতেও শণ ও পাট পচান হয়, ইহাতে মৎস্যের বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে, এমন কি কোন কোন জলাশয় একেবারেই মৎস্য শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আবার ঐ সকল জলাশয়ের মাছ হাট বাজারে খরিদ করিয়া লইয়া লোকের স্বাস্থ্য হানি, রোগ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, সুতরাং ইহাতে মৎস্যকুল নির্ম্মূল না হইবে কেন। ইহা অব্যাহত রাখিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

অনেক সময় দেখা যায় যে মৎস্য ব্যবসায়ীগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত মৎস্য ধরিয়া হাট বাজারে বিক্রী করে ও তাহাদের ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বেই অনেক মৎস্য ধৃত হয়। কাজেই বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

মৎস্য বংশ বৃদ্ধির দুইটী উপায় আছে (১) স্বাভাবিক, (২) কৃত্রিম। মৎস্য ও এক জাতীয় নহে। কতকগুলি সামুদ্রিক, কতকগুলি নদীস্রোত বিহারী, ও কতকগুলি বদ্ধ জলে থাকে। সুতরাং তাহাদের স্বভাবও ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্যের জীবন যাত্রার কথা কত জটিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে সমগ্র মৎস্য জাতির জীবনের একটা তত্ত্ব সাধারণ। প্রকৃতির এক বিচিত্র নিয়মাধীন মাছের জন্ম ব্যাপারটাই নূতন ধরণের, স্ত্রীমৎস্য কখনও পুংসঙ্গমে গর্ভ ধারণ করে না, অথচ পুংবীজ ব্যতীত ডিম্বে জীবন সঞ্চার হয় না। মৎস্য স্ত্রী প্রকৃতির অলৌকিক বিধানে গর্ভে ডিম্ব ধারণ করে। ডিম্ব প্রসব কাল উপস্থিত হইলে পুং মৎস্য স্ত্রীমৎস্যের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করে। ডিম্ব প্রসূত হইবা মাত্র তাহার উপর স্বীয় বীর্য্য নিষিক্ত করে, তাহাতেই ডিম্বে চৈতন্য আইসে।

এই বিচিত্র বিধান কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য বৃদ্ধি করণের একটা সুযোগ দিয়াছে, এই ব্যাপার সাধন করিতে হইলে আসন্ন প্রাবা একটী মৎস্যের গর্ভ হইতে চাপিয়া ধীরে ধীরে ডিম বাহির করিয়া লইয়া একটী পাত্রে রাখিতে হয়, পরে একটা পুংমৎস্যের বীর্য্য বেশ টিপিয়া টিপিয়া বাহির করত পাত্রের ডিম্বে ঢালিয়া দিতে হইবে, এখন পাত্রটী এক প্রকার যন্ত্রের মধ্যে রাখিতে হয়, ঐ যন্ত্র এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, উহা জলের একটা চৌবাচ্চা বা ট্যাঙ্কের ভিতর বসাইয়া দিলে জল ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরে একপথে প্রবেশ করিয়া অন্যপথে বাহির হইয়া আরও একটা স্রোতের সৃষ্টি করে। স্রোতের তরঙ্গে ডিম্বপাত্র আন্দোলিত হইয়া ডিম্বগুলি "মুথর"। পরে "মুথন" ডিম্ব কোন পুকুরে রাখিয়া দিলে "পোনা" ফুটিয়া বাহির হইতে থাকিবে, এমন পুকুরে রাখিতে হইবে যে ইচ্ছানুসারে অপর চারটী পুকুর হইতে জল আনিয়া এই পুকুরে পূর্ণ করা যায়,এবং ইচ্ছামত জল নিষ্কাষণ করা যায়।

এই পুকুরের আর একটী ব্যবস্থা করা আবশ্যক। জল নিষ্কাষণের প্রণালী পথের

নিকট কতকাংশ পুকুরের সাধারণ তলদেশ হইতে কিছু সমান করা আবশ্যক,ইহার কারণ এই যে এই পুকুর হইতে জল নিকাশ করিলে উচ্চ স্থানের জল কমিয়া আসিবে এবং সেই সঙ্গে মৎস্য নিম্নস্থানেও আসিবে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত নিম্ন স্থান হইতে মৎস্য ধরা সহজ হইবে। এখন পুকুরের আবশ্যকতার বিষয় বলিতেছি। উক্ত চারিটী পুকুরের একটীতে পুংজাতীয় আর একটীতে স্ত্রী জাতীয় মৎস্যের পোনা ছাড়িয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ দুই জাতীয় মৎস্য পৃথক পৃথক ভাবে পালিতে হইবে। এই পোনা চারি বৎসরের হইলে ডিম্ব প্রসবের উপযুক্ত হইবে। অপর দুইটী পুকুর খালি রাখিতে হইবে। মধ্যস্থলের সান বাঁধান পুকুর জল শূন্য অবস্থায় রাখিতে হইবে। এইটীকে ডিম প্রসব ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং কেবল ডিম প্রসব কালেই উহা পূর্ণ রাখিতে হইবে, নতুবা অপর সময় জলশূন্য অবস্থায় থাকিবে। সাধারণতঃ আষাঢ় মাসে রোহিতাদি মৎস্য ডিম পাড়িয়া থাকে, মৎস্যকে আসন্ন প্রসবা বোধ হইলে সান বাধান পুকুরের তলদেশ বেশ পরিষ্কার অথচ নরম তৃণে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে, পরে প্রণালী দ্বারা ঐ পুকুর জল পূর্ণ করিবে। জল ৩।৪ ফুটের বেশী না হইলেও ক্ষতি নাই। এখন মাছের পুকুরে জাল নামাইয়া মৎস্য ধরিয়া এই পুকুরে ফেলিতে হইবে। সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে পুকুরের পরস্পরের ব্যবধান কত নিকট হওয়া আবশ্যক দুইটি স্ত্রীমৎস্যের সহিত একটী পুংমৎস্য থাকিবে। এই নিয়মে ডিমের পুকুরে মাছ দিতে হইবে। একেবারে অনেকগুলি মৎস্য ডিমের পুকুরে না ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে ছাড়িলে ভাল হয়। যেমন ডিম ছাড়িবে তাহার পরই ডিমগুলি পুংবীর্য্য নিসিক্ত হইয়া থাকে। ডিমগুলি আবার অন্য মাছে না খায় তদ্বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক, এজন্য ঐ সময় পুকুরের জল এত কম করিয়া দেওয়া উচিত যে অনায়াসে ডিম প্রসবাদি ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। পরে পুকুরের জল বাহির করিয়া দিয়া স্ত্রীমৎস্য একটা খালি পুকুরে ছাড়িবে, পুংমৎস্য অপর পুকুরে ছাড়িবে। পরে ডিমগুলি তুলিয়া লইয়া আর একটী অনতি বৃহৎ সিমেণ্ট করা ট্যাঙ্কে রাখিয়া ফুটাইবে, এখন ছোট ছোট পোনাগুলি বিক্রয় করিবে বা অন্য পুকুরে ছাড়িবে। পোনাগুলি স্থায়ীভাবে কোন বৃহৎ জলাশয়ে ছাড়িবার পূর্ব্বে একটা ছোট পুকুরে কিছু দিন রাখিয়া দিলে ভাল হয়। এই পুকুরটীতে যাহাতে বড় মৎস্য না থাকে। বড় মৎস্যের গ্রাস হইতে পোনাগুলি বাঁচাইতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। এই প্রণালী জটিল ও ব্যয় সাধ্য হইলেও যাহাদের পুকুর পুষ্করিণী আছে কিম্বা যাহারা এই কার্য্যে সক্ষম তাহাদের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

যদি এ বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশ মৎস্য শূন্য হইবে। সুতরাং লাভ হউক বা লোকশান হউক এরূপ অনুষ্ঠান পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি বঙ্গের প্রবাহিনী কুল যেরূপ পল্লব শ্যাম শোভা বক্ষে প্রতিবিম্বিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বহিয়া যাইত, তাহা হইলে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত না।

দুঃস্থ লোকদিগের একমাত্র পুষ্টীকর খাদ্য দেশ হইতে বিলুপ্ত হইলে তাহাদের কি উপায় হইবে। অন্ন মৎস্য হীন বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি শোচনীয়, তাহা একবার বিশেষ চিন্তার আবশ্যক।

দেশের কথা

ডিউক অব কনট—ডিউক অব কনট ১০ই জানুয়ারি মান্দ্রাজে পৌছিবেন। তিনি ভারতে আসিয়া মান্দ্রাজ, কলিকাতা, দিল্লী এবং বোম্বাই পরিদর্শন করিবেন। বে-সরকারী হিসাবে মধ্যপ্রদেশ এবং আগ্রা যাইবেন। রাউলপিণ্ডী গমনও তাঁহার ইচ্ছা আছে। তিনি মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ এবং বোম্বায়ের প্রাদেশিক নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সামন্ত-রাজ সভা, ষ্টেটকাউন্সিল এবং ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির প্রথম প্রতিষ্ঠা কার্য্য তিনিই করিবেন। এ সম্বন্ধে ভারত সম্রাটের ঘোষণা বাণী তিনিই পাঠ করিবেন। তিনি সাত সপ্তাহকাল ভারতে থাকিবেন। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি মান্দ্রাজে অবতরণ করিবেন। জানুয়ারির শেষ হইতে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় থাকিবেন। দিল্লী সহরে উপরি উক্ত কাউন্সিল এবং এসেম্ব্লির প্রতিষ্ঠা কার্য্য ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্পাদিত হইবে। ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি তিনি বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিবেন। রাওলাপিণ্ডিতে ইহার সম্মানার্থ মিলিটারী প্রদর্শনী হইবে।

বাঙলায় মাছের অভাব—বাঙ্গালাদেশ নদীমাতৃক এবং বাঙ্গালায় খাল বিল বাঁওড় যত অধিক তত আর কোথাও নহে। তাই বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্বে মাছের অভাব ছিল না এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণশূদ্রনির্ব্বিশেষে মাছ খাইয়া থাকে। অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণরা সেই জন্য বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগকে একটু হীন দৃষ্টীতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার সে দিন আর নাই। নদীনালা হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে—বিল বাঁওড় "ডাঙ্গা" হইতেছে। তাই বাঙ্গালায় মাছ আর সুলভ নহে। এই কারণে মাছের অভাবে বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্যেরও অভাব হইতেছে বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এ কাজের ভার সর্ব্বপ্রথমে পাইয়াছিলেন—সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। তাহার পর হইতে সরকারী মৎস্য বিভাগে কেবলই "পরীক্ষা" ও "অনুসন্ধান" চলিতেছে; কিন্তু আজও তাহার ফলে দেশের লোকের কিছুমাত্র সুবিধা হয় নাই। অনুসন্ধানে অবশ্য ব্যয় হয়, সরকার এই কাজের জন্য যখন একটী স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিয়াছেন তখন সে বিভাগে যে মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীও আছেন তাহা বলাই বাহুল্য। যদি অনুসন্ধানের ফলে লোকের উপকার হয়, তবেই বিভাগের ব্যয় সমর্থিত ও সার্থক হইতে পারে—নহিলে নহে। দেশের লোকের কাছে দ্বিবিধ কাজের ফল আদরের হইবে—

[১] মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও
[২] সেই কারণে মূল্য হ্রাস।

গোল্ডেন ক্রাউন—এক কলিকাতা সহরে মাছ সরবরাহের বৃদ্ধিকল্পে অনেক চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। একবার সরকার "গোলডেন্ ক্রাউন" নামক জাহাজ নিনিয়া কলিকাতায় সামুদ্রিক মৎস্য সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সে জাহাজ বেচিয়া ফেলা হয়। কেন যে জাহাজে সামুদ্রিক মাছ আনিবার সুবিধা হয় নাই এবং সে সব অসুবিধা দূর করা যায় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ বিবরণ আমরা পাই নাই। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গাড়ীতে জলাধার রাখিয়া তাহাতে মাছ ফেলিয়া জীবিত মাছ কলিকাতায় আনিবার প্রস্তাব হইয়াছিল—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এমন কি মৎস্য ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা কার্য্যেও সরকারের চেষ্টা ফলদায়ী হয় নাই। সে কাজও অতি মন্থরভাবে অগ্রসর হইতেছে।

পোনামাছ—কয় বৎসর হইতে সরকার সে সব "অনুসন্ধান" করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে ইলিসের বংশবৃদ্ধির ও রোহিত, কাতলা, মৃগেলের বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই প্রধান। সরকারী মৎস্য বিভাগ এখন "পোনা" বিক্রয়ও করিতেছেন। এ কাজটার জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না। কারণ, পোনা বিক্রয়ের কাজ করিবার জন্য ব্যবসায়ী আছে। তবে যদি লোক সহজে ভাল পোনা পায়, তবে সে ব্যবস্থায় মোটের উপর লোকের উপকার হইবে। গত বৎসর সরকারী মৎস্য বিভাগ হইতে মোট ৮৮০,৫০০টি পোনা সরবরাহ করা হইয়াছে—

বাঙ্গালায়	৫,৯৫,০০০
বিহার ও উড়িষ্যায়	২,৩০,৫০০
কুচবিহারে	৫,০০,৫০০

ইহার মধ্যে বাঁকুড়া জিলার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে মোট ১ লক্ষ পোনা বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। ২ লক্ষ পোনার জন্য আবেদন পাইলেও

সরবরাহ করা যায় নাই। ঢাকায় যে পুষ্করিণীতে "পরীক্ষা" চলিতেছে, তাহাতে ৩২ হাজার ও কলিকাতায় ২টি সরকারী পুষ্করিণীতে ৩১ হাজার পোনা ছাড়া হইয়াছিল। কিরূপে পোণার চাষ করিলে ভাল হয়, তাহা দেখাইবার জন্য কলিকাতার কাছে খড়দহে পুষ্করিণী রাখিবার কথা হইয়াছে। পোনাগুলি যে অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা হয় না এমন কথাও একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছিল।

ইলিসমাছ—ইলিসের বিষয়ে বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। কারণ পূর্ব্বগত সেপ্টেম্বর মাসের ঝড়ে সব ব্যবস্থা পাল্‌টাইয়া গিয়াছিল। আমরা এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ঝড়ে মৎস্য সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে বাধা পড়িবার কারণ কি? সরকার যে পোণা সরবরাহ করেন, তাহা যেন ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে কিনিয়া সরবরাহ করেন, কি "ডিম" হইতে পোণা করিয়া বিক্রয় করেন, তাহা প্রকাশ নাই, তেমনই ইলিসের বিষয়ে কি অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাও প্রকাশ নাই। ঢাকায় শীতললক্ষায় ইলিসের পোণা অনেক দেখা যায়, সে কথা সরকারী রিপোর্টে স্বীকৃত হইলেও এমন কোন কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, সে সব পোণা লইয়া আবশ্যক পরীক্ষা কর হইয়াছে।

জীয়ানা মাছ—নানাস্থান হইতে যে সব "জীয়ানা" মাছ সহরে আমদানী হয়, তাহার সম্বন্ধেও বিশেষ অনুসন্ধানের পরিচয় এই রিপোর্টে নাই। প্রথম এক কলিকাতাতেই প্রচুর পরিমাণে "জীয়ান" মাছের আমদানী হয় এবং মফঃস্বলেও হাটে হাটে "হাটবাজারে" নৌকায় সেই মাছের আমদানী হয়।

শুটকী মাছ—এ দেশে শুটকী ও লোনা ইলিস পাওয়া যায়। শুটকীমাছ প্রধানতঃ রপ্তানী হয়—লোনা ইলিস লবণে রক্ষিত ইলিসমাছ। সেই দুই প্রকার মাছের ব্যবসায় কোন কথাই আমরা গত বৎসরের সরকারী মৎস্য বিভাগের বার্ষিক বিবরণে পাইলাম না। কেবল জানা যায়, গত বৎসর কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭ শত ৬৭ মণ শুটকী চিংড়ী রপ্তানী হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই মাছ রপ্তানির জন্য মফঃস্বলের নানো স্থান হইতে কলিকাতায় আমদানীহয়।

খাস কলিকাতায় গত বৎসর মোট ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত ৭৫ মণ মাছ আমদানী হইয়াছে। তাহার হিসাব এইরূপ :—

রেলপথে	মণ
আসাম বেঙ্গল রেলে	১৩৯৯
বারাসাত বসিরহাট রেলে	১৬৯৯৩
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলে	৪৬৯
বেঙ্গল নাগপুর রেলে	২৯২৯০

বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলে	২৪৭৩
পূর্ব্ববঙ্গ রেলে	১৬৬৮২৫
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে	৮০৩
হাওড়া আমতা রেলে	১৯১৮
ষ্টিমারে	২৭৪
দেশীয় নৌকায়	৩০৯৩১
হাঁটারাস্তায়	৫৪৩৬৪

এই হিসাবে দেখা যায়, গত-পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর কলিকাতায় ৬ হাজার ৯ শত ৩৮ মণ অধিক মাছ আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মাছের দর না কমিয়া বরং বাড়িয়া গিয়াছিল; হয় ত কলিকাতার জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় এই আমদানী-বৃদ্ধি যথেষ্ট নহে। কিন্তু কারণ যাহাই কেন হউক না ফলে লোকের কষ্ট হইতেছে।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে বাঙ্গালার মাছের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই এখন আমরা দেখিতে পাই না।

চীতল ভেকুট কই কাতল মৃগাল।
বালি লাটা গড়াই উল্কা শৌল শাল॥"

হইতে—

"গাঙ্গদাঁড়া, ভেদা, চেঙ্গা কুড়িশা খলিশা॥
খরওলা তপসিয়া পাঁসাস ইলিশা।

নানারূপ মৎস্য বাঙ্গালার হাটে সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত। এখন তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে সংপ্রতি দুর্ম্মূল্যতার সন্ধান-সমিতি বসিয়াছিল। সে সমিতি বাঙ্গালার মৎস্যের অভাবের আলোচনা করেন নাই; কিন্তু বাঙ্গালার মৎস্য-সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিসে বাঙ্গালায় মৎস্যবংশ বৃদ্ধি হয় এবং কিসের মাছের দাম কমিতে পারে সে বিষয়ে সরকারী মৎস্য বিভাগকে অবহিত হইতে হইবে; নহিলে চলিবে না। তাহা না হইলে মৎস্য বিভাগে দেশের লোকের অর্থব্যয় মাত্র হইবে।

গোয়ানো সার—মৎস্য বিভাগ যখন বাঙ্গালা ও বিহার উড়িষ্যা লইয়া, তখন সামুদ্রিক মৎস্যের বিষয়েও বিভাগকে অবহিত হইতে হইবে। মৎস্যের তেল মূল্যবান পণ্য। সেই তেল লইয়া অবশিষ্ট মৎস্যে যে সার প্রস্তুত হয়, তাহাও কৃষিকার্য্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে —এই বাঙ্গালাতেও বিদেশ হইতে আমদানী "গোয়োনো" সার বিক্রীত হয় অথচ এ দেশের মাছে অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে। বাঙ্গালারই স্থানে স্থানে হাটে আনিবার সুবিধার অভাবে মাছ নষ্ট হয়। সে সব স্থানে লোক যাহাতে সার করিয়া মাছের অপচয় নিবারণ করিতে পারে, তাহার উপায় মৎস্যবিভাগের ও কৃষিবিভাগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অথচ আমাদের বিশ্বাস, এ সব কাজ হইতেছে না।

মৎস্য পালন শিক্ষা—সরকারী মৎস্য বিভাগ খড়দহে পুষ্করিণীতে মৎস্যপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে ভালই। যাহাতে সমগ্র বাঙ্গালার লোক সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতে পারে, তাহা করিতে হইবে। বাঙ্গালায় আজ ও পুষ্করিণীর সংখ্যা অনেক—এক খুলনা জিলার জিলা বোর্ডের অধীনে ২ শত ৩০টি পুষ্করিণী আছে। সব পুষ্করণীতে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছের চাষ হইলে যে বাঙ্গালায় মাছ সরবরাহের সুবিধা হইবে, এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন যাহাতে মফঃস্বলের লোক সমবায় সমিতি গঠিত করিয়া বিল বাঁওড়ে মাছের চাষ করিয়া আপনারা লাভবান হইতে পারে এবং লোকেরও অভাব দূর করিতে পারে, সেরূপ শিক্ষা লোককে দিতে হইবে। এখন এই বিভাগের দ্বারা সেই কাজ কতদূর সম্পন্ন হয় তাহাই দেখিবার বিষয়।—বসুমতী

চাউলের কথা

চাউলই আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য সামগ্রী। এজন্য ইহার মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের লোকের যেরূপ কষ্ট বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেরূপ আর কোন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে হয় না। আবার ইহাও দেখা যায়, খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে দেশজাত সকল সামগ্রীরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, যে যাহা উৎপন্ন করে তাহাকে তাহার বিনিময়ে বা তাহা বিক্রয় করিয়া খাদ্য শস্য সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং তাহারা পূর্ব্বে যে মূল্যে তাহাদিগের শ্রমজাত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে, সেই সামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রয় না করিলে সেই পরিমাণ অন্ন পাওয়া যায় না বলিয়া কি শ্রমিক কি শিল্পী সকলেই নিজ নিজ শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়। এমন কি যাহারা দিন মজুরী করে, তাহারাও ঐ জন্য মজুরীর হার না বাড়াইয়া পারে না। এই হেতু এদেশে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সকল সামগ্রীরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সে কারণ যে সকল লোকের সেই সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হয় নাই তাহাদিগের দারুণ কষ্ট হইয়াছে। এদেশে বহু লোককেই নির্দ্দিষ্ট আয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এইজন্য যখনই খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয়, তখনই তাহারা যারপর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই নির্দ্দিষ্ট আয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই হেতু এদেশে খাদ্য সামগ্রীর সামান্য মূল্য বৃদ্ধিতে লোককে যেরূপ অর্দ্ধাশনে বা অনশনে দিন যাপন করিতে হয়, সেরূপ বোধ হয় আর কোন দেশে করিতে হয় না। গত কয়েক বৎসর হইতে এদেশে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি

হইয়াছে, তাহা স্বপ্নেও অগোচর ছিল। এদেশে ১০ টাকা ১২ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইবে, ইহা কখন কালে কেহ মনে করেন নাই। সুতরাং কেন এমন হইল তাহার অনুসন্ধান যে প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এজন্য সরকারের উদ্যোগী হওয়া যে কর্ত্তব্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকার সে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন তাহা আমরা অবগত নহি। তাঁহারা যখন তাঁহাদের সে কর্ত্তব্য পালন করিলেন না, তখন দেশের লোককে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহা করিতে হইল। এইজন্য সরকারের সহায়তায় এ কার্য্য সম্পাদিত হইলে যেরূপ সুশৃঙ্খলায় ও নিয়মনিবদ্ধ নির্ব্বাহিত হইত, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ সংগঠিত অনুসন্ধান-সমিতি দ্বারা তাহা হয় নাই। এ কথা বলিয়া আমরা তাঁহাদিগের উপর দোষারোপ করিতেছি না, যেহেতু এ জন্য সরকারই প্রকৃতপক্ষে দোষী। প্রত্যুত অনুসন্ধান সমিতি নানা বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও যে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইয়াছেন এজন্য তাঁহারা দেশ বাসীদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যাহা হউক তাঁহারা চাউলের দুর্ম্মূল্যতার যে কয়টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। পাঠকগণের অবগতির জন্য অদ্য আমরা নিম্নে তাহার পরিচয় দিতেছি।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ—অনুসন্ধান-সমিতির বিবেচনায় চাউলের বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার চারিটি কারণ (১) সরবরাহের অভাব, (২) বিদেশে রপ্তানি (৩) বাঁধি করিয়া মূল্য বৃদ্ধি, আর (৪) কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত খরিদদারের নিকট চাল পৌঁছিতে বহুবার হাত ফেরত হওয়া।

চাউল উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ না হওয়ার কারণ উৎপাদন শক্তির হ্রাস। ১৯১১। ১৯১২ সালে বাঙ্গালাদেশে ২০,৪৩৭,৫০০ একর জমিতে ৮৬৩৫০০০ টন ধান জন্মিয়াছিল, আর ১৯১৮।১৯ সালে ২১,৩৩০,০০০ একর জমিতে ৬,৯০১,০০ টন ধান জন্মায়। কেন এমন হইলে? অনুসন্ধান সমিতি পূর্ব্ববঙ্গের ঝড় ব্যতীত আর কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই তাঁহারা আর একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই যে, খাদ্য শস্য ভিন্ন এখন অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায়ের শস্য উৎপাদন করিবার জন্য জমী নিয়োজিত হইতেছে। তজ্জন্য খাদ্য শস্য আবাদের জমীর পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। কিন্তু তাহা যে হয় নাই, তাহা ত ১৯১১।১২ সাল ও ১৯১৮।১৯ সালে খাদ্যশস্য আবাদের জমীর যে পরিমাণ তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যাইতেছে প্রায় ৯ লক্ষ একর অধিক জমীতে ধানের আবাদ হইয়াছে। বাঁধি করিয়া অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা আজ কাল যে অধিক হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের কয়েক বৎসর নানারূপে অতিরিক্ত লাভ করিয়া আজকাল অনেক মহাজনের চাউল ধরিয়া রাখিবার শক্তি হইয়াছে। ঐ কারণে হাত ফেরতাও হইতেছে। দুই তিন হাত না ফিরিয়া আর প্রকৃত খরিদদারের হাতে চাউল পৌঁছে না ইহা অনেকেই জানেন।

শস্য রপ্তানি—অনুসন্ধান সমিতি সেচের জলের অভাব ও হলবাহক গো মহিষাদির অভাব হেতু উপযুক্ত পরিমাণে ধান জন্মাইতেছে না বলিয়া উহাও মূল্য বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল অভাব সত্ত্বেও এত দিন ত চাউল এত দুর্ম্মূল্য হয় নাই। সুতরাং উহাকে আমরা বর্ত্তমান মূল্য বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। রপ্তানিকে কমিটি যে মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ প্রদর্শন না করায় আমরা বুঝিলাম না, কি পরিমাণ চাউল বিদেশে চালান হওয়াতে মূল্যের তারতম্য ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ নামে কৃষক সম্প্রদায়ের যে প্রতিনিধি কমিটীতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তিনি ত রপ্তানির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। চাউল রপ্তানি না হইলে যে আবাদী জমীর পরিমাণ হ্রাস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং রপ্তানি বন্ধ হইলে যে মূল্য হ্রাস হইবে আমরা তাহা মনে করি না; তবে কমিটি এই রপ্তানি সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়াছেন, যাহা প্রণিধান যোগ্য। দেশে ভবিষ্যতের জন্য শস্য সঞ্চিত না রাখিয়া সমস্ত রপ্তানি করা বিধেয় নহে। ইহা নিবারণের জন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু কমিটী যে উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সম্ভব নহে। তাঁহারা বলেন, যতদিন না দেশে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ফসল সঞ্চিত হয়, ততদিন রপ্তানি বন্ধ রাখিতে হয়। কথাটা অর্থনীতিসম্মত নহে। কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ জমীদারগণ যদি চেষ্টা করেন তাহা হইলে রপ্তানি বন্ধ না করিয়া বিনা পীড়াপীড়িতে দেশে শস্য সঞ্চয় থাকিতে পারে। সমবায় শস্যের গোলা সংস্থাপন অথবা তেওতার জমীদার ৺ পার্ব্বতীশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মগোলা স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই প্রণালীতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অনায়াসে শস্য সঞ্চিত থাকিবে। ইহাতে কৃষকও লাভবান হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশেও শস্য থাকিবে। তদ্ব্যতীত সমবায় সমিতি সকল যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তাহার বন্দোবস্ত আবশ্যক। দেশের শিক্ষিত লোক সকল এ বিষয়ে চেষ্টিত না হইলে ইহা সংসাধিত হওয়া সম্ভব নহে।

অতিরিক্ত লাভ নিবারণ আইন—কমিটি মহাজনদিগের অতিরিক্ত লাভ নিবারণ করিবার জন্য সরকারকে যে আইন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন আমরা তাহা সমর্থন করি। আমরাও বহুবার এজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছি। এরূপ আইন হইলে দুর্ম্মূল্যতার কতকটা প্রতীকার হইবে। কিন্তু যে মুদ্রা-বিভ্রাট এই মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ তাহার প্রতীকার না হইলে দেশের লোক এই দুর্ম্মূল্যতাজনিত কষ্ট হইতে কখনই রক্ষা পাইবে না।—বসুমতী

জার্ম্মাণীর মাল আমদানী

সরকার পক্ষে স্যার রবার্ট হার্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম নয় মাসে বিলাতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পৌণ্ড মূল্যের জার্ম্মাণ শ্রমশিল্পজাত পণ্য আমদানী হইয়াছে। স্যার রবার্ট তাহার একটা তালিকাও দিয়াছেন। তালিকাটি এই :—

কাচের দ্রব্য—৬৯৯৮৩ হন্দর, মূল্য ৩৮৬১৩৯ পাঃ। লৌহ দ্রব্য—৬৩৭৫টন, ২৭৩০০১ পাঃ। কাচের ফ্যান্সি বোতল, জারইঃ—১৫৮৮৪৪ হন্দর, ২৩৫১৩৬ পাঃ। লোহার এনামেল দ্রব্য—১৮৬০ টন, ১৮২৬৮২ পাঃ। ঘড়ি—১১৭৭০০৩টী, ৩৮৩৮৬৫ পাঃ। পশমী দ্রব্য—৫৩৬০৪৭ (পাউণ্ড ওজনের) ৩০৬২০৭ পাঃ। রেশমী ফিতা—মূল্য ১৩৯৪০৩ পাঃ। রেশমী থান—২৫০৪২১৩ গজ, ৫৯৯৩৭৫ পাঃ। সুতির মোজা ইত্যাদি মূল্য ২১৪২১১ পাঃ। আলকাতরাজাত রঙ্গ—৩১৪৮৭ হন্দর, ১৩৯৯০২৭ পাঃ শোধিত চর্ম্ম—২৩৯৪ হন্দর, ৩১১০৮৭ পাঃ। ছাপার কাগজ—৯৭১৯০ হন্দর, ২৭৪৬২৬ পাঃ। মোড়কের কাগজ, ১৬৮৮২৮ হন্দর, ৫১৭৯১৯ পাঃ। মোটরকার ৫৩৮৫ খানা, ১৫৪৫৪০৭ পাঃ। সৌখিন দ্রব্য মূল্য ২৮৪৫৮১ পাঃ। শোধিত পশুলোম ও চর্ম্ম—১১৮৩৭৫৮টি, ২৯৪৬৯৯ পাঃ। সঙ্গীতের যন্ত্রাদি—৮৭৪৯১৪টী, ৩১৬৮০৫ পাঃ। খেলানা মূল্য ৯৩৪৮৩০ পাঃ। অন্যান্য দ্রব্য ৮৫৯১৭৯৫ পাঃ। একুনে ১৭১৯০৭৯৩ পাঃ।

বিলাতের ব্যবসায়ীরা জার্ম্মাণ পণ্যের এই আমদানীতে বিষম উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সরকারকে ঐ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। বিলাতের গবরমেণ্ট আপাততঃ একটা জর্ম্মণ পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এটা জর্ম্মণ নকল নীল ও অন্যান্য রঙ। তাঁহারা বলিয়াছেন, যদি ব্রিটিশ রঙ ব্যবসায়ী ও রঙ-ব্যবহার কারীরা এই বিষয়ে একটা আপোষ বন্দোবস্তে রাজী হন এবং আইন যে ভাবে হইবে, উহাতে একমত হন, তবে আইন হইবে, নতুবা নহে।

কৃষিবিভাগ শাখা মখোনুসন্ধান বিভাগ কর্ত্তৃক

মিঠা জলের কচ্ছপের বিষয় অনুসন্ধান

এই বৎসর শ্রীযুক্ত ডিপুটী ডিরেক্টর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বি, দাস ফিসারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কচ্ছপসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহার ফলাফল ৭ নং বুলেটিনে 'ঝিনুকের বিবরণীর সহিত প্রকাশ করা গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বাখরগঞ্জ খুলনা এবং ফরিদপুর জেলায় এই সকল কচ্ছপের কারবার হইয়া থাকে। বিহারে রাজমহলে কচ্ছপের কারবার হইয়া থাকে। আমাদের বিবরণীতে যেখানে যেখানে কচ্ছপ ধরা হয়, যত রকম কচ্ছপ ধরা হয় এবং কিরূপে ধরা হয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু কত পরিমাণে কচ্ছপ বৎসরে ধরা হয়, কত লোক এবং নৌকা ইহাতে নিযুক্ত থাকে এবং কত টাকায় এই কারবার চলে এই বিষয় সঠিক খবর পাওয়া এক রকম অসম্ভব হইয়াছিল।

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে বৎসরে ৭০,০০০ হাজারের কম কচ্ছপ ধরা হয় না এবং ইহার পাইকারি দাম ৪২,০০০৲ টাকা হইবে এবং খুচরা দাম উহার দ্বিগুণ হইবে।

যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে কচ্ছপ সকলকে রেলে লইয়া যাওয়া হইত তাহাতে যাবতীয় রেল সম্প্রদায় কচ্ছপ আর রেলে লইয়া যাইবে না বলিয়া ১৯১৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই কারণে কচ্ছপের কারবার অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ কলিকাতার আমদানি বিষয়ে অনেক হ্রাস হইয়াছে কলিকাতার চীনেরা কয়েক রকমের কচ্ছপ খাইয়া থাকে এবং হিন্দুত্বের মধ্যে ইহা সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত কিন্তু মুসলমানদের যদিও কচ্ছপ খাইতে কোন বিশেষ বারণ নাই তথাপি শাফী মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ই ইহা খায় না।

কচ্ছপ এবং কাঠুয়া বাঙ্গালাদেশে মাছের মত করিয়া যাইতেছে না। এই ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে কেবলমাত্র কোন উপায়ে ইহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার উপায় করিতে হইবে, এবং সেই উপায়ে যেন ইহাদিগের অত্যন্ত বেশী পরিমাণে তিষ্ঠুরতা না করা হয়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড | পৌষ, ১৩২৭ সাল | ৯ম সংখ্যা

শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রক *

সাধারণতঃ এ সকলকে আমরা ব্যাংএর ছাতা কহিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাদ্য সে গুলিকে শিলীন্ধ্র কহে, যে গুলি অখাদ্য সে গুলিকে শিলীন্ধ্রক কহে। বাঙ্গালী বা অন্যান্য ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির মধ্যে শিলীন্ধ্রের আহার সাধারণতঃ প্রচলিত নাই, অনার্য্য জাতিদের মধ্যেই এই খাদ্য সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর মধ্যে শিলীন্ধ্র সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্রই জ্ঞান আছে। ইংরাজদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে জ্ঞান কিছু কম। ইংরাজেরা ব্যাংএর ছাতা ইতর জাতির খাদ্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন না বরং নিতান্ত বড়মানুষী খাদ্য বলিয়া অনেকে "মশরুম্" (mushroom) খাইতে ইচ্ছা করিয়াই কিছু তফাতে থাকেন। ইংরাজী কোন কোন গ্রন্থে শিলীন্ধ্র নিতান্ত অপাচ্য খাদ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, আবার কোন কোন গ্রন্থে ইহা মাংস বা ডিম্বের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর খাদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইটালীতে শিলীন্ধ্র একটী সাধারণ খাদ্য। অনেকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। গাড়ি গাড়ি শুষ্ক শিলীন্ধ্র ইটালীর রাজপথ দিয়া চালান যাইতেছে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। কিরূপে শিলীন্ধ্রের চাষ করিতে হয়, ইহা আমি হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার (Hand book of Indian Agriculture) গ্রন্থের ৮০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছি; চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রকগুলি বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিলীন্ধ্রের চাষ এদেশের বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। কিন্তু যেগুলি সুস্বাদু, সহজ পাচ্য ও দুষ্প্রাপ্য সে গুলির চাষ হওয়া কর্ত্তব্য, সে গুলির ব্যবহারও সাধারণতঃ হওয়া কর্ত্তব্য। ১৫ই জুন হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত সাঁওতাল, ভীল,

* প্রবন্ধটি—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে "কৃষকের" জন্য লিখিত হইয়াছিল।

কোল, প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির স্ত্রীলোকগণ টুকরি হস্তে বহির্গত হইয়া দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই জঙ্গল; পাহাড়, কন্দর, প্রান্তর প্রভৃতি অকর্ষিত স্থান হইতে টুকরি ভরিয়া ভরিয়া শিলীন্ধ্র আনিয়া উহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া ভাতের তরকারি স্বরূপ আহার করে। যে সকল ভূভাগে জন সংখ্যা কম, এবং অকর্ষিত স্থান প্রচুর ঐ সকল ভূভাগে শিলীন্ধ্র সহজ প্রাপ্য বলিয়া উহার চাষ আবশ্যক করে না। কিন্তু সহরের নিকট এবং জনাকীর্ণ স্থানে শিলীন্ধ্রের চাষ আবশ্যক। কতকগুলি শিলীন্ধ্র সহজ-পাচ্য এবং নিতান্ত পুষ্টিকর। এ গুলির চাষ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ দেশে যখন নানা জাতীয় সহজ-পাচ্য ও সুস্বাদু শিলিন্ধ্র পাওয়া যায়, তখন অন্য দেশ হইতে শিলীন্ধের বীজ (Spawn) আনিয়া চাষের বন্দোবস্ত করা কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এদেশীয় শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রগুলি সাধারণের জানা আবশ্যক। জানা থাকিলে ব্যবহার করিতে শিখিলে ক্রমশঃ চাষ করিবার প্রয়োজন জন্মিবে। জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়াই যে শিলীন্ধ্র খাইতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। বস্তুতঃ বর্ব্বর জাতির লোকেরাও অবস্থাপন্ন হইলে তৈল হরিদ্রা, পেয়াজ ইত্যাদি সামগ্রীর সহযোগে ইহাকে পাক করিয়া খায়। রীতিমত খাইতে হইলে ডাল্‌না প্রভৃতি ব্যঞ্জনের ন্যায় সুপক্ক করিয়া খাইলেই শিলীন্ধ্র খাইতে ভাল লাগে।

ক। ছত্র শিলীন্ধ্র।

১ বালি ছাতাঃ—বর্ষার প্রারম্ভে যে বালি-ছাতা গুলি বাহির হয় ঐ গুলি খাদ্য এবং সহজ পাচ্য। সাঁওতালেরা ইহাকে ডা-মাণ্ডাই-ওৎ বা ভাত-ফ্যান্-ছাতা কহে ভাত ও ভাতের ফ্যান্ বা মাড় সাঁওতালেরা উভয়ই খাইয়া থাকে, এ দুইটী সামগ্রী উহারা উপাদেয় ও সহজ-পাচ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ভাত ও ভাতের মাড় যেমন উপাদেয় ও সহজ-পাচ্য বালি-ছাতাও তদ্রূপ। ছোট ছোট শুভ্রবর্ণ ছত্রের ন্যায় শিলীন্ধ্র গুলিই বালি-ছাতা।

২। গুবরে ছাতাঃ—বর্ষার প্রারম্ভে, গোবর গাদায় এবং নালায় ধারে যে কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণের ছোট ছোট ছত্রাকারের শিলীন্ধ্রক জন্মে, সে গুলি অখাদ্য এবং বিষাক্ত; আমরা ইহাকে "গুবরে ছাতা" বলি, এবং সাঁওতালেরা ইহাকে "গুরিৎ-ওৎ" বলে।

৩। মুচি-ছাতাঃ—কাল বা ময়লা রঙের ছোট ছোট ছাতাগুলি সমস্তই যে বিষাক্ত বা অখাদ্য এরূপ নহে। মুচি-ওৎ বা মুচি-ছাতা নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রাকারের শিলীন্ধ্র নিতান্ত সিক্ত স্থানে জন্মিয়া থাকে। এগুলি সাঁওতালেরা বালি-ছাতার ন্যায় খাইয়া থাকে। এ গুলি গোবর গাদায় অথবা ময়লা নর্দ্দমার ধারে জন্মে না। কিন্তু এগুলি খাইতে বড় ভাল নহে বলিয়াই ইহাদিগকে "মুচি" বা নিকৃষ্ট জাতীয় শিলীন্ধ্র বলা হইয়াছে। বালি ছাতার উপরের ছত্রাকার স্থানটী যেরূপ স্থূল শুভ্র ও মসৃণ, মুচিছাতার ঐ স্থানটী তাদৃশ স্থূল, শুভ্র বা মসৃণ নহে, এইমাত্র ইহাদের

মধ্যেপ্রভেদ। গুবরে ছাতা যত কৃষ্ণবর্ণের ও বৃহৎ দণ্ড বিশিষ্ট হইয়া থাকে বালি ছাতা মুচি ছাতা সেরূপ হয় না। এই তিন জাতীয় ছাতা সহজেই প্রভেদ করিতে পারা যায়।

৪। গোরা ছাতা বা হরুৎ-ওৎ ঃ—পুরাতন অর্থাৎ বৃহৎ বৃক্ষ কাটিয়া লইবার পরে যে গোড়াটি মাটীর মধ্যে বা কিঞ্চিৎ উপরে থাকিয়া যায়, ঐ গোড়া হইতে একরূপ অতি সুন্দর, শুভ্র বর্ণ সুমিষ্ট শিলীন্ধ্র উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে। বালি-ছাতা, গুবরে ছাতা বা মুচিছাতা যেমন এক একটী করিয়া ভূমি হইতে নির্গত হয় এ ছাতা সেরূপ নির্গত হয় না, একটী গোড়া হইতে ছোট বড় ৮।১০ টী বা ততোধিক ছাতা বাহির হইয়া শুভ্র সুন্দর গুচ্ছাকারে এই শিলীন্ধ্র বাহির হইয়া থাকে। অনেকগুলি ছত্র বিশিষ্ট বলিয়া ইহ "যুক্ত শিলীন্ধ্র" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ছত্র ও ছত্রদণ্ড গুলি বালি ছাতার অপেক্ষা স্থূল ও শুভ্র এবং মক্‌মলের ন্যায় চাকচিক্যশালী। ইহার ছত্রাংশটী কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থাৎ অল্প পরিধিবিশিষ্ট। উপরিভাগটী ছত্রের ন্যায় বর্ত্তুলাকার নহে, দোয়ানি গুলির অথবা জাপানী ছত্রের ন্যায় সমতল। এই শিলীন্ধ্র দেখিতেও ভাল খাইতেও ভাল, কিন্তু ইহা কিছু দুষ্পাচ্য। ইহা সাহেবদিগের বড়মানুষী "মশরুমের" মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়। পাক করিলেও ইহা কিছু দৃঢ় থাকিয়া যায়। ইহার দণ্ডটী খাইতে কিছু "দড়িদড়ি" অর্থাৎ ছিব্‌ড়ে ভরা। যেমন আঁশ ভরা আম্র দুষ্পাচ্য তেমনি গোড়া-ছাতাও দুষ্পাচ্য; ইহার দুষ্পাচ্যতা কিন্তু বিষজনিত নহে। তবে এ গুলি চিবাইয়া খাইয়া, ইহাদের রসাস্বাদন মাত্র করিয়া ফেলিয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না।

৫। শালিক্-ছাতা বা কিস্‌নী-ওৎ ঃ—এটী একটী শিলীন্ধ্রক অর্থাৎ বিষময় ছত্র। ইহা দেখিতে বালি-ছাতার ন্যায়, কিন্তু বালি-ছাতা অপেক্ষা ইহা অনেক বড়। ইহার ছত্রাংশের ব্যাস দুই তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার দণ্ডাংশটী ছত্রের পরিমাণে কিছু খর্ব্ব। নিতান্ত উর্ব্বর স্থানে জন্মিলে ইহার দণ্ডের নিম্ন ভাগটী অর্থাৎ গোড়াটী কিছু স্ফীত হইয়া থাকে। কিন্তু স্ফীতির অভাবই প্রায় দৃষ্ট হয়। বালি-ছাতা ও বড় জাতীয় ছত্রাকারের শিলীন্ধ্র হইতে (অর্থাৎ কোঁড়ক্ হইতে) এই শিলীন্ধ্রকটী প্রভেদ করিবার প্রধান উপায় ইহার দণ্ড ও ছত্রাংশের সন্ধিস্থলটী রগড়াইয়া ক্ষত করিয়া দেখা, সাদা রঙ বদল হইয়া লাল রঙ হইল কি না। শালিকের চঞ্চু ও পদ যেরূপ লালবর্ণের হইয়া থাকে, এই ছাতা রগড়াইলে সেই রূপ লাল রঙ পরিবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ এই লোহিত বর্ণের রস হইতে লাল লিট্‌মস্ পেপর (Red litums paper) প্রস্তুত হইতে পারে।

৬। ফোলা-জাতা বা গোফ ওৎ ঃ—দূরে হইতে দেখিতে ইহা ঠিক শালিক ছাতার ন্যায়। গোড়া শুদ্ধ উঠাইয়া দেখা যায় ইহার গোড়াটী অর্থাৎ দণ্ডের সর্ব্ব নিম্ন ভাগটি স্ফীত। এই স্ফীতি সময়ে সময়ে শালিক ছাতাতেও দেখা যায়। কিন্তু ফোলা-ছাতার ছত্রাংশের শীর্ষভাগের স্ফীতিটী শালিক-ছাতায় দেখা যায় না। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে

শালিক্ ছাতা ও "বেঁটে ফোলা ছাতায়" (সাঁওতালেরা যাহাকে গুণ্‌ড়ি-গোঁফা ওং কহে) দূর হইতে প্রভেদ করা অসাধ্য। তবে রগড়াইলেই প্রভেদ করিতে পারা যায় গোফ বা ফোলা-ছাতা শালিক্ ছাতা অপেক্ষা প্রায়ই বড় হইয়া থাকে। যে গুলি বিশেষ বড় ও দীর্ঘতর দণ্ড বিশিষ্ট সে গুলির বিশেষ নাম ছাতাম-গোঁফা বা ছত্রশিলীন্ধ্র। ছাতাম গোফা ও গুণড়ি-গোফা উভয় প্রকার ছাতাই খাইতে সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য।

৭। উই-ঢিপি ছাতা বা বুমুম্ ওং :—ইহা গোফা ছাতা অপেক্ষা কিছু ছোট শুভ্র বর্ণের সুখাদ্য ছাতা। আষাঢ় মাসের উই-ঢিপির উপরে এই ছাতা দেখিতে পাওয়া যায়।—

আমেরিকায় ফলের চাষ

সম্পাদক লিখিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এক মহা ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত লোকের আহারের জন্য এক রকম সুখাদ্য পিষ্টক তৈয়ার করার ফরমাইস করা হয়। সূপকার কয়েক মণ কিসমিস আনিতে বলিল, কিন্তু সমস্ত আমেরিকায় সে পরিমাণ কিসমিস জুটিল না। তখন ইউরোপ হইতে দ্রাক্ষাফল আমদানি করিতে হইত। ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার একটীও কমলা, আপেল বা পিচ ফলের গাছ ছিল না। এই ৩০ বৎসরে মানুষের অধ্যবসায়ে আমেরিকায় কতই যে নূতন ফলের চাষ হইতেছে, তাহারই আভাস এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

১৮০৩ সনের পূর্ব্বে আমেরিকায় কেহ কমলা লেবুর গাছ দেখে নাই। ইউরোপ হইতে অতি অল্প সংখ্যক কমলা লেবু আমদানি করা হইত, ধনী ভিন্ন আর কেহ তাহা ভোগ করিতে পারিত না।

১৮২৯ সনে ব্যবসায়ীগণ ক্যালিফর্ণিয়া হইতেই ১২ হাজার রেলগাড়ী পূর্ণ কমলা আমেরিকার নানাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে এক কালিফর্ণিয়াতেই এত কমলা জন্মিবে, যে সমস্ত পৃথিবীতে অতি সস্তা দরে সে কমলা প্রেরণ করিয়া ব্যবসায়ীগণ লাভ করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমেরিকার কমলা লেবু যদি বিনা ট্যাক্সে ভারতে আসিতে পারে, তবে কলিকাতার বাজারে শ্রীহট্টের কমলা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে। ১৯০০ সনে কালিফর্ণিয়া হইতে ১৮ হাজার রেলগাড়ী কমলা ভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হইয়াছিল। শীঘ্রই আরও ২ লক্ষ গাছ

ফলবান হইবে—তখন সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার কমলা লেবুতে পূর্ণ হইবে।

কালিফর্ণিয়া আমেরিকার মধ্যে ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। ফ্লোরিডা নামক প্রদেশে ৩ লক্ষ কমলা লেবুর গাছে ফল ধরিতেছে। আমেরিকায় এখন কৃষকগণ কমলার চাষ করিয়া ১ কোটি ২০লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ব্যবসায়ীরা ইহার ৩ গুণ পাইতেছে। কমলা লেবুর চাষে কৃষকেরা ১২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে উৎকৃষ্ট কমলা লেবু জন্মে। কিন্তু ইহার চাষে দুই চারিলক্ষ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। সুতরাং ভারতবাসী কৃষকেরা কমলা ফল বিক্রয় করিয়া ২।১ লক্ষ টাকা পায় কিনা, তাহাও সন্দেহ। বিধাতা ভারতবর্ষকে সকল ফলের উপযোগী ভূমিই দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী এমন অপদার্থ যে, সে ভূমি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উদরান্নের জন্য পরের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় পিচ ফলের গাছ দেখা যাইত না। এখন এক ইণ্ডিয়ানা প্রদেশেই ৩ লক্ষ পিচের গাছ জন্মিয়াছে। জর্জ্জিয়া প্রদেশে একজন কৃষক ১ লক্ষ ২০ হাজার পিচ গাছ জন্মাইয়াছে। মিসিগান প্রদেশের একজন কৃষক প্রতি বৎসর পিচ বিক্রয় করিয়া ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা লাভ করিতেছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকাতে তরমুজ খাইয়া আমেরিকার লোক বড় মুগ্ধ হইয়াছিল। পর বৎসর ১৩৩ রেলগাড়ী তরমুজ জন্মে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত তরমুজ বিক্রীত হয়। ১৮৯৯ সনে ১৫ শত গাড়ী তরমুজ জন্মে। ১৯০০ সনে ৭০ হাজার বিঘা জমিতে তরমুজের চাষ হইয়াছে।

১৮৩৬ সনের পূর্ব্বে কেহই এখানেবিক্রয়ের জন্য আঙ্গুরের চাষ করিত না। ১৮৬৩ সনে কেবল মাত্র ৬ হাজার বাক্স আঙ্গুর জন্মিয়াছিল। এখন ৩৫০০ রেলগাড়ী বোঝাই হইতে পারে, এমন আঙ্গুর এক কালিফর্ণিয়া হইতেই চালান হইয়া থাকে।

১৮৯০ সনে ৪,১৮,১৭,০০৩ পৌণ্ড কিসমিস বিদেশ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছিল, ১৯০০ সনে কেবল মাত্র ১ কোটি পৌণ্ড কিসমিস আমেরিকায় আমদানী করা হইয়াছে। ১০ বৎসরের মধ্যে ৩ কোটি পৌণ্ড আমদানী কম হইয়াছে। এখন কালিফর্ণিয়াতে প্রতি বৎসর ১০ কোটি ৩০ লক্ষ পৌণ্ড কিসমিস জন্মে। এই কিসমিসের চাষ করিয়া কৃষকেরা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে।

আমেরিকায় অপর্য্যাপ্ত আপেল ফল জন্মিতেছে। ১৮৯৪ সনে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের আপেল ফল বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০০ সনে ৮০ কোটি টাকার ফল বিক্রীত হইয়াছে। ইউরোপের ক্ষুদ্র বড় সমস্ত নগরে আমেরিকার সর্ব্বত্র আপেল ফল চালান হইতেছে।

আপেল ফল বিক্রয়ে বহু অর্থলাভ হয়, ব্যবসায়ীগণ এই ফল বহুদিন অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিবার উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছে। ঠাণ্ডাতে রাখিলে আপেল ফল বহুদিন ভাল থাকে। ৩২ হইতে ৩৫ ডিগ্রি তাপের মধ্যে রাখিলে ৮ মাস কাল টাটকা থাকে। প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতেই ঠাণ্ডা ঘর আছে, সেখানে সস্তার সময় আপেল সঞ্চয় করিয়া রাখে, মহার্ঘের সময় বাহির করিয়া বিক্রয় করে।

যে সকল ফল পাকিলে দুই চারি দিবসের মধ্যে পচিয়া যায়, আমেরিকার শিক্ষিত কৃষকগণ তাহা রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছে যে, কি পরিমাণ শৈত্যে কোন ফল কতদিন অবিকৃত থাকিতে পারে। তাহারা আপনাদের বাড়িতে, রেলগাড়ী ও জাহাজে সেইরূপ ঠাণ্ডাঘর তৈয়ার করিয়া দূর দূরান্তরে ফল পাঠাইতেছে।

ভারতবর্ষের জমি এমন উর্ব্বরা যে, প্রায় সকল রকম ফলই প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে; কিন্তু ফলের চাষ করিবার উদ্যোগ বা শিক্ষা অল্প লোকেরই আছে। ফলের চাষ পর্য্যাপ্তরূপে হইলে দুর্ভিক্ষ ভয়ও অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে আম ও কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তখন গরীব লোকেরা এই ফল খাইয়া অনেক সময় কাটায়। আমেরিকায় এক একজন কৃষক ৩০।৪০ হাজার বিঘা জমিতে ফল বৃক্ষ রোপণ করিতেছে এবং ধনৈশ্বর্য্যে তাহাদের গৃহ পূর্ণ হইতেছে। যে সকল ভদ্রলোকের পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা একটু উদ্যোগী হইলে অনায়াসেই ফলের চাষ করিতে পারেন, ইহাতে বিলক্ষণ অর্থলাভের সম্ভাবনা। মুর্শিদাবাদ জেলার কোন ভদ্রলোক অল্পাধিক পরিমাণ আম গাছ জন্মাইয়া দু দশ টাকা লাভ করিতেছেন, আমের পক্ষে মুর্শিদাবাদের জমি বেশ অনুকুল; কিন্তু আমেরিকার কৃষকের ন্যায় কেহই এই ব্যবসায় করিয়া ধনী হইতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমের ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতে পারে। উৎকৃষ্ট আমের চাষ করিলে বহু ধন উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে রকম উদ্যোগ কোথায়? বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত বোম্বায়ের আলফন্সো আমেরই চাষ হইল না। আলফন্সো আমের রাজা। এই আম বঙ্গদেশে কয়টাইবা আমদানী হয়। বিদেশে প্রেরণের কথা দূরে থাকুক, ৪৬ ঘণ্টার পথ, অথচ বোম্বাই হইতে এই আম বঙ্গদেশে অতি অল্পই আসিয়া থাকে। উদ্যোগবিহীনতাই আমাদের সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। চাকুরির লাঞ্ছনা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ, দারিদ্রপীরিত ভারতবাসী কতকাল নিশ্চেষ্ট থাকিবেন বলিতে পারি না।

পত্রাদি

শাক শব্জীর কীট নিবারণের উপায়

শ্রীঘনশ্যাম সরকার, হাথুয়া, সারন।

প্রশ্ন—আমি মিঠা ডোঙ্গার গাছ লাগাইয়াছি, কিন্তু গাছগুলি ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা হইবার পর দেখিতে পাই যে গোড়া হইতে ২।১ ইঞ্চি উপরে সাদারর্ণ হইয়া মাঝখান হইতে গাছটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছে এবং শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে। এইরূপে অনেকগুলি গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইহা কিসের দ্বারা নষ্ট হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি?

বেগুনগাছ জন্মাইবার পর কি সার ব্যবহার করা উচিৎ যাহাতে বেগুনগাছে পোকা লাগিতে না পারে?

আনারস গাছের পক্ষে কি সার উপযুক্ত এবং কোন সময়ে সার দেওয়া বিধি?

ডাঁহার ভিতর তুড়ঙ্গকারী একপ্রকার পোকা থাকে তাহাকে ইঃ ভাষায় Stem borer বলে। ইহা দিগকে ডাঁটা চিরিয়া বাহির করিতে ও মারিয়া ফেলিতে হয়। অথবা গাছ উপড়াইয়া পোকা সমস্ত পুরাইতে হয়। "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে ইহার বিশেষ বিবরণ পাইবেন।

বেগুন গাছে রেড়ীর খোল পচাইয়া সার রূপে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায় পরিণত সার জলে গুলিয়া গাছে ছিটাইলে পোকার উপদ্রব কমে এবং সারের কার্য্যও সম্পন্ন হয়।

আনারস গাছের পক্ষে পাকমাটি ও ছাই সার একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। চৈত্র বৈশাখে যখন গাছের গোড়া মেরামত করিতে হয় তখনই সার প্রয়োগ করা বিধেয়।

(ফসলের পোকা পুস্তক দেখুন) কৃষক আফিসে পাওয়া যায়।

লজ্জাবতী লতাদি, খেজুর, নারিকেল, আতা, পেয়ারা ও আলু।

১। এমন কি গুণ আছে যে—স্পর্শ মাত্র লজ্জাবতী লতা এবং সন্ধ্যাসমাগমে মান্দার গাছের পাতা সঙ্কুচিত হয়?

২। শীতকালে সাধারণতঃ সকল গাছই রসহীন হয়, কিন্তু খেজুর গাছের এবম্বিধ রসাধিক্যের কারণ কি যে, প্রতি রাত্রিতেই ৭।৮ সের পরিমাণ রস নির্গত হয়?

৩। নারিকেল গাছের সার কি? আমাদের এখানকার নারিকেল গাছ উপযুক্ত সময়ে ফল প্রদান করে না কেন এবং অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয় কেন?

৪। আতা ও পেয়ারার কলম করিতে পারা যায় কি না? পারিলে কিরূপ কলম করা উচিত?

৫। কিরূপ মাটীতে এবং কোন সময়ে গোল আলুর চাষ হওয়া উচিত?

১। লজ্জাবতী লতার পত্র বৃন্ত এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে উহার কোষগুলি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে। কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা বৃন্তে উত্তাপ লাগিলে বৃন্তে উপরিভাগের কোষসমূহ হইতে জল নির্গত হইয়া পত্রের কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে বৃন্তের আয়তন সঙ্কুচিত হয় এবং এই সঙ্কোচনের জন্যই সমস্ত পাঁতাটি পড়িয়া যায় ও ছোট পাতাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। আবার উত্তাপ হ্রাস হইলে, কিম্বা উদ্ভিদের স্বীয় ধর্ম্মে উক্ত জল নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলে পাতা প্রসারিত হইয়া পূর্ব্বে ন্যায় আকার ধারণ করে।

পালিতা মাদার প্রভৃতি অনেকগুলি শিম্বীজাতীয় বৃক্ষের (Leguminoseae) পত্র সন্ধ্যা সমাগমে মুদ্রিত হইয়া থাকে। তেঁতুল, শিম, মুগ প্রভৃতি এই সমস্ত বৃক্ষের পত্রবৃন্তের সহিত আলোকের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে আলোকের আধিক্য হইলে পত্রবৃন্তের বক্রশীল অংশ পত্রসমূহকে বিস্তার করিয়া দেয়, আবার আলোন্যূনতা হইলে, উক্ত অংশ এরূপভাবে বাকিয়া যায় যে পত্র সকল মুদ্রিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় আলোক কমিয়া যাওয়ার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

আপনার ১নং প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর এইরূপ। এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে বৃক্ষের অবয়ব প্রভৃতির নির্ম্মাণ প্রণালী এবং তাহাদের সহিত বাহ্য বস্তুসমূহের সম্বন্ধ, এ সকল বিষয় বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত দুইটি পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

Sach's Text book of Botany Eegilish Edition translated by S H Venis F . R . S .

2 Darwin's Movements of plants.

২। বসন্তকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৃক্ষের নূতন পত্রোদ্গম হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক বৃক্ষে রস সঞ্চিত হয়। সে সমস্ত বৃক্ষ শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যেমন সাধারণ শস্য প্রভৃতি তাহাদের কাণ্ডে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে তাল খেজুর প্রভৃতি ধীরবর্দ্ধনশীল বৃক্ষ সমূহের কাণ্ডে অধিক পরিমাণ রস সঞ্চিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে খেজুর বৃক্ষের যখন রস লওয়া হয় তখন বৃক্ষের নিম্নস্থিত পত্রসমূহ ছাঁটিয়া ফেলা হয়। পত্র দ্বারা যে পরিমাণ রস শোষিত হইয়া থাকে, পত্রের সংখ্যা কমাইয়া ফেলায় তাহার মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথচ বৃক্ষের সঞ্চিত রস এবং মূল দ্বারা আকর্ষিত রসের পরিমাণ প্রায় একই প্রকার থাকে। এই সমস্ত কারণে খেজুর তাল প্রভৃতি বৃক্ষে অধিক পরিমাণে এবং অপরাপর বহুবিধ উদ্ভিদে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে রসবহির্গত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের কাণ্ডের উর্দ্ধতম প্রদেশে রস বহন করিবার শক্তির পরিমাণ এবং রস সঞ্চারণের নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিতদিগের মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অনেক উদ্ভিদের শীতকালে পুষ্পদণ্ড কর্ত্তন করিলে রস বহির্গত হয়। এই রস বহির্গমন প্রণালী এবং বহির্গত রসের রাসায়নিক প্রভৃতি অনেক পরিমাণে বৃক্ষের স্বভাবগত ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে।

৪। পেয়ারার কলম হয়। আতার কলম হয় না।

পাট, শণের মত আতার ছাল ছাড়াইলে ডাঁটা হইতে ছাল এককালে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণে কর্ত্তিত স্থান হইতে শিকড় উদ্গিত হয় না এবং ক্ষতস্থানে রস থাকে না। স্থানটি ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। পেয়ারায় গুল কলম হয়। আতার কলম করিবার আবশ্যক নাই বীজ হইতে গাছ করাই সুবিধা। এক সঙ্গে সহজে অনেক গাছ জন্মান যায় সুতরাং খরচও কম হয় এবং দুবৎসরে ঐ গাছ ফলবান হয়। ডাল অতিশয় পলকা এবং কলমের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন।

আলুচাষ সম্বন্ধে কৃষককে অনেক আলোচনা হইয়াছে। সব্জীচাষ পুস্তকেও ইহার চাষের বিবরণ পাইবেন।

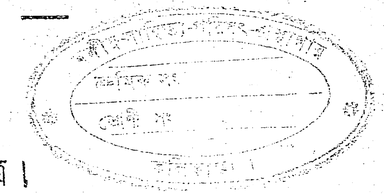

একখানি পত্র।

লেখক—শ্রীঅধর চন্দ্র লস্কর এ, এস্‌সি, ই, ই। করভালিস ওরিগন, হউ, এস, এ।

১লা নভেম্বর ১৯২০

কল্যাণীতে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন পত্রখানির মর্ম্ম "কল্যাণীতে" এবং পৃথকভাবে বাঙলা ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় মুদ্রিত করিয়া দেশীয় গণ্যমান্য রাজন্যবর্গের নিকট ও উকিল লাইব্রেরীতে প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্যার্থ আন্তরিক চেষ্টা করিলে বাধিত হইব।

"যে দেশের শতকরা ৮৫জন কৃষক" সে দেশের দরিদ্র কৃষকের জন্য ভারতে "কৃষিযন্ত্র" প্রস্তুত করিতে না পারিলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর কোনও সহজ উপায় নাই, এবং কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতের কারখানাই "ভারতের মৃতসঞ্জিবনী মহামনি"র আকর বলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিসন্দিগ্ধ চিত্তে বিশ্বাস করিয়া, সাধারণ কৃষকের একান্ত উপযোগী কতকগুলি যন্ত্র, কয়েক বৎসর হইতে প্রস্তুত এবং ক্রয় করিয়া বাক্সবন্দী করিয়াছি। কিন্তু জাহাজ ভাড়া ব্যতীত উহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেছি না! আমাদের পূজা হোম যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম কার্য্যের উপকরণ সমূহের যে অঙ্গহানি ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। উহা দ্বারায় এখন আর পূর্ব্বের

ন্যায় প্রত্যক্ষ উপযুক্ত ফল পাওয়া যাইতেছে না। ইহার বিশেষ কারণ এই যে সাধকের 'ভাবশক্তি পিতৃলোকে এবং দেবলোকে প্রেরণ করাই, আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই চিন্তাশক্তি অদৃশ্য লোকে প্রেরণ মানসে বর্ত্তমানের ধর্ম্মকার্য্যে যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার কতকগুলি সম্পূর্ণ আবশ্যকীয় এবং কতকগুলি উন্নততর প্রথায় প্রস্তুত করিতে হইবে। এ পূজার উপকরণ প্রস্তুতের জন্যও শিল্পশালার আবশ্যক, এবং এই জন্যই আমি গত বৎসর "বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারং পাস করিয়াও দেশে না যাইয়া, উচ্চ বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অভ্যাস, অভিপ্রায়ে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছি; এখানেও আমাদের আবশ্যকীয় অংশ আয়ত্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু আমি এখন এখানে নিঃসম্বল; আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করিয়া; যন্ত্রাদির জাহাজ ভাড়ার ৩।৪ হাজার টাকা হাতে পাইলেই দেশে রওয়ানা হইব; এবং আমি দেশে পৌছিলে তাতা ও বারণ কোং আদির পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মতে আশা করি যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিব, কিন্তু দেশের লোক যদি এই মহৎ কার্য্যের সহায়তা স্বরূপ, যন্ত্রাদি জাহাজ ভাড়ার জন্য বর্ত্তমানের আবশ্যকীয়, ৩০০০৲ তিন হইতে চারিহাজার টাকা, ব্যবসায়ের নিয়মে ব্যাঙ্কের মারফতে প্রচলিত সুদে আমাকে কর্জ্জ প্রদান না করেন তবে আমার বিবেচনা হয় তাহাতে দেশের ক্ষতি হইবে। এই জন্যই আশা করি, আত্মীয় স্বজনকে দুর্ভিক্ষ ও মহামরী হইতে রক্ষা জন্য এবং অদৃশ্য লোকস্থ পিতৃদেব লোকের সদাশয় দেশবাসী আমাকে যন্ত্রের জাহাজ ভাড়ার জন্য, ব্যাঙ্কের মারফতে অন্ততঃ বারশত ডলার প্রেরণ করিয়া, অক্ষয় যশধর্ম্ম এবং অর্থলাভ করিবেন। ইতি॥ প্রণতঃ

যন্ত্রের বিবরণ চিত্র পাইলে আমরা চেষ্টা করিতে পারি।—কৃঃ সঃ

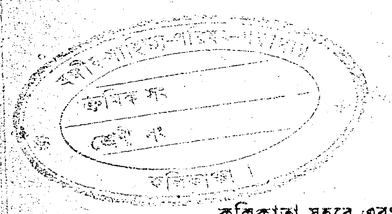

উদ্যান পরিদর্শন

কলিকাতা সহরে এবং সহরতলীতে সমৃদ্ধ গৃহস্থ, ব্যবসায়ী ধনাঢ্যগণের অনেকের সখের বাগান কিম্বা সব্জী ও ফুল বাগিচা আছে। বাগ বাগিচা প্রতিষ্ঠাকালে মালিকের যাদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম দেখা যায় ক্রমেই তাহার হ্রাস হইয়া আসে। যে কোন কাজের প্রতিষ্ঠা করা বরং সহজ কিন্তু রক্ষা করাই কঠিন। কাজের প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে, উদ্যম ও সখ থাকে, অর্থের স্বচ্ছন্দতা থাকে কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সে উদ্যম ও যত্ন সব সময়ে থাকে না; কখন বা যাঁর সখ তাঁর দেহাবসানের সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। অনেক স্থলে কিন্তু দেখা যায় যে মালিক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকা হেতু উদ্যান পরিদর্শন

কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হয় না। বাগান শ্রীহীন ও অকেজো হইয়া পড়ে। এই বাগান গুলি কিন্তু তাঁহাদের জুড়াইবার স্থান। বর্ত্তমান কালে ধনী, গৃহস্থ, ব্যবসাদার সকলকেই নানা আয়াস সাধ্য কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহাতে শরীর ও মন নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হয়। কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের মাঝে মাঝে বিশ্রাম আবশ্যক কিন্তু সহরের কোলাহল ও কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমালের মধ্যে বিশ্রাম স্থান মিলে না। যাহাদের বাগান আছে তাঁহারা সেই খানে গিয়া বিশ্রামলাভ করিতে পারেন। যেহেতু বাগান কেবল সখের জন্য কেন, শরীরক্ষারও প্রয়োজন। প্রত্যেক জিনিষের যথাযোগ্য ব্যবহারই সকলের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত।

বাগানটিকে রক্ষা করিতে হইবে, হতাদরে কোন জিনিষই মনের মত থাকে না।

বাগানের রাস্তা, ঘাট, মাঠ, কেয়ারিগুলি সুসন্নিবেশিত ও পরিষ্কার হওয়া চাই, বাগান ফলে, ফুলে, সব্জী, ও পরিমাণমত জায়গা থাকিলে শস্য সম্ভারে পূর্ণ হওয়া চাই। অনেকে জলের মত বাগানে অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু বাগানটি তাঁহাদের মনের মত হয় না বা আশানুরূপ ফুল ফল উৎপন্ন হয় না কিম্বা বাগান হইতে পরিচয় দিবার মত কোন আয়ই হয় না। অনুপযুক্ত হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হয় বলিয়া, নিজের তত্ত্বাবধানের অভাব হয় বলিয়া ফল এই প্রকার দাঁড়ায়।

বাগান পরিসরে বড় হইলে সেখান হইতে ফুল, ফল, মাছ, দুধ সব্জী সবই উৎপন্ন হইতে পারে। বাগানে গরু রাখিলে খোলা মাঠে চরিয়া খাইয়া উন্মুক্ত বাতাসে বেড়াইয়া তাহারা সুস্থ থাকে এবং উত্তম দুধ প্রদান করে। তাহাদের মল মূত্রেরও অপব্যয় হয় না—সে সমুদয় বাগানের জবীর সার যোগায়।

বাগান ছোট বা বড় হউক সেগুলি সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক—সে গুলিকে বিশ্রামালয়ে পরিণত করা চাই, সেখানে গিয়া সময়ে সময়ে পুত্র কলত্র ও আত্মীয়গণ লইয়া সাময়িক বাসের উপযোগী করিয়া রাখিতে হইবে। বাগানে যাইয়া বাগানের ছোট খাঁট কাজে ব্যাপৃত থাকিলে মন প্রফুল্ল হয়, পরিশ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলে বলধান হয়। সেকালে বৃক্ষাদিতে জল সেচন, পুষ্পপত্র চয়ন, মালাগাঁথা কত উদ্যানিক কার্য্যে স্ত্রীগণ, ব্যাপৃত থাকিতেন। বাগানে বালক বালিকাগণ মুক্ত বাতাসে বেড়াইবার ও ব্যায়ামের যথেষ্ট অবসর পায়। নগ্ন পায় থাকার ও বেড়াইবার যে কত সুখ ও উহা যে কত আরাম দায়ক ও স্বাস্থ্যকর তাহা সহরের লোকে অনুভব করিতে পারে না। সহরে নগ্নপায় থাকিবার ও মাটিতে পা দিবার সুযোগই ঘটে না।

আজকাল লোকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কতদূর দেশে যাইয়া কত অর্থ ব্যয় করেন ও বিড়ম্বনা ভোগ করেন। তাঁহারা হয়ত তাহাদের সহরের উপকণ্ঠোস্থিত বাগানের প্রতি উদাসীন, এই বাগানগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিলে এবং সপ্তাহের শেষে বা

মাসান্তে একবার দুই একদিনের জন্য তথায় যাইলে কত সহজে কত শারিরীক ও মানসিক উপকার পাইতে পারেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব নহে।

সঙ্গীত দেবতাগণেরও উপভোগ্য, সঙ্গিতের মত বিদ্যা নাই—ন বিদ্যা সঙ্গিতপরং। সঙ্গীত চর্চ্চার সুখ সুবিধা বাগানে বিশেষভাবে হওয়া সম্ভব। ইহাতে নির্ম্মল আনন্দ আনিয়া দেয়, মনের ময়লা নাশ করে। কুৎসিৎ সঙ্গিত কিম্বা কুসঙ্গ সঙ্গিত নিশ্চয়ই বর্জ্জনীয় কেন না তাহা বিমলানন্দদায়ী হয় না। সুসঙ্গত সঙ্গিতে হৃদয় মন প্রফুল্ল হয়, মনকে কি যেন এক অজানা উর্দ্ধস্থানে লইয়া যায়। রঙ্গিত রস সসিক মানুষ প্রায়ই উদার চেতা হয়। সঙ্গিতে প্রাণের জড়তা নাশ করে এবং মনকে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধকরে। বাগানে চাইয়া সঙ্গিত আলোচনা করা মন্দ নহে, বরং তাহা কতকতা স্যমলি স্বভাবিক সেইজন্য বলিতেছি যথেষ্ট বাগানগুলি যত্ন রক্ষা করুণ।

প্রতিকার—আপনার আবশ্যক হইলে আপনি নিম্নঠিকানায় আবেদন করিতে পারেন—ইণ্ডিয়ান গার্ডেনং এসোসিয়েসান লিমিটেড্। রেজিঃ আফিস ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

আপনার মূল্যবান বাগান শ্রীহীন বা নষ্ট হউক ইহা কখনই আপনার অভিপ্রেত নহে। সময়ভাবে আপনারা স্বয়ং আপনাদের বাগানের তত্ত্বাবধারণ করিতে পায়েন না বা উক্ত কার্য্যের জন্য উপযুক্ত মালী পান না।

আপনাদের বাগানগুলি সখের হইলেও অকেজো মনে করিবেন না—কারণ নানা বিধ কর্ম্ম পরিশ্রান্ত জীবনের জুড়াইবার স্থান এইগুলি। এইগুলি আপনাদের আরামের ও বিশ্রামের জায়গা। এই সকল স্থানে একদিন কাটাইলেও দেহ, মন, মস্তিষ্ক সবল ও সুস্থভাব ধারণ করে। ঘোর কোলাহল পূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমাল এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এখানে মন শান্ত হয় এবং কিছুকাল বিশ্রামের পর পুনরায় কর্ম্ম করিবার মনে একটি নবশক্তির সঞ্চার হয়।

এসোসিয়েসন আপনার বাগানখানি রাস্তা, ঘাট ও কেয়ারিতে সুশোভিত করিয়া ছবির মত করিয়া তুলিতে পারে এবং ফল, ফুল সব্জী ও শস্য সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া বাগানটিকে কেবল সুন্দর ও সুদৃস্য কেন লাভজনক আঙলাতে পরিণত করিতে পারে। বাগানে আপনি মালীর মাহিনা ও অন্য বাবতে কত ব্যয় করেন কিন্তু হয়ত আশানুরূপ আয় হয় না কিম্বা আপনার পসন্দমত কার্য্য হয় না; এসোসিয়েসনের উপর ভার দিলে আপনার বাগানের কার্য্য সুবিধামত চলিতে পারে।

নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ও সখের লতাপাতা ফুল ফল গাছ এসোসিয়েসন আপনাকে সরবরাহ করিতে পারে। বাগানে ব্যবহারের যাবতীয় যন্ত্রাদি জলোত্তলন ইঞ্জিন ও পাম্প, কীট নিবারক ঔষধাদি, ফুলগাছের টব ও বাগানের বেঞ্চ, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও এসোসিয়েসন হইতে পাইবেন।

একথায় ভার প্রাপ্ত হইলে এসোসিয়েসন আপনার বাগানের সমস্ত অভাব পুরণ করিতে পারে এবং মাসিক বন্দবস্তে আপনার বাগানের পরিদর্শন কার্য্য চালাইতে পারে।

অর্থব্যয় করিয়া যাহা তৈয়ারি করিয়াছেন, যাহা এত মুল্যবান, অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অর্থের অপব্যয় না হয় ইহা দেখাও আপনার কর্ত্তব্য এই জন্যই উপযুক্ত হস্তে কর্ত্তব্যভার অর্পণও আপনার প্রধান কর্ত্তব্য। আপনি যদি এসোসিয়েসনের উপর এই ভার অর্পণ করে এসোসিয়েসন তাহার যথা কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করিবে না ইহা সুনিশ্চিত।

THE INDIAN GARDENING ASSOCIATION LIMITED.

Reg. Office 162 Bowbazar Street Calcutta.

Why not make your gardens look gay and beautiful and preserve them for decay and ruin by securing expert supervision? You can hardly afford to neglect your gardens. They are valuable as well as necessary as they give you rest for your overworked nerves and much taxed brain. They give you rest and recreation. You can avoid bustles of busy centres while you are there and here you can regain fresh vigor and new energy to continue your work with greater earnestness.

The association makes a Special Feature of Landscape Gardening and has unusually extensive and well-grown stock of New and Rare Plants including Greenhouse and Harbaceous Plants, Roses, Ornamental Trees and Shrubs as well as seeds and bulbs of highest quality.

The Association supplies other Garden Requisites such as Garden Implements, Fertilisers, garden seats and Sundries, Flower pots and Tubs for Shrubs, Garden Pumps and Engines, Insecticides &c.

The Association designs and Estimates for laying out and furnishing new or renovating old gardens, orchards, Rockeries, Conservatories, Tennis and Cricket Lawns &c &c.

The Association can on a monthly contract system undertake supervision of your garden by an expert staff and The company is ready to take the responsibility to make your garden beautiful as well as profitable. The association can make your garden not only nice but at the same time rich in flowers, fruits and vegetables which will amply repay the cost of labour and money spent.

The Form of application.

*From*_____

_____

To the Indian Gardening Association Ltd.

Reg. office 162 Bowbazar Street, Calcutta.

Dear Sirs,

I beg to appoint your Company as supervisor of my Garden or gardens which is or are to be inspected once or twice weekly or monthly and for which I agree to pay to the Company the sum of Rs. per month as supervision charges.

It is requested that the bill of cost should be submitted at the close of every month and should be accompanied with inspection report of my Garden or Gardens.

Yours faithfully.

*Dated*_____ *192*

Name and description of Garden or Gardens.

Situation_____

বস্ত্র-সঙ্কট—বহুদিন হইতে কাপড়ের দর অতিশয় দুর্ম্মূল্য থাকায় বস্ত্রাভাবে লোকের ষৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে। গত শারদীয় উৎসবের সময় কাপড়ের দর অতি সামান্য একটু মাত্র কমিয়াছিল; এখন আবার ক্রমে চড়িতেছে। এই শীতের দিনে এখন বস্ত্রাভাবে লোককে অতি কষ্টে দিন কাটাইতে হইতেছে। গরীব দুঃখী ব্যক্তিরা এখন বস্ত্রাভাবে শীত ও হিম ভোগ করিয়া বহুল পরিমাণে রোগগ্রস্ত হইতেছে।

দুর্ম্মূল্যতার কারণগুলির প্রতিকারের উপায় কতক আছে গবর্ণমেণ্ট হাতে, কতক আমাদের নিজেদেরই হাতে। বিদেশীপ্রধান গবমেণ্টকে বিদেশী প্রীতি ছড়াইয়া স্বদেশ-প্রীতিতে আকৃষ্ট করিতে হইবে আমাদিগকেই ও নিজেদের যাহা আয়ত্তাধীন তার জন্যও আমাদেরই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের অভাব মোচনের জন্য নানাক্ষেত্রে অল্পস্বল্প চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা দেশের বিস্তৃতি ও অভাবের তুলনায় অত্যল্প। তবু এর জন্য যারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁরা ধন্যবাদভাজন ও তাঁদের দৃষ্টান্ত দেশের অনুকরণীয়। প্রবাসী।

ইন্দুর দ্বারা ক্ষতি—ইন্দুরের অত্যাচার আমরা কম বেশী সকলেই সহ্য করি। কিন্তু এই হিন্দুর যে আমাদের কি পরিমাণে সর্ব্বনাশ করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই কোন ধারণা নাই। সম্প্রতি "টাইম্‌স" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ভারতের দারিদ্র্যের জন্য এই ইন্দুরেরা কতদূর দায়ী, তাহা এই হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে। ইন্দুরের মোট সংখ্যা—৮০,০০,০০,০০০। প্রত্যেকটি ইন্দুর বৎসরে ৩ সের করিয়া শস্য হজম করে। ইহা ছাড়া ক্ষতিও করে প্রচুর। তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের বাৎসরিক মূল্য ১৫ কোটি টাকা এবং তাহারা যে ক্ষতি করে তাহার দাম ৩০ কোটি টাকা। গত বিশ বৎসরে ইন্দুর ভারতের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহারা যে রোগ বিস্তার করে তাহার দ্বারা যত লোক মরিয়াছে এবং যত লোক অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ ৬০৩ কোটি, শস্য প্রভৃতির ক্ষতি ৬০০ কোটি, প্লেগের প্রতিকার প্রভৃতির জন্য ব্যয় ৩৯৷৷০ কোটি—মোট ১,২৪২৷৷০ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে ঋণ ছিল ইন্দুরের জন্য এদেশে যে অপচয় তাহা সেই ঋণের পাঁচগুণ এবং যে আয় ছিল তাহার সাত গুণ।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

মূষিক ও মূষিকধর্ম্মী-বিদেশীদের কবল হইতে নিজেদের মুখের গ্রাস রক্ষা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পব্যয়সাধ্য কৃষির কাজে আমাদিগকে হাত দিতে হইবে।—প্রবাসী।

এখনও বঙ্গদেশের উপযুক্ত পরিমাণ লঙ্কার চাষ হইতেছে না। বঙ্গের বহু জেলার লোক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধানের চাষ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে। বহু ধান্য-ক্ষেত্র লঙ্কা চাষের উপযোগী। অল্পক্লিষ্ট বঙ্গবাসী বহু লক্ষ বিঘা জমিকে দোফসলী করিয়া বিপুল লঙ্কার চাষ করিতে পারে। লঙ্কা চাষে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত।

—মোহাম্মদী।

গোহত্যা নিবারণ—কৃষির সাহায্য করে ও পুষ্টিকর সুখাদ্য জোগায় আমাদের গোধন। ইহাদের রক্ষা পালন ও পুষ্টি উন্নতির চেষ্টা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থবুদ্ধি হইতেই করা উচিত।

গোবৎস ও গো-হত্যা বন্ধ—বোম্বাই হুগলী মিউনিসিপালিটী দুগ্ধবতী গাভী এবং বৎস হত্যা বন্ধ করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট।

গোহত্যা বন্ধ—পঞ্জাব লাহোর মিউনিসিপালিটী সহরে দুগ্ধবতী গাভী এবং বৎস হত্যা বন্ধ হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাব মঞ্জুরীর জন্য পাঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

—ত্রিপুরা হিতৈষী।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী হইতেও এইরূপ ব্যবস্থা করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তিনি হিন্দুমুসলমান সকলের ধন্যবাদভাজন।—প্রবাসী।

গঙ্গাসাগরের কর বৃদ্ধি—এবার গঙ্গাসাগর মেলার আর বেশী দিন বাকী নাই। প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন পুণ্যকামী হিন্দুগণ নানা দূরদেশ হইতে গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে স্নান করিতে আসিয়া থাকেন,—ইহাই মেলার 'বিশেষত্ব। দুঃখের বিষয়, তীর্থ করিতে গিয়াও যাত্রীরা শুল্কের হাত হইতে রেহাই পায় না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গঙ্গাসাগরের হিন্দু যাত্রীদের নিকট হইতেও কিছু কর আদায়ের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে বিনামূল্যেই সকলে এই পুণ্যতীর্থে অবাধে স্নানাদি করিতে পাইত। প্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে দুই আনা করিয়া কর লওয়া হইত, গত বৎসর হইতে ঐ কর দুই আনার স্থানে চারি আনা হয়। শুনিতেছি,—এবার উহা ছয় আনা করিবার কথা উঠিয়াছে। যদি সত্যই এইরূপ সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তবে, আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ, এই দুর্ব্বৎসর লোকের অর্থ-কষ্টের সীমা নাই; ফলে, ধর্ম্মার্থ কোন কাজ করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর যদি তীর্থক্ষেত্রে করের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে, ধর্ম্মকার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং এরূপ করবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ করবৃদ্ধি না করিয়া, যদি কামাইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা দেখিবেন। —বঙ্গবাসী।

তীর্থের কথা বাদ দিলেও সাগরে স্নান উপলক্ষে একটি মেলা বসে। যে সকল কৃষক ও অন্যান্য লোক আবাদ অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে তাহাদের অনেক জিনিষ দেখিবার ও ক্রয় করিবার এই সময় একটা মহা সুযোগ ঘটে। অনেক লোক কৃষিজাত দ্রব্যও এই সময় ক্রয় বিক্রয় হয়। গর্ভর্ণমেণ্ট ও জিলা-বোর্ডের সতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ ব্যয়ে এইরূপ মেলা বসান কর্ত্তব্য। কিন্তু পক্ষান্তরে করবৃদ্ধি করিয়া মেলায় ক্ষতি করিতেছেন ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।—কৃষক।

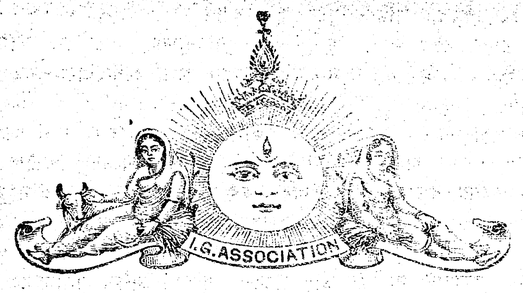

পৌষমাস

ফুলের আবশ্যকতা

ফুলের কি প্রয়োজন তাহা অধিক করিয়া বুঝাতে হয় না। যাঁহারা ফল চান তাঁহাদিগকে আগে ফুল ফুটাতেই হইবে। ফুল না হইলে ফল হয় না। কখন কখন ফুল লোক চক্ষুর অন্তরালে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করে—যেমন ডুমুরের ফুল। ডুমুরের ফুল লোক দেখিতে পায় না বটে তাহাও কিন্তু ফুটে এবং তাহাতে আপনা আপনি পরাগ সংযোগ হয় বলিয়া ডুমুরের উৎপত্তি হয়। ফুল সঙ্কল্প, ফল কার্য্য যেমন সঙ্কল্প না হইলে কার্য্য হয় না তেমনি ফুল না হইলে ফল হয় না। সঙ্কল্প আগে পরে কার্য্য, ফুল আগে পরে ফল।

ফলের আশা না করিলেও ফুলের স্বতন্ত্র প্রয়োজনও আছে। আমরা যাহা কিছু আহার করি বা গলাধঃকরণ করি তাহাই যে কেবল আমাদের খাদ্য তাহা নহে। যাহা কিছু দেখি, শুনি বা স্পর্শ বা আঘ্রাণ করি তৎসমস্তই আমাদের খাদ্য। ফুলের মনোহর গন্ধ, বিচিত্র বর্ণ, সুন্দর গঠন থাকা হেতু উহা আমাদের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। ফুল সাত্ত্বিক লোকের পূজার উপাদান, কর্ম্মীর কর্ম্মের সহায়, তমগুণ বিশিষ্ট লোকের শরীর সাজাইতে গৃহ সাজাইতে উহা আবশ্যক। ফুল বালকের খেলার সামগ্রী; কোন্ বালক ফুল না ভাল বাসে, ফুলে বশ হয় না। ফুল না হইলে দেব পূজা হয় না; এক এক দেবতা এক একপ্রকার ফুলে তুষ্ট—বলিতে কি ভারতের ত্রেত্রিশকোটী দেবতার জন্য ত্রেত্রিশ কোটী বিভিন্ন ফুলের প্রয়োজন। নায়ক নায়িকা ফুলের মোহে মুগ্ধ, একটী মাত্র ফুলের জন্য কেহ কাহার নিকট চির জীবনের জন্য প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। ফুল আর্ত্তের বন্ধু। ফুলের মধু মানব জীবনের রসায়ন। ফুলের রূপ ও গন্ধে রোগার্ত্ত শোকার্ত্ত, জীবনে হতাশজনও আনন্দ অনুভব করে। যাহাতে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয় তাহাতে যে রোগ শোকের উপশম হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

কুসুমের আঘ্রাণে, কুসুমের স্পর্শে মনের কলুষিত ভাব দূর হয় এবং মন স্বতঃই সাত্ত্বিকভাবে ভরিয়া উঠে। মৃতের সৎকারে এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতেও ফুলের প্রয়োজন —ফুল জীবনে মরণে মানবের সহায়।

অনেকে ব্যবহারিক বস্তু বিচারের দোহাই দিয়া বলেন যে ফুলের গাছ বসাইয়া জায়গা ও সময় নষ্ট না করিয়া ফলের গাছ করিলে কাজ দেখে। এই সকললোক ভুলিয়া যান যে ফলের পিছনেই যে ফুল আছে এবং মানব জীবনের খাদ্য কেবল চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নহে, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ইহাদেরও খাদ্য যোগাইতে হইবে। এই হেতু ফুল মানব জীবনে অপরিহার্য্য এবং নিত্য নৈমিত্তিক সহচর।

আর এক কথা—মানুষ সখ ছাড়াও কোন কালেই নহে। যতই তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য বাড়ুক না কেন তাহারা সখ ছাড়া নহে। মানুষকে সখের খোরাক যোগাইতেই হইবে। এই সখের বস্তু যোগাইয়া যদি কেহ কেহ তাহাদের অন্ন সংস্থান করিতে পারে তবে এক শ্রেণীর লোকেরত উপকার হইল, এটাত আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এদেশের লোক অপেক্ষা বিদেশীয়েরা অতি বেশী সৌখীন। তাহারা গাছ পাতা, লতা ফুল লইয়া সর্ব্বদাই থাকিতে ভাল বাসে। যদি বিদেশীয় ধনাঢ্য লোকের নিকট হইতে ফুল পাতা লতা যোগাইয়া অর্থ সংগ্রহ হয় তাতে ক্ষুন্ন হইবার কিছুই নাই এবং ক্ষুন্ন হওয়াও উচিত নহে।

বহুপূর্ব্বে ফুল সম্বন্ধে বঙ্গদর্শণে একবার আলোচনা হইয়াছিল তাহা অতি সুন্দর। পাঠক বর্গের অবগতির জন্য তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

ফুলের ভাষা

আকাশে নক্ষত্র ফোটে, পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা; পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্দ্ধ এবং বিশ্বের নিম্নার্দ্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর নীচে বাঁধা।

আবার ফুলের ডোরে নীচে সব বাঁধা। এখানেও ফুল আর নক্ষত্র একই বস্তু, কেন না নক্ষত্রের কিরণ ডোরেও নীচে সব বাঁধা। একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স জর্ম্মণি ভুলিয়া যাও; গ্রীস, রোম, পারশ্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কনারক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, অন্নবস্ত্রবিহীন কালদীয় মেঘপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে ভেড়া চরাইতেছে, রাত্রে নক্ষত্র ভাবিতেছে। অথবা গো-মহিষ সম্বল ভারতীয় আদিম আর্য্যগণের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে গো-ধন বাড়াইবার জন্য কত গব্য-কাষ্ঠ জ্বালাইতেছে, রাত্রে আকাশে সপ্তর্ষি দেখিয়া সাধের গো-ধন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। তার পর সেই আদিমকাল হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীর জিনিসে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে। নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা, আবহমান আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়নিহিত কৌতুহল! আবার পিছাইয়া যাও—সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয় যান প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য সম্পদ এবং সভ্যতাসূচক বস্তু ভুলিয়া, আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে তোমার যাহা আছে তাহার সে সব কিছুই

নাই। কেবল তোমার যে ফুলটী আছে তাহারও সেই ফুলটি আছে। তার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর জেল্লার মধ্যে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষ সব পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়াছে এখনও সেই ফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধ, আবহমান অনুরাগ, গূঢ়-নিহিত ভাব! তাই বলি যে আকাশের নীচে ফলের ডোরে আর নক্ষত্রের কিরণ ডোরে সব বাঁধা। সেই জন্যই বুঝি ঐ দুইটি ডোর মিশিয়া স্বর্গ মর্ত্ত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুল, তুমি কি কঠিন! তোমার কল্পনাতীত কমনীয় কান্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা! তবে বুঝি বাঁধিতে হইলে কমনীয়তা দ্বারা বাঁধিতে হয়?

ফুল, তুমি মানব-গুরু। মানুষে মানুষ আছে, আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্ব টুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে কত স্কুল, কালেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য্য—ফুল তোলা। যে দিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া ও পশুবধ করিয়া মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্ণে অস্তাচলগামী সূর্য্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতিঃ দেখিয়া কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণ জ্যোতিঃ পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল; সেই দিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে, মহারণ্যনিবাসী সহচর সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহা সম্পদ সৃষ্টি করিবে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মনুষ্যে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই আছে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্র চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মনুষ্য অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উঠিবে। সেইদিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সে শিক্ষা, সে উন্নতির মূলে—ক্ষুদ্র, কোমল, কমনীয় ফুল! কেন না ঊর্দ্ধতম স্বর্গ, অনন্ত নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর আর কিছুর সহিত বাঁধা নাই, কেবল ফুল-ডোরে বাঁধা। অতএব যদি স্বর্গাভিমুখী হইতে হয়, যদি অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে হয়, তবে আদি গুরু ফুল ভুলিও না। আদি ছাড়া অন্ত নাই। ফুলের কোমলতা, ফুলের কমনীয়তা, ফুলের গগনস্পর্দ্ধী নির্ম্মলতা হারাইলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, স্বর্গযাত্রা অকালে বন্ধ হইবে। অতএব, ভাই সকল, আমাদের মহারণ্যবাসী আদিপুরুষ যেমন মাথায় ফুল রাখিতেন, তেমনি করিয়া মাথায় ফুল রাখিয়া অগ্রসর হও।

ফুল, তুমি জগতের গূঢ় রহস্য!

ফুল সর্ব্বত্রই ফোটে। মরুভূমিতেও ফোটে উদ্যানপ্রদেশেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তর সীমার তুষাররাশির মধ্যেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তপ্ত কটিদেশেও ফোটে, মনুষ্যের বাসস্থানেও ফোটে, মনুষ্যের অগম্য প্রদেশেও ফোটে। ফুল সর্ব্বব্যাপী।

আমি এখানে, ওখানে কি আছে জানি না। তুমি ওখানে, এখানে কি আছে জান না। ভারতে ইংলণ্ড নাই, ইংলণ্ডে ভারত নাই। ফ্রান্সে আমেরিকা নাই, আমেরিকায় ফ্রান্স নাই। এ স্থান মৃত্তিকাময়, এখানে সমুদ্র নাই। ওস্থান অগাধ সমুদ্র, ওখানে মৃত্তিকা নাই। তুমি সব জান না, আমি সব জানি না, ভারত ইংলণ্ড

জানে না, ইংলণ্ড ভারত জানে না, মৃত্তিকা সমুদ্র জানে না, সমুদ্র মৃত্তিকা জানে না। ফুল সর্ব্বত্র ফোটে। ফুল সব জানে। ফুল সর্ব্বজ্ঞ।

ভারতবর্ষ, পারশ্যদেশ, আরবদেশ, আফরিক মহাদেশ—এই সকল স্থান প্রখর রবির প্রখর রঙ্গভূমি। এই সকল স্থানে প্রখর রবিকিরণে সকলই জ্বলিয়া যায়, পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যায়, জলাধার নদীগর্ভ ফাটিয়া বিকটাকার ধারণ করে। কিন্তু এ সকল স্থানে ফুল ফোটে। আবার লাপ্‌লাণ্ড, গ্রীণ্‌লাণ্ড, নোভাজেম্‌লা প্রভৃতি স্থানে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম, নীচে হিম, চতুঃপার্শ্বে হিম—যেন হিমাংশুর হিমঋতুর হিমশয্যা—হিমদেহ, হিমপ্রাণ, হিম-আত্মা! সে হিমে কিছুই হয় না, কিছুই বাঁচে না, মানুষ জমাট হইয়া যায়, জল জমাট হইয়া যায়, জগৎ জমাট হইয়া যায়। কিন্তু সে হিমে ফুল ফোটে। ফুল সর্ব্বশক্তিমান। ফুলের কোমলতা শক্তির প্রাণ

সুগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি—
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥

এখন বুঝিতেছি ফুল সর্ব্বত্র ফোটে কেন। একজন কবি-নামখ্যাত ইংরেজ লিখিয়াছেন:—

Full many a flower is born to
blush unseen
Aad waste its sweetness in the
desert air

মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র! মিথ্যা কথা। অসার কথা। অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি—জীবশূন্য, তৃণশূন্য, বারিশূন্য—জ্বালাময়, অগ্নি ময়—প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে; কঠোরতা কঠিনতা, নিষ্ঠুরতা প্রশ্বাসিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুদ্রমূর্ত্তিতে একটি অনির্ব্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে! প্রকৃতি ঐ কোমলতায় অনুপ্রাণিত। ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। তুমি দেখ আর নাই দেখ, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, প্রকৃতি ঐ কোমলতার গুণে পূর্ণতার ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে, সজীবতা অনুভব করিতেছে, আপনার প্রাণবায়ু আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছে। ফুল, তুমি মরুভূমিতে ফুটিও, নহিলে মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে এবং মহাশক্তি শক্তিহীন হইবে! বিশ্বনিন্দিত পৌরাণিক কবি ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণীকে কোমলতম লীলোৎপলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে মরুভূমি কি পৃথিবীতে থাকিত? না মহাশক্তির প্রকৃত শক্তি বুঝা যাইত? মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে আকাশের নক্ষত্র কেমন করিয়া মরুভূমিকে পৃথিবী বলিয়া চিনিত? তুমি দেখ আর নাই দেখ, কিন্তু মরুভূমিকে ত নক্ষত্রের কাছে পরিচিত হইতে হইবে। তাই মরুভূমিতে ফুল ফোটে। ফুল ডোর ব্যতীত পৃথিবীকে আকাশের সহিত বাঁধা যায় না।

মহারণ্যে মহান্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—কোথাও কিছু নাই। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একটি ফুল ফুটিল। আর্য্যকবি গাহিলেন:—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ইত্যাদি।

সেই অবধি আর্য্য ভক্ত মহাশক্তির পদে জবাপুষ্পের অঞ্জলি দিতেছেন।

আর্য্যকবিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ফুল জগতের গূঢ় রহস্য। তাঁহাদের মতন ফুলের ভাষা আর কোথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। গ্রীক্ কবিগণ ফুলে যত মানসিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তদপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন। তাঁহারা বেশী ফুল কোরিন্থিয়ান-স্তম্ভের শিরোপরি চাপাইতেন। রণপ্রিয় রোমানেরা রাজপথে ফুলের মালা ঝুলাইয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র ফুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কথা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কথাই পৃথিবীসম্বন্ধীয়। Midsummer Night's Dream—এও তদপেক্ষা বেশী নাই। কেবল ভারত ফুলে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই দেখিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ফুলে পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন; পৌরাণিক কবিগণ ফুলে স্বর্গের অথবা বিশ্বরহস্যের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছেন।

ফুল জগতের গূঢ় রহস্য। ফুল জগতের প্রাণ। ফুল-ডোরে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য বাঁধা। ফুল ছাড়া গতি নাই, ফুল ছাড়িলে স্বর্গের দ্বার খোলা যায় না। অতএব ভারতসন্তানগণ, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ফুল মাথায় করিয়া অগ্রসর হও! কিন্তু ফুলকে শুধু ফুল বলিয়া জানিলে চলিবে না। আরাধ্য পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় ফুলকে জগতের গূঢ় রহস্য, মহাশক্তির শক্তি, প্রকৃতির প্রাণ স্বর্গদ্বারের চাবি বলিয়া না জানিলে তোমাদের যুগ যুগান্তরের ফুলে মেল ভাঙ্গিয়া যাইবে—তোমরা পৃথিবীর হাড়ী হইয়া পড়িবে।

বৃক্ষাদির ভাব

আমরা ইতিপূর্ব্বে বৃক্ষ লতার নিরব ভাষায় কথা আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক উদ্যান পালক বৃক্ষলতার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারে। কেবল গাছের সন্নিকটে যাইলেই সে বুঝিতে পারে—যে উহা সুখে আছে বা দুঃখে আছে উহা ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়াছে কিনা, শীততাপে ক্লিষ্ট কিনা, তাহার উপর পশ্বাদির বা পোকার উপদ্রব ঘটিয়াছে কি না, বালকে, স্ত্রীলোকে বা মূঢ়ব্যক্তি তাহাকে অনর্থক অঘাত করিয়াছে কিনা বা তাহার কোন অংশ ক্ষত বা ছিন্ন হইয়াছে। গাছ অস্ফুট ভাষায় তাহাকে কত বিষয়ই জানায়, বস্তুতই বৃক্ষলতাদি তাহাদের লতা পল্লব দ্বারা তাহাদের শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা তাহাকে জ্ঞাপন করে। সে তাহাদিগকে সময়মত আহার যোগাইয়া তাহাদের প্রসন্নতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, পানকালে পানীয় যোগাইয়া তাহাদের প্রফুল্ল মুখকমল দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, শীততাপ ঝড়ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা পাইলে বৃক্ষলতা যে কত সচ্ছন্দে বোধ করে তাহা সে অনুভব করিতে পারে। ক্ষুধার নিবৃত্তি, পিপাসায় শান্তি, বা যে কোন কারণে সচ্ছন্দ অনুভব করিলে লতাবৃক্ষগণ তাহার সচ্ছন্দদাতা উদ্যানপালককে শাখা, পল্লবের শীরগ্রভাগ সঞ্চালন দ্বারা কত যে কি বলে তাহা সেই বুঝে। দুঃখের সময় তাহাদের নীরব রোদন সেই কেবল শুনিতে পায়।

বৃক্ষাদির অস্ফুট ভাষা ব্যতীত স্ফুটভাষাও আছে। বায়ু সহযোগে বৃক্ষপত্রাদির যে মর্ম্মর শব্দ উত্থিত হয় তাহাই তাহাদের স্ফুট ভাষা, বৃক্ষাদি গ্রীষ্মের সময় শীতের সময়, বসন্ত ও শরত্ কালে বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনী করে। বৃক্ষাদি হইতে সুখানুভব কালে যে ধ্বনী উত্থিত হয়, দুঃখের সময় ধ্বনী তাহার বিপরীত বা বিভিন্ন প্রকারের। এই প্রকার

শব্দের পার্থক্যানুভব করিতে হইলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। কিন্তু মানুষের সর্ব্বদাই নিজের কথাই পাঁচকাহান, নিজের শব্দই তুমুল করিয়া তুলে ও তাহাতে ডুবিয়া থাকে অপরিস্ফুট শব্দ শুনিবার তাহার ধৈর্য্য নাই, সময় নাই।

কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ একটি সৃষ্টিছাড়া জীব—সে হয় কে নয় করে বা নয়কে হয় করে এবং অতি অকিঞ্চিৎকরকে সে স্ফুটান করিতে প্রাণপন করে। বিজ্ঞাবিদ বৃক্ষাদির ভাবের আদানপ্রদান লক্ষ্য করিতে ব্যগ্র এবং তাহাদের অপরিস্ফুট ভাষার অর্থ নির্ণয় করিতে সে নিরতিশয় ব্যস্ত।

বিলাতে একজন অন্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ আছেন তাঁহার নাম মিঃ উইকিনসন—তিনি ২২ বৎসর বয়সের সময় অন্ধ হইয়া উদ্ভিদতত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করেন। বিধাতা তাঁহাকে দৃষ্টি শক্তি হইতে বঞ্চিত করিলেও তাঁহার স্পর্শেন্দ্রিয় এত প্রকাশ হইয়া উঠিল যে তিনি স্পর্শমাত্রেই যে কোন উদ্ভিদের নাম বলিয়া দিতে পারেন। ন্যূনকল্পে ৮০০ শত বৃক্ষলতার সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়রূপে তিনি সুপরিচিত।

তিনি ক্রমশঃ শব্দরূপে উহাদের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষেতে বিভিন্ন শস্য থাকিলে মৃত্তিকা হইতে বায়ু সংঘাতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উত্থিত হয়, এই শব্দানুসারে ক্ষেতের ফসল নির্দ্ধারণ করা যায়। এইরূপ তিনি প্রবল বাতাসের সময় কোন গাছ বায়ুর আঘাতে কি প্রকার শব্দ উত্থিত করে তাহা তিনি বলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃক্ষের উপর বারিবর্ষণ কালেও শব্দের পার্থক্য তিনি অনুভব করিলেন। এখন তিনি শব্দানুক্রমে তাহার নাম বলিয়া দিতে পারেন। তিনি বলেন এক জাতীয় পাইন বৃক্ষ আছে যাহারা বারিবর্ষণ কালে আদৌ শব্দ করে না, যদি কিছু শব্দ উত্থাপন করে তাহা যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন শোনা যায় না। এমন কি অতিবৃষ্টি ও বজ্রপাতকালে উহারা ক্বচিৎ কখন শব্দ করে। ঐ জাতীয় পাইন বৃক্ষের নাম শিলভার পাইন (Rinus sylvestris)।

পাইন গাছ আমাদের দেশের দেবদারু গাছের মত অনেকটা। আমাদের দেশের ঝাউ গাছ বাতাসের ঘাত প্রতি ঘাতে খুব বেশী রকম শব্দ করিয়া থাকে। শব্দকারিত্বে উহাদিগকে বিলাতী ওকের সহিত তুলনা করা যায়। অন্য উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ বলিতেছেন যে উহারা বৃক্ষ গণের মধ্যে সর্ব্বাপেকা অধিক শব্দকারী, বাতাসের ধ্বণী উহাদের পত্রে ও ত্বকে প্রতিধ্বনিত হইয়া তুমুল হইয়া উঠে। এমন কি উহাদের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে ঢোলের শব্দের মত শোনায়। আমরা দেখিয়াছি যে বনে ঝাউগাছ বা ওক গাছ অধিক সেখানে পাখীর কলরব খুব পরিস্ফুট কিন্তু দেবদারু বন অনেকটা নিস্তব্ধ বলিয়া মনে হয়। দেবদারু বা পাইনের পাতায় পক্ষীয় কলরব খুব কমই প্রতিধ্বনিত হয়—পাইন গাছ যেন ঐ সকল শব্দ হরণ করিয়া লয়। অন্ধবৈজ্ঞানিক বলিতেছেন তাহার কারণ আর কিছুই নহে—পাইন পাতা নরম কিন্তু ওকের পাতা কঠিন তাই এই বিভিন্নতা। তিনি আরও বুঝিয়াছেন যে গাছের ডাল পাতা যত অধিক স্থিতিস্থাপক, যাহারা বৈদ্যুতিক প্রবাহে অধিক সাড়া দেয় তাহারা বৃষ্টি বজ্রপাতের সময় তত অধিক নিস্তব্ধ থাকে। আর বৈজ্ঞানিক উইলকিনসন বলেন যে নেড়া পাহাড়ের উপর বারিবর্ষণ কালে এক রকম শব্দ উত্থিত হয় কিন্তু পাহাড় গাত্র যদি সেওলা দ্বারা (moss covered) আচ্ছাদিত থাকে তাহা হইলে তাহাতে পতিত বারি পাতের শব্দ মনোরম ও মধুর। সেওলা দ্বারা ঢাকা পাহাড়ের পক্ষীর রবও খুব মিঠা শুনায়।

ঐ অন্ধবৈজ্ঞানিকের স্পর্শ শক্তি এত প্রবল হইয়াছে যে তিনি মানুষের করে কর স্থাপন করিয়া তাহাদের চরিত্র বলিয়া দিতে পারেন। একটি কয়েদখানার তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। তিনি কয়েদীগণের সহিত কর মর্দ্দন করিয়া তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বলিয়া দিয়াছিলেন। হাতে এবং পায়ে হাত দিয়াও মানুষের মানসিক অবস্থা তিনি জ্ঞাপন করিতে পারেন। মনের কোন প্রকার চাঞ্চল্য থাকিলে হাত পায়ের স্পন্দন যে বিভিন্ন রকম হয় তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

অন্ধবৈজ্ঞানিকের অনন্য সাধরণ গুণ ও গবেষণা দেখিয়া বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম এস্‌সি (M. AC) ডিগ্রি দিয়াছেন। মাষ্টারকে মষ্টার বলা পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলা যোগ্যই হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

পৌষ ও মাঘ।

সব্জীক্ষেত্র—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুণ ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শশা, করলা, তরমুজ, কিম্বা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছের এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাধিয়া দেওয়া—গোময়, ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থানে অন্ততঃ দুই হাত

গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটি গুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্তভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পেয়ারা ও কুলের পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত। কুল খুব অধিক ছাঁটিতে হয়; পেয়ারা তত নহে।

কৃষিক্ষেত্র—সম্বৎসরের চাষ মাঘ মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি আঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিবার আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিয়াছে। গোলাপ ক্ষেত্রে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যূথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পাশ্চাত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমীর ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা—গাজর, সালগম, লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জল্‌দি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শ খণ্ড } মাঘ, ১৩২৭ সাল { ১০ম সংখ্যা।

ফুলের চাষ

পুষ্প সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবটি আরও বিশদ করিবার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে কর্ত্তৃক কৃষকে পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধটির এখানে পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ভারতবর্ষের মধ্যে নানাবিধ জল বায়ু আছে,—নানাবিধ গঠনের মৃত্তিকা আছে, সুতরাং এদেশে নানাবিধ পুষ্প জন্মিয়া থাকে,—আর যে সকল পুষ্প জন্মে, তৎসমুদয়েরই প্রায় একটা সুঘ্রাণ আছে। সচরাচর যে সকল ফুলের গাছ আমরা সখ করিয়া বাগানে রোপণ করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে বেল যুঁই, চামেলী নেওয়ার, গোলাপ, মালতী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, নেকালিকা চম্পক, বকুল ইত্যাদি প্রধান। এতদ্ব্যতীত খস্‌খস্, চন্দন, কস্তুরী, লেবু প্রভৃতি কাহারও ফুল, কাহারও বা ফল ও ত্বক হইতে সুগন্ধ পাওয়া যায়। আবার বিলাতী বা বিদেশী অনেক গাছ আজকাল ফল ফুল বা বাহারের জন্যও অনেকের বাগানে স্থান পাইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে হেলিওট্রোপ (Heliotrope) ভার্বিনা (Verbena), লেবেণ্ডার (Lavender), রোজমেরি (Rosemary) প্রভৃতির মধ্যে কাহারও পুষ্প কাহারও পাতা অতি সুঘ্রাণযুক্ত। এই সকল গাছের বিস্তৃতভাবে আবাদ করিলে, তদ্দ্বারা নানাবিধ পুষ্পসার ও এসেন্স, নানাবিধ আতর ও অন্যান্য উপাদেয় সুগন্ধী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। গোলাপ এবং কেতকী হইতে গোলাপজল ও কেওড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। বনে বনে ভ্রমণ করিলে কত রকমের যে সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। দেশে এত রকমের সুগন্ধী পুষ্প জন্মে, এত রকমের সুবাসময় পাতার গাছ জন্মে, তথাপি দেশে সুগন্ধী দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কয়টী কারখানা আছে, আর কয় রকম ফুলেরই বা আবাদ হয়? সকলেই দেখি ব্যবসায় বাণিজ্যের নূতন নূতন পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য করিতে দেখিতে পাই না। কলিকাতার সন্নিকটে বালিগঞ্জ, গড়ে

ইত্যাদি দুই একটী গ্রামে বেল ও যুঁই ফুলের কিছু কিছু মালঞ্চ আছে, মধুপুর ও বৈদ্যনাথে কিছু কিছু গোলাপের মালঞ্চ আছে। উল্লিখিত স্থানের মালঞ্চসমূহে যে ফুল জন্মে তাহা প্রতিদিন কলিকাতা সহরে চালান হয়। কলিকাতার মালিগণ বেল যুঁই খরিদ করে মালা প্রস্তুত করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করে, বে-বাড়ীতে যোগান দেয় ইত্যাদি আর যে গোলাপ ফুলের আমদানী হয়, তাহা সাহেব মেমদিগের ব্যবহারার্থে ধর্ম্মতলায় হগ সাহেবের বাজারে বিক্রয় হয়। ফুলের আর কোন ব্যবহার আপাততঃ আর দেখা যায় না,—তবে গাজীপুর ও জোয়ানপুরে যে গোলাপ, বেল ও যুঁই প্রভৃতির বিস্তৃত আবাদ হয়, তাহাতে, আতর, গোলাপ ফুলেল তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এত বড় দেশটার মধ্যে কেবল এই দুইটী স্থানে যে ফুল জন্মে তাহা হইতেই এই সামান্য সুগন্ধী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশে জমির হার সুলভ, জনের মজুরী সুলভ, আব-হাওয়া ও মাটি আবাদের অনুকুল, তথাপি যে এবিষয়ে লোকের কেন দৃষ্টি পড়ে না ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহা হউক আজকাল সাধারণের কৃষিবিষয়ে মন আকৃষ্ট হওয়ায়, লোকে নানাবিষয়ে নানা পন্থার অনুসন্ধান করিতেছে, সুতরাং অনুসন্ধিৎসুদিগকে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে নূতন নূতন পথ প্রদর্শন করা উচিত। ধান্য গোধূমাদির চাষবাসে সকলে নিযুক্ত হইলে, কৃষির অপরাপর বিভাগে যে কেবল অস্পর্শিত ভাবে পড়িয়া থাকে তাহা নহে,—ইহাতে সকলের সুবিধা হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এতদ্ব্যতীত মেঠো ফসলের চাষ আবাদে চাষীগণ যেমন সহজে সফলকাম হইতে পারে, ভদ্রলোক কেন যে তেমন পারে না, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে, তবে সে সকল প্রদর্শন করা প্রবন্ধের বিষয়ীভূক্ত নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। কৃষকগণ যে সকল বিষয়ে সহজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, যে সকল গাছের আবাদে সমধিক খরচ আছে, যে সকল ফসলের আবাদে সমধিককাল অপেক্ষা করিতে হয়, শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে এইরূপ কৃষি বা উদ্যানকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। কৃষকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে কৃষকদিগের কিছু ক্ষতি হয়। অন্যদিকে যাঁহারা উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীতাচরণ করেন তাহাদিগেরও লাভ হয় না।

গন্ধদ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ফুলের আবাদ করিতে হইলে, বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা বেহার বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ গ্রহণীয়। বাঙ্গালাদেশে বারিপাতের আধিক্য বশতঃ মৃত্তিকা অত্যন্ত আর্দ্র, আব-হাওয়া তদনুরূপ, একারণে তথাকার গাছের বৃদ্ধি সমধিক, তন্নিবন্ধন গাছের তাবৎ শক্তি গাছের অঙ্গপোষণেই ব্যয়িত হয়—অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহাই ফুলের পরিপুষ্টি সাধন করে। কিন্তু বেহার প্রভৃতি প্রদেশের বারিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প, জমি স্বাভাবিক গড়ন। এই দুই কারণে তথাকার আব-হাওয়া স্বতন্ত্র, মাটিও নীরস, ফলতঃ এখানকার গাছ তত অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে না। গাছের যে শক্তি

অব্যবহৃতভাবে অবস্থিতি করে, তাহা পুষ্পোৎপাদনে নিয়োজিত হয়। আবহাওয়ার এইরূপ তারতম্য হেতু নীরশ প্রদেশের ফুলে গন্ধ যেমন অধিক, তেমনি ফুলও অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার পুষ্পসকল বড় হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে ফুটে না, তাহাতে তেমন অধিক পরিমাণে গন্ধ থাকে না। বেহারাঞ্চলে আবাদ করায় আর একটী বিশেষ লাভ এই যে, এদেশে লোকজনের মজুরী যত সুলভ দুনিয়ার কোন দেশে বুঝি তার নাই। আবার এদেশের লোক যেমন কষ্ট সহিষ্ণু, অন্য দেশের লোক ততদূর নহে। এ সকল প্রাথমিক বিষয় উপেক্ষনীয় নহে।

নানাবিধ পুষ্প হইতে আতর বা অপরাপর গন্ধসার প্রস্তুত করা যে বিশেষ কঠিন কার্য্য তাহা নহে। তবে ইহা কিছু সময়াপেক্ষ সুতরাং তাহার জন্য ধৈর্য্য আবশ্যক। ইহাতে একদিকে যেমন কিছুদিন অর্থাৎ দুই তিন বৎসর প্রথমতঃ অপেক্ষা করিতে হয়, যেমনি অন্যদিকে এ সকলের আবাদ করায় সমধিক লাভের আশা থাকে। ভদ্রলোক-দিগকে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে, এইসকল লাভজনক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। দেশের মধ্যে এখনও লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পতিতাবস্থায় আছে। কিন্তু এই সকল জমিকে পুষ্পক্ষেত্র বা মালঞ্চে পরিণত করিতে পারিলে, দেশের সমূহ কল্যাণ সংসাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা হইতে ভূস্বামীর খাজানা হিসাবে আয় বাড়িবে; দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি জনমজুরের উদরান্নের উপায় হইবে; তৃতীয়তঃ উদ্যোগী ব্যক্তির আয়ের পন্থা হইবে এবং চতুর্থতঃ ইহা দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধির একটা পথ উদ্ঘাটিত হইবে। এ সকল কথা ঠিক হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পক্ষে একটী বিষম অন্তরায় আছে এবং সেই অন্তরায়—অর্থাভাব; বিস্তৃতভাবে আবাদ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু সে পরিমাণ অল্প আয়সম্পন্ন বা অল্প মূলধনবিশিষ্ট গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভবপর নহে। আর কায়ক্লেশে সম্ভবপর করিয়া লইলেও এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উদ্যান সংস্থাপনকালে অর্থ ব্যয় করিয়া—পরে আবার সেই উদ্যানকে, দুই তিন বৎসর খরচ যোগাইয়া রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন ইহা বিশেষ চিন্তার কথা। বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে দুই শ্রেণীর লোক আবশ্যক,—প্রথম মূলধনী চাই; তাহার পরে মূলধনীর টাকা বজায় রাখিয়া পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহী ব্যক্তির প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশসমূহে কোন উৎসাহী ব্যক্তি একটী কাজের সূচনা করিলে ধনীগণ অর্থ দ্বারা তাহাকে সাহায্য করেন, কিম্বা টাকা দিয়া সে কার্য্যের অংশীদার হইয়া থাকেন। এই প্রকার যৌথ কারবারের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই সাহেবদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাষ-আবাদ এত শীঘ্র উন্নতিলাভ করে। কিন্তু এদেশে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়, কারণ বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে কতকগুলি যৌথ কারবারের সূচনা হইল, কিন্তু তাহার প্রায় অনেকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। কি কারণে যে এরূপ হইল, এ প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিতে

চাহি না। বর্ত্তমান কালে কিন্তু দেশ নব উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়াছে—এমন কর্ম্মের সাফল্য আশা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ফুলের আবাদ ও গন্ধসারের কারখানা বা যে কোন ব্যবসা সংস্থাপন করিতে হইলে অর্থশালী ও উদ্যমশীল ব্যক্তির প্রয়োজন—অর্থ ও উদ্যম আছে এমন ব্যক্তির মধ্যে যোগ থাকা চাই। কেবল টাকায় কোন কাজ হইবে না, কেবল মাত্র উদ্যম ও উৎসাহেও কোন ফলোদয় হইবে না।

অরণ্যের-আবশ্যকতা

অনেকের মনে এই ধারণা রহিয়াছে যে, অরণ্য, দুর্গম ভীতিপ্রদ স্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং উহার উচ্ছেদ করিয়া যতই জমি কর্ষণ করা যায় ততই মঙ্গল। অশিক্ষিত মনুষ্যের মনে যে এই রূপ ধারণার উদয় হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, ব্যক্তিও অরণ্য সম্বন্ধে এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কোন দেশের পক্ষে অরণ্য যে আবশ্যকীয় এবং পুরাকালে যে সকল জাতি অরণ্য সংরক্ষণে অবহেলা করিয়াছে, তাহারা কাল ক্রমে যে উচ্ছেদিত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার লোকের ধারণায় আইসে না। আমরা আজকাল যে বালুকাময়, অনুর্ব্বর, প্রায় বৃক্ষ-লতা প্রাণী-বিহীন শাহারা মরুর বিবরণ পাঠ করি, তাহা এক সময় বহুল অরণ্যানীযুক্ত প্রাণীপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। রোমকেরা উহার উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ না করায় প্রবল দাবানলে উক্ত অরণ্য স্থানে স্থানে দগ্ধীভূত হইত। অসংখ্য মেষপালের অত্যাচারে নবীন পত্রাঙ্কুর আর বিকসিত হইতে পারিত না। এই রূপ বহু বৎসর ব্যাপী অবহেলার ফলে শাহারা এমন মরুভূমি হইয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পুরাকালে, ইরাণে, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, কার্থেজ এবং বর্ত্তমান সময়ে, স্পেন, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অরণ্য অভাবে অবনতির অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্য জগতে যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ততই অরণ্যের আবশ্যকতা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে।

অরণ্যের সহিত বারি প্রপাতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অবশ্য বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর তারতম্যের একমাত্র কারণ অরণ্য নহে। (১) বিষুব-রেখা হইতে দূরবর্ত্তীতা

(২) সমুদ্র, নদী, অথবা অন্যান্য বৃহৎ জলাশয়ের উপরিভাগ হইতে উক্ত দেশের উপরিভাগের উচ্চতা এবং তৎসমুদয় স্থান হইতে দূরবর্ত্তীতা (৩) প্রবহমান বায়ু (৪) অরণ্যের অভাব অথবা প্রাচুর্য্য এবং (৫) মৃত্তিকার তারতম্য, প্রধানতঃ এই কয়েকটি কারণই কোন দেশের জল বায়ুর স্বভাব নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত কারণ, পরস্পর এরূপ ভাবে জড়িত এবং উহাদের মধ্যে অরণ্য-জনিত প্রভাবের মাত্রা এত সামান্য যে বহু দিবস পর্য্যন্ত অরণ্যে জল বায়ুর উপর কোন প্রভাব আছে তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন নাই। কাল-ক্রমে জল বায়ু সম্বন্ধীয় বহু অনুসন্ধানের ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জল বায়ুর সহিত অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং দেশ মধ্যে অরণ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি রূপে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইলেন? সর্ব্বপ্রকারে সমভাবাপন্ন দুইটি স্থান নির্ব্বাচিত হইল। ঐ দুইটি স্থানের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ রহিল যে, একটি অরণ্যের বহির্ভাগে স্থিত এবং অন্যটি অরণের অন্তর্ভূত। বহু স্থলে এই রূপ দুইটি স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া উহাদের জল বায়ুর অবস্থা লিপি বদ্ধ করা হইল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, উত্তাপের হিসাবে গ্রীষ্ম-কালে দিবা দ্বি-প্রহরে অথবা পূর্ব্বাহ্নে অরণ্যের মধ্যে গড়ে ৭॥০ ডিগ্রি উত্তাপ কম। বসন্ত অথবা হেমন্ত কালে ৪ ডিগ্রি এবং শীতকালে ২ ডিগ্রিকম। যে সমস্ত স্থলে এই সকল পরীক্ষা হইয়াছিল তৎসমুদয় স্থানে গড়ে গ্রীষ্মকালে ৭৫ ডিগ্রি উত্তাপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এতদপেক্ষা উত্তাপ অনেক অধিক। সুতরাং ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে অরণ্যের বহির্ভাগ এবং অন্তর্ভাগের উত্তাপের তারতম্য অপেক্ষাকৃত বহুল পরিমাণে অধিক। এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, অরণ্য উত্তাপের মাত্রা হ্রাস করিয়া দেয় বলিয়াই বারি-প্রপাত, বায়ুমণ্ডলে শৈত্যের মাত্রা এবং জমি হইতে সূর্য্যের কিরণ দ্বারা জল শোষণের মাত্রার উপর ইহার প্রভাব এত অধিক। বস্তুতঃ নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা জলবায়ুর উপর অরণ্যের প্রভাব এরূপ নিঃসন্দেহ-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত স্থলে বারি প্রপাত কম, সে সকল স্থানে কেবল বারি প্রপাতের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে অরণ্য আবশ্যকীয় এরূপ নহে। উচ্চ পাহাড় সমূহ উত্তম রূপে অরণ্য দ্বারা আবরিত না থাকিলে নদী প্রভৃতিতে জলাভাব হয়, বাণ দ্বারা দেশ প্লাবিত হয়। পক্ষান্তরে অরণ্যে থাকিলে, যে জল বৃষ্টির সময় সময় নগ্নপাহাড়ের গাত্র বহিয়া উপত্যকা প্লাবিত করিয়া শস্য ও জীবন-ধ্বংসকারী বন্যায় পরিণত হইত তাহা অরণ্য দ্বারা শোষিত এবং সংরক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ নদীর কলেবর বৃদ্ধি করে। অধিকন্তু অনাবৃত স্থানে সূর্য্যাতপে যে পরিমাণ জল শোষিত হয়, গলিত-পত্রযুক্ত অরণ্যে তাহার কেবল শতকরা ২২ ভাগ মাত্র হইয়া

থাকে। সুতরাং অবশিষ্ট ৭৮ ভাগ জল উদ্বৃত্ত হয়। উক্ত জল নদী, ঝরণা প্রভৃতির পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

উপত্যকা অথবা সমতল ক্ষেত্র অরণ্য বিহীন হইলে অনিষ্টের মাত্রা অর্দ্ধেক পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে। কারণ তখনও নদীর জলবেগ সমান থাকে, পলী দ্বারা নদীস্রোত আবদ্ধ হয় না এবং খাল পয়োনালা প্রভৃতি দ্বারা জল সেচন চলিতে পারে। সিন্ধুনদ এবং গঙ্গা উভয়ই অরণ্যাবৃত পর্ব্বতাঞ্চল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এখনও উক্ত পর্ব্বত গাত্র সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে পাদপরাজি বর্ত্তমান। সুতরাং এখনও জল প্রবাহ সমভাবে চলিতেছে। কিন্তু যে দেশে পর্ব্বত-গাত্রস্থ বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল হইয়াছে, তদ্দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বর্ষার প্রচুর বারিপাতে পর্ব্বত-গাত্র বিধৌত হইয়া যাইতেছে, জল স্রোতের ধীর অথচ অনব্যাহত গতিতে মৃত্তিকা স্থান চ্যুত হইয়া নদী গর্ভে পলীরূপেই বিরাজ করিতেছে এবং কালক্রমে বৃহদাকার উপল খণ্ড সমূহ বিচ্যুত হইয়া পর্ব্বতের আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস করিতেছে। পক্ষান্তরে যে স্থলে অরণ্য বর্ত্তমান, তথায় প্রকৃতির কার্য্য বিভিন্ন রূপে সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অরণ্য সংযুক্ত স্থানে বারিপ্রপাত হইলে তাহা অবাধে বহিয়া যাইতে পারে না। প্রথমতঃ বারির শতকরা ২৫ ভাগ বৃক্ষ দ্বারা শোষিত হয় এবং ক্রমে বৃক্ষ অবয়ব দ্বারা মৃত্তিকায় নীত হয়। ২য়তঃ বৃক্ষের অনাবৃত মূল, গলিত শাখা এবং পত্র এতদ্দমুদয়ই জলের গতি রোধ করায় জল নিম্নগামী হইয়া নদী, ঝরণা প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বারি-যোজনা করিয়া থাকে। ৩য়তঃ মৃত্তিকাস্থিত চতুঃপার্শ্বগামী মূল দ্বারা বৃক্ষ সমূহ মৃত্তিকাকে দৃঢ়ীভূত করে। এতদ্ভিন্ন বৎসরের পর বৎসর গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের স্তর ক্রমশঃ স্থূলতর হইতে থাকে। এই সমস্ত কারণবশতঃ মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হইতে পারেনা, সুতরাং নদী গর্ভে পলিও পড়িতে পারেনা। ৪র্থতঃ প্রবল নদী অথবা সমুদ্রতটস্থ যে আল্‌গা বালি এবং মৃত্তিকা স্থানভ্রষ্ট এবং নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে বায়ুবেগে বাহিত হইয়া প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়েরই অনিষ্ট সাধন করিত, তাহা অরণ্যের প্রভাবে স্বস্থানেই আবদ্ধ থাকে।

জল সেচন এবং অরণ্য সংরক্ষণ, উভয়ই এক প্রকারে না হইলেও উভয়ের ভাবীফল এক প্রকার। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক ;—জল-সংবাহন দ্বারা ফসল উৎপাদন এবং মনুষ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। খাল দ্বারা জল সেচন প্রণালীতে আমাদের দেশে যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। জল সেচন সমিতির অধিবেশন কালে অনেক দেশীয় এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, খাল ও খালের জল দ্বারা জমির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, উর্ব্বর জমি অনুর্ব্বর হইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া জন্মিয়াছে এবং দেশের জল বায়ু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের স্বকীয় পর্য্যবেক্ষণের ফলও তাই। সুতরাং এরূপ স্থলে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই যে

অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষপাতী হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? ডাক্তার রিনণ্ট নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 'অরণ্য-উচ্ছেদ এবং অবনতি'(Deboisement et Decadence) শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে অরণ্যের উপকারিতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে অসংখ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎসমুদয় পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, যে মেঘখণ্ড অনাবৃত উত্তপ্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া এক বিন্দু বারিপাত না করিয়া চলিয়া যায় তাহা পাদপ পূর্ণ অরণ্যের উপর গিয়া অকাতরে স্বীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অবশ্য ডাক্তার রিনণ্ট অরণ্য অর্থে ক্ষুদ্র বৃক্ষ অথবা গুল্ম বিশিষ্ট জঙ্গল বলেন নাই এবং আমরাও অরণ্য অর্থে বহুল পরিমাণ শাখা পল্লব সমন্বিত বৃহৎ পাদপ সমষ্টিই বলিয়া আসিতেছি। ডাক্তার রিনণ্টের অভিমত যে প্রত্যেক দেশের আয়তনের অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রবাদ যে মেঘ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া পাহাড়ের শালবনে প্রবেশ করিয়া শালপাতা খায় ও তথায় বারিবর্ষণ করে। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত রহিয়াছে ইহা আমরা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। উক্তির বৈজ্ঞানিক যথার্থতা অনুভূত হইয়া থাকে। ইটালী এবং ফ্রান্স উভয় দেশেই আয়তনের অনুপাতে অরণ্যের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ জর্ম্মান ২৪ ভাগ, এবং রুসিয়া ৪০ ভাগ; অস্মদ্দেশে ২২.২২ ভাগ। তুলনায় বুঝিতে পারা যায় আমাদের দেশে অরণ্যের পরিমাণ উপযুক্ত না হইলেও অত্যন্ত কমও নহে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কোন সুবিখ্যাত ইংরাজি দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে তত্ত্বাধারণের অভাবে এবং অত্যধিক পরিমাণ কর্ত্তন,চারণ প্রভৃতি দ্বারা আমাদের সংরক্ষিত অরণ্য সমূহের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতেছে এবং বর্ত্তমান সময় হইতে উহার প্রতীকার না করিলে ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের প্রায় সকল পাঠকই অবগত আছেন যে গবর্ণমেণ্টের একটি বন-বিভাগ রহিয়াছে। যথোযুক্ত ভাগে অরণ্য সংরক্ষণ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। দেশ মধ্যে অনেক গুলি বড় বড় বন গবর্ণমেণ্টের খাসে রহিয়াছে। উপযুক্ত অবস্থায় এবং যথাবিধি নিয়ম ক্রমসারে এই সমস্ত অরণ্য বৃক্ষ কর্ত্তন অথবা পশ্বাদি চারণ করিতে অনুমতি দেওয়া যায়। অনেক নিঃস্ব ব্যক্তি বিশেষ অনুমত্যানুসারে বন হইতে বিনা ব্যয়ে কাট সংগ্রহ অথবা পশ্বাদি চারণ করিতে পারে। এই বিধান মহত উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইলেও ইহার ফল অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। অবশ্য জ্বালানি কাট, নানাবিধ গৃহসজ্জার জন্য পরিপক্ক বাঁশ এবং কাট, প্রভৃতি বন হইতে উপযুক্ত অথবা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং এতদ্দমুদয়কে সঙ্গত বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং গবর্ণমেণ্টও ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ বনবিভাগের সৃজনই এই নিমিত্ত। কিন্তু এতদ্ভিন্ন এবং ইহাদের সহিত জড়িত হইয়া যে কতকগুলি কাঠাহরণার্থ অসঙ্গত দাবিদাওয়া রহিয়াছে তাহাতেই অরণ্যের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। তৎসমুদয়কে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় (১)যথেষ্ট এবং অসমিচীন কর্ত্তন (২)অযথাপশ্বাদি চারণ (৩)অগ্নুৎপাত।

(১) যে পরিমাণ কাষ্ঠ প্রয়োজন তাহাই সাবধানে কর্ত্তন এবং গ্রহণ পূর্ব্বক লোকে যদি সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট হইত না। কিন্তু দেখা যায় যে একটি গাছ অথবা উহার এক অংশ লইতে হইলে লোক পার্শ্বস্থিত বহু সংখ্যক নবীন বৃক্ষ মারিয়া ফেলে, ৩।৪ টি বৃক্ষ কর্ত্তন করিবার পর একটি বৃক্ষ অথবা উহার এক অংশ গ্রহণ করে এবং এরূপ ভাবে বৃক্ষ কর্ত্তন করে যে, উহার গোড়া হইতে আর উত্তম রূপ চারা বাহির হয় না। অবশ্য অনেক সময় অজ্ঞানতা এবং তাচ্ছিল্য বশতঃ এই সমুদয় সংঘটিত হয়, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক বৃক্ষের অঙ্গহানি করার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। (২) অনিয়মিত পশ্বাদি চারণ দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয়। ছাগল প্রভৃতিতে সমস্ত নবীন পত্রাঙ্কুর খাইয়া ফেলে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে ১৫ হইতে ৩৫ বৎসরের বনে ছাগল চরিতে দিলে আর বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ১৫ বৎসর অপেক্ষা অল্প দিনের জঙ্গলে পশ্বাদি চারণে পুরাতন বৃক্ষও নাশ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পত্র, মুকুল, নবীন শাখা সমূহ ভগ্ন করিয়াই মেষ প্রভৃতি যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। (৩) অরণ্য অগ্ন্যুৎপাত নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তথাপি অনবধানতাবশতঃ সময়ে সময়ে উক্ত রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে

উপরোক্ত কারণ সমূহ ব্যতীত অরণ্যের উপযুক্ত পরিমাণ-বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের আরও কতকগুলি অন্তরায় রহিয়াছে। স্থানাভাববশতঃ আমরা তৎসমুদয় এ স্থলে বিবৃত করিতে পারিলাম না। ফলতঃ আমরা অরণ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলাম তৎসমুদয় হইতে প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, অরণ্যের সহিত কৃষি-কার্য্যের কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। গ্রাম অথবা বৃহৎ জনপদসমূহের নিকট জঙ্গল থাকা যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, লোকালয় হইতে উপযুক্ত ব্যবধানে বৃহৎ পাদপ-বিশিষ্ট অরণ্য থাকা তেমনই প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত স্থানের অদূরে অরণ্য বর্ত্তমান তৎসমুদয় স্থানের জল বায়ুর প্রবাহ স্বাস্থ্যকর, মৃত্তিকা রসযুক্ত অথচ আবদ্ধ জল সমন্বিত নহে এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প। আমাদের অরণ্যের ধারণা জঙ্গলের ধারণার সহিত জড়িত। তজ্জন্য আমরা অরণ্যের নামে ভয় পাইয়া থাকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্মযুক্ত স্থান স্বাস্থ্য এবং কৃষি উভয়েরই পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। উহার উচ্ছেদ করাই শ্রেয়। কিন্তু যে অরণ্যের প্রতি মহাকবি কালিদাসের 'তমালতালী বনরাজিনীলা' প্রযুজ্য হইতে পারে তাহা বাস্তবিকই প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি, দেশের মহৎ হিতসাধক এবং সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণীয়। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির যুগে এক বিন্দু বারিরও সংস্থান যাহাতে হয় সেই রূপ উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়। পল্লী দ্বারা কত স্থানের নদী স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, সংস্কার অভাবে কত বৃহৎ জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, অনাবৃষ্টির এবং অতিবৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য

থাকিলে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইত না। সুতরাং অরণ্য সংরক্ষণের উপর আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ করা প্রয়োজনীয়।

উপরুক্ত অরণ্য হইতে আমরা আরও কত যে উপকার পাই তাহার গণনা করা যায় না, যেমন—

শাল, সেগুণ, শিশু, মেহগ্নি চাঁপ প্রভৃতি গৃহসজ্জার উপযুক্ত অনেক মূল্যবান কাষ্ঠ আমরা অরণ্য হইতে সংগ্রহ করি।

ঘর বাঁধা,বেড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে সুন্দরী, গরাণ প্রভৃতি কাষ্ঠের নিত্য প্রয়োজন।

বাঁশ, উলু, গোলপাতা, খড়, পল অরণ্য হইতেই সংগ্রহ হয়।

অরণ্য না থাকিলে আমরা এত রাশি রাশি হরিতকী, আমলা, বহেড়া কোথায় পাইতাম—

অরণ্যের পাতা খাওয়াইয়া রেশম পোকা পালন করিয়া গুটি রেশম প্রস্তুত করিতে পারি—

অরণ্য হইতে আমরা কুরচী, লোধছাল, গন্ধবেনা প্রভৃতি অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাই।

মানুষকেও বাস করিতে হইবে বাসস্থান কিছু ফাকা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক বটে কিন্তু অদূরে অরণ্য থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় কাষ্ঠ ও তাহার উপযোগীতা

ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের প্রধান উপকরণ গুলির মধ্যে কাষ্ঠ একটী অত্যাবশ্যক পদার্থ। সমগ্র পৃথিবীতে কত প্রকার কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন এবং সে সমুদায় আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে তবে দেশীয় কাষ্ঠ সম্বন্ধে অল্পাধিক কিছু বর্ণণা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ কাষ্ঠের দুইটী শ্রেণী করা যাইতে পারে (১) কঠিন এবং ভারি, (২) কোমল এবং হালকা। এমত কতকগুলি কার্য্য আছে যাহাতে ভারি কাষ্ঠের প্রয়োজন কিন্তু অপর কতকগুলিতে ভারাধিক্য বাঞ্ছনীয় নহে। এতদবস্থায় উভয়বিধ কাষ্ঠের গুণাগুণ পর্য্যালোচনা আবশ্যক। এক একটী করিয়া কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাষ্ঠের দোষ গুণ ও কার্য্যকারিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। সেগুণ—সরল আঁশবিশিষ্ট হালকা অথচ বেশ দৃঢ় কাষ্ঠ। সাধারণতঃ রেঙ্গুন হইতে এই কাষ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই, যে ইহাতে

এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট তৈলাক্ত পদার্থ থাকাতে ইহাকে কোনও প্রকার কীটে হঠাৎ নষ্ট করিতে পারে না এবং অন্য কাষ্ঠে লৌহ সংযুক্ত থাকিলে সেই লৌহ যেমন অল্প সময়ের মধ্যে মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং কাষ্ঠের লৌহসংযুক্ত স্থানটীও যেমন জরিয়া যায় সেগুন কাষ্ঠে তদ্রূপ হয় না। কাষ্ঠ-দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই সেগুস-নির্ম্মিত; ইহা প্রায় সমস্ত কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে। দুয়ার, জানালার কপাট, চৌকাট, অধিকাংশ গৃহসজ্জার দ্রব্য, কড়ি, বরগা, খাট, চৌকী, গাড়ি, নৌকা জাহাজ নির্ম্মাণ ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য্যেই এই কাষ্ঠ প্রশস্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরাপর কাষ্ঠ যেমন রৌদ্র জলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, সেগুন তদ্রূপ নহে, ইহা এরূপ অবস্থাতেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; একারণ গৃহবহিঃস্থিত দুয়ার জানালাগুলি সেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত হওয়া উচিত। আজকাল ভাল শাল কাষ্ঠের অভাবে, লৌহের এবং সেগুন কাষ্ঠের কড়ি (Beam) যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেগুণের বীম ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সেগুলিকে বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক কেননা উহার মধ্যে ফোপরা থাকিলে কিম্বা উহা গাঁটবিশিষ্ট হইলে, কড়ির উপর যখন ভার লাগিবে তখন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এবং তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। কড়ির একধারে একজন তাহার কাণ সংলগ্ন করিয়া থাকিবে এবং অপর ধারে একজন আঘাত করিতে থাকিবে, ইহাতে কাণে যদি কণকণে আওয়াজ লাগে তাহা হইলে বীমে ফোপরা নাই জানিতে হইবে; এই প্রকারে সেগুনের গুঁড়ীও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। গাঁট আছে কিনা পরীক্ষা করা বিশেষ শক্ত নহে কারণ আঁশগুলি সরল থাকিলে সাধারণতঃ ভিতরে গাঁট থাকে না জানিতে হইবে। বীমের পরিমাণ ঘরের দৈর্ঘ্য অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে; সাধারণতঃ ৫ ফিট পরিসরবিশিষ্ট ঘরে ৫ ইঞ্চি গভীরতা-(depth) বিশিষ্ট কড়ি ব্যবহৃত হয়, তদূর্দ্ধে প্রত্যেক ২ ফিটে এক ইঞ্চি করিয়া গভীরতা বাড়িয়া থাকে; যথা ১৫ ফিট চওড়া ঘরে ১০ ইঞ্চি গভীরতাবিশিষ্ট কড়ি ব্যবহার করা উচিত। কড়ির প্রস্থের মাপ গভীরতার হইয়া থাকে। এক ঘন ফুট সেগুণ কাঠের ওজন সাধারণতঃ ২৫ সের হয় এবং কলিকাতায় উহার মূল্য ২।০ টাকা হইতে ২৸০ টাকার মধ্যে ছিল, এখন অনেক অধিক।

২। শাল—জড়িত আঁশবিশিষ্ট, খুব ভারী ও বেশ মজবুত কাঠ। পূর্ব্বে নেপাল দেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শাল কাঠ কলিকাতা অঞ্চলে আসিত; এই সকল কাঠ, সমসাময়িক গৃহে বীম, বরগা, দুয়ার, জানাল, কপাট চৌকাটরূপে যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া গিয়াছে কিন্তু আজকাল উক্ত কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী না হওয়ার জন্য গৃহীর পক্ষে শাল কাঠের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। গার্হস্থ্য ব্যাপারে শাল কাঠ আজকাল বীম এবং খুঁটীর জন্য ও কিয়ৎ পরিমাণে নৌকা গঠন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ছোটনাগপুর ও মধ্য প্রদেশীয় শাল এখন নেপালী শালের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে উক্ত প্রদেশের জঙ্গল হইতে এই

কাঠ বাহির হইয়া থাকে। প্রধানতঃ রেলের স্লিপারের (slipper) জন্য এই কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলে নৌকা গঠন কার্য্যে, রাণীগঞ্জ, ঝড়িয়া প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনির খুঁটীর জন্য ও কলিকাতার খোলার ঘর নির্ম্মাণ কার্য্যেও ইহার প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শাল কাঠ সরল আঁশবিশিষ্ট না হওয়ায় ইহাকে ভাল করিয়া পরিষ্কার করা যায় না এই জন্য গৃহোপকরণ (Furniture) নির্ম্মাণকার্য্যে ইহার ব্যবহার বিরল। কিন্তু ব্রহ্মদেশে শালকাঠের সিন্দুকে নানারূপ কারুকার্য্য দেখা যায়। শালের একটা প্রধান দোষ এই যে ইহাতে বড় পোকা লাগে এবং ক্রমান্বয়ে রৌদ্র জল পাইলে কাঠ ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। নেপালী শালের কড়ির দীর্ঘকাল স্থায়ীত্বের জন্য বিখ্যাত; কিন্তু নাগপুরী শালের সে গুণ না থাকায় কড়ি জন্য উহা অল্পই ব্যবহৃত হয়। নাগপুরী শালের গাছ খুব বড় বড় হয় এমন কি ৩ ফিট ব্যাস ও ৪০।৫০ ফিট উচ্চ বৃক্ষ দেখা গিয়াছে। এই প্রকার বড় বড় গাছ আজকাল গবর্ণমেণ্ট রক্ষিত জঙ্গল ভিন্ন অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। সিংহভূম প্রদেশে শাল কাঠের ব্যবসা অতিব লাভজনক। গবর্ণমেণ্টের জঙ্গলে কাঠের মূল্য ॥০ আনা হইতে।৵০ আনা। জঙ্গল রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১০।১২ মাইলের মধ্যে হইলে খরচ সমেত কাঠ আসিতে ॥৹ আনা হইতে ৸০ আনা ঘন ফুট পড়ন হয়। কিন্তু ষ্টেশনে যে সকল খরিদ্দার খরিদ করেন তাঁহারা ১৲ টাকা হইতে ১।৵০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া থাকেন। আর কলিকাতায় ঐ কাঠের মূল্য ২,২।০ টাকা ঘন ফুট ছিল, এখন সর্ব্বত্রই দর বাড়িয়াছে। ভাল শাল কাঠ এক ঘন ফুট ওজনে সাধারণতঃ ॥৭-৷৷৮ সাতাস আটাসসের হইয়া থাকে।

৩। শিশু পরিষ্কার আঁশবিশিষ্ট ও ভারী কাঠ। ইহা শাল অপেক্ষা মূল্যবান ও ইহাতে বেশ পরিষ্কার কাজ হয়। ইহার বর্ণ গাঢ় লাল। ইহাতে গাড়ী নির্ম্মাণ, দামী, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি গৃহসজ্জার দ্রব্য বেশ ভাল হয়। ছোট বোট নির্ম্মাণ কার্য্যে কিছু কিছু শিশু কাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক অস্ত্রের হাণ্ডেলের বেশ উপযুক্ত কাঠ। শিশু সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। এক ঘন ফুট শিশু কাঠের ওজন ॥৪-৷৷৫ চল্লিশ পঁচিশ সের।

৪। সুন্দরি—জড়িত আঁশবিশিষ্ট ভারি কাঠ। বঙ্গদেশের দক্ষিণ সুন্দরবনই ইহার উৎপত্তি স্থান। ইহার রং গাঢ় লাল। রৌদ্রে ও জলে পড়িয়া থাকিলে ইহার আয়তনের অনেক হ্রাসবৃদ্ধি হয়; এবং পর্য্যায়ক্রমে ঐ অবস্থায় থাকিলে বড় পোকা লাগে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কাঠ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের নৌকা নির্ম্মান কার্য্যে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ইহার মূল্যও তখন খুব কম ছিল। ১০ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরি কাঠের যে নৌকা প্রস্তুত করিতে ১০০ টাকা খরচ হইত আজকাল তাহাতে ২৫০ টাকা লাগে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে সুন্দরি আজকাল তত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না। গাড়ীর চাকার

পাখি সূত্রধরের রেঁদার (Planes) এবং ছোট ছোট গাছে ঘরের খুঁটী ও জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির জন্য সুন্দরি প্রধান। সুন্দরি গাছ খুব বড় হয় না, ২ ফিট ব্যাস ও ৩০।৩৫ ফিট লম্বা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ইহার প্রত্যেক ঘন ফুটের ওজন ২৬।২৭ সের।

৫। পশুর সুন্দরির ন্যায় শক্তি, ভাবি, সুন্দর ও সুন্দরবনজাত। তবে তত মোটা নয়; জোর ১ফুট ১॥ ফিট, লম্বে কিন্তু সুন্দররিরই সমান। ইহার খুঁটীই উত্তম। অগ্রভাগ একটু পোড়াইয়া মাটিতে পুতিলে খুঁটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। খুঁটীতে খোদাই কাজ বেশ পরিষ্কার হয়। এ পশুর গাছের মধ্যভাগের রং গাঢ় উপরিভাগের রং সাদা। মধ্যভাগটীই সার এবং ঐটুকুই কাজে লাগে। সুন্দরির ন্যায় উহাতে পোকা লাগে। ওজনে দুইই প্রায় সমান।

৬। বাবলা অনেক জাতীয় বাব্‌লা গাছ আছে ইহাদের কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় আশযুক্ত ইহাতে গো-শকটের চাকা প্রস্তুত হয়।

৭। তুঁত—তুঁত (Toon) কাষ্ঠে গৃহ সজ্জাদি প্রস্তুত হয়। এই কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ়। ইহাতে পালিশ বেশ ভাল হয়। ইহাতে অশ্বযানের চাকা, পেনেল, প্রভৃতি কার্য্য ভালরূপ সংসোধিত হইয়া থাকে।

৮। শিরিশ—ইহার কাষ্ঠে গৃহসজ্জা, ঘরের কড়ি বরগা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৯। আবলুস্—ইহার কাষ্ঠ কাল রঙের। ইহাতে উৎকৃষ্ট গৃহসজ্জা প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ খুব দৃঢ় এবং ভারি। ইহাতে লিখিবার আসবাব দোয়াতদানি, রোলার, ডেক্স, টেবিল উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১০। মেহগ্নি—ইহা কাঠের রাজা বলিলে হয়—কাঠের রঙ লাল। ইহাতে পালিস সুন্দর নানাপ্রকার আসবাব প্রস্তুতে ইহা অদ্বিতীয়। কাঠ খুব মুল্যবান। ৫০ হইতে ১০০ বৎসরের কম ইহার কাঠের সার জন্মে না—দুই রকম মেহগি ১ম—এক বড় পাতা, এক ছোট পাতা। ছোট পাতা মেহগ্নির কাষ্ঠই উৎকৃষ্টতর। এই গাছের বাড় অতিশয় কম।

১১। খল্‌সে—ইহার কাষ্ঠ খুব হাল্‌কা ইহা সাধারণতঃ জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে প্যাকিং বাক্স তৈয়ারি হয়। এই কাষ্ঠে দেশালাইয়ের বাক্স ও কাঠি তৈয়ারি হইতে পারে।

১২। শিমুল—ইহার কাঠও খুব হাল্‌কা। বেড়া দিবার কার্য্যে ইহার কাঠ বেশ উপযোগী এবং প্যাকিং বাক্স নির্ম্মাণের কাজেও লাগান যায়। শিমুলের তক্তা হাল্‌কা হইলেও বেশ দৃঢ় ইহাতে জানালা, দরজার কবাটও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার কাঠের রঙ শাদা।

১৩। চাঁপকাষ্ঠ—ইহার রঙ সেগুণ কাঠের মত। সেগুণ কাঠের পরিবর্ত্তে ইহা আজকাল ব্যবহার হইতেছে। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহার কাঠ অতিশয় বাড়ে কমে ইহাই ইহার একমাত্র দোষ। সেগুণ অপেক্ষা কিছু অধিক ভারি। ইহা রসশূন্য হইতে অধিক সময় লাগে। এবং ব্যবহার উপযোগী হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়।

১৪। গরাণ—সুন্দরির মত জ্বালানি কাষ্ঠরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। গরাণের ছাল সুন্দরির ছালের ন্যায় কাঠের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বেড়া দিবার কার্য্য ইহার ব্যবহার সমধিক ওজনে সুন্দরির মত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কোঁড়ক

Mushroom

খ। ছাতু।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বর্ত্তুলাকারের কয়েকটী শিলীন্ধ্র ও উদ্ভূত হয়। এ গুলির সাধারণ বাঙ্গালা নাম "ভূই-ফোড়"। যে গুলি নিতান্ত ছোট সে গুলির সাধারণ নাম বড়ি-ছাতু বা পুট্‌কা-ওৎ। বড় গুলির নাম আলু-ছাতু বা তুম্বা ওৎ। বড়ি-ছাতু তিন জাতীয় হইয়া থাকে; মানুষ-বড়ি (হর-পুট্‌কা), কুকুর-বড়ি) (শেতা-পুট্‌কা) এবং ব্যাং-বড়ি-(রটেপুট্‌কা) বর্ত্তুলাকারের আহার্য্য শিলীন্ধ্রের সাধারণ বাঙ্গালা নাম "ছাতু"।

৮। মানুষ-বড়ি ছাতু বা হর-পুটকা ওৎঃ—মাটীর নিম্নে হইয়া থাকে। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য। ইহা সাহেবদিগের বড়মানুষী মশরুমের আর একটী। ষ্টু, সুপ্ প্রভৃতি সাহেবী খাদ্যে এই ছাতু ব্যবহার করিলে ষ্টু বা সুপ্ ইত্যাদি খাইতে অতি সুস্বাদু হয়। মানুষবড়ি পাক করিলেও দৃঢ় থাকিয়া যায় এবং ব্যঞ্জনের ক্বাথ ঝোল ভাগটী মাত্র না খাইয়া ছাতু গুলিও যদি খাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলেই কখন কখন উদরাময় পীড়া হইয়া থাকে। ঝোলভাগটী মাত্র খাইলে কোন পীড়া হয় না। মানুষ-বড়ি-ছাতু যে খানে জন্মে সেখানকার মাটি ফাটিয়া যায়, এ কারণেই এই ছাতু অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। স্থানটীতে জল দাঁড়াইলে ক্রমশঃ ছাতু মাটি ফুঁড়িয়া উপরে বাহির হয়, নচেৎ মাটির মধ্যেই থাকিয়া যায়।

৯। কুকুর-বড়ি বা শেতা পুট্‌কাঃ—ইহাও মাটির নীচে জন্মে ও উপরিস্থ মৃত্তিকাকে বিদীর্ণ করিয়া আপন অবস্থান মানুষকে জ্ঞাপন করে। ইহা মানুষ-বড়ির ন্যায় তাদৃশ সুস্বাদু নহে বলিয়া ইহাকে কুকুর-বড়ি বলে, তবে মানুষ-বড়ির সহিত মিশাইয়া সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য লোকেরা ইহা আহার করিয়া থাকে। মানুষ বড়ির ন্যায় কুকুর বড়ির গাত্র মসৃণ নহে, দেখিতে শুভ্র লোম পূর্ণ।

১০। ব্যাং-বড়ি বা রটে পুটকাঃ—রাজপথের দুই পার্শ্বে ঘাসের সহিত মৃত্তিকার উপরিভাগে ছোট ছোট শুভ্র বর্ণের বর্ত্তুলাকারের যে বড়ি সর্ব্বদাই বর্ষার প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি শিলীন্ধ্রক জাতীয় অর্থাৎ অখাদ্য এবং বিষময়। এগুলি খাইলে মানুষ মাতালের ন্যায় হইয়া যায়, অধিক খাইলে মরিয়া যায়। সাঁওতালেরা বালি-ছাতার সহিত দুই পাঁচটা ব্যাং-বড়িও তুলিয়া পাক করিয়া খাইয়া থাকে। শালিক্-ছাতা বা গুবরে ছাতা যেরূপ বিষাক্ত, এছাতুটী সেরূপ বিষাক্ত নহে।

১১। আলু-ছাতু বা তুম্বা ওৎঃ—এগুলি মাঠের যেখানে সেখানে এবং পথের ধারে, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ জাতীয় শিলীন্ধ্রের মধ্যে ইহা যত সহজ প্রাপ্য অন্য কোনটী সেরূপ নহে। দেখিতে ইহা গোল আলুর ন্যায় কোনটী ছোট, কোনটী বড়। গোল আলু অপেক্ষা ইহার গাত্র কিঞ্চিৎ শুভ্র। ইহা ভাঙ্গিয়া দেখিলে ছানার ন্যায় অতিশুভ্র পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই পদার্থ কাঁচা আস্বাদন করিলেও নিতান্ত মন্দলাগে না। তবে ছাল ছাড়াইয়া আলুর ন্যায় কাটিয়া ইহা পাক করিয়া খাওয়াই নিয়ম ইহা অতি সহজ-পাচ্য।

গ।

চারি জাতীয় শিলীন্ধ্র সাঁওতালেরা কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকে। ইহাদের নাম মুর্গি-ছাতা (সাঁওতালী নাম, শিম্-ওৎ) কালসার-ছাতা (মুকুম-ওৎ), ঝাল ছাতা (কড়ুয়া-পটকা-ওৎ) ও লাল ছাতা (টোর্মা ওৎ)।

১২। মুর্গি-ছাতা বা শিম্ওৎঃ—ইহার ছত্রাংশ সিন্দুরের ন্যায় লোহিত বর্ণ। কুক্কুটগণ এই শিলীন্ধ্র খুঁটিয়া খাইয়া থাকে।

১৩। কালসার-ছাতা বা মুকুম্ ওৎঃ—ইহার বর্ণ কৃষ্ণ সারের ন্যায় ধূসর।

১৪। ঝাল-ছাতা বা কড়ুয়া পটকা ওৎঃ—ইহা কাঁচা খাইতে কিছু ঝাল বলিয়া ইহা খাইলে চক্ষু দিয়া জল পড়ে। পাক করিয়া খাইলে এই তীব্র আস্বাদন পাওয়া যায়। ইহা গোফা বা ফোলাছাতার ন্যায় অষাঢ় মাসে উদ্ভূত হয়, দেখিতেও "খর্ব্ব ফোলা-ছাতার" ন্যায় শুভ্র বর্ণ ও খর্ব্ব দণ্ড যুক্ত আস্বাদন ব্যতীত ইহা নির্দ্দেশ করিবার একটী উপায় আছে। ইহার ছত্র ও দণ্ড ভাগ এরোরুট বিস্কুটের ন্যায় মটমট্ করিয়া সহজে পৃথক্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

১৫। লাল-ছাতা বা টোর্মা ওৎঃ—ইহা মাটির মধ্যে হইতে বাহির হইবার সময়া ছত্রাংশ হরিদ্রা বর্ণের থাকে, ক্রমশঃ কমলা লেবুর রংএর মত উহার রং ঘোর হইয় আইসে। মুর্গি-ছাতা অপেক্ষা ইহা অনেক বড়। ইহার দণ্ডাংশ খুব মোটা ও সাদা। ইহা মুর্গির ও মানুষের খাদ্য এবং কাঁচা ও পাক করিয়া উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। ইহা খাইতে বড় ভাল নহে, পরিপাকও সহজে হয় না। পুটকাওৎ ও হরুৎ-ওৎ-এর ন্যায় ইহা পাক করিলে শক্ত থাকে। ঘ।

বৃহৎ জাতীয় ছত্রাকারের শিলীন্ধ্রকে বাঙ্গালা ভাষায় "কোড়ক্" কহিয়া থাকে। তিন জাতীয় কোঁড়ক প্রসিদ্ধ—বাঁশের কোঁড়ক্ (মাৎ-ওৎ) টানা কোঁড়ক (অর্থৎ-ওৎ) ও মোটা-কোঁড়ক্ (মোতাম্-ওৎ)। ভাদ্র মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত বনে জঙ্গলে কোঁড়ক পাওয়া যায়।

ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ঋণ বিধি

জমির উন্নতি সাধন, পুষ্করিণী খনন বা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার বা কূপ খনন ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন জন্য এই ঋণ ১৮৮৩ সালের ১৯ আইন অনুসারে দেওয়া হয়।

জেলার কালেক্টর সাহেব এই আইন মতে কোন একটী কার্য্য বাবত ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ প্রদান করিতে সক্ষম। তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা ঋণ প্রদান করিতে হইলে কমিশনর সাহেবের অনুমতি লইতে হয় এবং কোন একটী কার্য্যে ৫০০০৲ পাচ হাজার টাকার অধিক ঋণ লইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী আবশ্যক।

ঋণের জন্য কালেক্টর সাহেব কিম্বা মহকুমার কর্ম্মচারী অথবা কানুনগোর নিম্ন পদস্থ নহেন এমন রাজকর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিতে পারা যায়। এই আবেদন করিবার ফরম বিনা খরচায় দরখাস্তকারীগণ পাইবেন। দরখাস্ত দাখিল হইলে কাননগোর নিম্ন পদস্থ নহেন এমন কোন রাজকর্ম্মচারী দ্বারা কিম্বা কোন বিশ্বস্ত বেসরকারী দ্বারা তদন্ত করা হয়। যে ভূমির উৎকর্ষ সাধন জন্য ঋণ আবশ্যক তাহা ঋণ পরিশোধের জামিন স্বরূপ দিতে হয়। কিন্তু তাহার মূল্য ঋণ পরিশোধের জন্য যতেষ্ট বিবেচিত না হইলে

অন্য সম্পত্তির জামিন দিতে হয়। আবেদনকারীর কিম্বা তাহার প্রতিভূ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের অপরাপর যে হস্তান্তর যোগ্য স্বার্থ থাকে তাহা কিম্বা কোন ব্যক্তি জামিন হইতে পারিবে। আবদ্ধ সম্পত্তি কোনরূপ দায় সংযুক্ত কিনা জানিবার জন্য রেজিষ্টারী আফিস অনুসন্ধান করিতে হয়, কিন্তু সে জন্য যে খরচ হয় তাহা দরখাস্তকারীকে দিতে হয় না।

ঋণ মঞ্জুর হইলে আবেদনকারীকে একরার পত্র সম্পাদন করিতে হয়, এবং তাহাকে কোন প্রতিভূ দিবার প্রয়োজন হইলে ঐ প্রতিভূগণ যখন ব্যক্তিগত জামিন দেন বা স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখেন তখন তাঁহাদিগকে এক খত সম্পাদন করিতে হয়। যখন যে জমির জন্য ঋণ লওয়া হয় তাহা ভিন্ন অন্য স্থাবর সম্পত্তি জামিন স্বরূপ আবদ্ধ রাখা হয়, তখন একরারনামা ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করাইতে হয়।

যত টাকা ধার দেওয়া যায় তাহার পুরা সুদ সহ সমস্ত টাকা পরিশোধ হইয়া গেলে দেন্দার ইচ্ছা করিলে একরারপত্র ও খত যথা বিধি রহিত মতে ফেরৎ লইতে পারেন।

কালেক্টর অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঋণ সাধারণতঃ তিন কিস্তিতে দেওয়া হয় যথা—কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বের ঋণের আন্দাজ ।৵০ আনা অংশ, কার্য্যের মোটামুটি অর্দ্ধেক শেষ হইলে আন্দাজ ।৵০ অংশ, এবং যথাবিধি পরিদর্শনের পর কার্য্য হইয়াছে বলিয়া মঞ্জুর করা হইলে অবশিষ্ট সমস্ত।

ঋণের উপর সুদের সাধারণ হার বাৎসরিক টাকা প্রতি ।৵০ আনা অর্থাৎ শতকরা ৬.০ হইবে।

প্রতি বৎসরে ইং তাং জানুয়ারী ৩১শে তারিখে ঋণ পরিশোধের দিন ধার্য্য করা হয়। কিস্তীর টাকা সময় মত দাখিল না করিলে কালেক্টর সাহেব ঋণের সমস্ত টাকা ও সুদের জন্য সার্টিফিকেট জারী করিতে পারেন।

যদি কোন সময়ে ইহা প্রমাণিত হয় যে ঋণের টাকা বা তাহার কোন অংশ অযথা প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ যে কাজের জন্য ঋণ প্রদান করা হইয়াছে তাহা সাধিত হয় নাই বা ঐ টাকা অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ঋণের সমস্ত টাকা শতকরা ১২৷৷০ টাকা হারে সুদ সহ তৎক্ষণাৎ আদায় করিতে পারেন।

কালেক্টর সাহেব যদি বিশেষ কোন কারণে ফসল হানি হওয়ার দরুণ বা, অপর কোন দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ কোন কিস্তির টাকা দেনাদরের পক্ষে পরিশোধ করা কষ্টকর হইবে বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি কিস্তির টাকা আদায় কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন। এই কালের জন্য কোন সুদ ধরা হয় না।

কয় কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে তাহা কালেক্টর সাহেব স্থির করিয়া দেন।

কৃষকদিগকে ঋণ দানের নিয়ম

এই ঋণ কৃষকগণকে বীজ, সার, লাঙ্গল, গরু ইত্যাদি চাষের দ্রব্যাদি খরিদ জন্য ১৮৮৪ সালের ১২ আইন অনুসারে দেওয়া হয়।

এই আইনমতে কালেক্টর সাহেব প্রত্যেক স্থলে ৫০০৲ টাকা ও মহকুমার কর্ম্মচারী ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ প্রদান করিতে সমর্থ। তাহার অধিক ঋণ দান করিতে হইলে কমিসনার সাহেবের অনুমতি লইতে হয় এবং প্রত্যেক স্থলে ৩০০০৲ হাজার টাকার অধিক ঋণ দান করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী লইতে হয়।

কানুনগোর নিম্নপদস্থ নহেন এমন যে কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট ঋণের জন্য আবেদন দাখিল করা যাইতে পারে। আবেদন করিবার ফরম বিনা খরচায় দেওয়া হয়।

যদি এক গ্রামবাসী ৫জন বা ততোধিক আবেদনকারী সকলে একত্রে এবং প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত জামিন লইয়া ঋণ দেওয়া যাইতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিয়াও (ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ঋণের ন্যায়) এই ঋণ দেওয়া যায়।

ঋণ মঞ্জুর হইলে আবেদকারীকে একরার নামা সম্পাদন করিতে হয়। ঋণ গ্রহণ জন্য আবেদনকারীকে কোন প্রতিভূ দিতে হইলে যখন ঐ প্রতিভূগণ ব্যক্তিগত জামিন জন্য বা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখেন তখন তাঁহাদিগকে এক খত সম্পাদন করিতে হয় এবং উহা রেজিষ্টারি আইনমতে রেজিষ্ট্রী করাইতে হয়।

ঋণের সমস্ত টাকা মায় সুদ পরিশোধ হইলে আবেদকারী ইচ্ছা করিলে একরারনামা ও খত রহিত মতে ফেরত লইতে পারেন।

সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ঋণ পরিশোধের কিস্তির দিন ধার্য্য হয়।

ঋণের উপর সুদের সাধারণ হার বাৎসরিক টাকা প্রতি ৵০ এক আনা অর্থাৎ শতকরা ৬।০ টাকা হইবে।

ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে সার্টিফিকেট জারি দ্বারা কালেক্টর সমস্ত টাকা মায় সুদ আদায় করিতে পারেন। ব্যক্তিগত জামিন দিয়া ঋণ লইলে প্রথমতঃ সকলের নিকট টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়, তাহাতে আদায় না হইলে যে কোন এক জনের নিকট সমস্ত টাকা আদায় হইতে পারে।

কোন স্থানে কোন কারণে ফসল হানি হওয়ার দরুণ বা অপর কোন দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ কিস্তির টাকা দেওয়া ক্লেশকর হইবে যদি কালেক্টর সাহেব এইরূপ ধারণা করেন তাহা হইলে তিনি কিয়ৎকালের জন্য টাকা আদায় স্থগিত রাখিতে পারেন। এই কালের জন্য অতিরিক্ত সুদ দিতে হয় না।

কয় কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে তাহা কালেক্টর সাহেব স্থির করিয়া দেন। সাধারণতঃ এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

বাঁকুড়া কৃষি পঞ্জিকা।

দেশের কথা

দেশের খাদ্য শস্য এবং বস্ত্রাদি যেরূপ দিনদিন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে, তাহাতে এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই কৃষির দিকে এবং কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আশুক হইয়াছে। দেশে বিস্তর অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে। গবরমেণ্টর উচিত, এই সকল জমি,—জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতির নিকট হইতে বিলি করিয়া উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ দ্বারা কৃষি প্রসার করা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলে জমি সংগ্রহের জন্য অনেকেই উদ্যোগী হইয়াছিলেন; অনেকে জমি সংগ্রহও করিয়াছেন,—কিন্তু ইদানী আর যেন ততটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। একবার এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কয়েকজন শিক্ষিত যুবক ই-আই রেলের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকট প্রচুর পরিমাণে জমি লইয়া নানারূপ কৃষি কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচীন সপ্তগ্রাম এই ত্রিশবিঘা ষ্টেশনেরই অদূরে অবস্থিত। এখন এ অঞ্চলের অনেক স্থানই অরণ্যময়। ফল কথা,—অন্ন সমস্যার এই দুর্দ্দিনে ভূমিহীন লোকের ভূমি সংগ্রহ এবং কৃষিকার্য্য করিবার জন্য পারতপক্ষে চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক।

এ সম্বন্ধে দেশের লোকের যতটা দৃষ্টি না পড়ুক,—বেঙ্গল গবরমেণ্ট কিন্তু কৃষি উন্নতির জন্য যেন এক্ষনে কিঞ্চিৎ অধিকতর পরিমাণেই উদ্যোগ আয়োজন দেখাইতেছেন। ১৯১৯-২০ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ দেশের ছাত্রগণকে উন্নত প্রণালীর কৃষি শিখাইবার জন্য গবরমেণ্ট বিশেষ-চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য ঢাকায় একটী এবং চুঁচুড়ায় একটী কৃষি ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গতপূর্ব্ব বৎসর অনুমোদিত হইয়াছিল। ফলে ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। চুঁচুড়ায়ও এই বৎসর এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। বলা বাহুল্য,—চুঁচুড়ায় আদর্শ সরকারী কৃষিক্ষেত্রেই স্কুল বসিতেছে। মৈয়মনসিংহ, বগুড়া এবং কুমিল্লায় সরকারী কৃষিক্ষেত্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীরভূম বাঁকুড়া, মুরশিদাবাদ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলেও সরকারী কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

কেবল বিদ্যালয় বা কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াই গবরমেণ্ট নিশ্চিত নহেন, নূতন নূতন ফসল চাষেরও যথেষ্ট কার্য্য চলিতেছে। "কাকিয়া বোম্বাই" পাট এবং ইন্দ্রশালি ধান্যের চাষে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। দুধসর নামক এক প্রকার ধান্যের ফলন ইন্দ্রশাল ধান্যের ফলন অপেক্ষাও কিছু অধিক হইতেছে এবং ইহা কিছু আগে পাকে। পূর্ব্ববঙ্গের কটকতারা ধানেরও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলনের পরীক্ষা চলিতেছে। এ ধানও খুব আগে পাকে। দেশের নাতব্বর চাষী সমুহের এই সকল ধানের বিবরণ সযত্নে সংগ্রহ

করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহ হইতেও এই সব বিবরণ বিস্তৃতভাবে দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়া চৌকিদার এবং দফাদারগণ মারফত বা পঞ্চায়ত প্রেসিডেণ্ট মারফৎ গ্রামে গ্রামে প্রচারের ব্যবস্থা করা গবরমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য।

কেবল ধান্য বা পাট নহে, গত বৎসর তামাক চাষের উন্নতি চেষ্টাও বিশেষরূপ হইয়াছে। বুড়ী হাটের সরকারী কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের কৃষকেরা এক্ষণে সুমাত্রা তামাকের চাষ আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কাটতির ব্যবস্থাও ইহারা করিতেছে। বর্দ্ধমান বিভাগে চীনাবাদামের চাষ ক্রমেই বাড়িতেছে। নদীয়া জেলার অনুর্ব্বর উচ্চ জমিতেও এক্ষাণে চীনাবাদামের চাষ চেষ্টা হইতেছে। রাজসাহি বিভাগে গত বৎসর রবিখন্দ চাষের বৃদ্ধি চেষ্টাও বিশেষরূপ হইয়াছে। ইহার ফলে গত বৎসর এই বিভাগে আঠার শত মণ রবিখন্দের বীজ বিক্রীত হইয়াছে। গত বৎসর রেশম চাষেরও অনেক উন্নতি ব্যবস্থা হইয়াছে। গবরমেণ্ট এ সম্বন্ধে যেরূপ প্রচুর চেষ্টা করিতেছেন, এদেশের লোকেরও এ পক্ষে সেইরূপ ততোধিক চেষ্টা করা একান্ত উচিত।

গবরমেণ্ট আরও এক ব্যবস্থা প্রচুররূপে করিতেছেন। প্রত্যেক জেলায় সরকারী কৃষিক্ষত্রে প্রত্যেক বৎসর এক কৃষি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে গবরমেণ্ট ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইহাতে কৃষকগণকে কৃষি উৎপন্ন উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। ইহাতে প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমে উত্তম কৃষিদ্রব্য সমূহই উৎপন্ন হইতে পারিবে।

কৃষি সম্বন্ধে গবরমেণ্ট যাহা যাহা করিয়াছে বা করিতেছেন, তাহার কতক পরিচয় ত দিলাম তোমরা করিতেছ কি? তোমাদের টনক কি নড়িবে না?—বঙ্গবাসী

চিনি।—ইদানী এদেশে চিনি যেরূপে দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে চিনি যাহাতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইতে পারে,—সে সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিপাত খুব আবশ্যক হইয়াছে। সুখের বিষয়, আখ চাষ যাহাতে খুব বাড়িতে পারে, ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি তাহার বিশদ তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে আখ যথেষ্ট জন্মাইয়া থাকে। উত্তর বিহারে আখ জন্মে প্রচুর; দক্ষিণ বিহারেও আখ জন্মে। বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ দক্ষিণ বিহারের ইক্ষু উৎপত্তির যোগ্য ভূমিসমূহের এক ম্যাপ প্রকাশ করিয়াছেন। দক্ষিণ বিহারের কোন্ জেলায় কত আখ জন্মে—এই ম্যাপে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণ বিহারে যাহারা প্রচুর পরিমাণে আখ চাষ করিতে চাহে, তাহারা এই ম্যাপে অনেক সাহার্য্য পাইবে বলিয়াই প্রকাশ। এই ম্যাপের মূল্য এক টাকা; রাঁচিতে, বিহার উড়িষ্যা গবরমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে ইহা প্রাপ্তব্য। আশা করি, বঙ্গেও বঙ্গীয় গবরমেণ্ট অধিকতর ইক্ষু চাষের জন্য যথোচিত উদ্যোগী হইবেন। চাষাদের এখন পাট চাষ কমাইয়া আখ চাষই বেশী করা উচিত নহে কি?—বঙ্গবাসী

ময়দার ভেজাল—আজকাল ধর্ম্মহীনতার জন্য লোকের হিতাহিত বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়াছে। লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি না জাগিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। ময়দার কলের মালিকগণ পচা সীম, পচা মটর, সোডা, লবণ ও হাড়েরগুড়া ময়দার সঙ্গে পিষিয়া উচ্চ মূলো বিক্রয় করিত। তাহা খাইয়া লোকের উদরাময় প্রভৃতি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতেছিল। ইহা দেখিয়া একদল লোক অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কলের গুদামে উক্ত দ্রব্যসমূহ পায়। তাহাতে তাহারা উত্তেজিত হইয়া কল ওয়াদের উপর হাঙ্গামা করে। এখন উত্তেজনা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ভেজালের নষ্টামি সমভাবে চলিতেছে। নিজেদের নিজেরা রক্ষা করা উচিত নতুবা এখন হাঙ্গামা হইলে উপায় নাই। পুলিশও যে সে দেশব্যাপী হাঙ্গামার প্রতিকারে সহসা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে তাহাও বোধ হয় না। এখন হইতেই যদি কোন প্রতিকার করা হয়, তবেই রক্ষা।

ছোটকলেও বিষম ভেজাল—খড়গপুরে মাড়োয়ারী কয়েকটি হস্তচালিত ছোট ময়দার কল স্থাপন করিয়া ময়দার কারবার করিতেছে। তাহারা ময়দার সঙ্গে বাবলা জাতীয় ফল বা অন্য এক প্রকার অজ্ঞাতগুণসম্পন্ন ফলের শাঁস মিশাইয়া অবাধে বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের গুদামে উক্ত ফল বস্তা বস্তা মজুত আছে। কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তি ময়দার কলের কলত্তয়ালাগণও এক প্রকার সাদা পাথর গুঁড়া রাশীকৃত করিয়া রাখে, করিয়া ময়দার সঙ্গে ভেজাল দেয়। তাহাতে ময়দা বেশী ও ভারী হয়। প্রকাশ্যে এই সকল হীন কার্য্য করিতে ব্যবসায়ীরা কুণ্ঠিত নহেন। ইহাতে জ্ঞাত অজ্ঞাত এমন কতপ্রকার ভেজাল চলিতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?

প্রতিকারের উপায়—প্রতিকারের উপায় দেশবাসীর হস্তে। শিক্ষিত জনসাধারণ অবহিত হউন। এখন প্রতি জেলায় জেলায় রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে যেমন কো-অপারেটিভ ষ্টোর করিবার জন্য সরকার আদেশ দিয়াছেন, দেশীয় শিক্ষিত জনসাধারণ সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির পরস্পরের মধ্যে সরবরাহ জন্য সমবেত চেষ্টা ও মূলধনে উক্ত দ্রব্য সমুদয় উৎপাদন জন্য কারখানা খুলুন। একে অজন্মা, দুর্ম্মূল্য—দুর্ভিক্ষ! তাহার উপর বিষ ভক্ষণ! জীবন কয় দিন টিকিবে? সত্বর সাবধান হউন এবং প্রতিকারের উপায় করুন, নতুবা বাঁচিবার আশা নাই। গ্রামে ময়দা পিষিবার জন্য কল না করিতে পারেন ময়দা পিষিবার চাকি বা জাঁতা ঘরে রাখুন বা চাকিতে ময়দা ভাঙ্গিয়া বিক্রয়ে ব্যবস্থা করুন। তৈলের জন্য কলের ব্যবস্থা অপেক্ষা ঘানির ব্যবস্থাই সুবিধা! দশজন বিশজন বা ততোধিক ব্যক্তিতে মিলিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান খুলুন। যাঁহারা যৌথ কারবারের অংশীদার বা সভ্য হইবেন কেবল তাঁহাদিগকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যথামূল্যে সরবরাহ করিবেন। এইরূপ করিলে অতিলোভী ব্যবসায়ীবৃন্দ জব্দ এবং তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান হইবে।

খাদ্য শস্যের রপ্তানি হ্রাস—আর একটি ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক—সে ব্যবস্থাটি এই যে, রপ্তানী হ্রাস! এ কাজটি আমাদের নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাড়োয়ারী মহাজনগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া ধান্য, চাউল, সরিষা, কলাই, গম, যব, তিল, গুড় ও নানাপ্রকার তৈলের বীজ হাজার হাজার মণ ক্রয় করিয়া চালান দিতেছি! আর আমরা রাতারাতি বড় মানুষ হইবার জন্য তাহা অবাধে তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেছি! ইহা অপেক্ষা মুর্খতা আর কি আছে? ব্যবসায় করিতে হয় আমরা স্বয়ং ক'রব।

পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আমি হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার মালিক হইলেই প্রকৃত পক্ষে আমি ধনী বা সুখী নহি। আমার চারি পার্শ্বের শত শত হাজার হাজার লোক না খাইয়া রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, প্রত্যহ কত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কত কঙ্কালসার লোক অর্দ্ধমৃত হইয়া অচিন্ত্য যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে; তাহা দেখিয়াও কি আমার সুখ অক্ষুণ্ণ থাকে? মেদিনীপুর হিতৈষী

অভাব ও দুঃখ মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ গুরুমহাশয়

অভাব ও দুরবস্থায় শিক্ষা—আর্থিক অভাব না থাকিলে যেমন অপরিণামদর্শী লোকে বিলাসীতার চরমসীমায় উপনীত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আর্থিক অভাবেও লোকে ক্ষুধায় অন্ন না পাইয়া তিল তিল করিয়া মরে। এই অভাব ও স্বচ্ছলতার পর্য্যন্ত-সীমায় উপনীত হইলে তাহার ফলাফল দেখিয়া লোকের চৈতন্য হয়, তবে লোকে সাবধান হয়। সচ্ছলতায় লোকে রসে পচিয়া মরে, আর অভাবে শুষ্ক হইয়া মরে! সেই জন্য সাম্য প্রয়োজন! আর এই সাম্য রক্ষা করিতে হইলে পরস্পর মৈত্রী প্রয়োজন। পরস্পর এই মিত্রতায় আবদ্ধ হইলে, পরস্পরের সহায়তায় সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা আপনিই জন্মে! তখন কল কারখানা, উপায়, উদ্ভাবনায় দেশ ছাইয়া যাইবে। তখন ব্যষ্টি স্বাধীনতা যেমন সমষ্টি স্বাধীনতায় নির্ভর করিয়া বড় হইতে চায়, তদ্রূপ ব্যষ্টি স্বাধীনতাও সমষ্টি স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিয়া উদর-সমস্যা পূরণে অগ্রসর হয়। এই শিক্ষা যেদিন যে জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন সেই জাতি উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছে। ইহার ভিত্তি ত্যাগের উপর সংস্থাপিত। ত্যাগ নহিলে এ উন্নতি এ পারম্পর্য্য সংরক্ষা হয় না। ত্যাগ নহিলে এ মহত্ত্ব লাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই। "আমিকে" ছোট করিলে তবে এ বর লাভ হয়! জাপান যে দিন বুঝিল ছোট "আমি"র সমষ্টী করিয়া বড় আমি "আমি" না করিলে আর রক্ষা নাই, আমরা সকলেই মরিব, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই সে সমুদায় ছোট "আমি" একত্র করিয়া বড় "আমির" পায়ে ঢালিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিল—তুই "আমিকেই" বাঁচাইল। আমরা যে দিন ইহা বুঝিব সেদিন আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা দূর হইবে। সেই দিন আমরা ছোট বড়য় মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে কার্য্যক্ষেত্রে নামিব। দেশের ধনধান্য কেমন করিয়া দেশে থাকে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিব। সেই দিন আমরা পরস্পর পরস্পরকে মানিয়া চলিব, পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া অন্নবস্ত্রের দুঃখ মোচন করিব। সে দিনের আর বিলম্ব নাই। সে দিন ঐ অদূরে! সে দিন আমরা পরস্পর দ্বেষ হিংসা ভুলিব, সে দিন আমরা মিথ্যাচার ছাড়িব। সে দিন অধর্ম্ম দূরে পলায়ন করিবে। এখন আমাদের প্রত্যেকের মনেই এই চিন্তার উদয় হইতেছে, সুখের বিষয় বটে, কিন্তু অবিলম্বে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা চাই, তবেই সাফল্যের সম্ভাবনা নতুবা নহে।—মেদিনীপুরহিতৈষী।

পত্রাদি

কৃষকের জন্য 'পিয়েমন্ডি' স্বাক্ষরিত আমাদের দেশীয় লোকদের জ্ঞাতব্য আধুনিক কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি ছোট ছোট প্রবাস পাঠান হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী সংখ্যার "কৃষকে" ছাপাইলে বাধিত হইবে। যদি আপনাদের মত হয় তবে প্রতিমাসেই এরূপ ছোট প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। এ বিষয় আপনাদের স্পষ্ট মতামত জানাইলে বাধিত হইবে।

লেখক আপনাদের অপরিচিত নহেন। তিনি সময়াভাববশতঃ নিজে এগুলি পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁহার বহু লেখা বাহির হইয়াছে, এমন কি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে 'কৃষকেও' একবার বাহির হইয়াছিল। তিনি B.Sc. F.L.S: M.R.A.S. ইত্যাদি।

শ্রীপীযুস কান্তি দেববর্ম্মা

১। শুষ্ক স্থানে স্থানে গাছে জল দিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

যে সব জায়গার মাটী স্বভাবতঃ শুষ্ক সে সব স্থানে বৃক্ষাদি রোপন করিলে জল দিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। বেশী জল না দিলে শুষ্ক মাটী ভিজে না, আবার জল বেশী দিতে হইলেই বেশী জল সরবরাহ হওয়া দরকার। আর ঐ অতিরিক্ত জল সরবরাহের জন্য লোক এবং খরচ উভয়ই অতিরিক্ত লাগে। কিন্তু আরব ও ইটালীর অন্তঃপাতী কোন কোন স্থানে প্রখর গ্রীষ্মের সময়েও গাছে জল দিবার বেশ এক সুন্দর পন্থা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ উপর হইতে জল ঢালিয়া মাটী যেরূপ ভাবে ভিজান হয় তাহা না করিয়া এই প্রণালী মতে গাছের গোড়ায় শিকড়ের সন্নিকটে মাটীর বা লোহা ইত্যাদির ধাতব নল বসাইয়া সেই নলের মধ্য দিয়া জল দেওয়া হয়। এজন্য জলের অপচয় মোটেই হয় না, সুতরাং খরচও কম পড়ে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে

যে উপর হইতে জল দিতে গেলে প্রতিগাছে যে পরিমাণ জল লাগে তাহার তুলনায় এ প্রণালীমতে অর্দ্ধেক পরিমাণ মাত্র জল দিলেই চলে। এ প্রণালী অনুসরণের আরও কতকগুলি সুবিধা আছে। তন্মধ্যে মোটামুটি এই কয়েকটি কথা আমাদের জানা থাকা মন্দ নয়—যখন (১) জল অনর্থক অপচয় হয় না সুতরাং প্রয়োগ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ও প্রয়োজন হয় না; (২) যথাস্থানে পৌঁছে বলিয়া গাছে সতেজ হয় এবং ভাল ফল ধরে; (৩) শ্যাতশেঁতে জায়গায় কিম্বা উপর হইতে জল দেওয়ায় গাছের পাতা ইত্যাদি অনবরত ভিজিয়া থাকার দরুণ সাধারণতঃ গাছ ও ফলে যে সমস্ত রোগ দেখা যায়, এ প্রণালী অনুসরণে তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কাজে কাজেই বাজারে এ সমস্ত ফল ইত্যাদি বেশী দরে বিক্রীত হয়; (৪) কম খরচে তরল সার (Liquid manure) ব্যবহার করার পক্ষে এই উপায় অতি প্রশস্ত। এ প্রণালী এ দেশে আবশ্যক মত অনুসৃত হইলে সুফল ফলিবার কথা!

২। তামাকের পোকা

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের (United States) কৃষি বিভাগ কৃষিবিদ্যার উন্নতি ও প্রসারের জন্য যেরূপ অদম্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সাধারণের জ্ঞাতার্থ সময় সময় ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীদের অনুষ্ঠিত নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। সম্প্রতি ঐ বিভাগ হইতে তামাকের পোকা সম্বন্ধে একটী পুস্তিকা বাহির হইয়াছে 'The tobacco Beetle. Bulletin no. 737 of the U.S. Department of agriculture পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে তামাকের পাতাগুলির সংগ্রহের পর হইতে সিগারেট, চুরুট, নস্য ইত্যাদি বিক্রয়োপযোগী ব্যবহার্য্য নানা জিনিস প্রস্তুতের সময় পর্য্যন্ত যে কোন সময়ের মধ্যে Lasioderma serricorue নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। এ পোকা ভারতের তামাক পাতায় দেখা গিয়াছে। উপরোক্ত পুস্তিকায় কি উপায়ে এ আক্রমণ নির্দ্ধারণ ও নিবারণ করা যায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। এতদ্দেশে যাহারা তামাকের চাষ করেন বা ব্যবসা করেন তাহারা এ পুস্তিকা পাঠে উপকৃত হবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পিয়েমডি

দুর্গাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়
(পোঃ ভক্করাজহাট, চট্টগ্রাম।)

কৃষি বিভাগ-পাঠ্য তালিকা

বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্তরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন অতি কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। কেবল চাকুরীগত আয়ের দ্বারা কিছুতেই চলিতেছে না এবং চাকুরীর ক্ষেত্রও ক্রমশঃ ভারতীয় কৃষির অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ উপর ব্যক্তিকে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। সময়ের প্রভাব সুতরাং কৃষির উন্নতির দ্বারা অল্প সময়ের

মধ্যেই বহু লোক উপকৃত হইতে পারে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিগত যুদ্ধের সময় হইতেই কৃষিকার্য্যে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। এখন এদেশের উৎপন্ন—চাউল, গম আদি খাদ্য শস্য, পাট, কার্পাস, শন প্রভৃতি আঁশ (Fibres) এবং তৈল, সরিষা, তিসি ও রেড়ি প্রভৃতি তৈল বীজের (Oil seeds) উপর অনেক দেশকে নির্ভর করিতে হয়। চিনির মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ইক্ষুর চাষেও এখন প্রচুর লাভ হইতেছে। উপযুক্ত যত্নের সহিত চারি বিঘা (প্রায় সাহী এক কাণি) পরিমাণ জমিতে আখ, তামাক বা গোল আলুর চাষ করিলে, যে লাভ দাঁড়ায় তাহা আজকালকার বাজারের একজন বি, এ উপাধিধারী ব্যক্তির এক বৎসরের উপার্জ্জন অপেক্ষা কম নহে! ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির এমন আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে যে আমাদের অনেকের তাহা স্বপ্নবৎ বোধ হইবে। একই ক্ষুদ্র জমি হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া সারা বৎসরই নানা ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে।

অল্প মূল্যধন কৃষি এতদ্ব্যতীত কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গরু, ভেড়া, ছাগল পশু ও হাঁস কবুতর ইত্যাদি পক্ষী, রেশম ব্যবসায় ও লাক্ষা কীট (Lac insect) পালন এবং নিজ বাটী ও খামারের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী, ডোবা আদিতে মৎস্য পালন করিয়া স্বাধীনভাবে এবং শান্তি স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবনযাপন করা যাইতে পারে। কৃষিকসন্তান ও মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানের উপকারার্থেই প্রধানতঃ এই কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতেও এককালীন এবং মাসিক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। স্কুলের সঙ্গেই সরকারী বীজাগার (seed and manures store) স্থাপিত হইয়াছে এবং কৃষি বিভাগের একজন কৃষি পরিদর্শক (Agricultural Demonstrator) ঐ স্থানেই বাস করেন। স্কুলে প্রাথমিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botanay) রসায়ন (Chemistry) ও ভূবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্কুলের লাইব্রেরীতে কৃষি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তক ও পত্রিকা আছে। পাহাড় ও সমুদ্র তীরবর্ত্ত বিভিন্ন স্থানের নানাপ্রকারের কৃষি প্রণালী দেখিয়া শিখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছেন। স্কুলের ১০।১৫ মাইলের মধ্যেই আধুনিক প্রণালীতে পরিচালিত কয়েকটী চা বাগান ও ফুলের বাগান স্থাপিত হইয়াছে। উহাতেও অনেক শিখিবার ও দেখিবার বিষয় আছে। দুর্গাপুর ও পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামসকলে যেরূপ বিস্তির্ণ ভাবে আখের চাষ ও গুড়ের ব্যবসায় চলিতেছে, চট্টগ্রাম বিভাগ ত দূরের কথা বাঙ্গালা দেশের খুব কম স্থানেই সেরূপ আছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য ও জল বায়ু উত্তম। স্কুলে Football, Cricket, Basketball, Badminton ও নানা প্রকার Gymnastics এর সুবন্দোবস্ত আছে। আসাম

বেঙ্গল রেলওয়ের মিরসাই জোরারগঞ্জ এই উভয় ষ্টেশনই স্কুল হইতে ৩।৷মাইল দূর, উভয় ষ্টেশন হইতে গাড়ীর রাস্তা আছে। বাজার, পোষ্ট আফিস ও ডাক্তারখানা স্কুলের পার্শ্বেই অবস্থিত।

ভর্ত্তির নিয়ম

১। এখানে কৃষিশিক্ষা প্রধানতঃ হাতে কলমে এবং বাংলা পুস্তকের সাহায্যে দেওয়া হইবে। যাহারা ইংরাজী স্কুলের ২য় বা ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ভর্ত্তি করা হইবে।

শিক্ষা প্রণালী

শিক্ষাকার্য্য প্রধাতঃ একজন Sabour Agriculture College এর, ডিপ্লোমা প্রাপ্ত (L Ag) শিক্ষক ও একজন B Sc পাশ (Honours in Botany Chemistry) শিক্ষক দ্বারাই পরিচালিত হইবে ও এই উভয় শিক্ষকই বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতেছেন।

Agriculture Branch. Durgapur H. E. School. P. O. Bharadvaj-hat, Chittagong, Telegrams—Head master, Durgapur Mirsarai.

কৃষক মাঘ, ১৩২৭

কচুরি বিলাতী পানা (Water Hyacinth)

(Eichornia crassipes Solons.)

কচুরি পানায় পূর্ব্ববঙ্গের অনেক নদ নদী, খাল, বিল জলাশয় ভরিয়া উঠিতেছে। এমন কি অনেকস্থলে নৌকা চলাচলের অসুবিধা ঘটিতেছে, জেলেরা মাছ ধরিবার সময় বিঘ্ন ভোগ করিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। আইন দ্বারা সকলকে নিজ নিজ সীমানার মধ্যস্থ জলাশয়ের পানা নষ্ট করিবার জন্য বাধ্য না করিলে আর উপায়ান্তর নাই।

এই পানার বংশ বৃদ্ধি অতিশয়, ইহা প্রতি গাঁইটে গাঁইটে শিকড় ছাড়িয়া নূতন নূতন গাছের উৎপত্তি ঘটায়। একটী ঝাড়ে প্রায় ২০০ গাছ একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা উর্দ্ধেও খুব বাড়িয়া থাকে। ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালীর উপর বাঁশের কিম্বা কাঠের সেতু থাকিলে তাহার তলায় বিলাতী পানা জন্মাইয়া তাহার সংহতি শক্তিতে পুল উল্টাইয়া দিতেও দেখা যায়।

ইহা জল আচ্ছাদন করিয়া অনেক অসুবিধাত ঘটাইতেছে, অধিকন্তু ইহার নিম্নস্থ পুরাণ পাতা শিকড় পচিয়া জল দুষিত করিতেছে। এই জল বা তদুত্থিত হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকুল নহে, কারণ এমতাবস্থায় ইহাতে নানা জাতীয় রোগের জীবাণু ও কীটাণু আশ্রয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশের জলাশয়েও এই পানার উৎপাত আছে। ইহা জলে ভাসমান থাকিয়া বাড়িতে পারে বলিয়া বায়ুর বেগে বা স্রোতের সাহায্যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়া ইহাদের পক্ষে নিতান্ত সহজ। এই জাতীয় উদ্ভিদের পাতা পুরু। ইহাতে দুই প্রকারের পত্র বিন্যাস দেখা যায়; যে পাতা গুলি জলের মধ্যে থাকে সেগুলি লম্বা ও সরু, জলের উপরে যে পাতা জন্মে তাহা চওড়া ও অর্দ্ধ গোলাকার। গাছগুলি ১ ফুট হইতে ২ ফিট লম্বা হয়। ফুল দেখিতে সুন্দর। পুষ্প দণ্ড ১।১॥ ফিট লম্বা হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং সমুদয় ডাঁটাটি ঈষৎ হরিদ্রাভ নীল রঙের কলিকা আকারের ফুলে শোভিত থাকে। প্রত্যেক দণ্ডে ৮,১০টী ফুল থকে। ইহাতে শুঁটি হইয়া বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ পরিণত হইয়া আসিলে ডাঁটা বাঁকিয়া

জল মধ্যে নিমজ্জিত হয় এবং গুঁটি ফাটিয়া বীজ জল মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং আশ্রয় পাইলেই তাহা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। গাঁইট হইতে গাছ উৎপন্ন হইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এমেরিকায় এই পানা নষ্ট করিবার বিস্তর চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কোন প্রকারই তাদৃশ ফলবতী হয় নাই—সাফল্যের প্রধান অন্তরায় অত্যধিক খরচ। আর্সেনিক (সেঁকো) বিষ পিচকারি দ্বারা ছড়াইতে পারিলে উপকার হয়।



চিত্রে দেখা যাইতেছে কচুরী পানার কি প্রকারে বংশ বৃদ্ধি হইতেছে।

এখন দেখা উচিত ইহাকে কোন কাজে লাগাইতে পারা যায় কি না?—ইহার গাছ তুলিয়া শুকাইয়া লইয়া দগ্ধ করিতে পারিলে ইহা হইতে যে ছাই প্রস্তুত হয় তাহা উত্তম পটাস প্রধান সার। ইহার গাছ পচাইয়া চূর্ণ করিয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা চলে। ইহাতে পাতাসারের (Leaf mould) কার্য্য ভালরূপ হয়। কঠিন মাটিতে এইরূপ সার প্রয়োগ দ্বারা আলুগা করা যাইতে পারে। যেখানে ইহা বহুবিস্তৃতি

লাভ করিয়াছে সেখানে ইহা দমন করা নিতান্ত ব্যয় সাপেক্ষ ও কঠিন। ইহার গাছ পাতা গবাদি পশুর খাদ্য রূপেও ব্যবহার করা চলে। গোবৎসাদি ইহা আগ্রহে খায়। গবাদির শারীর পোষণের উপাদানও ইহাতে আছে। সার তৈয়ারি দ্বারা বা গবাদিকে খাওয়াইলেও ইহা ফুরাইবে না। ইহার অন্য প্রতিকার চাই। ইহার দামদল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া স্রোতে ভাসাইয়া দিলে ইহা স্রোতের টানে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতে পারে এবং লোণা জলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু ইহা সম্যক উপায় নহে কারণ নদীতে ভাসিতে ভাসিতে নৌকার, জাহাজের তলায়, জেঠিতে, নদীর বাঁকে কত জায়গায় যে বাঁধিয়া যাইবে তাহার সংখ্যা নাই এবং যেখানে ইহা আটকাইবে সেই খানেই ইহা বংশ বৃদ্ধি করিয়া—বিস্তৃতি লাভের চেষ্টা করিবে।

এমেরিকায় ইহার নাশের জন্য বড় বড় ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে ৬০০ পাউণ্ড শাদা আর্সেনিক গুড়া এবং ৬০০ পাউণ্ড সোডা ৬০০ গ্যালন জলে গুলিয়া উত্তাপ দ্বারা ফুলাইয়া আরক প্রস্তুতকরা হয়। এই আরক ট্যাঙ্কের অন্য একটি কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাতে আবশ্যকানুযায়ী ১২০০ গ্যালন পর্য্যন্ত শীতল জল মিশান হয় এবং তখন ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। এই ট্যাঙ্ক জলে ভাসিতে পারে। ষ্টীমলঞ্চ সাহায্যে এগুলিকে ইস্ততঃ টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, এবং উহা হইতে পানার উপর পিচকারি সাহায্যে ঐ দ্রাবক ছিটান হয়।

এমেরিকায় এই বিপদ যে আকর ধারণ করিয়াছে ভারতে এখনও সে আকার ধারণ করে নাই কিন্তু পূর্ব্ব সাবধান না হইলে পরে প্রতিকার অসম্ভব বা ব্যয়সাধ্য হইবে।

বৈদ্যুতিক উপায়ে বীজ সংস্কার

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে বীজ, কর্পূর জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ শুকাইয়া লইলে বীজের জীবনী শক্তি বাড়ে এবং বীজ সমধিক শক্তি সম্পন্ন হয়। বিলাতী বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন যে লবণ জলে চূণের জলে বা বীজ ভিজাইয়া তাহার মধ্যে দিয়া যদি বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালান যায় এবং পরে ঐ বীজ ছাকিয়া তুলিয়া শুকাইয়া লইলে বীজের জীবনী শক্তি বাড়ে বা বীজের অঙ্কুরোদ্গম সহজে ও অধিক মাত্রায় হয়। গাজর, বাঁধাকপি, ম্যাঙ্গোল্ড বীট লইয়া পরীক্ষা করা হইয়া ছিল বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা হেতু ম্যাঙ্গোণ্ডের অঙ্কুরোদ্গম সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য দেখা বটে—কিন্তু তাহাও সামান্য। বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংস্কৃত বীটের অঙ্কুরোদ্গম শতকরা ৯৪, অসংস্কৃত বীটের অঙ্কুরোদ্গম শতকরা ৮২, ক্ষার জলে বিটের অঙ্কুরোৎপত্তি শতকরা

অনেকে চাকরির জন্য লালায়িত, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান কিন্তু ভেবে দেখ ১টা কুমড়ার বীজ হইতে একটা গাছ তৈয়ারি করা পর্য্যন্ত বড় বেশী ৵০ আনা খরচ পড়ে। সেই গাছে ৪টা কুমড়া ফলিবে এরূপ আশা করা যায়—৪টা কুমড়ার দাম এ বাজারে এক টাকার কম নহে—সুতরাং ৸৵০ চৌদ্দ আনা লাভ কেহ ছাড়ায় না। ইহা পড়ে পাওয়া চোদ্দ না। তার পর আরও কত কি করিতে পার তাহা এক বার ভাবিয়া দেখ—তুলা চাষ করিয়া কাপড় পর্য্যন্ত বুনিতে পার, গোমহিষ পুষিয়া দুধ,দধি, ক্ষির, ঘৃত বানাইতে পার, মাছের চাষ করিতে পার। মাছের সারে তোমার জমি উর্ব্বরা হইতে পারে, মাছের তেল তোমার কত কাজে লাগিবে—মাছ খাদ্যত আছেই। পাট হইতে পারে, মাছের তেল তোমার কত কাজে লাগিবে—মাছ খাদ্যত আছেই। পাট বুনিয়া তাহা হইতেই রসা রসি, চট, থলে সবই প্রস্তুত করিতে পার, তুঁত গাছের আবাদ করিয়া, রেড়ীর আবাদ করিয়া রেশম প্রস্তুত করিতে পার, ছাগল ভেড়া পালন দ্বারা তুমি পশম উৎপন্ন করিতে পার। জল, মাটি, উত্তাপ হাতে পাইলে তুমি না পার কি করিতে!

এই ব্রাহ্মণ বংশের সংশ্রবে যে কেহ আসিয়াছে তাহারা কেহ চাকরি করে না—কামার, কুমার, ছুতার, ধীবর, মুচী, গোয়ালা সকলেই এক পরিবার ভুক্ত—সকলের অভাবে তিনি এবং সকলে তাঁহার অভাব পূরণ করে। তিনি অপুত্রক—কিন্তু তাঁহার পুত্র কন্যার অভাব নাই—

স পিতা পিতর স্তোষাম কেবলং জন্ম হেতবঃ।

তিনি সকলেরই পিতা তাহাদের জন্মদাতা পিতাসত্ত্বেও শিক্ষায়, দীক্ষায়, অভাবে, অভিযোগে তিনিই তাঁহাদের পিতা। তাঁহার স্ব গ্রামে অনাথ আশ্রম আছে, এখানে অন্ধ, খঞ্জ, বধীর সকলেই খেতে পায়, আশ্রয় হীন আশ্রয় পায়। এখানে সকলকেই উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা হয়—

সাবলম্বন এখানকার শিক্ষার মূল মন্ত্র।

রাত্রি ৮টার সময় তাঁহার হরকরাগণ যাইয়া গ্রাম ঘুরিয়া আসে—আসিয়া খবর দেয় কেহ অভুক্ত আছে কি না। যদি থাকে তখন ১কঠা (পাঁচপোয়া) চাউল, কিছু ডাউল, লবন তৈল তাহার নিকট পাঠান হয়। সকলের খোজ লইয়া তিনি তবে আহার করেন।

ঐশ্বর্য্য একা ভোগ করা যায় না, সকলে মিলিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগে কত সুখ তাহা ভোক্তাই অনুভব করিতে পারে। হতভাগা যারা তারা ভাগ দিতে চায় না। সকলে মিলিয়া কাঁদিয়াও যে সুখ আছে।

কর্ম্ম বিভাগ করিয়া কাজ কর—কাজেব শৃঙ্খলা হইবে। সব কাজ একা করা যায় না, এক কাজ সকলে মিলিয়া করিতে যাওয়াও দোষ। কৃষি আমাদের মূল—কিন্তু কামার, কুমার, ছুতার, তেলী, ধীবর সকলকে কৃষিদ্বার রক্ষা-করিতে হইবে এবং সকলে মিলিয়া কৃষিকে রক্ষা করিবে। কৃষি সচ্ছন্দে চলিলে তবে শিল্প বানিজ্য ফুটিয়া উঠিবে।

কৃষির প্রধান অবলম্বন গো-গণ, একারণে গো-গণকে যত্নে পালন ও রক্ষা করিতে হইবে।

প্রকৃতি সযত্নে সকলকেই ডাকিতেছেন যে তোরা কে ধন লইবি ত আয়। গোমাতা-গণও প্রত্যহ প্রাতে ক্ষির ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া হাম্বা হাম্বা রবে ডাকে—আয় ক্ষির লইবি ত আয়। ক্ষির প্রদানের জন্য কত আকুলি ব্যাকুলি করে—অস্পষ্ট রবে কত কি জানায়। এযে মায়ের আহ্বান। মাটি ও গো একত্র সংস্থাপন কর তাহাদের যথাযথ সেবা কর, তোমার সব মিলিবে। গোময়, গোমূত্রের মত এমন উৎকৃষ্ট ও সহজপ্রাপ্য সার আর কোথায় পাইবে। ইহাতে উদ্ভিদের খাদ্য—নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্ফরিক অম্ল সকলই পাওয়া যায়। ইহা জমির প্রাকৃতিক গঠন বদলাইয়া দেয়, কঠিন জমিকে নরম করে, মাটিতে রস সংরক্ষণের সুবিধা করে।

জমি লইয়া, গরু লইয়া কাজে লাগিয়া যাও, তোমার গৃহ ফল শস্যে পূর্ণ হইবে তোমার গ্রাসাচ্ছাদন জুটিবে এবং পোষ্য প্রতিপালন হইবে।

এখনও আমরা বিদেশীগণের হাত ধরিয়া চলিয়াছি, তারা ছাড়া যেন আমাদের গতি নাই। তারা কিন্তু মনে করে যে তারাই—

আমাদের বাপের ঠাকুর

আমরা তাদের পোষা কুকুর।

এ বড় হীন অবস্থা। নিজের আত্মরক্ষার উপায় নাই, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে।

আমরা ছেলেদের সাবলম্বন শিখাইতে চাই—তারা জুতাগড়া থেকে চণ্ডীপাঠ সব রকম শিখিবে। গুরু গৃহে থেকে তারা এই শিক্ষাই পাইত। তারা গুরু গৃহে থাকিয়া গো-রক্ষণ, কৃষি, পশু পালন, গৃহস্থালী রেশম, পশম ও কার্পাস সুত্র প্রস্তুত পর্য্যন্ত কিছু কিছু শিখিত। আবার সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতীষ, ষড় দর্শনের আলোচনা করিত। অস্ত্র বিদ্যা, সঙ্গিত বিদ্যা কোন শিক্ষাই বাদ পড়িত না। এখন কলেজের ছেলেকে গৃহস্থালী করিতে দিলেই সর্ব্বনাশ!

Education is a mould ; মানুষের মন প্রথমাবস্থায় কাদার তালের মত নরম থাকে। তাকে যে ছাঁচে ফেলিবে সেই রকম আকার ধারণ করিবে। সাহেবিয়ানার সংস্পর্শে আসিলে সে ভাবে ব্যবহারে সাহেবিয়ানার অনুকরণ করিবেই। আমরা বিদ্যাই শিখি এবং বুদ্ধিমানই হই নিজের জাতীয়তা ভুলি কেন, আমরা আত্মসর্ব্বস্ব হই কেন, নিজেকে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া ফেলি কেন? বিদ্যাবল, বুদ্ধি বল, অর্থ বল যাহা কিছু অর্জ্জণ করি তাহাত কেবল নিজের ভোগের জন্য নহে—ত্যাগেই ইহার সাফল্য—ত্যাগই ভারতের ধর্ম্ম। ভোগের সুখ সসীম, ত্যাগের সুখ অসীম।

আর একটা বড় ভয় হচ্ছে—য়ুরোপের দেখাদেখি ভারতে কতকগুলা কলকারখানা

করে যেন ভারতের মাটীর মানুষগুলাকে কলের মানুষ করে না ফেলি। আজকালকার নেতৃবৃন্দ! দোহাই তোমাদের—ভারতের মানুষকে মাটি ছাড়া করিও না। তাহাদিগকে গো বৎসাদি লইয়া নদ নদী, পুকুর কুপাদি লইয়া পাহাড় পর্ব্বত, কানন প্রান্তর লইয়া সন্তান সন্ততি প্রতিবাসী সহিত উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সচ্ছন্দচিত্তে স্বাধীন হৃদয়ে বাস করিতে দাও। সুবৃহৎ অট্টালিকার সুদৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে শিক্ষা এবং প্রকৃতির উন্মুক্তক্ষেত্রে শিক্ষা এ দুয়ের পার্থক্য অনেক।

জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান গঙ্গা টিকুরি—নদীয়া।

বাগানের মাসিককার্য্য

ফাল্গুন মাস

সব্জী বাগান—তরমুজ, সশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যেসকল সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ হইবে। সব্জীক্ষেত্র জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এইসময় বপন করিলেও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর যব সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র চষিয়া ভবিষ্যৎতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগানে—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফলের বাগান—এখন, জুই, মল্লীকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই টবে রক্ষিত পাতবাহার, পাম প্রভৃতি মুলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বসাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাসের গোড়ায় সারের কার্য্য করে। এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়া প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
প্রেষ্ঠ সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
প্রেষ্ঠ সং
কলিকাতা।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২১শখণ্ড } ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৭ সাল { ১১ ও ১২ সংখ্যা

শ্বেত সার।

শ্রীশশী ভূষণ সরকার লিখিত

অনেকেই পালোর বিষয় জানিতে চাহেন। অনেক শস্যাদি ও ফল মূলের পালো আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। মহামান্য ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পালোর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার লেখা অনুসরণ করিয়া পালো সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। তাঁহার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইতে দেখিয়াছি। পালো বিষয়ে প্রবোধ বাবুও লিখিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু বাকী নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী অন্য কথা আমি বলিব।

রাসায়নিক ভাষায় পালোকে শ্বেত-সার বলে। উদ্ভিদ্-শরীরে ইহা সঞ্চিত হয়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের বীজে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। মূলের ন্যায় বস্তু,—যেমন গোল আলু, রাঙা আলু, ওল, আরোরুট,—এ সকল বস্তুতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাল জাতীয় বৃক্ষেও ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথি শ্বেত-সার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক প্রকার তাল গাছ হইতে সাবুদানা সংগৃহীত হয়। সাবুদানা শ্বেতসার ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

চাউলের বারো আনা ভাগ শ্বেত-সার। একখণ্ড কাপড়ে চাউলের গুঁড়া বাঁধিয়া পুটুলিটী ক্রমাগত জলে ধুইলে, তাহার ভিতর হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের পদার্থ নির্গত হয় এবং জলটী দুধের ন্যায় সাদা হইয়া যায়। অশ্বত্থমার মা ইহাই ছেলেকে দুধ বলিয়া খাইতে দিয়াছিলেন। চাউল হইতে এই যে শ্বেতবর্ণের পদার্থ নির্গত হয়, ইহাই শ্বেত-সার। সুতরাং শ্বেত-সার প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার নহে। চাউল, মকাই, আলু আরোরুট প্রভৃতি বস্তুকে প্রথম চূর্ণ করিয়া, তাহার পর বার বার জলে ধুইয়া

পরিষ্কার করিয়া,অবশেষে শুষ্ক,করিলেই শ্বেত-সার হয়। অধিক পরিমাণে শ্বেত-সার প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কল আছে। চাউল-চূর্ণ-পূর্ণ পুঁটুলি জলে ক্রমাগত ধুইলে, তাহার ভিতর অবশিষ্ট আর কিছু রহিয়া যায় না। সে জন্য বুঝিতে হইবে যে, শ্বেত-সার ব্যতীত চাউলের অন্য কোন পদার্থ বড় আর কিছু নাই। গমের ময়দাও পুঁটুলি বাঁধিয়া এইরূপে জলে ধুইলে, তাহা হইতে শ্বেত-সার নির্গত হয়। ময়দা ধুইলে কিন্তু শেষকালে পুঁটুলিতে আর একটী পদার্থ লাগিয়া থাকে। আটার মত, ইহা কিছু চটচটে। এই পদার্থকে গুলুটেন বলে। চাউলের গুলুটেন অতি সামান্যভাবে থাকে। যব, মকাই, জোয়ার, বাজরা এই সমস্ত ঘাসের বীজ ও শ্বেত-সার দিয়া গঠিত। এ সমুদয় বস্তুতেও গুলুটেন অতি সামান্যভাবে থাকে। গোল আলু, রাঙা আলু প্রভৃতি পদার্থও শ্বেত সার দিয়া গঠিত। ইহাতে গুলুটেন নাই, বলিলেই হয়। আলুতে জলের ভাগ অধিক। আলুর প্রায় বারো আনা জল।

খরিদার কোথায়?—কিছুকাল পূর্ব্বে আমি শিল্প-সমিতিকে রাঙা আলু ও আরোরুট হইতে শ্বেত-সার বাহির করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়াছিলাম। কাসাভা নামক এক প্রকার বিদেশীয় শ্বেত-সার-পূর্ণ মূলেরও চাষ করিতে বলিয়াছিলাম। গোল আলু হইতে আমি শ্বেত-সার বাহির করিবার পরামর্শ দিই নাই। গোল আলু হইতে পালো বাহির করিতে, আমার বোধ হয়, খরচ অধিক পড়িবে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কথা এই যে, পালো করিয়া হবে কি? কে তাহা খরিদ করিবে, কোথায় তাহা বিক্রয় করিব? শ্বেত-সার হইতে বিলাতে মদ হয়, কাপড়ের কলপ হয়, আটা হয়, কৃত্রিম হস্তী-দন্ত হয়। সেখানে এ বস্তুর খরিদার আছে। আমাদের দেশে ইহার খরিদার নাই। কোন একটী নূতন বস্তু চালাইতে হইলে, নিজে বিক্রয় স্থানে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। সেই জন্য বিলাত ও আমেরিকার লোক আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। সেই জন্য এক-ঘড়িওয়ালা আড়াই টাকায় এক একটী ঘড়ি বেচিয়া কলিকাতায় লালদিঘীর ধারে রাজভবন-সদৃশ বৃহৎ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ অট্টালিকা তাঁহাদের বোধ, পৃথিবীর সকল নগরেই আছে। কিন্তু আমাদের কোন একটী নূতন কাজে হাত দিবার যো নাই। কি বিদ্যা, কি জ্ঞান, কি ধন-উপার্জ্জন করিতে আমরা বিদেশে যাইতে পারি না। অনেকে এখনও মনে করে বিদেশে গমন করিলে আমাদের জাতি যাইবে, পিতা মাতা আত্মীয়স্বজনও যাইতে নিষেধ করে। কেরাণিগিরি দুর্লভ হইয়া আসিতেছে এবং ঐ কার্য্যের লাঞ্ছনাও বাড়িতেছে। সুতরাং কুলিবৃত্তি ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই। অমৃত বাজার পত্রিকা সম্প্রতি হিসাব দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের ভদ্রলোকগণ ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক আমার উপদেশ

এই যে কোন একটা নূতন বস্তু প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে সে দ্রব্যের খরিদদার আছে কি না, অথবা তাহার খরিদার করিতে পারিব কি না। আরোরুটের খরিদার এ দেশে আছে। সে জন্য বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইহার চাষ করিয়াছিলেন, বটকৃষ্ণ পালেরও আরোরুটের চাষ আছে। যদি কাহারও বীজের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর ভারতীয় কৃষিসমিতি তাহা দিতে পারিবেন। বীজ অবশ্য দাম দিয়া কিনিতে হইবে।

আমাদের আহার

চাউল, গম প্রভৃতি বস্তু প্রধানতঃ শ্বেত সার দিয়া গঠিত। সুতরাং শ্বেত-সার মানুষের প্রধান খাদ্য। ধান, গম প্রভৃতি বীজ হইতে উদ্ভিদদিগের সন্তান উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া তরুণ অবস্থায় ইহা দ্বারা প্রতিপালিত হইবে, সে জন্য উদ্ভিদগণ এই শ্বেত-সার সঞ্চিত করিয়া রাখে। গোবৎসকে বঞ্চিত করিয়া মানুষ যেরূপ গরুর দুগ্ধ অপহরণ করে, সেইরূপ উদ্ভিদ শিশুদিগকে ভ্রূণ অবস্থায় বধ করিয়া, তাহার খাদ্য দ্বারা, আমরা আপনাদিগের শরীর পোষণ করি। মানুষ-শরীর পোষণের নিমিত্ত এই কয় প্রকার বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন; (১) যাহাতে মাংস গঠিত হয়; (২) যাহাতে অস্থি হয়; (৩) যাহাতে শরীর উত্তাপ ও শক্তি হয়। এই কয় বস্তু ব্যতীত জলও অনেক পান করিতে হয়। গমে যে আটার ন্যায় পদার্থ থাকে; যাহাকে গুলুটেন বলে, তাহা দ্বারা মাংস গঠিত হয়। চাউলে সে পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে, সে জন্য চাউলের গুড়া দিয়া আমরা রুটি করিতে পারি না। চাউলে এই পদার্থ অধিক নাই সে জন্য মাংস-গঠনের উপযোগী পদার্থ চাউলের ভালরূপ পাই না। দাল এ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে এজন্য ভাতের সহিত আমরা দলে ভক্ষণ করি। তরকারীতে হাড় গঠনের উপযোগী পদার্থ থাকে। চাউলের শ্বেত-সারে উত্তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়; তৈল ও ঘৃত হইতেও উত্তাপের উৎপত্তি হয়। আমাদের শরীরে মাংশ, অস্থি, শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বদা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। আহার দ্বারা সেই ক্ষয় দিন দিন পূরণ হইতেছে। ভাত হইতে শক্তি, তৈল ও ঘৃত হইতে উত্তাপ দাল হইতে মাংস, তরকারী হইতে অস্থি অহরহ মানুষ শরীরে উৎপাদিত হইতেছে।

মুখের লালা

কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আহার,—শরীরের ভিতর পরিপাক না হইলে, এ সব কাজ কিছুই হয় না। শরীরের ভিতর পাকযন্ত্রে আহার পিষ্ট হইয়া প্রথম তরল অবস্থায় পরিণত হয়। সেই বস্তু তারপর রক্তে পরিণত হইয়া,শরীরের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া পোষণকার্য্য সাধন করে। আহার তরল না হইলে তাহার দ্বারা শরীর পরিপোষিত হয় না। কিন্তু আমাদের প্রধান আহার—শ্বেত-সার। ইনি সামান্য জলে দ্রবীভূত হইয়া তরল অবস্থায়

পরিণত হন না। আহার করিবার সময় মুখের ভিতর ভাত যখন চর্ব্বিত হয়, তখন ইহার সহিত মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া যায়। লালার গুণে শ্বেত সার চিনিতে পরিণত হয়। চিনি জলে গলিয়া যায়। সুতরাং আমরা যে ভাত খাই, প্রথম চিনিতে তাহা পরিণত না হইলে, শরীরের কোন কাজেই লাগে না। সে জন্য ভাত মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভাতে জল দিয়া ফেলিয়া রাখিলেও, ইহার শ্বেত-সার, বায়ুস্থিত এক প্রকার বীজাণুর সহায়তায়, প্রথমে চিনিতে পরিণত হয়, তাহার পর সেই চিনি সুরায় পরিণত হয়। ভাত হইতে পচই অথবা মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথম ইহাকে চিনিতে পরিণত করা চাই। গন্ধকের দ্রাবক যোগেও শ্বেত-সার চিনিতে পরিণত করিতে পারা যায়। সেই জন্য গন্ধকের দ্রাবকের সহায়তায় পরিত্যক্ত নেকড়া প্রভৃতি উদ্ভিদজাত পদার্থ হইতে চিনি ও মদ প্রস্তুত হয়।

চিবাইবার চাকর

আপন আপন সন্তান প্রতিপালনের নিমিত্ত উদ্ভিদগণ বীজে, পক্ষীগণ ডিম্বে, গো মহিষ প্রভৃতি পশুগণ স্তনে যে খাদ্য সঞ্চয় করে, মানুষ তাহা অপহরণ করিয়া স্বদেহ পরিপোষণ করে। খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত পশুগণ উদরের ভিতর যে বস্তু সঞ্চয় করে তাহাও মানুষ ছাড়িয়া দেয় না। কোন কোন পশুর পিত্ত দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয় ও আহার পরিপাকের নিমিত্ত পেপসিন নামক আর একটী পদার্থ জীবের উদরে সঞ্চিত হয়। শূকরের পেপসিন অজীর্ণরোগের একটী প্রধান ঔষধ। খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত মুখের লালাও নিতান্ত আবশ্যক। যদি ষাঁড়ের পিত্ত লইলাম, যদি শূকরের পেপসিন লইলাম, তাহা হইলে মুখের লালা লইতে দোষ কি?

নাম করিলেই আমাদের গা শিহরিয়া উঠে, কিন্তু পৃথিবীতে, এমন মানুষও আছে, যাহার অন্য লোকের মুখের লালা সাদরে ভক্ষণ করে। লালার গুণে শ্বেত-সার শীঘ্র চিনিতে পরিণত হয়; তাহার পর সেই চিনি তরল হইয়া, শরীর পোষণে উপযোগী হয়। খাদ্যের সহিত শ্বেত-সার মিশ্রিত করিতে হইলে ভালরূপে চর্ব্বণ করা আবশ্যক। চর্ব্বণ করিতে পরিশ্রম হয়। বড় মানুষ লোকে কি এত পরিশ্রম করিতে পারেন? সে জন্য কোন কোন স্থানে বড় মানুষ লোক তাঁহাদের খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া দিবার নিমিত্ত চাকর নিযুক্ত করেন। সেই ভৃত্যেরা খাবার চিবাইয়া দেয়, তবে তাঁহারা ভক্ষণ করেন। শ্বেত সার চিনিতে পরিণত হইলে, তাহার পর ইহা হইতে সুরা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কোন কোন স্থানে শস্য প্রথমে ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া, তাহার পর তাহা হইতে লোকে সুরা প্রস্তুত করে। এ সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলিবার রহিল। বারান্তরে তাহা বলিব।

পালো তৈয়ারি করিবার সহজ প্রণালী—গম, যব প্রভৃতি, এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, পেষণ করা হয়। এই পেষিত গম বা যব জলে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। পালো তৈয়ারির কল আছে। ঐ কলের মধ্যে ঘুরাইলে জল ও পালো পৃথক হইয়া পড়ে। চাউল হইতে পালো প্রস্তুত করা তত সহজ নহে। চাউল প্রথমত কষ্টিক সোডার ক্ষীণ দ্রাবণে এক দিন সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়, পরে ধৌত করিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করা হয়। পরে এই পিষ্ঠকে পুনঃ ক্ষার-দ্রাবণ যোগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা জলে আন্দোলিত করা হয়। এই প্রণালীমতে প্রথমতঃ চাউল এক দিন জলে সিক্ত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয়। পরে এই পিষ্টক জলে মিশ্রিত করিয়া, ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের দ্রাবণ যোগ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে, পালো ব্যতীত পিষ্টকের অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত হয়। তৎপরে পালো জমাইয়া জলে ধৌত করিয়া লইয়া পালো বাহির করা যায়।

আলুর পালো প্রস্তুত করিতে হইলে, আলুর ছাল ফেলিয়া ঢেঁকী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে পেষিয়া লইবে। পরে সালফিউরিক এসিডের দ্রাবণযুক্ত জলে ইহা, মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ জল কোন পাত্রে রাখিলে, পূর্ব্বের ন্যায়, পালো এই পাত্রের তলায় জমা হয়। ইহার পর, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, কষ্টীক সোডা (অভাবে সোডা) মিশ্রিত জলদ্বারা ইহা ধৌত করিলে ইহার তৈলাদি পদার্থ দূরীকৃত হয়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কষ্টীক সোডা মিশ্রিত জল ও পরে পরিস্কৃত জল দ্বারা ধৌত না করিলে, কোন পালোই বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

আলু ভুট্টা ও জুয়ার (সুলভ হইলে), তাহা হইতে পালো বাহির করা খুব লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে।

এরোরুট ও সিমুলিয়া আলুর মূল হইতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পালো বাহির করা যাইতে পারে।

ফলশস্যাদিতে শ্বেতসার ও শর্করার পরিমাণ

		পূর্ণ মাত্রা	পচনীয় অংশ
গমের আটা	...	৭১·৯	৭৩·৬
ভুট্টার আটা	...	৭৫·৪	৭৩·৯
জইয়ের আটা	...	৬৬·২	৬৪·৯
চাউল	...	৭৯·০	৭৭·৪
কাঁচা শিম	...	৬·৯	...

	পূর্ণমাত্রা	পচনীয় অংশ
বিট পালং ...	৭·৭	৭·৩
বান্ধা কপি ...	২·৬	৪·৬
কাঁচা ভুট্টা দানা ...	১৯·৭	...
সশা ...	২·৬	...
পিয়াজ ...	৮·৯	...
সিমের ডাইল ...	৫৯·৬	৫৭·৮
মটর ডাইল ...	৬২·০	...
কড়াই শুঁটী (খোসা ছাড়ান)...	১৬·৯	...
বরবটী ডাইল ...	৬০·৮	...
বিলাতী আলু ...	১৪·৭	১৪·০
মিঠা আলু ...	২১·৯	২০·৮
বিলাতী বেগুণ ...	৩·৯	৩.৭
শালগম ...	৫·৭	...
আপেল ফল ...	১০·৮	৯·৭
কলা ...	১৪·৩	১২·৯
আঙ্গুর ফল ...	১৪·৪	১৩·০
লেবু ...	৫·৯	·৪
কমলা লেবু ...	৮·৫	৭.৭
তরমুজ ...	২·৭	...
খেজুর ...	৭০·৬	...
নারিকেল (মালার সহিত) ...	১৪·৬	...
নারিকেল (মালা ছাড়ান) ...	৩১·৫	...
চীনা বাদাম ...	১৮·৫	...

কৃষি-রসায়ন।

নারিকেলের মাখন

নারিকেলের সবই উপকারী। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ী ও মাদুর, মালা হইতে হুকা ও জল পাত্র বোতাম, শস্য হইতে তৈল ও খাদ্যদ্রব্য এবং জল হইতে স্বাস্থ্যকর পানীয় হয় পাওয়া যায়। এমন জিনিষ পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবর্ষ নারিকেলের জন্য সুবিখ্যাত। ইউরোপ বিজ্ঞানবলে নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা মূর্খ,সুতরাং আমরা নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মাখন ও ঘৃত দুর্লভ হইয়াছে। পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহ বিজ্ঞানবলে আপনাদের অভাব মোচন করিতেছেন, আর আমরা ঘৃত নামে বিদিত চীনাবাদামের তৈল কিম্বা পপকৃষ্ট চর্ব্বি খাইয়া অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতেছি। নারিকেলের তৈল বেশ পুষ্টিকর পদার্থ। বোম্বাই অঞ্চলে সরিষার তৈল ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয় না। সেখানে সরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে নারিকেলের তৈল রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের তৈলের একটা দুর্গন্ধ আছে। সদ্যজাত নারিকেল তৈলে রন্ধন ও মিষ্টান্ন পাক করিলে খাদ্য সুস্বাদু হয়। কিন্তু নারিকেল তৈ দুই চারিদিনের পুরাতন হইলেই তাহাতে দুর্গন্ধ হয়। এই দুর্গন্ধের জন্য ইহা রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু অভ্যাস সব বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে পায়ে। বোম্বাইর অধিবাসীরা নারিকেল তৈলে যে দুর্গন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন না।

ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ নারিকেলের শুকনা শস্য জর্ম্মনি ও ফ্রান্সে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই শুকনা শস্যকে "কোপরা" বলে। ইউরোপীয়েরা "কোপরা" দ্বারা কি করে, তাহা জানিতাম না।

ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলস ও জর্ম্মণীর অন্তর্গত মানহিম নগরে দুইজন বাণিজ্যদূত লিখিয়াছেন, "ফ্রান্সে ভেজিটেলাইলন" নামক এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। এই পদার্থ ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভারতবর্ষের নারিকেল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ইহা দেখিতে ঠিক মাখনের মত। রুটী, বিস্কুট, ও নানা প্রকার পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা মাখন অপেক্ষা সস্তা। মাখনের দ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিলে তাহা সুখাদ্য হয় বটে,কিন্তু "ভেজিটেলাইনের" দ্বারা প্রস্তুত করিলে আরও সুস্বাদ হইয়া থাকে। ইহা অতি পুষ্টিকর ও রসাল দ্রব্য।

জর্ম্মণীর অন্তর্গত মানহিমের ইংরেজ বাণিজ্যদূত মিঃ হেরিস লিখিয়াছেন, মানহিমের কারখানায় প্রতিদিন ২৮০ মণ মাখন প্রস্তুত হয়। এই মাখনকে "পামিন" বা "ককুসনন" অর্থাৎ নারিকেলের মাখন বলে। নারিকেলের শস্য হইতে এই মাখন প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা মাখন ও চর্ব্বির কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ শুভ্র, প্রায়

স্বাদবিহীন, ৮০ ডিগ্রি উত্তাপে গলিয়া যায়। এই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে তৈলের অংশ ৯০ ভাগ ও অতি সামান্য জল আছে। বিশুদ্ধ মাখনের মধ্যে তৈলের অংশ ৮৫ ও জলের অংশ ১৫ ভাগ। সুতরাং "পামিন" আসল মাখন। অপেক্ষা অধিক উপকারী। এই পামিন ঠাণ্ডা জায়গায় ৩।৪ মাস অবিকৃত থাকিতে পারে। সাধারণ তৈলাক্ত পদার্থ হইতে ইহা অধিক পুষ্টিকর ও সহজে জীর্ণ হয়। ইহার এক সেরের মূল্য এক টাকা। জর্ম্মণীতে এক সের আসল মাখনের দাম দুই টাকার কম নয়। নারিকেলের শস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকনা অবস্থায় এদেশে আমদানী করা হয়। এই নারিকেল খণ্ড নানা উপায়ে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করা হয়। ইহা দ্বারা নারিকেলের সর্ব্বপ্রকার এসিড ও অন্যান্য বাজে পদার্থ পৃথক হইয়া যায়। কেবল উদ্ভিজ্জ তৈলাক্ত পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। মাখন প্রস্তুতের কল অনেকে দেখিয়াছেন। মাখন প্রস্তুতের জন্য "সেপারেটার" নামক এক কল ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের উদ্ভিজ্জ তৈলাক্ত পদার্থও এই "সেপারেটারে" ঢালিয়া দিয়া তাহা হইতে জল ও অন্যান্য পদার্থ পৃথক্ করা হইয়া থাকে।

ফ্রান্সের "ভেজিটেলাইন" ও জর্ম্মণীর "পামিন" বা "ককুসনস" আমাদের নারিকেল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতের নারিকেল ফ্রান্স ও জর্ম্মণীতে যায়, সেখানে তাহা হইতে মাখন প্রস্তুত হয়। এই মাখন ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। নারিকেল হইতে কত মাখন প্রস্তুত হয়, আমরা সে সংবাদ পাই নাই; কিন্তু জর্ম্মণীর একটা কারখানাতেই প্রতি দিন ২৮০ মণ মাখন প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্যাপারটা কম নয়। এই মাখন পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য। সুতরাং ইহার কটতি আরও বাড়িবে।

ভারতবর্ষে কি এই মাখন প্রস্তুত হইতে পারে না? এই প্রশ্ন মনে উদিত হইবা মাত্র প্রাণ বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। আমাদের জন্মভূমি রত্নহীনা নহেন। কিন্তু আমাদের অযত্নে সব রত্ন ধূলি সমান হইয়া রহিয়াছে।

একটা কথা মনে হইতেছে। জাপানে পূর্ব্বে দেশলাইয়ের কারখানা ছিল না, এজন্য কেহই দেশলাই তৈয়ার করিতে জানিত না। আত্ম বলিদান না করিলে জগতে কোন মহৎ কার্য্য হইতে পারে না। জাপান সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আত্ম বলিদান করিয়া স্বদেশে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে রাজভূষা পরিত্যাগ করিলেন, রাজবেশ ত্যাগ করিয়া মুটে মজুরের পরিচ্ছদ পরিলেন। সুইডেনে গমন করিয়া কোন দেশলাইর কারখানায় ঝাড়ুদারের কার্য্যে বহাল হইলেন। কারখানার মালিক জানিতেন না যে, ইনি জাপান সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহাও বুঝিতে পারে নাই যে, ইনি লেখা পড়া জানেন, রসায়ণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুতরাং ইনি কারখানার সর্ব্বত্র অবাধে যাইতে

পারিতেন। মুখ ঝাড়ুদার কি আবার দেশলাই নির্ম্মাণের গোপনীয় কৌশল শিখিতে পারে? সুতরাং আর কেহ সেখানে যাইতে পারিত না, এই ঝাড়ুদার সম্মার্জ্জনী হস্তে সেখানে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিল। ইনি কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিয়া দেশলাই নির্ম্মাণের সমস্ত প্রণালী শিক্ষা করিলেন এবং স্বদেশে আগমন করিয়া সকলকে দেশলাই নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দিলেন। সেই হইতে জাপানে এত দেশলাই নির্ম্মিত হয় যে, চীন ও শিঙ্গাপুরে বিদেশী দেশলাইর আমদানী বন্ধ হইয়াছে। জাপানী দেশলাই ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়াছে, জাপানী দেশলাই ইউরোপে পর্য্যন্ত প্রেরিত হইতেছে।

জাপানীদের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ কি কোন আয়োজন হইবে না? বোম্বাইর ওয়াগ্গে কুলির কার্য্য করিয়া বিলাতে কাচ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়া, বোম্বাইর কেলকার কুলির কার্য্য করিয়া ইংরেজ তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্রয়ন প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। ভারতে যে সকল ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা আছে, সেই সকল ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইবার যে কোন আয়োজন হইবে তাহাতে কিছুনা কিছু কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা।

আজ নারিকেলের মাখনের কথারই আলোচনা করিতেছি। এই মাখন অতি সহজে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানে উপাধি প্রাপ্ত কোন কোন যুবকের ফ্রান্স ও জর্ম্মণীতে পাঠাইয়া এই ব্যবসায়ের কৌশল শিখাইয়া আনা যাইতে পারে। নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখিলে আমাদের ঘৃতের অভাব দূর হইবে, বিদেশেও নারিকেলের মাখন রপ্তানি করিয়া আমাদের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিব। কিন্তু প্রশ্ন এই কে এই ব্যয়ভার বহন করিবেন?—

কি প্রকারে শুকনা নারিকেলের শাঁস হইতে মাখন প্রস্তুত হয় এদেশের লোক জ্ঞাত নহে। কিন্তু দেশের কাঁচা নারিকেল হইতে গ্রাম্য প্রণালীতে মাখন প্রস্তুত হইয়া থাকে। টাটকা ঝুনা নারিকেল "কুরিয়া" বা পিষিয়া লইয়া তাহা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া লইতে হয়। এই দুগ্ধ মন্থন করিলেই মাখন উত্থিত হয় এবং দুধের উপর ভাসিতে থাকে। এইরূপে প্রস্তুত মাখন হইতে স্বচ্ছন্দে ঘৃত প্রস্তুত হইতে পারে। এই ঘৃতে নারিকেল তৈলের দুর্গন্ধ থাকে না; খাইতে অতি সুস্বাদু। এইরূপে নারিকেলের মাখন প্রস্তুত করিয়া আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। নারিকেল মাখনের আস্বাদন প্রকৃত আস্বাদন অপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন নহে বরং তাহার মিষ্টগন্ধ আরও মন মুগ্ধকর। তবে শুকনা নারিকেল শাঁস হইতে যে কি প্রকারে মাখন করা যাইতে পারে তাহা অবশ্য শিক্ষা করা উচিত। কারণ ব্যবসায়ের জন্য এ পর্য্যন্ত কেহ এ দেশে নারিকেল মাখন তৈয়ারী করেন নাই। ব্যবসায় চালাইতে গেলে সর্ব্বদা টাটকা ঝুনা নারিকেল পাওয়া সুকঠিন হইবে। আর কি কলকজা ব্যবহার করিলে সহজে ও সস্তায় মাখন প্রস্তুত হইতে পারে তাহাও আমাদের শিক্ষা করা উচিত। এজন্য আমরা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত বৈদেশিক

শিক্ষার পোষকতা করি। সদ্যজাত নারিকেল মাখন ও ঘৃত যে সুস্বাদু তাহা সম্প্রতি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। নারিকেল মাখন বা ঘৃত কতদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে। যথা সময়ে ফলাফল পাঠক গণকে জানান যাইবে।
—জনৈক পল্লীবাসী।

বঙ্গদেশের জলতত্ত্ব

(শ্রীমহাভারতী লিখিত প্রবন্ধ হইতে)

জল কেবল মনুষ্যের এবং জীব সমূহের জীবন নহে, ইহা উদ্ভিদের এবং অচেতন পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ বলিয়া পরিগণিত। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকের একথা জানা নাই যে, শিলা বা শৈল অথবা ধাতুর খনি বা খাদ গুলিতে যদি বহুকাল পর্য্যন্ত সলিলের সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে প্রস্তরের গুরুত্ব, পর্ব্বতের তুঙ্গত্ব, খনির উৎপাদিকা শক্তি এবং খরাজের প্রশস্ততা ক্রমে ক্রমে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। আমি বহুস্থানে দেখিয়াছি যে, বহুবর্ষকাল পর্য্যন্ত আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত না হওয়ার, বড় বড় পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য, স্থূলতা, গুরুত্ব, উৎপাদিকা শক্তি, পরিধি অথবা প্রশস্ততা বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক জলের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক পদার্থেরই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাঁহারা কৃষিকার্য্য না করিয়া কেবল ব্যবসা করেন অথবা কারখানা চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটেও জল প্রতি পদে পদে প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। তুলার কল, সুরকীর কল, ইটের কারখানা প্রভৃতি জল না হইলে একেবারেই চলে না। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সর্ব্বোপেক্ষা জলের অধিকতম প্রয়োজন। কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বিধান জন্য যতই যত্ন ও পরিশ্রম করা যাউক, জলের অত্যন্ত অভাব অথবা সম্পূর্ণাভাব হইলে কৃষকের কার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। কৃষকেরা সাধারণতঃ যে কয়েক প্রকার জল ব্যবহার করে তাহাকে আমরা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অভিহিত করিতে পারি, তদ্যথা—আকাশজল বা বৃষ্টি; পর্ব্বত জল অর্থাৎ ঝরণা প্রভৃতি; মর্ত্তজল অর্থাৎ সরোবর দীর্ঘিকা, নদ, নদী খাল, বিল, ঝিল প্রভৃতি; এবং পাতাল জল অর্থাৎ মৃত্তিকার নিম্ন হইতে আপনা হইতে ফোয়ারা (উৎস) আকারে যে জল উদ্ধত হয় তাহাই পাতাল জল। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে এই চারি প্রকার জলের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে আর এক প্রকার জলের উৎপাদন হইতে পারে, তাহা এস্থলে নানা কারণে উল্লেখ করিতেছি। ডিনেমাইট (dynameti প্রয়োগে বা গোলাবর্ষণদ্বারা আকাশে কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করিবার সম্প্রতি

এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; প্রাচীন ঋষিরা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাশি রাশি ধূমের সাহায্যে কৃত্রিম মেঘ উৎপাদন করিতেন, ইহাও প্রাচীনকালের গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে; কিন্তু সে সকল কথার উপরে নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য চলে না এবং চলিতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য, সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই কৃত্রিম জলের বিবরণ উহ্য রাখা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। ইউরোপীয় রসায়ণ শাস্ত্রে জলকে "কোমল" ও "কঠিন" (Hard water and Soft water) এই দুই নব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত এই দুই কথার সম্পর্ক না থাকায় আমি তাহারও উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রাচীন এবং নবীন জাতিদিগের শাস্ত্র সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি যে, কৃষিকার্য্যের জন্য উপরিউক্ত চারি প্রকার জলের মধ্যে "উৎসজল" (পাতালজল) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু এই মহোপকারী জল প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য প্রকার জলের সঙ্গে তুলনা করিলে পাতাল জল কৃষির পক্ষে শ্রেষ্ঠতম; অন্য জলে ৫ মাসে যে কার্য্য হয়, পাতাল জলে ৫ সপ্তাহে তদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ধানের চাষ সর্ব্বাধিক, সুতরাং ধান্য চাষ সম্বন্ধে প্রোক্ত চারি প্রকার জলের দ্বারা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

(দৃষ্টান্ত)

জল।	সময়।
আকাশ জল	৫ মাস
পর্ব্বত জল	৪ মাস
মর্ত্ত জল	২ মাস
উৎস জল	৫ সপ্তাহ

অর্থাৎ ক্ষেত্রের শস্যে বা বপনকালে ৫ মাস মধ্যে আকাশ জলের (বৃষ্টির) দ্বারা যে পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, পর্ব্বত জলে ৪ মাস মধ্যে, মর্ত্ত জলে ২ মাস মধ্যে সেইরূপ উপকার পাওয়া যায়। উৎসজল সকল সময়ে এবং সকল স্থানে সুলভ নহে, পর্ব্বতের ঝরণার জলও সকল দেশে মিলে না, সুতরাং মেঘের জল এবং মর্ত্তজলেরই উপর কৃষকেরা প্রধানতঃ আশা ও ভরসা স্থাপন করে। মেঘের জল (বৃষ্টি) সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের প্রয়োজন অনুসারে, সময় বিশেষে, বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার অল্পতা বা আধিক্য অনুভূত হয়, অর্থাৎ কোনও কৃষক তাহার নিজের স্বার্থানুসারে ভাদ্র মাসে জল চায়, কেহ বৈশাখে জল প্রার্থনা করে, কেহবা মাঘ বা ফাল্গুনে বৃষ্টির জন্য লালায়িত হয়। শস্যের অবস্থা দেখিয়া বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, জলতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বৎসরান্তর্গত বারমাসের জলের

উপকারীতা, অনুপকারীতা শুদ্ধতা অশুদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, বিশেষতঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানবিদ বিদ্বদ্বৃন্দেরও সহিত একমত হইয়া, যে সকল প্রয়োজনীয় অভিমত অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুক্ষ্মানুসুক্ষরূপে বুঝিতে পারিলে, জানিতে পারিলে উপকার হয়। সম্বৎসর মধ্যে মাঘ মাসের জল অথবা মাঘের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহার জল বঙ্গের কৃষিকার্য্য পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও উপকারী ইহা সর্ব্ববাদী সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। মাঘের জলের পরে বৈশাখের এবং বৈশাখের পরে শ্রাবনের জল প্রশস্ত। অন্যান্য মাসের জল তুলনায় বা সমালোচনায় প্রায় সমতুল্য। কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন উপরিউক্ত তিন মাসের জলে, কৃষিকার্য্যোপযোগী সমুদয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা মাঘের জলকে অত্যন্ত উপকারী বলিয়া স্থির করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥

সমুদায় ভারতের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশকে অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হয়; বাঙ্গালার সমুদয় স্থান অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে অধিকতর বৃষ্টি পতিত হয়। বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, সন্দীপ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কতিপয় স্থানে "আঁশ মাটি" নামে এক প্রকার শাৎলা মৃত্তিকা দেখা যায়, উহার উপরে বৃষ্টি পতিত হইবামাত্র উহা জমিকে সরস করিয়া দেয়, এই পাৎলা মাটির এরূপ শক্তি যে, একবার ইহাতে বৃষ্টি বা অপর জল পতিত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত জল না পাইলেও ইহা তরলত্ব সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। "কালো তুল্য মাটি" নামে আর এক প্রকার মৃত্তিকা আছে, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে অথবা তদুপরে মেঘের জল পতিত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার তরলত্ব থাকিয়া যায়, সুতরাং অনাবৃষ্টি বা জলাভাব বশতঃ সেই জমির বিশেষ ক্ষতি হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন " The blac cotton soil is noted for its power of retaining moisture." এই মাটিতে অন্য জলপেক্ষা মেঘের জল বিশেষ প্রশস্ত।

উপরে মর্ত্তজলের উল্লেখ করা গিয়াছে। আমরা কূপ, পুকুর, দিঘী, নদ, নদী, খাল, বিল, ঝিল প্রভৃতি হইতে মর্ত্তজল সংগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক, উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকার জলাপেক্ষা, নদ বা নদীর জল হইতে পুকুর বা খালের জলের এরূপ ভিন্নতা কেন এবং কি জন্যই বা কৃষিকার্য্যে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হয়। তাহার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য সে বিষয়ের তর্ক বা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না? ইহাও জানা আবশ্যক যে, অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিকর্ম্মে, নদ বা নদীর সলিল অপেক্ষা কূপের জল অকিতর প্রশস্ত। পাঞ্জাবে খালের জল, মান্দ্রাজে পার্ব্বত্য জল, বোম্বায়ে কূপের জল এবং রাজপুতানায় ঝরণার জল, কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সহায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সমগ্র ভারতবর্ষে

কূপের জল কৃষিকার্য্যে যেরূপ উপকারীতা দেখাইয়াছে, অন্য জলে তদ্রূপ উপকার দেখা যায় নাই। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরাগণা ও ছোটনাগপুর বিভাগে মেঘের জল পতিত না হইলে শস্যাদি প্রায়ই রক্ষিত হয় না। কৃষিবিদ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বিবেচনা করিতেন, বোধ হয় ক্ষেত্রের গুণের ভিন্নতা অনুসারে এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বহুবর্ষের পরীক্ষা, চিন্তা ও আলোচনায় প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্রের গুণ ও দোষের অসমতা ইহার অন্যতম সামান্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ জলের গুণ ও দোষই ইহার প্রবল কারণ। ইন্দারা (Reservoirs and tanks) কাটিয়া নানা প্রকারের জল রক্ষা করিয়া বিশেষতঃ বৃষ্টির জলের ইঞ্চি হিসাবে পরিমাণ করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে জলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা না থাকিলে "পাকা চাষা" হওয়া যায় না। মহীসুরের সুবিখ্যাত সুলেকাড়ে (Sulakare) নামক কৃত্রিম হ্রদে সম্প্রতি পণ্ডিতেরা জলের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ হ্রদ প্রায় ২০ ক্রোশ পরিধি পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খালের (canal) মধ্যে গঙ্গানদীর সংযুক্ত খাল সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কথিত আছে, ১৩৫১ অব্দে ফেরোজ সাহ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে খাল কাটার সৃষ্টি হয়। ১৬২৮ অব্দে আলি মর্দ্দানের যত্নে যমুনা খালের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ১৮১৭ অব্দে ইংরাজ সরকার সর্ব্বপ্রথম খাল কাটা বিষয়ে মনোযোগ প্রদর্শন করেন। এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রায় ৫০,০০০ মাইল ব্যাপিয়া খালের সংযোগ আছে, ইহাতে ২২,০০০ মাইল পর্য্যন্ত চাষ হইতে পারে।

বঙ্গদেশে ইডেন খাল, উলুবেড়ে খাল, পাশকুড়া খাল, সোননদের খাল, মহানদী খাল প্রভৃতি প্রধান। এই সকল খাল কৃষিকার্য্য পক্ষে খুব সহায়ক বটে, ঐ খালগুলি নানা কারণে করভারে প্রপীড়িত থাকে। অনেক সময় টাকা প্রদান করিয়াও জল পায় না। রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, জলের সহিত কৃষিকার্য্যের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ, মেঘের সহিত বার্ষার এবং বর্ষার সহিত জলের সম্বন্ধ। জলতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনকরা ও প্রদান করা, বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জল সিঞ্চনের সহজ ও সুলভ উপায় এবং জল প্রবেশ ও জল নির্গমের সরল প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে কৃষকদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া রাখিলে কৃষকার্য্যের আশাতীত উন্নতি হইতে পারে।

কাসাভা আলুর চাষ

(কৃষি তত্ত্ববিদ্ ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে)

ইহার অপর নাম সিমুল আলু। দুর্ভিক্ষের সময় যাঁহারা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সকল ফসল সমভাবে নষ্ট হয় নাই এবং কয়েকটী ফসল অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সুন্দর জন্মিয়াছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, দরিদ্র লোকে দুর্ভিক্ষের সময় এমন সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে আহার করিয়া চাউলের সুসার করিয়াছে, যে সকল সামগ্রী লোকে সচরাচর আহারের আনুষঙ্গিক মাত্র বলিয়া গণ্য করে। যথা—ধান্য, গোধূম ও যব এককালে বা আংশিকরূপে নষ্ট হইলেও, স্থানে স্থানে অড়হর কলাই, ছোলা, ভুট্টা, কাওন, বাজরা, জুয়ারি, চীনা, খাম্‌আলু, সুতনী আলু, শকরন্দআলু, পটল, সাজনা, ডুমুর, ফুটী, খরমুজ, এই সকল উত্তম ভাবে অথবা মধ্যম ভাবে জন্মিয়াছে। এই সকল সামগ্রী চাউলের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে লোকে ব্যবহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে আমি দেখিয়াছি অনেক শ্রমজীবী দিবাভাগে ফুটী ও কাঁকুড় খাইয়া রাত্রিকালে কেবল কিছু ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ সময়ে দুই আনার চাউলের ভাত খাইয়া লোকের পেট ভরে নাই; কিন্তু এক পয়সার ফুটী বা পটল খাইয়া পেট ভরিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্ভিক্ষের সময় দুধ, মাছ প্রভৃতি কয়েকটী সামগ্রীর দর বৃদ্ধি হয় নাই। ভাত অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর খাদ্য, যথা—পটল, ডুমুর, কলাই, দধি, মৎস্য প্রভৃতি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষ দ্বারা অনেক লোকের একটী শিক্ষা হইয়াছে যে ভাত না খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায় এবং চাউল ভিন্ন আরও পাঁচ রকম ফসল, যথা—তুট্টা, কাওন, দে-ধান, ভাদুই কলাই, অড়হর, ওল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের চাষ ধান্যের চাষ অপেক্ষা স্বল্প লাভজনক, এ সকল জন্মান, ধনুতে একটী রজ্জু না লাগাইয়া অনেকগুলি রজ্জু লাগানের সদৃশ। কোন গতিকে একটী ফসল লোকসান হইলে, আর পাঁচটীর দ্বারা জীবনধারণ হইতে পারে। এমন ফসল জন্মান চাই যে ফসল স্বল্পকাল স্থায়ী ও বর্ষা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

যে সকল ফসলের কথা বলিতেছি, এ সকল জন্মানের পক্ষে একটী প্রতিবন্ধক আছে। (১) হয়ত ইহাদের ফসল কম, (২) নয়ত উহারা সহজে হজম হয় না, (৩) নয়ত উহারা মুখরোচক নহে (৪) আর নয় ত উহাদের অনেক দিবস ধরিয়া রক্ষা করিয়া ব্যবহার করা সুকঠিন। আজ আমি একটী ফসলের কথা বলিব, যাহা উক্ত কয়েকটী ফসল অপেক্ষাও সহজে অনাবৃষ্টিতে জন্মান যাইতে পারে, যাহা কি আওতাতে, কি খোলা স্থানে, সকল স্থানেই জন্মান যাইতে পারে, যাহা পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য উৎপাদন করে, যাহা মূলাবস্থায় টার্টকা ব্যবহারও করা যাইতে পারে, অথবা যাহা হইতে ময়দা

প্রস্তুত করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া ব্যবহার করাও যাইতে পারে, যাহার ময়দা গমের ময়দা অপেক্ষা অধিক দিবস অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, যাহা হইতে বিঘা প্রতি যে পরিমাণ নিট শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, এরূপ আর কোন ফসল হইতে পাওয়া যায় না, যাহা বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশ অতি অল্পায়াসেই জন্মান যায়।

প্রথমেই কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে ফসলের বিষয় আমি বলিতে চাহিতেছি, সে সকলেরই জানা আছে; উহা হইতে 'ট্যাপিওকা' নামক যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাঙ্গালীর মুখে কখনই রুচিবে না, উহার আবাদ এদেশে করা বৃথা। আমি নিজেও 'ট্যাপিওকা' সুখাদ্য বলিয়া গণ্য করি না এবং ট্যাপিওকা প্রস্তুতের পক্ষপাতী আমি নহি। 'কাসাভার মূল সিদ্ধ করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোকে খাইয়া থাকে এবং সিদ্ধ করা 'কাসাভা' মূল মান্দ্রাজের রাজপথে বিক্রীত হইতে আমি দেখিয়াছি। 'কাসাভা' মূল সিদ্ধ করিয়া খাইতে মন্দ লাগে না; কিন্তু টাট্‌কা মূল কত দিন রাখা যাইতে পারে? আলু কিছু দিন রাখিলে পচিয়া যায়, 'কাসাভা' মূল কিছু দিন রাখিলে শুষ্ককাষ্ঠবৎ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ময়দা বাহির করিবার কোন উপায় বাহির হয় নাই; কিন্তু টাট্‌কা মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত করা অতি সহজ, এবং ময়দা অবস্থায় এ সামগ্রী অনেক দিবস রাখা যায় এবং নানাবিধ সুখাদ্য যে এই ময়দা হইতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা আপনারা আস্বাদ করিয়া দেখিবার সুবিধা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া করিতে পারেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ 'কাসাভা'—গাছ জন্মানতে একটী বিশেষ সুবিধা আছে। এই গাছের মূল প্রতি বৎসরে না উঠাইয়া লইলেও চলে। কৃষক আপনার কোন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এই গাছের বেড়া দিয়া রাখিয়া, যে বৎসর তাহার সাধারণ অন্যান্য ফসলে লোকসান হইবে, সেই বৎসর কাসাভা গাছ গুলির মূল উঠাইয়া আহারার্থে ব্যবহার করিতে পারে। যে বৎসর তাহার ফসল ভাল জন্মিল, সে বৎসর সে যদি 'কাসাভা' গাছের কোনই পাইট না করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি হয় না। ভাল রকমে জমি প্রস্তুত করিয়া একবার গাছগুলি জন্মাইয়া লইতে পারিলে কয়েক মাসের মধ্যেই গাছগুলি এত উচ্চ হইয়া উঠিবে যে, গরু ছাগলে উহাদের পাতা লোকসান করিতে পারিবে না। মৃত্তিকার মধ্যে মূল গুলি সংখ্যাতে ও আয়তনে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। যে বৎসর অন্যান্য ফসল নষ্ট হইবে, সেই বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসরে মূলগুলি না উঠাইলেও চলে।

তবে, ১০।১২ মাস অন্তর একবার করিয়া মূল গুলি ব্যবহার করিয়া লইয়া রীতিমত বৎসরে একবার করিয়া 'কাসাভার' চাষ করাতে লাভ অধিক হয়। এক বৎসর পরে মূলের মধ্যে ময়দার ন্যায় সামগ্রীটীর সঞ্চয় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। মূল বৃদ্ধির অনুপাত প্রথম বৎসরে যেরূপ অধিক হয়, পরে সেরূপ অধিক হয় না। কৃষকদের মধ্যে এই ফসলটী প্রচলিত করিতে গেলে প্রথমে তাহাদিগকে বেড়ার গাছ রূপে লাগাইবার পরামর্শ দেওয়াই ভাল, নতুবা উহাদের সাধারণ কৃষিকার্য্যের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে

উহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কৃষকদিগের উপকারার্থে ইহা করিতে গেলে "ঢে সকেল দিয়ে কটক" লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। উপকার করিতে গেলেও ধীরভাবে, সহিষ্ণুভাবে, উহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। দারিদ্র্য দোষে উহারা স্বভাবতঃই সন্দিহানচিত্ত। যদি আপনারা কোন কৃষককে বলেন, "তোর একখানা জমিতে একসের ধান বা কলাই বা পাট না লাগাইয়া 'ক্যাসাভা' লাগাইয়া দেখ" সে অমনই সন্দেহ করিবে,—উহা দ্বারা আপনি আপনার স্বকীয় কোন অভিসন্ধি সাধিত করিয়া লইতে চাহেন।

—:—

২)

'কাসাভা' দুই জাতীয়। দুই জাতীয় কাসাভা হইতেই আমেরিকা মহাদেশে 'ট্যাপিওকা' প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে একজাতীয় কাসাভা (মানিহোৎ উতিলিসিমা) বিষাক্ত। মানিহোৎ আইপি বা মিষ্ট কাসাভা, বিষাক্ত নহে; ইহার মূল কাঁচা অবস্থাতে খাইতেও তিক্ত লাগে না, বা অখাদ্য মনে হয় না। এই জাতীয় কাসাভা লাগানই শ্রেয়। তিক্ত কাসাভাতে প্রুসিক নামক তীব্র বিষাক্ত পদার্থের ভাগ কিছু অধিক পরিমাণে থাকাতে ইহা কাঁচা অবস্থাতে ব্যবহার করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। ট্যাপিওকা প্রস্তুতকালে যে অগ্নির উত্তাপ ব্যবহার হয়, উহা দ্বারাই এই বিষাক্ত পদার্থটী উড়িয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাপিওকা চাই না; কাজে কাজেই আমাদের মিষ্ট কাসাভার (মানিহোৎ আইপির) উপরেই নির্ভর করা উচিত। শিবপুর-গবর্ণমেণ্ট-কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে এই জাতীয় কাসাভারই পরিক্ষা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই গাছ এখন দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের যে নাম হিমুল (অর্থাৎ সিমূল) আলু। এই গাছের পাতা দেখিতে ঠিক সিমুল তুলার গাছের পাতার ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'সিমুল-আলু' গাছ বলা যাইতে পারে। 'গাছ-আলু' ও 'রুটী-আলু' নামে এই গাছ স্থান বিশেষে আখ্যাত। পোর্ত্তুগীজেরা আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে এই গাছ রোপণ করে। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এ গাছের কোন ব্যবহার প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, কটকে, ব্রহ্মদেশে ও আসাম প্রদেশে সিমুল-আলুর মূল কাঁচা, সিদ্ধ বা রন্ধন করা অবস্থায় ভক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের কোন স্থানেই মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত নাই। উদ্যানের জন্য একটি শোভমান গাছ কলিকাতার কোন কোন উদ্যানে ইহা যত্নে রক্ষিত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাসাভা গাছের মূল আস্বাদন করিয়া আপনারা দেখিতে পারেন, ইহারা কোন্ জাতীয় কাসাভা, তিক্ত জাতীয় বা মিষ্ট জাতীয়।

গত চৈত্র মাসে আমি কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ট্যাপিওকা, ট্যাপিওকা মীল (বা ব্রেজিলিয়ন এরারুট) এবং কাসাভা-ময়দা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা এখন বর্ণনা করিব। ইহাতে যে সকল মূল ব্যবহার করি, সে গুলি সমস্ত এক বৎসরের গাছের নিম্ন হইতে খুড়িয়া বাহির করি। সর্ব্বসমেত নয়টি গাছের মূল ব্যবহার করি। গাছের পাতাগুলি ও মূলের মোটা মোটা ছালগুলি গরুতে আগ্রহ সহকারে খায়। ডাল পালাগুলি সমস্তই কলম করিয়া আমরা কৃষিক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া দিয়াছি। গাছ নয়টির কোন অংশই অপচয় হয় নাই। ডাল-পালাগুলি যদি সমস্ত কলম করিবার জন্য ব্যবহার না হয়, উহাদের শুকাইয়া অনায়াসে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক কাসাভার আবাদ হইতে গরু ও মানুষের আহার এবং জ্বালানী কাষ্ঠ, এই সমস্তই উৎপন্ন হইতে পারে।

এক্ষণে ময়দা প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাউক। মূলগুলি খুড়িয়া বাহির করিয়া, উহাদের উপরিভাগের মৃত্তিকা ও পাতলা ছাড়া-ছাড়া ত্বকের ন্যায় পদার্থ, জলে ধৌত করিয়া ফেলা হয়। পরে ৬।৭ ঘণ্টা কাল মূলগুলি এক গামলা জলের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে জলের মধ্যে মূলগুলি ডুবাইয়া রাখাতে উহাদের উপরিভাগের মোটা ছাল আলগা হইয়া আইসে এবং ছুরিকা দ্বারা হাসাইয়া অনায়াসেই ছাল অঙ্গুলি দ্বারা খুলিয়া লওয়া যায়। একে একে মূলগুলি জল হইতে বাহির করিয়া উহাদের ছাল খুলিয়া ফেলিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদের অন্য আর এক গামলা পরিষ্কার জলে রাখা হয়। এই জলে খণ্ড গুলি এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঢেকিতে কুটিয়া লইয়া উহাদের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। মণ্ডের তাল শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া চাপের নিম্নে রাখা হয়। চাপ দিবার জন্য আমি 'চিজপ্রেস' নামক পনির প্রস্তুতের যন্ত্রের ন্যায় একটি যন্ত্র ব্যবহার করি। মূলের খণ্ড গুলিকে এক ঘণ্টা কাল ডুবাইয়া রাখা এবং মণ্ড হইতে চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, মিষ্ট কাসাভাতেও প্রুসিক এসিড নামক বিষের অতি সামান্য পরিমাণ থাকা সম্ভব। এই পরিমাণ বিষের দ্বারা মূল কাঁচা অবস্থায় আহার করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না; কিন্তু মিষ্ট কাসাভা কাঁচা চিবাইয়া খাইলে জিহ্বা কেমন একটু সামান্য "রি রি" করে। খণ্ডগুলি জলে ধৌত করিলে এবং মণ্ড চাপিয়া লইলে এই সামান্য মন্দ আস্বাদটি ময়দাতে পাওয়া যায় না।

ট্যাপিওকা মীল বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত করিতে হইলে, মণ্ডটি মোটা কাপড়ে রাখিয়া এক গামলা পরিষ্কার জলে মধ্যে কাপড় শুদ্ধ মণ্ড কিঞ্চিৎ ডুবাইয়া দিয়া নাড়িতে হয়। মণ্ডটি নাড়িতে নাড়িতে দেখা যাইবে, উহা হইতে শ্বেতসার (Starch) নির্গত হইয়া জলের নিম্নে স্তরে স্তরে বসিতেছে। মূলের মধ্যে যে পদার্থ থাকিবার কারণ মিষ্ট কাসাভা খাইলে সামান্য ভাবে জিহ্বা "রি রি" করে,

সেই পদার্থ এই গামলার জলের সহিত নিশ্রিত হইবা আরও হ্রাস হয়। এক ঘণ্টা এইরূপ নাড়িবার পরে কাপড় শুদ্ধ মণ্ডটী আর এক গামলা পরিষ্কার জলে ডুবাইয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ৫।৭ মিনিট নাড়িতে হইবে। এই দুই গামলার জল গামলা দুইটী কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া নিম্নস্থ শ্বেতসার সংগ্রহ করিতে হয়। শ্বেতসার ভারি পদার্থ বলিয়া গামলার নিম্নে জমাট হইয়া বসিয়া থাকে এবং ইহা সহজেই রৌদ্রে শুকাইয়া উঠাইয়া লওয়া যায়। গামলার তলদেশ রৌদ্রে দিবার পূর্ব্বে জল ছিটাইয়া দিয়া গামলা কাত করিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দিয়া শ্বেতসার আরও পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। গামলার নিম্নভাগের শ্বেত পদার্থ রৌদ্রে শুকাইয়া গেলেই ট্যাপিওকা মীল বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত শেষ হইয়া গেল। ঐ শুষ্ক শ্বেত পদার্থ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা ঠিক এরারুট। ইহাই লণ্ডনে জেমেকা এরারুট বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট নামে বিখ্যাত। মূল খুড়িয়া বাহির করা হইতে, এই এরারুট প্রস্তুত ও কাসাভা ময়দা প্রস্তুত, সমস্তই এক দিবসের মধ্যে হওয়া উচিত; নতুবা ময়দাতে একটু গন্ধ হয়। যদি মূলগুলি উঠাইয়া উপর ধুইয়া লইয়া নয়টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত উহাদের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, বেলা আটটার মধ্যে মোটা ছাল খুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ফেলা হয়, নয়টার সময় জল হইতে উঠাইয়া টুকরাগুলি ১০ টার মধ্যে ঢেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড করিয়া ফেলা হয়, এবং বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে যদি শ্বেতসার বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে শ্বেতসার ও মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ রৌদ্রে শুকাইয়া লইবার জন্য সমস্ত অপরাহ্ণ কাল পাওয়া যাইবে। এ সকল কার্য্য বৎসরের মধ্যে যে কালটী সর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক কাল, সেই কালেই অর্থাৎ ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই কালে বেলা দুই প্রহর হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত শ্বেতসার এবং চাপ দিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ, অনায়াসে রৌদ্রে বিচাইয়া দিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়।

কাসাভা-ময়দা মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ হইতে প্রস্তুত করা হয়। শুষ্ক হইয়া গেলে, এই পদার্থটী অনায়াসে যাঁতায় পিসিয়া পরে চালুনী দ্বারা সূক্ষ্ম অংশ পৃথক করিয়া লওয়া যায়। এই সূক্ষ্ম অংশই কাসাভা-ময়দা যাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। ইহা কেমন পরিষ্কার, খাইতে কেমন সুমিষ্ট। চারি মাস ধরিয়া টিনের কৌটার মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও তথাপি ইহাতে জটা ধরে নাই।

ট্যাপিওকা প্রস্তুত করিতে শ্বেতসারকে শুকাইয়া না লইয়া সিক্ত অবস্থাতেই উহাকে পিত্তলের কটাহে তুলিয়া লইয়া, ঢিমে আগুনের উপর ঐ কটাহ বসাইয়া পিত্তলের একটী খুন্তি দ্বারা ক্রমাগত নাড়িয়া নাড়িয়া, শ্বেতসারটি যখন ট্যাপিওকার মত হইবে, তখন উহা নামাইয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইবে। এই ট্যাপিওকা যাহা এইরূপে প্রস্তুত হইল, তাহা বাজারের ট্যাপিওকা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না।

আপনারা বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা করেন, নয়টি গাছ হইতে ঠিক কি পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয়? আমি নয়টি গাছ হইতে ঠিক ১'১ সের মূল পাই। উহা হইতে পৌনে ৭৫ সের চাপ দেওয়া মণ্ড পাই। ইহা হইতে প্রায় সাড়ে ১৬ সের কাসাভা-ময়দা, পৌনে ৩ সের জামেকা এরারুট এবং সওয়া ৩ সের ট্যাপিওকা, অর্থাৎ পৌনে ২৩ সের নিট শুষ্ক খাদ্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সাড়ে তিপান্ন সের গরুর আহারের উপযুক্ত পত্র ও নবপল্লব এবং ৯৩৭টি কলম যাহা কৃষিক্ষেত্রের চতুপার্শ্বে লাগান হইয়াছে এই দুইটি সামগ্রীও ধরিতে হয়।

৫ ফিট অন্তর একটি করিয়া কলম লাগাইলে এক একার জমিতে নূন্যাধিক ১৭০০ গাছ জন্মিবে। গত চৈত্রে নয়টি গাছ হইতে যে ফল পাইয়াছি, বড় আবাদের ফল যদি সেই অনুপাতে ফলে, তাহা হইলে আমাদের উচিত এক একার হইতে

$\left\{\frac{১৭০০ \times ১০১}{৯ \times ৪০}\right\}$ ৪৫০ মণেরও অধিক কাঁচা বা সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার উপযুক্ত মূল

এবং

$\left\{\frac{১৭০০ \times ২২৮}{৯ \times ৪০}\right\}$ ১০০ মণেরও অধিক ময়দাতে ও এরারুটে পাওয়া উচিত।

$\left\{\frac{১৭০০ \times ৫২৷৷}{৯ \times ৪০}\right\}$ ২৪০ মণেরও অধিক গরুর খাওয়া উপযুক্ত কাঁচা পাওয়া যায়।

যদি স্মরণ করিয়া দেখেন ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গরুর খাওয়ার উপযুক্ত কাঁচা ঘাস-পাতা পাওয়া কত দুরূহ এবং একার প্রতি ২৪০ মণ কাঁচা আহার এই কয় মাসের মধ্যে আলগা লাভ ভাবেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনাদের সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে—কাসাভার চাষ বিশেষ লাভজনক। এই কাঁচা আহারের মূল্য যদি মণ প্রতি ৵০ আনা ধরা যায়, তাহা হইলে এক একারের কাঁচা পাতার মূল্য ৩০৲ টাকা হয়। কলম বা জ্বালানী কাঠ এ চাষের আর একটী আলগা লাভ। আমি ৯৩৭টি কলমই ব্যবহার করিয়াছি। ঐ গুলি শুকাইলে কি ওজনের জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে উহারা শুকাইলে যে অন্ততঃ এক মণ হইত, ইহা আমার বিশ্বাস। নয়টি গাছ হইতে যদি এক মণ জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তবে ১৭০০ গাছ হইতে ১৭৫ বা ২০০ মণ পাওয়া যাইতে পারে। স্থান-বিশেষে ইহারই দাম ৫০৲ টাকা।

কলিকাতার বাজারে ট্যাপিওকার দাম ।৵০ সের। লণ্ডনের বাজারে ট্যাপিওকার দাম পাউণ্ড প্রতি এক পাঁচের-আট পেনি ছিল। স্পেনবাসীরা কাসাভার ময়দা ব্যবহার করিয়া থাকে শুনিয়াছি; কিন্তু এই সামগ্রী কি দরে বিক্রয় হয়, বলিতে পারি না। ট্যাপিওকা, কাসাভা-ময়দা ও জ্যামেকা এরারুট সমস্ত যদি ৵০ আনা সেরে

বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এক একার জমির উৎপন্ন সামগ্রী নূন্যাধিক ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে।

দেশের কথা।

শিক্ষিতের হল চালনা—ভারতের অতীত যুগে রাজর্ষি জনক ও বলরাম প্রমুখ মনীষীগণ স্বহস্তে হল চালন করিয়া কৃষিকার্য্যকে অতি গৌরব জনক কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কাল প্রভাবে বিজাতীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ফলে দেশের মতিগতি বিগড়াইয়া যাওয়ায় কেবল কৃষিকার্য্য নহে—শারীরিক শ্রমজনক স্বাধীন জীবিকায় যে কোন কার্য্যকেই মুটে মজুরের কাজ বলিয়া শিক্ষিত সমাজ উপেক্ষা করায় এখন পরনির্ভরতা ছাড়া কোন বিষয়ে আর আমাদের আত্মনির্ভর করিয়া চলিবার উপায় নাই। আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশের শিক্ষিত উপাধিকারী ভদ্র সন্তানগণ ভ্রান্ত মানমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা স্বাধীন জীবিকার উপায় স্বরূপ শারীরিক শ্রমজনক সকল প্রকার কার্য্য এমন কি ভৃত্যের কার্য্য ও কুলি মজুরের কার্য্যাদিকেও শ্লাঘনীয় মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড়ই অক্ষেপের বিষয় এই হতভাগ্য দেশের বালক যুবকেরা দুই এক পাত লেখা পড়া শিখিলেই অমনি এমন বাবু সাজিয়া পড়েন যে, শারীরিক শ্রমজনক কার্য্যমাত্রকেই তাঁহারা মুটে মজুরের কার্য্য বলিয়া দূরে পরিহার করেন, এমন কি হাট বাজার হইতে সামান্য দু'একটা জিনিষ পর্য্যন্ত স্বহস্তে গৃহে লইয়া যাওটাকে লজ্জা ও ঘৃণার কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; অথচ সামান্য দশ বিশ টাকার একটা চাকরীর জন্য শত অপমান লাঞ্ছনা ও হীনতা স্বীকার করিতে একটুও লজ্জা বোধ করেন না। ফলে দেশের দেহ মন প্রাণ এমন একটা পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন স্থানে কোন একটা চাকরী খালি হইলেই শত শত ব্যক্তি সেই কার্য্য পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়েন; অথচ এদিকে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদি স্বাধীন জীবিকার শত শত পথ উন্মুক্ত থাকিলেও তৎপ্রতি কাহারও অনুমাত্র দৃষ্টি পতিত হয় না। এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশের এতাদৃশ শোচনীয় হীনাবস্থা দূর করিতে না পারিলে যে আমাদের দৈন্য দুর্গতি দূর হইবে না, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের এই কাঁথি সহরের উপর স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র কুমার রায় বি-এল মহাশয়ের বাগানে গত

বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে স্বদেশভক্ত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মহাশয়ের উদ্যোগে উকীল, ডাক্তার, কেরাণী ও উচ্চ বংশজাত ভদ্রলোক প্রকাশ্যে হল চালনা করিয়াছিলেন; চালকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির লোকও ছিলেন।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় প্রথমে স্বহস্তে হল চালনা করেন। তারপর স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র কুমার রায় বি-এল, শিক্ষক শ্রীযুত প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায় বি-এ, ডাক্তার শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র হাজরা, উকীল শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ মান্না এবং উকীল শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ স্বহস্তে হলচালনা করিয়াছিলেন।

প্রমথ বাবুকে এই হলচালনার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে—"বর্ত্তমান সময় সকলেই বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ ছাড়িয়াছেন, পূজা ইত্যাদিও ছাড়িয়াছেন, কাজেই ব্রাহ্মণের উপজীবিকা নষ্ট হইয়াছে। এ সময় ব্রাহ্মণ কখনই নোকার মত না খাইয়া মরিতে রাজী হইবে না। যদি তাহাদের পেশা বন্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতির পেশা গ্রহণ করিবেন, ইহা স্থির নিশ্চিত এবং হলচালনা যে, আর্য্যজনোচিত কার্য্য ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।" যাহা হউক, এখন শিক্ষার স্রোত যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা বড়ই আশার বিষয়।—নীহার।

দুর্ভিক্ষ ও গৃহশিল্প

বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। রাজার দান পাইয়া কোনরূপে জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকাটাকেই সাধারণের পনর আনা লোক শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছি। কাজ না করিয়া আধপেট খাইয়াও যদি জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে পারা যায় তবেই যেন মানবজীবন সার্থক হইল। আত্মসম্মান এবং স্বাবলম্বন-শক্তি হইতে ভিক্ষাবৃত্তিই শ্রেয়। আর চাই কি?

গভর্ণমেণ্ট এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদের অন্নবস্ত্রের সাহায্য করিয়া, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখানেই কি তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন হইল?—আমরা বলিব যতদিন না তাঁহারা অনুক্লিষ্ট নরনারীদের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া স্বোপার্জ্জিত অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের পথ ধরাইয়া দেন ততদিন কর্ত্তব্য ঠিক পূর্ণ হইবে না। আর তাহাদের অভাবও দূর হইবে না। অতএব বর্ত্তমানে গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ হইলে ইহার একটা উপায় হইতে পারে।

যে দ্বীপবাসী জাপান আজ সমগ্র পৃথিবীর সভ্যজাতির একজাতি বলিয়া সুপরিচিত, তাহাদেরও গৃহশিল্পের বাণিজ্য দ্বারাই অর্থাগমের পথ মুক্ত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমরে ভারতে একচেটিয়া শিল্পবাণিজ্য দ্বারা তাহাদের ধনাগার পূর্ণ হইয়াছে।

সত্যবটে আজকাল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মেয়েরা সূচীশিল্পে বিশেষ নিপুণতার পরিচয়

দিতেছেন ; তাহাতে অনেক সময় বড় বড় দর্জ্জিদেরও হার মানিতে হয়। স্কুলে মেয়েদের লেস্, কার্পেট, জরি, ইত্যাদি শিল্পকার্য্য যে ভাবে শেখানো হয় এবং মেয়েরাও যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন, বিবাহিত জীবনে অনেক সময়ই সুযোগের অভাবে সে সব একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমাদিগের সে-সব শিল্প শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে এমন শিল্প আয়ত্ত করাও উচিত যে-শিল্প শিক্ষা করিলে প্রথমে আমাদের ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল পরিবারেরই উপযোগী হয় এবং উপকারে আসে।

ইউরোপীয় সহাসমরে বিদেশ-জাত আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর আমদানি বন্ধ হইয়া গেলে আমরা দেশীয় শিল্পের মর্য্যাদা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। তাই চরকায় সুতাকাটা, কাপড় বুনা ইত্যাদি গৃহ-শিল্প কর্ম্ম একটু একটু করিয়া আরম্ভ হইল। তবে স্থায়িত্ব বা প্রসার বৃদ্ধি কতটা হইল বা হইবে এখনো বলিতে পারি না। যে জেলার যে সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে শিল্পসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে কুণ্ডা-শিল্প-সমিতিই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার পর চার মাসের উপর সময় যায় নাই, কিন্তু এ সময়ের মধ্যেই ৪০ জন মহিলা নানা বিভাগে কার্য্য করিতেছেন, তন্মধ্যে ৮।১০ জন মহিলাই এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

বাঁশ বেত দ্বারা ধারি, চাটি, টেবীল, চেয়ার, বেগ, চিক ইত্যাদি, শণসুতা কাটা, জালবুনান, কাপড়বুন, পাট দ্বারা চট, কেন্‌ভাস, খড় ও কাশ দ্বারা টুপী (Hat) আসন প্রভৃতি হইতেছে। কর্ম্মীর সংখ্যা অল্প তাই এখনো প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে না। যাহারা গভমেণ্টের দান পাইতেছে তাহাদের মধ্যে কর্ম্মক্ষম স্ত্রীলোকের নিকট হইতে দানের পরিবর্ত্তে এই সকল কাজ আদায় করা হইতেছে।

আজ আমরা মহা দুর্ভিক্ষের তাড়নায় পড়িয়া যে কর্ম্মকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি—হোক সে অতি ক্ষুদ্র, তথাপি আমরা ইহাকে আর ত্যাগ করিব না। মঙ্গলময়ের কৃপায় এই ক্ষুদ্রই এক দিন বিরাট আকার ধারণ করিবে। কুণ্ডা, ত্রিপুরা।
শ্রীহেমলতা দত্ত। (প্রবাসী হইতে ১৩২৬)

দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির একটী নিদর্শন আমরা আনন্দে প্রকাশ করিতেছি।—

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এই কাপড়ের কলের কর্ত্তৃপক্ষ ১৯০৮ সালে দেড় লক্ষ টাকা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯১০ সালে মূলধন দুই লক্ষ টাকায় পরিণত হয়, পরে লোকের আগ্রহাতিশয্যে কর্ত্তিপক্ষ ১৯১৯ সালে মূলধন আরও এক লক্ষ বৃদ্ধি করেন। সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, মিলের পরিচালকগণ মূলধন ১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করিয়াছেন। এই মিলের পরিচালকগণ সকলই বাঙ্গালী। যাহারা বলে বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধি নাই, তাহারা কি বলিতে চায় ?—যশোহর।

দেশে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠায় দেশের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া মানুষ খল হইয়া অধঃপাতে যায়। তার চেয়ে গৃহশিল্পের প্রচার ও প্রচলনে গৃহ ও সমাজ-বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া অর্থাগমের পথ পরিষ্কার হয়। আমাদের ঝোঁক এইদিকেই বেশী থাকা উচিত। শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী।

—:০:—

চরকার কথা

৩৬ নং স্থাতাস টানায় ২০ নং সুতার পোড়েনে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় প্রস্তুত হয় সম্প্রতি খুলনা জেলায় বাগেরহাটে আমাদের নিজেদের লোক ঐ কাপড় বিক্রয় করিতে গিয়া, যে পত্র লিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, সাধারণ চাষী শ্রমজীবীগণও উহা নিতান্ত মোটা বলিয়া খরিদ করিতে প্রস্তুত নহে।

দেশের রুচি পরিবর্ত্তন করা সহজে সম্ভবপর নহে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন যুগ ফিরাইয়া আনাও অসাধ্য, কেননা সেকালের চরকায় সুতা কাটিয়া যে কাপড় তৈয়ার হইত, তাহা এতই অপ্রচুর, এ যুগে তাহাতে কোন মতেই কুলাইবে না, তখন পূজার একজোড়া কাপড় প্রতিজনের জন্য দেওয়া হইত, সারা বছর ধরিয়া তাহাতেই চলিয়া যাইত, বাঙ্গালী হাঁটুর উপর কাপড় পরিয়া গামছা কাঁদে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। কুলমহিলাগণ ক্ষারে কাপড় কাচিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিত। ঐ সকল পুরাতন কাহিনী ছাড়িয়া, বর্ত্তমান অবস্থার মত আমাদের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

চরকার কাটা সুতা চট্টগ্রামে যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং সে সুতা আমরা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি, উহা প্রচলিত ২০ নং সুতার অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং তাঁতের উপযোগী করিয়া তোলাও অসম্ভব। এই সুতার স্থানে স্থানে পাক এত এলো এবং সরু মোটার মাত্রা এত অধিক, সানায় ইহা একেবারেই চলে না, হাতে মাকু চালাইয়া খুব মোটা চটের মত কাপড় করিতে পারা যায়। কিন্তু উহা বাজারে চলিবে না।

"প্রবাসীতে" ত্রিপুরা জেলার কালিকচ্ছ গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় ১৫।২০ জন স্ত্রীলোককে চরকাতে সুতাকাটা শিক্ষা দিয়াছেন, এবং উহার বাড়ীতে ঐ সুতার দ্বারা ধুতি ও বিছানার চাদর প্রস্তুত করা হইয়াছে—যদি কেহ কাপড় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার নিকট চিঠি লিখিলে পাইতে পারেন—এই কথা জানিতে পারিয়া একদিকে আশ্চর্য্য ও অপরদিকে উৎফুল্ল হইয়া চিঠির সঙ্গে আমরা লোকও পাঠাইয়াছিলাম—নৈরাশ্য হইয়াই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু ডাক্তার তিনি অবসরমত একখানা তাঁত চালান, এবং সে তাঁতে কত কাপড় হয়, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এতদ্ব্যতীত এই হাতে কাটা সুতায় কাপড়

তিনি সখ্ করিয়া যাহা বাড়ীতে ব্যবহার করেন, তাহাও সাঁওতালদিগের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি অপেক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে।

যাঁহারা আজ চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এবং এইরূপে দেশের বস্ত্রসমস্যা দূর করিবেন ভাবিতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহভঙ্গ করিতে চাহি না, তবে ইহা যে একেবারেই অসম্ভব, এই কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। একখানা দশ হাত কাপড়ে সাড়ে বাইশ হাজার গজ সূতার প্রয়োজন হয়। একজন মানুষ প্রতিদিন পাচসাত ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের জন্য ৩০।৪০ নং সূতা অনুমান ৭০০।৮০০ গজ সূতা কাটিতে পারে। তাহা হইলে একখানা কাপড়ের জন্য একটি লোককে প্রায় একমাস পরিশ্রম করিতে হইবে। একখানা কাপড়ের সূতার মূল্য বর্ত্তমান বাজার দর সাত সিকা হইতে দুই টাকা—একজন মানুষের সারাদিনের পারিশ্রমিক এক আনা হইলে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ বাতুলতা নহে কি?

একখানা কাপড় প্রস্তুত করিতে যে সূতার প্রয়োজন, তাহার জন্য একজন লোককে একমাস পরিশ্রম করিতে হয়, একখানা তাঁতে অন্ততঃ তিন জোড়া কাপড়ের সূতা বিমে জড়াইয়া আরম্ভ করিতে হয়, একজন লোকের ছয়মাস পরিশ্রমের পর একখানা তাঁত বড় জোর ৮দিন চলিতে পারে, এই হিসাবে সখের কাজে কত সহস্র লোক প্রয়োজন হইবে একটি তাঁতশালা চালাইবার জন্য, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই, কর্ম্মীর চক্ষে জল ঝরিতে থাকে।

এই অসম্ভবকে যদিও কোন বিশ্বকর্ম্মা সম্ভব করিতে পারেন, অথচ হাতের দ্বারা সূতার সঙ্গতি, (uniformity) সকলেই যে সমভাবে রাখিতে পারিবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ যাইবার নহে, আমরা ২০।২৫টী চরকা, চালাইয়া, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। চট্টগ্রামের সূতা রীতিমত তাতাইয়া (Sizing) তাঁতে চড়াইবামাত্র, এরূপ ছিড়িতে আরম্ভ করিল, যে সে সূতা অবহার্য্য বলিয়াই আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমাদের একখানি চরকায় অধিকল ৪০ নং সূতার মত সূতা প্রস্তুত হইতেছে—যিনি এই চরকা চালাইয়া থাকেন, তাঁহার মত অভ্যাস ও নিষ্ঠা অর্জ্জন করা যাহার তাহার ধৈর্য্যে কুলাইবে কি না আমরা বলিতে পারি না, আর ইহা সম্ভব করিয়া তুলিলেও, সূতা প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণে সময় ও পরিশ্রম দিতে হয়, উহার গণনায় তাঁত চালাইয়া দেশের উন্নতি সাধন আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের মতই অসম্ভব।

মহাত্মা গান্ধী এই সকল অন্তরায় বুঝিয়াছি নূতন চরকার জন্য ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—আজ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচটী চরকা তিনি পাইয়াছেন ১৯২১ সালের ৩১ শে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তিনি আরও চরকা পাইবার আশায় অপেক্ষা করিবেন। এই পাঁচখানি চরকার মধ্যে মাত্র দুইখানি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে এরূপ আশা আছে। ইহার মধ্যে একখানিতে ঘণ্টায় ১ সের সূতা প্রস্তুত হয়।

মহাত্মা গান্ধী যে চরকা নির্ম্মাণের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন উহাতে বৈদেশিক কলকব্জার ব্যবহার যাহাতে না হয়, এবং উহার মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সত্য সত্যই দেশের কারিগর দিয়া দেশীয় পদার্থ সংযোগে এরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ হইলে দেশের পক্ষে গৌরবের কথা, কিন্তু উপস্থিত বস্ত্রসমস্যা নিরাকরণের জন্য অন্ততঃ বাংলা দেশের নেতৃগণ যদি অধিক পুরস্কার ঘোষণা করিয়া জাপান অথবা ইউরোপ হইতেও, শেলায়ের কল অথবা ঔষধের বড়ি প্রস্তুতের কলের মত এই সূতা কাটার চরকা নির্ম্মাণ করাইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহার সকল অংশই আমরা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিব এবং এই কলের মূল্য যদি ২০০।২৫০ টাকাও হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই, প্রতি ঘণ্টায় যদি এক সের তুলার ৪০ নং সূতা ইহাতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ করিলে আট জোড়া কাপড়ের সূতা অনায়াসেই হইতে পারিবে, ২০।২৫ টা তাঁত এইরূপ একটা সূতার কল লইয়া চালাইতে তখন আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে না।

বংলার কার্পাসের চাষও চলিতে পারিবে। যদিও গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে বাংলার তুলার চাষে শুধুই ক্ষতির কথাই বর্ণিত আছে—তত্রাচ পরিশ্রম, যত্ন এবং অধ্যবসায় থাকিলে ইহাতে আমরা সফলকাম হইব। Egyptien Amorican Cotton চাষ করিয়া আমরা যে তুলা পাইয়াছিলাম অন্যান্য প্রদেশের উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা উহা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। ভারতের এই বস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক কথা ভাবিবার আছে, আজিকার হুজুগে একটা সেকেলে ধরনের চরকা কাঁদে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলে কাজ বিশেষ আগাইবে না। প্রবর্ত্তক।

আমরা বুঝিনাম হাতেকাটা সূতাদ্বারা বস্ত্রবয়ন কার্য্য চালাইতে হইলে এবং তাহার উপর নির্ভর করিলে আমাদের দেশের কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করা দুরূহ এবং যাহারা ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে তাহাদের পেটের ভাত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এক সময়ত ভারতবাসী হাতকাটা সূতার তাঁতে বোণা কাপড়ের উপরেই নির্ভর করিত। সূক্ষ্ম সূত্র বস্ত্র তাহারা ব্যবসায়ের জন্য বিদেশে রপ্তানি করিত। ইহা কি প্রকারে সম্ভব ছিল?

এত্ন সময়ে অধিক কাজ হয় এমন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও ব্যবহার হউক তাহা সকলেই বাঞ্ছা করে কিন্তু যে গৃহ শিল্পে ভারত এক সময়ে খ্যাত ছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা কি বাঞ্ছণীয় নহে? বারানসী ক্ষেত্রে যেখানে বেণারসী বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহার এক একখানায় বহু হাতের যে পরিশ্রম হয় তাহার মূল্য যোগাইতে হইলে সাধারণে বেনারসী কাপড় পরিতেই পারিত না। ছোট ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই সূত্র কাটার সাহায্য করিতে পারেন। সময় বৃথা নষ্ট হয় তাহার কতকটা এই কাজে

লাগাইলে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা এক রকম বিনামূল্যে উৎপন্ন হইল বলিয়া মনে করিলে দোষ নাই বরং লাভ আছে।

চাষীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা ক্ষেতে থাকিয়া যে ফসল উৎপন্ন করে তাহার সমুদয় পরিশ্রমের মূল্য কেহ দিতে পারে না। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে এক একটি পল্লিবার ও এক একটি সম্প্রদায় বিশেষ কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকিয়া যে প্রতিজ্ঞা ও পারদর্শিতা লাভ করে তাহাতে কাজটা সুকর ও সহজ হয় এবং যাহা দৃশ্যতঃ অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়।

লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে অনেক বিঘ্ন বিড়ম্বনা উপস্থিত হইবেই, কত জিনিষ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে হইবে বহু সাধনায় যাহা মিলিয়াছিল, পুনঃ সাধনায় সেই সাধ্য আবার ফিরাইয়া পাইতে হইবে। প্রথমতঃ উত্তেজনা, উৎসাহ চাই এবং ইহা সবসময়ে সুসুগ বলিয়া উপেক্ষা করিবার নহে।

বাঙ্গালায় বজেট প্রার্থ্য হইয়াছে।

(১) পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ—৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

(২) কৃষি—৭৮ হাজার টাকা। এই দুই বাবদে যে টাকা গত বৎসর খরচ করা সম্ভব হয় নাই—সে টাকা কেন হয় নাই, তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? যদি কোন অনিবার্য্য কারণে সে টাকাটা রহিয়া গিয়া থাকে, তবে এ বৎসর তাহা সেই বাবদে খরচ করিলেই কি বরাদ্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না?—বসুমতী

সমগ্র বঙ্গে ৭৮ হাজার টাকা কৃষির উন্নতি কল্পে ব্যয় ইহাতে কৃষির উন্নতি কতটুকু সংসাধিত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।—কৃঃ সঃ

আর স্বাস্থ্য? বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কথা আর কত বলিব? আমরা বলিয়াছি, লর্ড রোণাল্ডসেই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুরহার ও লোকের দুরবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। অথচ সেই ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কখনই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ৩জন মিনিষ্টারের ও শাসন পরিষদের ১জন অতিরিক্ত সদস্যের বেতন বার্ষিক ২ লক্ষ ৪৬ হাজর টাকা এই বাবদে ব্যয় করিলে, বোধ হয়, কিছু উপকার হইত।—বসুমতী

৬৬ হাজার টাকা খরচ করিয়া ভাল পাটে ও ধানের বীজ বিতরণ করা হইবে। সরকারী রিপোর্টে কাকিয়া বোম্বাই পাটের ও ইন্দ্রশাল ধানের যে গুণকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে কৃষকরা কি আজও টাকা দিয়া সে বীজ কিনিতে শিখিল না? বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের কর্ত্তরা এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ভাজন কয়িবেন কি?

ইন্দ্রশাল ধান ও কাকিয়া বোম্বাই পাটের ক্ষত বা তদপেক্ষা ভাল বীজধান ও ও পাটবীজ পাওয়া যায়। কৃষি প্রচারনাশ তাহার অনুসন্ধান করিয়া চাষাগণকে উপদেশদিলে অধিকতর উপকার হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রজার কাছ থেকে খাজনা বলে যা আদায় করবার কথা হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি আবওয়াব ছিল। এগুলি আসল খাজনা নয় কিন্তু নবাবী-গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার জন্য রাজকোষের শূন্য স্থান পূরণ করবার উপায়-স্বরূপ অস্থায়ী কররূপে স্থাপিত হয়েছিল। যখন প্রজা এতে আপত্তি করলে, ইংরেজ-কোম্পানী প্রজাকে বললেন, যা হয়েছে তা হয়েছে তার জন্য কিছু মনে কোরো না, নতুন আবওয়াব আর হবে না। এই আবওয়াব-সৃষ্টির বিবরণটা অনেক পুরানো হয়ে গিয়েছে। আজ-কালকার প্রজা তা জানে না। তাদের সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টোডর মল্লের বন্দোবস্ত হয়। তখন, বাঙলা দেশের রাজস্বের পরিমাণ হয়েছিল ১,৪৯, ৬১ ৪৮৩ টাকা। এর মধ্যে কোন আবওয়াব ছিল না। ১৪০ বৎসর পরে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুরশিদ কুলি খাঁ এর উপর একটী আবওয়াব যোগ করিছিলেন। সেটী হচ্ছে আবওয়াব খাস-নিবাসী রাজস্ববিভাগের খাস-নবিস এবং মুতঃসুদ্দীনের পার্ব্বণী দেবার জন্য এটা স্থাপিত হয়েছিল। আর দিল্লীর বাদসাহ-সরকারে একটা বার্ষিক নজর আনা দিতে হত। এই দুটো মিলিয়ে মোট হত ২,৫৮, ৪৫৭ টাকা। এই টাকাটা সমস্ত বাঙলা দেশের ভূ-সম্পত্তির উপর হারাহারি করে আদায় করা হত। চার বৎসর পরেই সুজা খাঁ এই বন্দোবস্তকে পাকা করে এর উপর আর চারিটী আবওয়াব স্থাপন করেন। (১) নজর আনা মোকররী (২) জার মাথট, (৩) মাথট ফিলখানা (৪) আবপয়াব ফৌজদারী। জার মাথটের মানেটা একটু কৌতুহলজনক। জার মানে টাকা, মাথট কথাটা আরবী "মাং হেট" কথার অপভ্রংশ। এর অর্থ এই যে, শস্য-ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে না, এই অনুগ্রহের জন্য ক্ষেতের মালিককে কিছু দিতে হত। পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে একে নজর শওয়ারী বলত, কোন কোন স্থানে লালবন্দীও বলত। ব্যুৎপত্তি-মানে এই হলেও, যার ক্ষেতের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য যেত না, তার কাছ থেকেও এটা আদায় করা হত, আর সকলের কাছ থেকেও আদায় করা হত। পুণ্যাহের দিন জমিদার যে তাঁর জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেন, তার চিহ্ন স্বরূপ তাঁকে একটা খেলাত দেবার কথা ছিল। সেই খেলাতের মূল্যটা এই থেকেই দেওয়া হত। আর মুরশিদাবাদে কেল্লার সম্মুখে গঙ্গার উপর পোস্তাবন্দী করবার ব্যয়টাও এই থেকে দেওয়া হত। অন্য তিনটী আবওয়াবের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

সুজা খাঁর পরে আলিবর্দ্দী খাঁ আর তিনটী আবওয়াব স্থাপন করেন—(১)নজর-আনা মনসুরগঞ্জ, (২) আলক (৩) চৌথ মারাঠা। আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদৌলা বাঙলার মসনদে আরোহণ করবার পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য বিহারের শাসনকর্ত্তা হয়েছিলেন। সেই সময় আলিবর্দ্দী তাঁর স্থলবিহারের জন্য একটী প্রমোদ ভবন,

আর জলবিহারের জন্য একটী কৃত্রিম হ্রদ এবং একটী বাজার তৈরী করে দেন। প্রমোদ ভবনের নাম মনসুরগদী। হ্রদের নাম হীরাঝিল এবং বাজারের নাম মনসুরগঞ্জ। এই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে একটা আবওয়াবের আবশ্যক হয়; তারই নাম নজর-আনা মনসুরগঞ্জ। এর পরিমাণ ৫০,১,৫৯৭ টাকা। দ্বিতীয়টী দ্বারা মুরশিদাবাদের কেল্লা ও রাজবাড়ীর জন্য চুণ আনবার খরচ দেওয়া হত। এর পরিমাণ ১,৮৪,১৪০ টাকা তৃতীয়টী বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের জন্য। হাঙ্গামাহজ্জত করবার কষ্ট স্বীকার না করে কিঞ্চিৎ নিয়ে বাঙলা দেশে বর্গী না আসেন সেইজন্য ৭এটা উহার স্বরূপ তাঁদের দেওয়া হত। এই কিঞ্চিতের মূল্য ১৫,৩১, ৮১৭ টাকা।

মীরকাসিম এর উপর আর চারিটী আবওয়াব স্থাপন করেন—(১) কেফায়েৎ হস্তবুদ (জমা-বেশি) (২) কেফায়েৎ ফৌজদারাণ (ফৌজদারীর রাজকর) (৩) সায়রাৎ (শুল্কাদি) (৪) তৌজীর জায়গীদারাণ (জায়গীর মহলের বর্দ্ধিত আয়)। এই সকল আবওয়াবের দ্বারা মীরকাসেম ১,১০,৩৬০,৫৮ টাকা রাজস্ব বাড়িয়েছিলেন। নায়েব নায়েব সুবাদার রেজা খাঁ এর উপরে আরও কিছু বাড়িয়েছিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেওয়ানী নেন, তখন বাঙলার রাজস্ব তিন কোটীর উপর। এর মধ্যে অবশ্য উপরিউক্ত আবওয়াবগুলি সবই ছিল।

দেওয়ানী নেবার ছ-মাস পরেই (১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে) মুরশিদাদ কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ হল। নবাব নজম-উদ্দৌলা মসনদে আসীন। দক্ষিণে দেওয়ান কেম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইব। দেশের আমীর ওমরাহ, জমিদারগণ যথাযথ স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন। সকলেই নজর দিলেন, খেলাত পেলেন। অনেক টাকা আদায় হল। তার মধ্যে এক কোটী চল্লিশ লক্ষ আমাদের সংবাদ বিলেতে গেল। অন্যান্য আমোদ-প্রমোদেও ত্রুটি হয় নি। এইরূপে মহাসমারোহে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। কোম্পানীর অংশীদারেরা শতকরা ১২৷৷০ টাকা লাভ পেলেন। কোম্পানীর এই আশাতিরিক্ত সমৃদ্ধিতে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল। প্রজার একটু অবস্থা ভাল হলেই রাজার নেক-নজর পড়ে থাকে সুতরাং ১৭৬৯ সালে পার্লামেণ্টের এক আইন দ্বারা কোম্পানীর কাছ থেকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ৪০ লক্ষ টাকা আদায় করে নিলেন, বৃটীশ রাজকোষে ভারতীয় রাজস্বের বোধ হয় এই প্রথম প্রবেশ।

কোম্পানীর পুণ্যাহ কিন্তু দেশের পক্ষে মহাপাপ হল। এক মাস না যেতেই যেতেই নবাব নজম-উদ্দৌলার নবাব-লীলা সাঙ্গ হল। বসন্ত রোগে তার মৃত্যু হল। তার কিছুদিন পরেই দেশে অনাবৃষ্টি হল। শস্য জন্মাল না। প্রজার ঘরে কিছু সঞ্চিত ছিল না, আবওয়াব দিতে দিতে প্রজা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ১৭৭০ সাল দুর্ভিক্ষ হল। সেটা বাঙলা ১১৭৬ সাল। এই সালের নাম অনুসারে এই দুর্ভিক্ষ

"ছেয়াত্তর মন্বন্তর বলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এমন দুর্ভিক্ষ দেশে আর কখনও হয় নি। অসংখ্য লোক অনাহারে মরে গেল। যারা বেঁচে থাকল, তাদের মধ্যে অনেক দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। দেশের সে দুরাবস্থার সবিস্তার বর্ণনা এখানে স্থানোচিত হবে না। কৌতুহলী পাঠক সবিশেষ বিবরণের জন্য Hunter's Annals of Rural Bengal এ দেখতে পারেন। নবাবী আমলের আরম্ভে সুবাদারী করমানে দিল্লীর সম্রাট্ বাঙলা দেশকে "জেন্নেৎউল বিলেত" অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য বলে বর্ণনা করেছিলেন। আর সেই নবাবী আমলের শেষে সেই বাঙলার এই শোচনীয় পরিণাম! সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙলা মহা শ্মশানে পরিণত!!

(শ্রীহৃষিকেশ সেন।)

স্যার—রাসবিহারী ঘোষ

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনাম ধন্য উকীল ডাঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ সি, আই, ই, গত রবিবার ২৫শে ফাল্গুন রাত্রি ১টার সময় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাসবিহারীর পরলোক গমন সংবাদ দিবার উপলক্ষে আজ এই অল্প স্থানে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আর অধিক দিবার অবসর নাই, তিনি হৃদয়ের দিক্ দিয়া কতটা বড়, তাহাই দেখাইয়া আজ এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। রাসবিহারীকে একটা প্রতিভাবান করিয়াও তিনি যদি তাঁহাকে এই ওকালতী গণ্ডীর মধ্যে না রাখিতেন, তাঁহাকে যদি এই আইন ব্যবসায়ে আনন্দ দান, এই ব্যবসায়ে তাঁহার প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি না করিয়া দিতেন, তাঁহাকে যদি আমরণ মিতব্যয়ী না করিতেন, তাঁহাকে যদি পুত্রকন্যায় বঞ্চিত না করিতেন, তাহা হইলে আজ দেশের জন্য রাসবিহারী তাঁহার আজীবন সঞ্চিত ওকালতী অর্জ্জিত প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা বোধ হয় এমন ভাবে দান করিয়া যাইতে পারিতেন না। তাহার বহু অভাবগ্রস্ত দরিদ্র দেশকে এই মহাদান করিয়া যাইবেন বলিয়াই, ভগবান্ তাঁহাকে ঐ ওকালতী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করাইয়াছিলেন, পর পর দুই পত্নীর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমনের পর, তাঁহাকে চরিত্রবানের জীবনযাপন করাইয়া, মিতব্যয়ী করাইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করাইয়াছিলেন, আর সেই বিপুল সঞ্চিত অর্থ শেষকালে দেশের কাজে দান করিবার জন্য তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। জীবিতাবস্থাতেই রাসবিহারী একুশ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান কলেজের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যান। ইহা ছাড়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা, বাঙ্গালী

পণ্টন গঠনে দশ হাজার টাকা, ইহা ছাড়া অন্যের অজ্ঞাত দান বহু টাকা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার যে উইল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, দেশে কৃষি শিক্ষার প্রসার উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে কৃষি বক্তা প্রেরণের উদ্দেশে রাসবিহারী আরও আড়াইলক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বগ্রাম তোড়কোণা স্কুলে দেড় লক্ষ টাকা এবং তাঁহার আইন পুস্তকসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় পুস্তক দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বগ্রামের শিবকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং কিছু ভূসম্পত্তি শিবোত্তর স্বরূপ দিয়া গিয়াছেন; তাঁহার আত্মীয় এবং পোষ্যবর্গকে যথাযোগ্যরূপে কিছু কিছু দিয়া তাঁহার বক্রী সম্পত্তীর মূল্য প্রায় আট দশ লক্ষ টাকা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলেই দেখা গেল, ঐ বিরাট পুরুষ ওকালতীতে আজীবন যেমন মস্তিষ্কের বিরাটত্ব দেখাইয়াছেন, জীবনের শেষকালে তেমন হৃদয়ের বিরাটত্ব দেখাইয়া গেলেন। এই এক দানেই তাঁহার স্বদেশভক্তি, স্বগ্রামভক্তি, স্বজনভক্তি, দেবতাভক্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথের ও স্যার রাসবিহারির স্বদেশভক্তির এই পার্থক্য যে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ চিরটা কাল রাজনীতির বাহ্বাস্ফোট করিয়া শেষকালে বাৎসরিক চৌষট্টি হাজার টাকার বেতনের সরকারের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিলেন, আর স্যার রাসবিহারী চিরটা কাল রাজনীতি সম্বন্ধে প্রায় নীরব থাকিয়া শেষকালে তাঁহার প্রায় যথাসর্ব্বস্ব দেশের জন্য দান করিয়া গেলেন। আজীবন মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া, মৃত্যুকালে মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া "মানুষ"-বিরল বাঙ্গালার একটা মানুষের মত মানুষ চলিয়া গেল।

এবারকার বজেটে দেখিতেছি, গরিবের গাঁটে গবর্ণমেণ্টের হাত পড়িয়াছে। একটী পয়সার পোষ্টকার্ড গরিবে আর বিদেশের আত্মীয় স্বজনের খবর লইতে পারিবে না, তাহাকে দুই পয়সায় পোষ্টকাড কিনিতে হইবে। অধিক কথা বা গোপনীয় কথা হইলে গরিবে দুইটী পয়সার টিকিটওয়ালা খামের লধ্যে চিঠি পাঠাইতে পারিত, আর তাহা পারিবে না, এখন তাহাকে খামে চিঠি পাঠাইতে হইলেই চারিটি পয়সা খরচ করিতে হইবে। কয়লা একে অগ্নিমুল্য, তাহার উপর আরও কর চাপাইয়া গবর্ণমেণ্ট গরিবের উনুনের কয়লাকে আরও অগ্নি মুল্য করিলেন। মহাযুদ্ধের সময় হইতেই দেশলাই দুর্ম্মুল্য হইয়াছে, বোধ হয় জাপান না থাকিলে দেশলাই মোটেই মিলিত না, সেই দেশলাইয়ের উপর কর বাড়াইয়া গরিবের নিত্য প্রয়োজনীয় দেশলাইকে আরও দুর্ম্মুল্য গবরমেণ্ট করিলেন। গবরমেণ্ট সংবাদ পত্র বহুল প্রচারের উদ্দেশে সংবাপত্রের জন্য যে বিশেষ ডাক মাশুলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে এক পয়সায় আট তোলা পর্য্যন্ত ওজনের সংবাদ পত্র যাইতে পারিত, গবরমেণ্ট তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সঙ্কোচ সাধন করিলেন।

হাতে দেশে সুলভে সংবাদপত্র প্রচারের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। মণিঅর্ডারের মাশুল দ্বিগুণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদেশে চাকুরিজীবী গরিব লোকের বাটিতে টাকা পাঠাইবার লোকসান বাড়াইলেন। চিনি ও বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক করিয়া যেমন ঐ দুইটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে দুর্ম্মুল্য হইতে দুর্ম্মুল্যতর করিলেন, তেমনই উহা দ্বারা দেশী চিনি দেশী বস্ত্র উৎপাদনের ও ব্যবহারের সহায়তা করিলেন। ইহা এক প্রকার অমঙ্গলে মঙ্গল হইয়াছে বলিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে মদ, এসেন্স, মোটর প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের উপর শুল্ক বাড়াইয়াছেন, বড় লোকের ইন্‌কম টেক্স বাড়াইয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তাহা ঠিক ব্যবস্থাই হইয়াছে। কিন্তু গরীবের খাম, পোষ্টকার্ড, দেশলাই, কয়লা, ছাতা, সংবাদ পত্র মণিঅর্ডারের যে দাম বাড়াইলেন, তাহাতেই আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আরও বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি গরিবের গাঁটের পয়সা এমনই করিয়া লইয়া গবরমেণ্ট প্রায় সত্তর ক্রোর টাকা সামরিক খরচে ফেলিয়াছেন, এক ক্রোর টাকা দিল্লীতে নব রজধানী গঠনে ফেলিয়াছেন। গরিবের গাঁটের টাকা লইয়া গবরমেণ্টর এত অতিরিক্ত সামরিক খরচ, এত বিলাস ব্যয় কখন সমর্থনযোগ্য নহে।

রেলওয়েতে মাল চালানের উপর ভাড়ার হার বৃদ্ধি করিয়া গবরমেণ্ট মোটা ঠাকা তুলিবার মন্তব্য স্থির করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কাঁচা কয়লা পোড়া কয়লা এবং জ্বালানী কাঠের উপর মণকরা ১ পাই এবং অন্যান্য জিনিষের উপর ২ পাই হারে ভাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু এই সকল জিনিষের হার নিম্নলিখিতরূপে বর্দ্ধিত হইবে;—

পোড়া কয়লা কাঁচা কয়লা, জ্বালানি কাট ও খাদ্যদ্রব্যের উপর প্রতি মণে ছয় পাই।

কাটা কাপড়, জমাটী তুলা, পাট, লোহার জিনিস, কাঠ এবং তৈলের উপর প্রতি মণে দুই আনা।

ব্যবসায়ের অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যের উপর এক মণে এক আনা। বঙ্গবাসী—

—:—

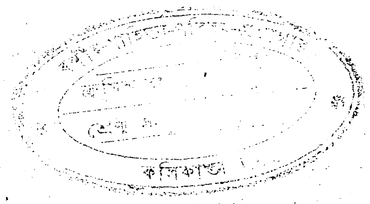

পত্রাদি

আলুর আবাদ—জনৈক অনুসন্ধিৎসু লিখিত পত্রের উত্তর—শীতঋতুতে আপনি যে দশ বিঘা আলুর আবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার জন্য যে সম্ভাবিত ব্যয় হইবে, এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহার তালিকা অতি পরিপাটীর সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। ব্যয় সম্বন্ধে যে হার ধরিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিব না, কারণ উহা স্থানীয় বাজার দরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আপনার দেশের কুলি-মজুরের রোজ কত, জিনিষপত্রের বা মূল্য কিরূপ, তাহার বিষয় আমা অপেক্ষা আপনি নিজেই অধিক জানেন।

প্রথম কথা,—বীজ বপনের সময় সম্বন্ধে। আপনার তালিকায় দেখিতেছি যে আপনি আশ্বিন মাসের ২৪।২৫ এ নাগাদ ক্ষেত্রে প্রথম চাষ দিবেন এবং ১লা অগ্রহায়ণ বীজ পুতিবেন। এ সম্বন্ধে আপনি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন। যদি ফলের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি না হইত, তাহা হইলে পশ্চাতে পড়িয়া গেলেও আমার কোন কথা ছিল না। আপনি যে সময় প্রথম চাষ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, আমি প্রায় সেই সময় বীজ রোপণ করিয়া থাকি। এ সময়ে বরষা প্রায় শেষ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাই বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। ঠিক সময়ে বীজ পুতিলে ফসল অনেক দিন ক্ষেত্রে থাকিতে পায়। সুতরাং পাট-তদ্বির যথারীতি হইয়া থাকে। তাহার ফলে গাছের বৃদ্ধি অধিক হয়, ফসলও সমধিক হয়।

বীজ পুতিবার প্রায় এক পক্ষ পরে সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। তবেই আপনার হিসাবমত অগ্রহায়ণের ১৫ তারিখ হইতে টেনে-টুনে মাঘের শেষ পর্য্যন্ত ফসলকে ক্ষেতে থাকিতে দিতে পারিতেছে না। ফাল্গুন মাসের আরম্ভের সঙ্গে গরম বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়, সূর্য্যোত্তাপও প্রখর হইতে থাকে সুতরাং আলুগাছও সেই সময় হইতে বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করে। গাছ বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে তাহার বৃদ্ধি বন্ধ হয়। এই আড়াই মাস মধ্যে উদ্ভিদ আর কত বাড়িতে পারে? ধাতব পদার্থ হইলে পিটিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারিত। সার বা পাটের বাহুল্য হইলেই যে উহা অপরিমিত বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আলু ফসল পূর্ণ চারি মাস কাল যাহাতে ক্ষেত্রে থাকিতে পায়, তাহার জন্য অগ্রে আবাদ আরম্ভ করা উচিত। আমার আলুর ক্ষেতে ইতিমধ্যে 'দোয়ার'-চাষ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আর যদি সুবিধা পাই তবে, ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে জমির তাবৎ কাজ সারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছি।

আকাশের অবস্থা দেখিয়া যদি বুঝিতে পারি যে ১৫ই কার্ত্তিকের পর আর বৃষ্টি হইবে না, কিম্বা হইলেও সামান্য দুই এক পসলা হইবে, তাহা হইলে অনর্থক কালবিলম্ব না করিয়া ১৫ই তারিখের পর যত শীঘ্র পারি, বীজ বুনিব। এই সময়ে বীজ বুনিলে, বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। অধিক সময় পাইলে গাছত স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইবার অবসর পাইবেই, তা-ছাড়া যে সার প্রয়োগ করা যায়, তাহা কালবিলম্বহেতু দিন দিন বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইতে থাকে। সময় অল্প পাইলে, উহার সকল অংশ সাররূপে উদ্ভিদ-শরীরে ক্রিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই, ফসলের অন্তিম দশা উপস্থিত হয়। ফলতঃ সে সময়ে গোড়ায় সার থাকিলেও কোন ফল হয় না। মাটীতে সার দিবা মাত্র যে, উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করে, তাহা নহে। সার বা মৃত্তিকাস্থিত সারাংশ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গলিয়া রসরূপে পরিণত হয়, যতক্ষণ না উহার রসমধ্যে মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষ বা অপর জীবজন্তুর ন্যায় যদি উহাদিগের মুখব্যাদন করিয়া পানাহার করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে যথানিয়মে বীজগুলিকে পুংক্তিতে রোপণ করিয়া গোড়ায় গোড়ায় সার দিয়া গেলেই চলিত। যখন তাহা নহে, তখন তাহাদিগকে যথেষ্ট সময় দিতে হইবে।

সারকে যতদূর বিগলিত করিতে পারা যায়, তাহা করিয়া, মাটিতে সংলগ্ন করিতে পারিলে ভালই হয়। সময় ও অবকাশাভাবে এতটা ঠিক পারা যায় না বলিয়াই টাট্‌কা সার প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত পরেই বীজ বপন করা যায় কিম্বা বপনের সঙ্গেই সার প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উদ্ভিদ-শরীরে সারের কার্য্য হইতে কিছু সময় অধিক লাগে। বিগলিত সার হইলে উদ্ভিদে সদ্য সদ্যই উহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদগণও আরম্ভ হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত উহার উপকারিতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

দশ বিঘা জমিতে প্রত্যেক গাছে স্বতন্ত্রভাবে তরল সার দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। তরল সার ব্যবহার করিতে দুইটা অনর্থক খরচ পড়িয়া যায়। প্রথমতঃ সার দিবার মজুরী; দ্বিতীয়তঃ গাছের গোড়া ঈষৎ শুষ্ক হইলে, গোড়া খুঁড়িয়া উপরিভাগ-স্থিত সর বা ঘন পদার্থটাকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করাইবার জন্য নিড়াইয়া দেওয়া। তৎ-পরতা স্থলে সার প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু যখন সময় রহিয়াছে, এরূপ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ঘুটে ও গোবরের গুণ স্বতন্ত্র। গোবর অবস্থায় গোবরে যে যে পদার্থ থাকে, উহা ঘুটেয় পরিণত হইলে সে সকল গুণের অনেক হ্রাস হইয়া থাকে সে জন্য গোবর হইতে সার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে।

খইল চূর্ণ করিয়া কোন পাত্রে ৫।৬ দিন ভিজাইয়া রাখিলে, উহা ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। একটু যত্ন করিলে উক্ত কয় দিন মধ্যেই উহার উত্তাপ কমিয়া যাইবে তখন আর উহার ব্যবহারে কোন ক্ষতি না হইবার সম্ভাবনা।

বীজের উপরে গমের বিচালী চাপা দিলে, মাটি আল্‌গা থাকে, সুতরাং বীজ আলু সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। খড় চাপা দিলে আর একটা উপকার এই যে, উহার উত্তাপে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। হালকা বা দোয়াস মাটীতে গরমে বিচালী দিবার তত প্রয়োজন দেখা যায় না। মাটি অতিশয় ভারি ও কঠিন হইলে, উহা দিতে পারিলেই ভাল হয়।

আশ্বিনের শেষভাগে যদি বীজ রোপণ করা যায়, আর সেই সঙ্গে অস্থিচুর্ণ (মিহিগুড়া ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে আর উহাকে স্বতন্ত্রভাবে পচাইবার আবশ্যকতা নাই। উল্লিখিত অস্থিচুর্ণ ধূলিবৎ থাকে, তাহা ব্যতীত সে সময়ে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে, সুতরাং উহা বিগলিত হইতে বিলম্ব হয় না। তবে উক্ত চূর্ণ যাহাতে মাটির সহিত উত্তম রূপে বিমিশ্রিত হইয়া যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে যে ক্ষেত্রে অস্থিসার দিবার কথা বলিয়াছি, তাহা সকল স্থলে নহে। স্থূল অস্থিচুর্ণ হইলেই বিগলিত হইতে অধিক সময় লাগে। কিন্তু মিহিগুড়া সদ্য দিতে পারা যায়। তবে দিন পনর আগে খইল ও অস্থিচুর্ণ একত্রমিশাইয়া ভিজাইয়া রাখিলেই উহা বীজ বপনের সময় ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। বীজের গোড়ায় গোড়ায় দিতে হইলে বিঘা প্রতি দুইমণ অস্থিচুর্ণ ও চারিমণ খইল যথেষ্ট।

মাটিতে ছাই মিশাইলে মাটি আল্‌গা থাকে। তা ছাড়া উহার অবস্থান হেতু নাইট্রোজানিক পদার্থটা উড়িয়া যাইতে পারে না। ছাই অর্থে পাথুরিয়া কয়লার ছাই নহে—কেবল কাষ্ঠের ছাই অথবা পাতা বা পানা পোড়াইয়া বুঝিতে হইবে।

বীজ-আলু মাঝারি গোছের হওয়া উচিত। বড় জাতীয় আলুর বীজ ছোট হইলে ক্ষতি নাই। ছোট আলুর বীজ ভাল পাট ও তদ্বির পাইলে সম্ভবমত হইবে। আদত আলু রোপণ করায় সুবিধা আছে। আলু কাটিয়া রোপণ করিলে গাছ প্রথম অবস্থায় বড় শীর্ণ থাকে, বিশেষ যত্ন করিলে তবে সে ভাব পরিবর্ত্তন হয়। বড় বীজ-আলু কাটিয়া রোপণ করিতে হইলে, আলুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাতো দিয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইতে হয়, পরে ক্ষেতে যথানিয়মে রোপণ করা যুক্তিসিদ্ধ

সিমলা বা দার্জ্জিলিং পাহাড় হইতে বীজ-আলু আনিতে অনেক খরচা পড়িয়া যাইবে কিন্তু উপায় নাই। প্রতিবৎসর পাহাড় হইতে বীজ আনা কর্ত্তব্য। অত খরচা করিয়া আনিয়া যে আলু উৎপন্ন করিবেন, তাহা পল্লীগ্রামের বাজারে কত দরে বিক্রয় হইবে? স্থানীয় বাজারের জন্য স্থানীয় ভাল আলুর আবাদ করা ভাল বলিয়া মনে হয়। আপনি যে উৎপন্ন আলুর দর ১৷৷০ টাকা ধরিয়াছেন তাহার অধিক বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে বাজারে আলু উঠে, সে সময় ২৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা দরও বিক্রয় হয়। আমি কখনও ২৷৷০ টাকা মূল্যের অধিক বিক্রয় করিতে পারি না, তবে যদি সহরে পাঠান যায়, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ব্যয় আছে। আর যদি আপাততঃ আলুকে গুদামজাত করিয়া রাখিয়া দুই চারি মাস পরে বিক্রয় করা যায়, তাহালে, উহার ওজন কমিয়া যাইবে, দাগী পচা বাদ যাইবে। মুষিক প্রভৃগণও অনেক অনিষ্ট করিবেন। অধিকন্তু সেই রাশীকৃত আলুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় হইবে। সুতরাং হরে-দরে হাটু জল দাঁড়াইল। তাহা অপেক্ষা সদ্য সদ্য বিক্রয় করিয়া ফেলা ভাল। আর নগদ টাকারও একটা বাজার দর আছে।—কৃঃ সঃ

সহজ ব্যবসায়

অনেকেই শিল্প ব্যবসায়ের কথার প্রত্যুত্তরে মূলধনহীনতার দোহাই দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এমন কোনও ব্যবসায় আছে, যাহা বিনা মূলধনে বা অল্প মূলধনে আরম্ভ করা যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে কাজ বিস্তৃত করিতে পারা যায়।

"কষ্টিক পটাস" সাবান প্রস্তুত করিবার একটী প্রধান উপাদান। পাড়াগাঁয়ে এই দ্রব্যটী গুল্ম, শুক্‌না পাতা, কলার বাসনা, লতা ও তদ্বিধ অন্যান্য দ্রব্যাদি বিনা ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়। কেহ তাহার খোঁজ রাখে না। "কষ্টিক পটাস" প্রস্তুত করিতে হইলে এই প্রকার শুষ্ক ও হালকা জিনিষগুলি এক স্থানে গাদা করিয়া, পোড়াইতে হয়। পোড়াইলে ইহা হইতে এক প্রকার সাদা ছাই বাহির হয়। কাল ছাইগুলি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত পোড়াইবার জন্য রাখিয়া দিবে। সাদা রংএর ছাইগুলি একত্র করিয়া কোন চীনামাটীর পাত্রে অথবা দেশীয় মাটীর পাত্রে জল দিয়া গুলিয়া লও। ছাইগুলি জলে মিশাইবার পর ঐ মিশ্রের মধ্যে প্রতি /৫ সের জলে ৵০ ছটাক হিসাবে কলি চুণ মিশাইয়া দাও তার পর বেশ করিয়া জল চুণ একত্র করিয়া নাড়িয়া ঘোলাইয়া দাও। এক ঘণ্টার পরে দেখিতে পাইবে, উপরে পরিষ্কার জল, কিন্তু নীচে সাদা ও কতকগুলি দ্রব্য স্থির হইয়া রহিয়াছে।

এখন যাহা নীচে রহিয়াছে, তাহা চক বা চাখড়ি চূর্ণ, এবং উপরের দ্রব্য বই আর কিছুই নহে। তারপর অন্য আর একটা মৃৎপাত্রে "কষ্টিক পটাস" দ্রব্য ঢালিয়া পৃথক করিয়া লও। না হয় খুব ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেও চলিতে পারে। তাহাতে চক-চূর্ণগুলি ঐ কাপড়ের মধ্যে আঁটিয়া যাইবে ও ঐ কষ্টিক পটাস দ্রব্য কাপড়ের মধ্য দিয়া পাত্রান্তরে পড়িতে থাকিবে। কাপড়খানি খুব পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। আর একটী কথা এই যে, কাপড়খানি ব্যবহারের অব্যবহিতপরেই উত্তম করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। না হইলে কাপড়খানি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে।

"কষ্টিক পটাস" দ্রব্য সমুদায় সংগৃহীত হইলে উত্তম মৃৎপাত্রে করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে রাখিয়া দাও। যদি কোন রং বিকৃত করিবার পদার্থ উহার মধ্যে থাকে ত শোধরাইয়া যাইবে। অবশেষে ঐ জল একটী এনামেল পাত্রে করিয়া অগ্নির উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে

হইবে। অজেকাল এনামেল পাত্র সংগ্রহের জন্য আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কলিকাতায় বাজারে এনামেল করা জলের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া এনামেলের কড়াই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। জ্বাল দিতে দিতে ক্রমে জল মরিয়া যাইবে। তখন ঘন আঠার মত এক প্রকার পদার্থ কড়াইয়ের নীচে থাকিবে। আগুনের জ্বালে যখন ঐ পদার্থ গাঢ়তর হইয়া লালবর্ণ হইবে, তখন ইহা উপযুক্ত পাত্রে ঢালিয়া ফেল। কিছুকাল পরে জমিয়া কঠিন হইবে। তারপর ছাচ হইতে খুলিয়া লইয়া সাবধানে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও।

ইহারই নাম "কষ্টিক পটাস।" এই দ্রব্য কলিকাতার ঔষধ-বিক্রেতাদিগের দোকানে বিক্রিত হইতে পারে।

মনে কর সঠী গাছ। উহার মূলে পালো পাওয়া যায়। পাতাগুলি শুকাইয়া লইতে হয়। মনে কর, হলুদের গাছ কিম্বা আদার গাছ। ডাইলের গাছ ধানের খড়, আলুর পরিত্যক্ত লতা, কুমড়া, ফুটী, তরমুজ প্রভৃতির শুষ্ক লতা প্রভৃতি সমস্ত হইতেই প্রভুত কষ্টিক পটাস পাওয়া যায়। সমস্ত প্রকার লতা পাতা কিম্বা গুল্ম বা ঔষধজাতীয় শুকাইয়া পোড়াইতে হয়।

প্রথম একবার গাদা করিয়া পোড়াইতে হয়। তার পর ঐ জলে জ্বাল দিবার জন্য বাকী মজুদ লতা পাতা ইত্যাদি পোড়াইতে পারা যায়। এই ভাবে করিলে জ্বালানি কাষ্ঠের খরচ লাগিবে না।

আবার আমাদের বাঙ্গলা দেশে যে কচুরি পানার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার ছাই হইতে সহজেই কষ্টিক পটাস তৈয়ারি হইতে পারে। ইহাতে তাহাদের বৃদ্ধি কথঞ্চিৎ গৃহিত করা যায়।

অল্প হউক, বেশী হউক, এই প্রকার লতাপাতা জ্বালাইয়া তাহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে চুণ মিশাইয়া কোন ব্যবসায় করা অপেক্ষা আর অল্প মূলধনে কি ব্যবসায় হইতে পারে? আমরা এমন দুরাশা করি না যে, এই বৃত্তান্ত পড়িয়া কেহ এ কাজ করিবেন। করিলে আমাদের বহুদিন অভ্যস্ত লুপ্ত বিদ্যা হইতে মুষ্টিমেয়ের হয় ত অন্নও সংগৃহীত হইতে পারে।—

সাবলম্বী।

কতকগুলি সবজী চাষের সমস্য—

শ্রীরমেন্দ্রলাল চৌধুরী, সহকারী হেড মাষ্টার, সরিষা হাই স্কুল, ২৪ পরগণা।

১। "ভীতি পিয়াজের" বীজ পাওয়া যায় কিনা? উহার চাষ ২৪ পরগণায় সম্ভব কিনা? ভীতি পেঁয়াজ এক প্রকার পাঠনাই পেঁয়াজ। উহার চাষ ২৪ পরগণার মাটীতে হইয়া থাকে। কৃঃ সঃ

২। কোন কোন নার্শরির তালিকার বারমেসে ওলকপি ও বারমেসে বীটের উল্লেখ দেখাযায় ইহা বিশ্বাস্য কি না? বারমাস হয় এমন বীট ও ওলকপি এবং বাঁধাকপি ও ফুলকপি আছে। কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বারমাস হয় না। শীত প্রধান স্থানে বারমাস হইতে পারে। কিন্তু আবার সে সমস্ত জায়গায় অত্যন্ত শীত এবং যখন ভুষারপাত তখন ঐ সকল সব্জী চাষ সম্ভব নাই।

৩। ফাল্গুনমাসে "কালি পেঁয়াজ রোপণ করা চলে না। গরমের হাওয়ায় উহাদের গাছ শুষ্ক হইয়া যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পেঁয়াজ রোপণ বিধেয়। কৃঃ সঃ।

সবজী বীজের মূল্য তালিকা ভারতীয় কৃষি সমিতির (Indian Gerdening Asoca tion) অফিসে পাওয়া যায়। সকল প্রকার সবজী বীজও ঐখানে পাইবেন। সবজী চাষ পুস্তকের মূল্য ॥০ আনা ছিল কিন্তু ইহা পুন মুদ্রিত করার পর আর ॥০ আনায় পাইবেন না। ইহার ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কৃষি সহায় এখন পাওয়া যায় দাম ॥০ আনা মাত্র। কৃঃ সঃ

প্রাপ্তি স্বীকার—গোধন শীর্ষক এক কবিতা পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এপ্রকার কবিতা প্রকাশের মতস্থান আমাদের পত্রিকায় নাই। গোধন গণের অবাধ হত্যা হেতু উচ্ছাস হইতে প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু কেবল উচ্ছাসে কাজ হইবে না—গোধন রক্ষার উপায় করিতে হইবে। প্রত্যেক পল্লী ইউনিয়ানে গোশালা স্থাপন না করিলে উপায়ান্তর নাই। লেখক উদ্যোগী হইয়া এরূপ একটী গোশালা স্থাপনে কৃত সঙ্কল্প হউন ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা। ইতি কৃঃ সঃ

সুন্দরবনে আবাদ

সুন্দর বনের মাটী প্রায় সর্ব্বত্রই লোণা। যেখানে সেখানে সমুদ্রের লোণাজল উঠিয়া ভাসিয়া যায় তথাকার মাটী অতিশয় লোণা সে জমিতে কোন চাষের সম্ভাব নাই। ঐ সকল জল প্লাবিত স্থান সমূহে সুন্দরি, গরাণ, খলসে, গেঁয়ো কাঠের জঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। লোণা জলে ঐ সকল গাছ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে কিন্তু অন্যগাছ লোণাজলে মরিয়া যায়। লোণা জলে আর এক প্রকার গুল্ম জন্মিয়া থাকে তাহাকে হড়কোচ গাছ বলে। ইহা এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গুল্ম। গাঙসারে কিম্বা লোনা জলযুক্ত খালবিলে হড়কোচের বিস্তর জমিতে দেখা যায়। ইহাতে জোয়ারের পলিমাটি আটকাইয়া জমি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে। গাঙের ধারে এক প্রকার ঘাষ জন্মে সেগুলির মুখ সূচাল এই ঘাষকে ধানে ঘাস বলে' ধানে ঘাসেও জলে আটকাইয়া জমি উচ্চ হইতে থাকে। সুন্দর বনের জমি উচ্চ হইলেও তাহাতে চাষ হয় না অধিক লোণায় সব ফসলই নষ্ট হইয়া যায়। যে জমিতে ধান কিম্বা অন্য ফসলে আবাদ করিতে হইবে তাহাতে লোণা জল উঠা বন্ধ করিতে হইবে। লোণা জল উঠা বন্ধ করার একমাত্র উপায় জমিটি চারিদিকে বাঁধা বা ভেড়ীয় দ্বারা বন্ধ কর। এই প্রকারে জমির

ভেড়ী বাঁধিয়া ক্ষেত্র মধ্যস্থ সমস্ত জঙ্গল কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কখন কখন জঙ্গল কাটিয়া তাহা পুড়াইয়া দেওয়া হয়। বড় কাষ্ঠ অবশ্য পুড়ান হয় না—ঝুপি জঙ্গলই পুড়ান হয়। ক্ষেত্র মধ্যস্থ বড় গাছে গোড়া তুলিয়া না ফেলিলে জমিতে লাঙ্গল দিবার অসুবিধা হয়। কৌশল দ্বারা গোড়াগুলি পুড়াইতে পারিলে আবাদের অনেক খরচ বাচিয়া যায়। একবার কাটিলেই জঙ্গল সাফ্ হয় না বার বার ২।৩ বার পোড়া দিতে হয় তবে জমি আবাদের উপযুক্ত হয়। জমিতে পাতা পচিতে পাইলে এবং পাতা পোড়া ছাই জমিলে জমি অতিশয় উর্ব্বর হইয়া উঠে এবং ২।৩ বৎসর ধরিয়া এবংক্রমাগত বৃষ্টির জলে ধৌত হইলে জমি ধান চাষ বা যে কোন ফসল চাষের উপযোগী হয়। সুন্দর বনের জমী নীনা স্থানে ছোট বড় নদী ও খাল সমাচ্ছন্ন। ঐ সকল খাল ও নদী দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতে পারিবে অথচ লোণা জল উঠিবে না এরূপ ব্যবস্থা করিয়া তবে সুন্দর বনের চাষ আরম্ভ করিতে হয়।

ভেড়ী দ্বারা আবদ্ধ এক একটি আবাদের (যাহাকে চল্‌তি কথায় লাট বলে) মাসে মাসে পুষ্করিণী বা জলাশয় খনন করিতে হইবে। এই সকল জলাশয়ে যে বৃষ্টিবারি সঞ্চিত হইবে তাহা গবাদি ও মানুষের পানীয়। পুষ্করিণী বা জলাশয় প্রথমতঃ অধিক গভীর খনন করিতে নাই, কারণ তাহার জল দুই এক বার ছেচিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে নতুবা জল সুমিষ্ট হইবে না। প্রথম যে জল সঞ্চিত হইবে তাহা জমির ধোয়াট লবণ সংযুক্ত হইয়া কতটা লোণা আস্বাদ হয়। ঐরূপ ছেচিয়া বাহির করিয়া দিয়া জলাশয় গুলি আরও গভীর খনন করিলে তাহাতে যে জল সঞ্চিত হয় তাহা সুপেয়।

লোণা জল উঠিবে না কিন্তু ঘেরির মধ্য হইতে বাড়তি জল বাহির হইবার পয়নালা না থাকা চাই। তাহা না থাকিলে লোণাজল আটকাইয়া থাকিয়া চাষ ভাল হইবে না এবং বৃষ্টীর জলে লবণ সমুদায় ধৌত হইয়া যাইতে পারিবে না। রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অভিজ্ঞতা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সুব্যবস্থা করিলে দুই বা তিন বৎসরের মধ্যেই লোণা-মাটি মিঠা কিন্তু আমি দেখিয়াছি, কোন কোন লাটে ভেড়ী বান্ধিবার সঙ্গে সঙ্গেই আইল বান্ধিয়া জমী প্রস্তুত করায়, চারি বা পাঁচ বৎসরেও ধান চাষের উপযুক্ত হয় নাই। শীঘ্র শীঘ্র আইল বান্ধিয়া জমী প্রস্তুত করিলে, জল নিকাশের গতি অল্প বিস্তর রোধ হয়। ইহাতে মাটীতে অধিক দিন লবণ থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি। এই নিয়মে ফ্রেজারগঞ্জের জমী করায়, পাঁচ বৎসরেও মৃত্তিকা হইতে লবণ ধৌত হয় নাই। ১৯০৮ সনে কোন জমী হইতে পাট জন্মে নাই, তবে পূর্ব্বোক্ত ঢিপির উপর বেশ পাট জন্মিয়াছিল।

উক্ত ঢিপির মৃত্তিকা জীভ-দ্বারা পরীক্ষা করায় লবণাক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই।

কিন্তু ভাগলপুর কৃষি-কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষক মিঃ টেলার ঐ মৃত্তিকা হইতে ও শতকরা ০-২৫ ভাগ লবণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষায় ফ্রেজারগঞ্জের অন্যান্য জমীর উর্দ্ধভাগের এক ফুট মৃত্তিকায় শতকরা ০-৫ হইতে ১৫৮ ভাগ লবণ; এবং পরবর্ত্তী আর এক ফুটের মৃত্তিকায় ০-৫ হইতে ২ ভাগ লবণ, এবং তৎপরবর্ত্তী এক ফুট মৃত্তিকায় ০-৯ হইতে ২·৪ ভাগ লবণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই সকল জমীতে যথা সময়ে পাটের বীজ বপন করা হইয়াছিল, কিন্তু লবণের আধিক্যহেতু এক মাসের মধ্যেও বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। পরে তথায় দুই দিন বৃষ্টি হয়; তৎপর বীজ উত্তমরূপ অঙ্কুরিত হয়। ইহার পাঁচ বা ছয় দিন পরে একদিন প্রখর রৌদ্র উঠে এবং সেই দিনই সমুদয় চারা গাছ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, বৃষ্টি দ্বারা লবণ ভূমির নিম্নে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সূর্য্যোত্তাপে ইহা পুনঃ ভূমির উপরে উত্থিত হইয়া চারা গাছ সকল মারিয়া ফেলিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষার নিমিত্ত উক্ত মৃত্তিকা ১৯০৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তলন করা হইয়াছিল। এই সময়ে বৃষ্টির দ্বারা মৃত্তিকার অধিকাংশ লবণ নিম্নদেশে নীত হইয়াছিল। ঢিপি বাদে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে ঐ বৎসর ধান্যও উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ষার পূর্ব্বে তথাকার মৃত্তিকা জীভে লবণাক্ত বলিয়া অনুভূত হইত; এবং অনেক জমীর উপরে লবণ জমা হইত।

ভেড়ী বান্ধিবার পর, প্রথমে গিমি শাকের ন্যায় বিরি নামক একরূপ শাক উৎপন্ন হয়। কিছুদিন পরে তামেলি বা তালমুড়ি * নামক একরূপ ঘাস জন্মিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ মৃত্তিকায় লবণ হ্রাস হইয়াছে। তৎপরে তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরে জমী প্রস্তুত করিয়া ঐ লাটে ধানের আবাদ করা যাইবে। সুন্দর বনের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা, তথায় বিনা সারেও অনেক দিন প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সুন্দরবনের যে মৃত্তিকায় ধান জন্মে তাহাতেই যে রবি শস্য কিম্বা পাট জন্মিবে তাহা নহে। কারণ বর্ষাকালে ধান জন্মে, তখন লবণ বৃষ্টির জলের সহিত মৃত্তিকার নিম্নদেশে প্রবেশ করে। এবং অবশিষ্ট লবণ মৃত্তিকার উপরিস্থিত আবদ্ধ জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় ক্ষীণতা প্রযুক্ত ইহা ধান্যের অপচয় করিতে পারে না। এবং মৃত্তিকার উপরে আবদ্ধ জল থাকায়, সূর্য্যের কিরণ দ্বারা নিম্নস্থ লবণ মৃত্তিকার উপরে উঠিতে পারে না। শীত ও গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের উত্তাপে মৃত্তিকার নিম্নস্থ লবণ উর্দ্ধভাগে উত্থিত হয়। সুতরাং লবণাক্ত মৃত্তিকায় রবিশস্য কিম্বা পাট জন্মিতে পারে না। যে মৃত্তিকায় একশত ভাগের মধ্যে একার্দ্ধ ভাগ লবণ তথায় কোন শস্যই জন্মিতে পারে না। বরিশালের অনেক স্থানে ফাল্গুন হইতে জৈষ্ঠ্য মাস পর্য্যন্ত জোয়ারের সময় লোণা জল উঠে, তথাপি তথায় প্রচুর উত্তম ধান জন্মে। ইহার কারণ এই যে বর্ষাকালে তথায় লোণা জল থাকে না। তখন

* সম্ভবত এই ঘাস দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

জোয়ারের মিঠা জল মৃত্তিকার লবণ বিধৌত করিয়া লইয়া যায়। যখন ঐ জমীতে ধান্য রোপণ করা হয়, তখন ইহার মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে মিষ্টতা লাভ করে। এই স্থলে আমার ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, যে স্থানের ক্ষেত্র এইরূপ জোয়ারের জলে সিক্ত হয় এবং ভাটার সময় শুষ্ক হয়, তাহার মৃত্তিকা যেমন উর্ব্বরা এমন মৃত্তিকা আর কোন প্রদেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। বিনা সারে এই সকল ক্ষেত্র প্রচুর ধান্য উৎপন্ন করিয়া বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অন্ন বিতরণ করে। বন্যা ও কীট পতঙ্গের আবির্ভাব না হইলে, বৃষ্টির অভাবে তথায় কখনও শস্যহানি হয় না।

লবণ সার—লবণ অত্যাধিক মাত্রায় থাকিলে ফসলের হানী হয় কিন্তু ইহার উপযুক্ত ব্যবহারে অনেক ফসলের উপকার হয়। নারিকেল, সুপারি, খর্জ্জুর প্রভৃতি ভাল জাতীয় গাছ সকল লবণ প্রয়োগে উৎকর্ষতা লাভ করে। ধান চাষে জমিতে কিছু লবণ প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্য মিঠান দেশে ধান চাষ করিতে হইলে ধানের ক্ষেতে অন্য সারের সহিত খারি লবণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। লবণ সারের গুণাগুণ সম্বন্ধে সরল কৃষি-বিজ্ঞানে যাহা বর্ণিত আছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

যেমন চুণ-সার দ্বারা কলাই জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে সেইরূপ লবণ-সার দ্বারা এই জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ অপকার হয়। এ কারণ সমুদ্র হইতে ৫০ ক্রোশ অন্তরের মধ্যে অড়হর, কলাই, ছোলা, মুগ ইত্যাদি ভাল জন্মে না। কিন্তু যে জমিতে চুণের ভাগ অধিক ঐ জমিতে লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে কোন কোন ফসলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উদাহরণ কার্পাস। যে জমিতে চুণের ভাগ অধিক ঐ জমিতে কার্পাস জন্মাইতে হইলে বিঘা প্রতি অর্দ্ধ মণ লবণ সাররূপে ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে কার্পাসের ফল অধিককাল স্থায়ী ও অধিক হয়, এবদৃঢ়ং আঁইশ ও লম্বা হয়। কার্পাসের আঁইশের উন্নতি সাধন করিতে গেলে এই বিশেষ উপায়টী অবলম্বন করা উচিত।

উদ্ভিদ-রোগ, জোক, শামুক, ইত্যাদি মারিতে গেলে বিঘা প্রতি এক মণ লবণ ব্যবহার করা উচিত। যে জঙ্গল মহলের মৃত্তিকা সমুদ্র তীর হইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ যাহাতে লবণের ভাগ অধিক থাকা সম্ভব নহে, সে জমিতে চুণ দিয়া যেরূপ উপকার পাওয়া যায় লবণ দিয়াও সেইরূপ উপকার পাওয়া যায়। জমির উর্ব্বরতা আদায় করিয়া লইবার দুইটী প্রধান উপায়, চুন ও লবণ সাররূপে ব্যবহার করা ইহা দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি পদার্থের সারভাগ সকল সত্বর গলিত হইয়া ফসলের পোষণোপযোগী অবস্থায় সংজে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা ফসলের উপকার ও জমির অপকার করা হয়। এ কারণ নিস্তেজ জমিতে চুণ বা লবণ কখনই সাররূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ ফসলে বিঘা প্রতি এক মণ লবণ সাররূপে

ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। বাঁধা কপি, ফুল কপি, বীট, ম্যাংগোড, যব, টোমাটো বা গুট বেগুন, পেঁয়াজ, শতমুলী, ব্রেড্-ফ্রুটের গাছ, আমগাছ, নারিকেল গাছ, খর্জ্জুর গাছ, হিজ্‌লি বাদামের গাছ প্রভৃতি কয়েক প্রকার গাছের গোড়ায় গোড়ায় প্রতিবার পরবৎসর লবণ সার দেওয়া উচিত, সমস্ত জমিতে লবণ ছিটাইয়া দিলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক বিঘাতে যদি ১২০টী নারিকেল গাছ লাগান হয় তাহা হইলে সমস্ত জমিতে এক মণ লবণ ছিটাইয়া না দিয়া গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক খুড়িয়া দিয়া প্রত্যেক গাছের তলে ১ সের করিয়া লবণ প্রয়োগ করিলে ফল অধিক পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে (অর্থাৎ ৫০ ক্রোশের মধ্যে) লবণ সার ব্যবহার করা কোন আবশ্যক নাই। বায়ু সহকারে সমুদ্রের জলকণা ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত অন্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

লোণা-মাটির ব্যবহার—সোরা, প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে; এ কারণ, বিশুদ্ধ, অর্থাৎ বারুদ প্রস্তুতের উপযোগী, সোরা প্রস্তুতের বিরুদ্ধে রাজ-নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও লোণা-মাটি, অর্থাৎ সারের জন্য ব্যবহারের উপযুক্ত সোরাপূর্ণ মাটি প্রত্যেক কৃষকই প্রস্তুত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে পারে। আনুবীক্ষণিক কয়েক প্রকার উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে সারবান পদার্থ (অর্থাৎ যবক্ষার-জান) সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া দিতে পারে।

লোণা-মাটির ভাঁটি—প্রত্যেক কৃষক আপন গৃহের অথবা ক্ষেত্রের সন্নিকট একটী লোণা-মাটি প্রস্তুতের ভাঁটি করিয়া উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রতি বৎসরে একবার করিয়া ঐ লোণা-মাটী ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে। ভাঁটীটী সূর্য্যের কিরণ ও বৃষ্টির জল হইতে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ, উহার উপরে একটী অনতি-উচ্চ চালা অথবা টীনের ছাদ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ছাদের বা চালার নিম্নবর্ত্তী মৃত্তিকা একফুট বা ১৫ ইঞ্চি গভীর করিয়া চষিয়া বা খুঁড়িয়া, উহার উপর ৩।৪ইঞ্চি, ঘোড়ার নাদি বা গোময়, এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরাতন চুণ বা ঘুঁটীং পাথর, বিস্তৃত করিয়া দিয়া, পুনরায় লাঙ্গল বা কোদালি দ্বারা মৃত্তিকা আলোড়িত করিয়া সমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইয়া, মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ, মাসে দুই তিনবার জল ছিটাইয়া দিয়া মৃত্তিকা আলোড়িত করিয়া লইলে, চারি পাঁচ মাস পরে ঐ মৃত্তিকা সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোধুম, আশু-ধান্য, ইক্ষু, ভুট্টা, দেব-ধান্য, শাক, কপি, ইত্যাদি ফসলের পক্ষে এই লোণা-মাটি বিশেষ উপকারী। যে স্থানের মৃত্তিকায় চুণের পরিমাণ স্বভাবতঃই প্রচুর, সেই স্থানে চুণের আবশ্যক নাই। মৃত্তিকাতে স্বভাবতঃ চুণের পরিমাণ প্রচুর আছে কি না ইহা একটী সহজ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতে পারে। যে মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া উহাকে লেবুর রসের বা সির্কার মধ্যে ফেলিয়া দিলে যদি স্ফুট বিম্ব দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত মৃত্তিকাতে প্রচুর, অর্থাৎ, শতকরা একভাগের অধিক চুণ আছে বুঝা যাইবে। যবক্ষার উৎপাদন ৯৮° ফারেন্ হিট্ উত্তাপেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর হইয়া থাকে; কিন্তু ৪৫° হইতে ১৩০° ফারেন্ হিট উত্তাপ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু যবক্ষার উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিম্ন বঙ্গদেশে এক হাত গভীর মৃত্তিকার মধ্যে কি শীত কি গ্রীষ্মে ৬৫° হইতে ১০০° ফারেন্ হিট্ উত্তাপের সীমা কখনই অতিক্রম করে না। ভাঁটির উপরের চালা বা ছাদ যদি তিন-চারি হাত মাত্র উচ্চ হয়, এবং ভাঁটির চতুর্দ্দিক অনুচ্চ দেউলের দ্বারা সংরক্ষিত থাকে তাহা হইলে ভাঁটির মধ্যে অধিক বায়ু সঞ্চালিত না হইবার কারণ, দিবারাত্রি উষ্ণতা প্রায় ৭০০° হইতে ১০০০° এই সীমার মধ্যে সংরক্ষিত করিতে পারা যায়।

খাভি সোরা—লোণা-মাটি হইতে বারুদ প্রস্তুতের উপযুক্ত সোরাও প্রস্তুত হইতে পারে। এই সোরাও সাররূপে আশু-ধান্য গোধূম, ইক্ষু, ভুট্টা, বাঁধা-কপি, তুঁত, শাক, ইত্যাদি ফসলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ হইতে তিনমন পর্য্যন্ত সোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। গাছগুলি যখন অন্ততঃ অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ হইয়া উঠিয়াছে দেখা যাইবে তখনই সোরা জমিতে ছিটাইতে হইবে। নিতান্ত চারা গাছের নিম্নে সোরা পড়িলে কখন কখন গাছ জ্বলিয়া যায়। সোরা সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে হয় জলের সহিত নতুবা চূর্ণ মৃত্তিকার সহিত, মিশ্রিত করিয়া, তবে জমিতে ছিটান উচিত। ক্রমান্বয়ে একই জমিতে প্রতি বৎসর কেবল সোরা-সার ব্যবহার করিলে জমি নিস্তেজ হইয়া যায়। এ কারণ সোরা সার প্রত্যেক বৎসর ব্যবহার করিতে হইলে হাড়ের গুঁড়ার সহিত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হাড়ের গুড়া সহজে মৃত্তিকা মধ্যে গলিত হয় না—সোরা সহজেই গলিয়া যায়, এবং মৃত্তিকা মধ্যগত সারবান পদার্থ সকলেও গলাইয়া লয়। গলিত অবস্থায় উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এককালীন মৃত্তিকার মধ্যগত অনেকটা সারবান পদার্থ গলিত হইয়া গিয়া শেষে মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অসার হইয়া পড়ে। হাড়ের গুড়ার মিশ্রণ দ্বারা এই অনিষ্ট বোধ হইয়া থাকে। সোরা-সার নিতান্ত সহজে গলিয়া যায় বলিয়া ইহা বর্ষাকালে ব্যবহার করা উচিত নহে। বর্ষাকালে এই সার সহজে ধৌত হইয়া চলিয়া গিয়া জমিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যেখানে ভাদুই ফসল লাগান হয় সেখানে এই সার চৈত্র-বৈশাখ মাসে ব্যবহার করা চলিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসেই এই সার তৃণজাতীয় রবিশস্যের জন্য ব্যবহার করা যুক্তি-সঙ্গত।

সোরা-প্রস্তুত—লোণা-মাটি প্রস্তুতের পক্ষে কোন বাধা নাই বটে কিন্তু সোরা প্রস্তুত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন চলিতে পারে না। মল-মূত্র প্রোথিত করিবার জন্য নগরের বহির্ভাগে যে সকল ক্ষেত্র মিউনিসিপালিটী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

থাকে ঐ সকলে প্রোথনকালে চুণ ব্যবহৃত হইলে অনায়াসে উহারা সোরা প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মল-মূত্র ও চুণ মিশ্রিত মৃত্তিকা খনন করিয়া লইয়া উহাদ্বারা কতকগুলি স্তূপ করিয়া লইতে হয়। এই স্তূপগুলি দুই হাত মাত্র উচ্চ ও শ্লথ মৃত্তিকা গঠিত হওয়া আবশ্যক, কেননা স্তূপ গঠনের উদ্দেশ্য যেন মৃত্তিকার মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। স্তূপগুলির মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীর এবং উপরে একটী চালা থাকিলে মৃত্তিকার মধ্যে অধিক পরিমাণে সোরা জন্মিয়া থাকে। বৃষ্টি-পাত দ্বারাও স্তূপগুলির মৃত্তিকা কিয়ৎপরিমাণে ধৌত হইয়া যাওয়া সম্ভব; তবে অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অধিক বৃষ্টি হওয়ার সম্ভব প্রায় নাই। চৈত্র মাসে সোরা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হইয়া দেড় মাস কাল পর্য্যন্ত কার্য্য চলিতে পারে। স্তূপগুলির মৃত্তিকা হইতে (অর্থাৎ, লোণা-মাটি হইতে) সোরা প্রস্তুত করিতে হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে যেরূপ পানীর জল একটী কলসীর উপর আর একটী কলসী রাখিয়া পরিস্কৃত করিয়া লওয়া হয়, সেইরূপ বন্দোবস্তে তিন তিনটী করিয়া কলসী সজ্জিত করিয়া-লোণা-মাটি হইতে সোরা মিশ্রিত পরিষ্কার জল বাহির করিয়া লওয়া হয়। উপস্থিত দুইটী কলসীর নিম্নে দুইটী ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যের কলসীটীর নিম্নে এক স্তর খড় বিছাইয়া উহার উপর নীল সিটির ক্ষার একস্তর বিস্তৃত করিয়া দিয়া, উপরে শ্লথ ভাবে লোণা-মাটি দ্বারা কলসীটী পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। সর্ব্বোপরিস্থ কলসীটীর মধ্যে পরিষ্কার জল পূর্ণ করিয়া দিয়া উহার নিম্নস্থ ছিদ্রটী দুই এক টুকরা খড় দ্বারা কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতে হয়। বিন্দু বিন্দু পরিষ্কার জল লোণা-মাটির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া ক্রমশঃ সর্ব্ব-নিম্নস্থ কলসীর মধ্যে সোরা-সংযুক্ত পতিত হয়। সর্ব্ব-নিম্ন কলসী গুলির জল মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া লইয়া অগ্নি সহযোগে উহাকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া দিয়া, জল-সংযুক্ত যবক্ষার বিশ্লিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। রৌদ্র-সহযোগে জল বাষ্পাকারে পরিণত হইতে অনেক সময় লাগে বলিয়া অগ্নির উপর লৌহ কটাহে করিয়া জল সিদ্ধ করিয়া, যেমন জলের মধ্যে কিছু সোরার দানা জমিয়া যায় অমনই ঝাঁজরি দ্বারা উহা ছাঁকিয়া লইয়া, ঐ কটাহ মধ্যেই ক্রমাগত সোরা-মিশ্রিত জল মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া যাইতে হয়। এইরূপে রাত্রি দিন সোরা-প্রস্তুত কার্য্য চলিয়া থাকে।

কটাহ গুলির ব্যাস প্রায় দুই ফুটের ন্যূন ও গভীরত্ব নয় ইঞ্চি হইয়া থাকে। জল সিদ্ধ হইতে হইতে দেখা যাইবে প্রথমে উহার উপর গাদ উত্থিত হইতেছে। এই গাদ মধ্যে মধ্যে ঝাঁজরি দ্বারা ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। ক্রমশঃ জল গাঢ় হইলে উহার নিম্নে সোরা জমিতে আরম্ভ করে। এই সোরা ছাঁকিয়া লইয়া কটাহে পুনরায় কিছু সোরা সংযুক্ত জল মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চুলা জ্বালাইয়া কার্য্য করিতে পারিলে প্রত্যেক কটাহ হইতে চারি হইতে আট

সের পর্য্যন্ত সোরা প্রস্তুত হয়। এই সোরা এককালীন বিলাতী সোরার ন্যায় পরিষ্কার কখনই হয় না; কিন্তু এই অবস্থাতেই ইহা হইতে এদেশে দেশী-বারুদ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং এই অবস্থাতেই এই সোরা বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে। মধ্যস্থিত কলসী হইতে যে জল নির্গত হয় উহার আস্বাদন এককালীন পরিষ্কার জলের ন্যায় অনুমিত হইলে, ঐ জল আর ফুটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় না।

পূর্ব্ব কথিত নিয়মে প্রস্তুত সোরা জমির সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবহার করিবার সময় ইহা মৃত্তিকা অথবা জল সহযোগেই যখন ব্যবহার করা উচিত, তখন লোণা-মাটি অথবা সোরা-মিশ্রিত জলাকারেই জমির সার ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এ কারণ সোরা প্রস্তুত অপেক্ষা লোণা-মাটির ভাঁটি মাত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ মাটি সারের জন্য ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রত্যেক কৃষকের আয়ত্ত-ভূক্ত। বিঘা প্রতি২০।২৫ঝুড়ি লোণা-মাটি ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এবং সোরা ব্যবহার দ্বারা যে সকল ক্ষতি হওয়া সম্ভব এই মাটি সাররূপে ব্যবহার দ্বারা সেরূপ কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

আমরা ক্রমাগত সুন্দর মৃত্তিকা সম্বন্ধে গুণাগুণ বিচার করিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাইতেছি এবং লোণা মাটির কোন উপকার আছে কিনা অনেকেই জানিতে চান। সে সকল পত্রের সংখ্যা বহুল সেইজন্য আমরা সরল কৃষিবিজ্ঞান ও অন্যত্র হইতে যাহা জানিয়াছি তাহা উপরের আলোচনায় সন্নিবেশ করিলাম।—কৃঃ সঃ

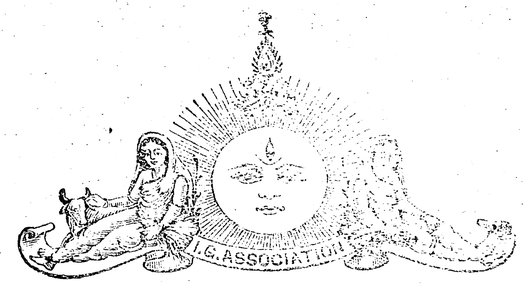

চৈত্র ১৩২৭ সাল।

বাংলায় কার্পাস চাষ

বর্ত্তমান সময়ে তুলা চাষে অনেকেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেকেই এখন চরকায় সুতাকাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার কথা ভাবিতেছেন। অনেকেই বুঝিলেন যে নিজের হাতের ষোল ছাড়িয়া দিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। আমাদের নগ্নতা নিবারণের জন্য আমাদিগকে সমুদ্র পারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়—ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! বড় বড় কল কারখানা অপেক্ষা কুচির শিল্পই ভারত ভূমির পক্ষে অধিক উপযোগী।

বড় কল কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ভারতের বাহিরে কাপড় রপ্তানির কথা এখন আমরা ভাবিতে পারিব না—কারখানা না হইলে তাহা সম্ভব হইবে না। কারখানা স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক আইন মানিয়া চলিতে হইবে, নানা বাণিজ্য কর ও শুল্কাদি দিতে হইবে। ভারতে এখনও অনেক ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও বিধবা আছে যাহাদের উপযুক্ত কায নাই, তাহাদের দ্বারা অনায়াসে সুতা কাটা কাপড় বোনার কাজ চলিতে পারে। তাঁতি, যোগী, জোলাগণের আবার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। মনে করিলে ভারতের ৩০ কোটী নরনারীর পরিধেয় আমরাই যোগাইতে পারি। ইহা কি কম লাভ? এত বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাইবে। তুলা উৎপন্ন করিয়া কাপড় বোনা পর্য্যন্ত কার্য্যে আমরা পরের মুখাপেক্ষী হইব না। আমরা চরকা ও তাঁতের উন্নতি করিয়া, ভগ্ন যন্ত্র পুনরায় মেরামত করিয়া লইয়া আমরা এখনই কাজে লাগিয়া যাইতে পারি।

বাঙলা দেশে তুলা চাষ বিস্তার কি পরিমাণ হইতে পারে এখন বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। লোকের মন দেশের দিকে, ঘরের দিকে ফিরিয়াছে; দেশময় সাবলম্বনে হাওয়া বহিতেছে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মীগণ এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন কি না জানা যায় নাই। হুজুগে পড়িয়া কাজ করিতে গিয়া পয়সার অপব্যবহার না হয় তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। কাজের সাফল্য চাই নতুবা শেষ রক্ষা হইবে না। আমরা বার বার ঠকিয়াছি এবার আমরা ঠকিব না এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। আমাদের ঘর গুছাইয়া লইতেই হইবে। অন্ন, ও বস্ত্রের সংস্থান আগে করিয়া তবে আমরা অন্য কথা ভাবিব।



কানপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উৎপাদিত মার্কিণ তুলার গাছ
(Cawnpore Acclimatized)

উচ্চ জমি না হইলে কার্পাস চাষ হইবে না। যাহাতে জল নিকাশি পরোনালার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে সেইরূপ জলি জমি ব্যতীত জলবসা জমিতে তুলার চাষ হইবে না।

সাধারণতঃ মুখ্য ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলের কতিপয় স্থানে তুলা অতি উৎকৃষ্ট রূপে জন্মাইয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় এই তুলা জন্মায় তাহার নাম 'কৃষ্ণবর্ণ তুলা জমি' (Black Cotton Soil)। তুলা চাষের জন্য ইহা আদর্শ জমি বলিয়া এস্থলে তাহার কতক বিবরণ প্রদান করা গেল। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে এই জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারক পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ অধিক মাত্রায় অঙ্গারক পদার্থ বর্ত্তমান থাকার জন্যই এই জমির বর্ণ,—কৃষ্ণ। অধিকন্তু পর্ব্বতের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা এই জমি গঠিত। অর্থাৎ পর্ব্বত গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর কণা বিচ্যুত হইয়া অঙ্গারক পদার্থ সহযোগে এই মৃত্তিকা গঠিত করিয়াছে। পর্ব্বত গাত্র সম্ভূত হইলেও এই জাতীয় জমি কঠিন অথবা বালুকাময় নহে। পরন্তু ইহা অনেকটা কর্দ্দমময়। ইহা অনেক পরিমাণে জল আকর্ষণ ও সংরক্ষণ করিতে পারে। অথচ বাড়তিজল বাহির হইয়া যায়। ইহাতে চুণের (Carbonate of lime) মাত্রা অধিক। আমাদের দেশে যে সমস্ত জমিতে ঘুটিং পাওয়া যায় তাহা যদি জল সংরক্ষণের উপযোগী হয় হইলে সে সমস্ত জমিতে কার্পাস চাষ মন্দ হয় না। মধ্য ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে তুলার জমিতে কম জল দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রথম বর্ষার জল পাইলে এই সমস্ত জমি এত অধিক পরিমাণে জল টানিয়া লয় ও সংরক্ষণ করে যে পরে উক্ত জমিতে অল্প পরিমাণ জল সেচন করিলেই কাজ চলে। বস্তুতঃ তুলার জমি একটু আল্‌গা হওয়া আবশ্যক। একবারে বেলে অথবা একবারে কর্দ্দমময় জমিতে চাষ করিলে তুলা ভাল হয় না। অঙ্গারক সার যুক্ত দোয়াঁশই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা। জমিও কিঞ্চিৎ গভীর হওয়া আবশ্যক। যে জমিতে বৎসরে ৩০ কথবা ৪০ ইঞ্চি বারি পাত হইয়া থাকে তাহাই কার্পাসের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বর্ষার পূর্ব্বেই জমিতে তিন চারি বার লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক। এই সময় জমি বেশ করিয়া চষিয়া বীজ বুনিবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়।

বপন প্রণালী—পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২—২½ সের বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হয়। তুলার বীজ তুলা সংশ্লিষ্ট থাকায় জলে ভিজিলেই কিম্বা শুষ্ক অবস্থায়ও বীজ সমস্ত জড়াইয়া যায়। সেই জন্য কাদা, গোবর ও জল একত্র মিশাইয়া তাহাতে সমস্ত বীজ মাখাইয়া লওয়া হয়। পরে শুষ্ক হইলে দড়ির খাটিয়া অথবা ঐরূপ অপর কোন দ্রব্যের উপর ঘষিয়া বীজ সমূহ বেশ করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহাতে বীজ গুলি পরস্পরের সহিত জড়াইয়া থাকে না এবং বুনিবারও সুবিধা হইয়া থাকে। ২½ হইতে ৩ ফিট্ অন্তরে দাঁড়া করিয়া তাহাতে বীজ উপযুক্ত ব্যবধানে বুনা হইয়া থাকে। অঙ্কুরাবস্থায় কোন রূপে নষ্ট হইলে বীজ পুনর্ব্বার রোপণ করা আবশ্যক। বর্ষার অধিক পূর্ব্বে বপন করিলে বীজ পুঁতিয়া জল দেওয়ার আবশ্যক হয়, কিন্তু বর্ষার সময় সাধারণতঃ বৃষ্টি হওয়ায় উক্ত রূপ পাইট আবশ্যক হয় না। তুলার ফসল পরিপক্ক হইতে ৫।৬ মাস কিম্বা ততোধিক সময় আবশ্যক হয় বলিয়া তুলা ক্ষেত্রে অন্য ফসলও বুনিতে পারা যায়। বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে তুলা ক্ষেত্রে ধান

চাষ হয়। ইহাতে তুলা উত্তমরূপ না জন্মাইলেও কৃষককে একবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু তুলাও ধানের পক্ষে এক রকম নিয়ম খাটে না। অধিক বৃষ্টি হইলে সাধারণতঃ তুলার ক্ষতি হয় কিন্তু ধানের সুবিধা হইয়া থাক। পক্ষান্তরে অল্প পরিমাণ বৃষ্টিতে তুলার গাছ ভাল হয়। ফলতঃ যে কোন ফসলই ভুলা ক্ষেত্রে বপন করা হউক না কেন তাহা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তুলা গাছ চারি পাঁচ মাস হইলে উহা উঠিয়া যায় এরূপ সময়ে উঠিয়া গেলে তুলা গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে পারে। ধান ব্যতীত ধনে, লঙ্কা, মৌরী, তিল, ছোলা অবহর প্রভৃতিরও তুলার সহিত চাষ হইয়া থাকে। তুলার দাঁড়ার মাঝে মাঝে এই সমস্ত গাছ বসান হয় এবং ফসল উঠিয়া গেলে জমি বেশ করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া হয়।

(বাঙলা দেশে তুলা চাষ করিতে হইলে পূর্ব্বোলিখিত জমি নির্ব্বাচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।)

তুলা বুনিবার প্রসস্তসময় দুইটি—প্রথমতঃ বর্ষার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় অথবা বর্ষার পর কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ। জ্যৈষ্ঠ,আষাঢ় মাসে যে ফসল বপন করা হয় তাহা কার্ত্তিক,অগ্রহায়ণ নাগাত পাকিয়া উঠে এবং ২য় আশ্বিন কার্ত্তিক মাস কার্ত্তিক মাসের ফসল বৈশাখ,জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। আগে বাঙলার যে আয়তন ছিল তাহার মধ্যে তুলা চাষের প্রধান প্রধান স্থলে অর্থাৎ সারণ, দ্বারবঙ্গ,কটক, মানভূম প্রভৃতি জেলায় উপরোক্ত উভয় সময়ই বীজ বপন করা হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় তুলার ফসল জলদি অর্থাৎ ৫।৬ মাসে পরিপক্ক হয়। নিম্নে ইহাদের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

সার অপেক্ষা চাষ—অনেক স্থলেই তুলার জমিতে কোন সার দেওয়া হয় না। কৃষিতত্ত্ববিৎ মলিসন সাহেব বলেন যে সার অপেক্ষা চাষ দ্বারা তুলার অধিক উপকার হয়। সার দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মত যে তুলার জমিতে চাষের সময় সার দেওয়াতে যে উপকার হইয়া থাকে পূর্ব্ব প্রদত্ত সার অথবা তাহার অবশিষ্টাংশ দ্বারা ততোধিক উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে তুলার জমিতে ভস্ম ও আবর্জ্জনা সার দেওয়া হয়। সার দেওয়া সব সময় অথবা সর্ব্বস্থলে লাভজনক না হইতে পারে সুতরাং একটু সারবান জমি দেখিয়াই তুলা চাষ করা প্রশস্ত। যে জমিতে পূর্ব্বে কোন ফসলের জন্য সার দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপ জমিতে তুলা বীজ বুনিলে তুলা মন্দ হয় না। বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে এক জমিতে বৎসর বৎসর তুলা চাষ করা অপেক্ষা জমি এক বৎবর পতিত রাখিয়া তৎপর বৎসর তুলা দিলে ফসল আরও ভাল হয়। জমি নিতান্ত সারহীন হইলে বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর সার দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বীজ বুনিবার অনেক পূর্ব্বে দেওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা না হইলে সার জমির সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত হয় না এবং উত্তমরূপ মিশ্রিত না হইলে তুলার বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু সকল সময় ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে সার অপেক্ষা চাষই তুলার পক্ষে অধিক উপকারী। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে এবং গাছ জন্মিবার পরেও যাহাতে ক্ষেত্রে কোন রূপে আগাছা না জন্মাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুলা চাষ,

অধিক না হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে জল প্রয়োগ আবশ্যক। মৃত্তিকা গভীর ভাবে কর্ষিত হইলে জল কম আবশ্যক হয়। অনেক সময় উত্তমরূপে কর্ষনের অভাবে তুলায় মূল শিকড় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অধিক দূর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে না। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে অধিক গরমের সময় মূল দ্বারা উপযুক্ত পরিমানে রস শোষিত না হওয়ায় পাতা ঝিমাইয়া পড়ে। পাতাগুলি ক্রমশঃ পাটকিলে বর্ণ হইয়া যায় এবং বোধ হয় যেন আগুণে পুড়িয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে গাছের কোন বিশেষ রোগের জন্য এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। শুদ্ধ গভীর কর্ষণের অভাবে এইরূপ হইয়া থাকে। তুলার জমিতে কত দিন অন্তর এবং কি পরিমাণে জল প্রয়োগ করিতে হয় এবং স্থান বিষেশ জল প্রয়োগ একবারে আবশ্যক হয় কি না, তৎ-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলিতে পারা যায় না। স্থান এবং বীজ বপনের সময় বিশেষে জলের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে

বীজ নির্ব্বাচন—আমরা আপাততঃ বাঙলা দেশে মানভূমের বুড়ী-কাপাস ও কানপুরী এমেরিকান ও ঢাকার গাছ কাপাস বা দেব কাপাসের চাষের পরীক্ষা করিতে বলি। আমরাও স্বক্ষেত্রে বহুবিধ কর্পাসের পরিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি পরীক্ষার ফল আমরা সকলকে পরে জানাইতে পারিব।

উপমুক্ত জমি নির্ব্বাচিত হইলে এক একরে (৩বিঘা ॥০কাঠা) ১৬০ পাউণ্ড হইতে ৩০০ পাউণ্ড সূত্র পাওয়া যাইবে। উহার মূল্য ৪০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৪ মণ হইতে ৬ মণ বীজ উৎপন্ন হইবে তাহার দাম ৬৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা। তুলা বীজ জীবাদির পুষ্টীকর খাদ্য। বাঙলা দেশে তুলার জন্য এক একর জমি চাষের খরচ ২৫৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকা। পর্য্যাপ্ত সারদিতে হইলে খরচ আরও কিছু অধিক হয়।

কাপাস চাষের উন্নতি—কাপাসের উন্নতি তিন প্রকারে হইয়া থাকে

১। সুচাষ।

২। বীজ নির্ব্বাচন।

৩। সাঙ্কর্য্যের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর কাপাস হইতে নূতন কাপাসের উৎপত্তি। কৃষি রসায়ন তত্ত্ববিদ ও উদ্ভিদ তত্ত্ববিদগণ কৃষকের সহায় হইলে ভারতে কাপাস চাষের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কাপাস সম্বন্ধে রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "কার্পাস চাষ" পুস্তক হইতে কতিপয় সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। উক্ত পুস্তক ও কাপাস প্রসঙ্গ কৃষক অফিসে পাওয়া যায়। ঠিকানা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা CO ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন।

কার্পাস আবাদীজমী—১৯০৪—৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মাত্র ৯০,০০০ একরে কার্পাস আবাদ করা হইয়াছিল; কিন্তু ১১ বৎসর পূর্ব্বে ২২৯,০০০ একর জমীতে কার্পাস জন্মিত। ১৯০৩—৪ সনে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৭,৫৮১, ৬৮৪ একর জমীতে কার্পাস আবাদ হইয়াছিল, দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ১৫,০০০,০০০ একর জমীতে কার্পাসের চাষ ছিল। বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড় ও সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, কার্পাস চাষ মোটের উপর অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জলবায়ু ও মৃত্তিকা—ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কার্পাস জন্মিতে পারে। অধিক বৃষ্টিপ্রাপ্ত প্রদেশে কার্পাস-সূত্র দৃঢ় হয় না; এই জন্য আসাম হইতে বঙ্গ এবং বঙ্গ হইতে বিহার ও ছোটনাগপুর কার্পাস চাষের অধিক উপযোগী। যেস্থলে বৎসরে ৩০—৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সেই স্থলেই উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে।



কানপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উৎপাদিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কার্পাস

দোআঁশ পলিমাটী কার্পাস চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গদেশে কার্পাস ক্ষেত্র হইতে জল নিকাশের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, সকল প্রকার মাটীতেই কার্পাস উৎপন্ন হয়।

জমির পাইট—নূতন পতিত জমীতে বর্ষার পরেই পাইট আরম্ভ করিতে হয়। পুরাতন চাষী জমীর পাইট ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আরম্ভ করা যাইতে পারে। চারি বা পাঁচবার লাঙ্গল করিলেই কার্পাসের জমী প্রস্তুত হয়। লাঙ্গল করিবার পর জমীতে মই দেওয়া উচিত।

শস্য পর্য্যায়—বহুদিন কোন ক্ষেত্রে একই ফসল উৎপন্ন করিলে, ইহা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও গুণেরও বিপর্য্যয় ঘটে। সুতরাং কার্পাসের পরে এক বৎসর কড়াই বা গম-যবের চাষ যুক্তিসঙ্গত।

সার প্রয়োগ—রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কার্পাস-সূত্র অতি অল্পমাত্রায় নাইট্রোজেন্, পটাস্ ও ফস্ফরিক্ এসিড গ্রহণ করে। যদি উৎপন্ন বীজ, খোসা পত্রাদি জমীতে প্রত্যর্পণ করা যায়, তবে কার্পাস ক্ষেত্রে অতি সামান্য মাত্রায়ই সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডালপালাদির সারভাগ শীঘ্র গ্রহণোপযোগী হয় না; সুতরাং কার্পাস ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে সার প্রয়োগের আবশ্যক হয়। অধিক গোবর ও উদ্ভিজ্জ সার প্রয়োগে কার্পাসের ডালপালারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বীজ বপন—চৈত্র হইতে বৈশাখ মাস কার্পাস-বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ছোটনাগপুর ও বেহারে আষাঢ় মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত বীজ বপন করা হয়। কোন কোন কার্পাস আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেও বপন করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে কার্পাস সংগ্রহ শেষ করিতে পারিলে, বর্ষাধিক্যহেতু কার্পাসের অপকৃষ্টতার প্রতিবন্ধ হইতে পারে।

কার্পাস বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করা যুক্তিসঙ্গত। একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর ব্যবধান ৩—৪ ফিট হওয়া উচিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে এক হইতে দেড় ফুট বপন বীজ রোপণ করিতে হয়। এক একর জমীতে প্রায় আট সের বীজের প্রয়োজন। গাছ কার্পাস ৬ হইতে ৮ ফিট অন্তর রোপণ করা বিধেয়। বঙ্গদেশে আইলের উপরে বীজ রোপণ প্রথা বিশেষ উপযোগী হইবে।

কার্পাসের শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে মকাই রোপণ করিলে, মকাই গাছ বর্ষার অতিরিক্ত জল শোষণ করিয়া লয়, তাহাতে কার্পাসের উপকার হয়, বলিয়া অনুমান হয়।

গাছের তদ্বির—কার্পাস বীজ দশ দিনে অঙ্কুরিত হয়। চারাগাছ ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে, ক্ষেত্র প্রথম খনন বা কর্ষন করিতে হইবে। প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ একবার খনন আবশ্যক। গাছে গোটা ধরিলে, আর কোন তদ্বির করিতে হইবে না।

কার্পাস সংগ্রহ—সাধারণতঃ তিনবারে ক্ষেত্রের সমস্ত কার্পাস সংগৃহীত করা যায়। অধিক উত্তাপের সময়ে কার্পাস সংগ্রহ করা উচিত নয়, কারণ তখন গোটার

খোসা শুষ্ক হইয়া কার্পাসের সহিত ভাগিয়া আসে। ইহাতে কার্পাসের মূল্য কমিয়া যায়। সারাদিন কাজ করিলে এক ব্যক্তি অন্ততঃ এক মণ বীজ কার্পাস সংগ্রহ করিতে পারে। ভাল মন্দ কার্পাস পৃথক পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

উৎপন্ন কার্পাসের পরিমাণ—প্রতি একরে ১৫০ পাউণ্ড হইতে ৩০০ পাউণ্ড কার্পাস সূত্র উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশীর বীজ-কার্পাস হইতে সাধারণতঃ এক চতুর্থ ভাগ সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বীজ ছড়ান—দেশীয় চরকী বা কেরকী দ্বারা উত্তমরূপে বীজ ছড়ান যায় না। উন্নত চরকী যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। ২০০—৩০০ টাকায় মার্কিন দেশীয় হস্তচালিত চরকীকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বীজ রক্ষা—মনোনীত গাছের প্রথম প্রথম প্রস্ফুটিত গোটা হইতে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। বীজ উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বায়ুবদ্ধ কলসিতে রাখিলে ইহা ভাল থাকে।

আয় ও ব্যয়—এক একর জমীর উৎপন্ন দেশীয় উত্তম কার্পাসের মূল্য প্রায় ৪০৲ টাকা। উৎপন্ন কার্পাসের পরিমাণ ১৫০ পাউণ্ডের অধিক হইলে আয়ও তদানুযায়ী অধিক হইবে। বাঙ্গালায় এক একর জমী চাষ করিতে, সার ব্যতীত, প্রায় ২৫৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

কার্পাসের ব্যাধি—লেদাপোকা ঝাঙ্গাপেকো প্রভৃতি পার্পাসের অনেক শত্রু আছে। বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ব্যাধির প্রতিকার হয়।

অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা বাঙলাদেশের ভাবের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছে আমরা দেখিতে পাই বিবাহ, অন্নপ্রাশন, দেবার্চ্চনায় ধান দুর্ব্বা, আই বুড়া মেয়ের হাতে কাটা সূতার আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মণ বিধবার হাতে কাটা সূতা না হইলে ব্রাহ্মণের উপনীত ধারণ করা হয় না। সুখে, দুঃখে আমরা চরকা ও ধ্যান্যাদি শস্যের কথা না ভুলি তাই এই ব্যবস্থা। বিবাহকার্য্যে ও অন্ন প্রাশনে ও উপনয়ন কার্য্যে তাঁতের মাকু স্থান পাইয়াছে। তথাপিও আমরা এই মৌলিক কথা গুলি ভুলিয়াছি ইহা বড় বিষম ভ্রম!—কৃঃ সঃ

ব্যাধির প্রতিকার জন্য "ফসলের পোকা" পুস্তকখানি দেখুন। উহা কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

স্বাধীন ব্যবসা—খেজুরের গুড় ও চিনি।

আমি এ প্রদেশে, —অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত খণ্ডে (C. P. and C. L.) প্রায় ৪২ বৎসর বাস করিতেছি। ওকালতী ব্যবসা করিতে করিতে আমি অভ্রত্য খেজুর বন হইতে কি পরিমাণে খেজুর-গুড় ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে তাহা স্থানে স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই বৎসর আশ্বিন মাস হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিয়া একটি কোম্পানি ইন্দোর রাজ্যে স্থাপন করিয়াছি। ইন্দোর সহরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে, নদীয়া জেলা হইতে ২৪ জন গাছী অর্থাৎ সিউলী আনাইয়া খেজুর গাছ হইতে গুড় ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিতেছি। মাঘ মাসের শেষ হইলেই ঐ গাছীরা দেশে ফিরিয়া যাইবে। তার পরে আমাদের কোম্পানির আকের চাষ ও নানা প্রকার কৃষিকার্য্যের কর্ম্ম চলিবে। প্রায় ২৫ বৎসর হইতে আমি এই প্রকারে যশোহর, ২৪ পরগণা, নদীয়া হইতে গাছী আনাইয়া স্বকীয় কার্য্য চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। তাহাতে আমার বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে; ও অনেক পরিশ্রম করিয়াছি। শেষ জীবনে ও বৃদ্ধাবস্থাতে স্বকীয় কর্ম্ম করিতে গেলে, যাহাতে আমার অবর্ত্তমানে আমার চেষ্টা, পরিশ্রম, ও বিস্তর খরচ ব্যর্থ না হয় সেইজন্য কোম্পানি স্থাপন করিয়াছি। গাছী লইয়া কেহ এখানে গুড় ও চিনি তৈয়ারী শিখিতে আসিলে অগ্রিম কাহাকেও আমরা কিছুমাত্র টাকা দিব না; বাসস্থান দিব, ও খাইবার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব; এবং যে পরিমাণে খেজুর গুড় আমরা পাইব তাহার মূল্য দিব। তাহাতে বেশ বলিতে পারি, প্রত্যেক গাছী ৪।৫ মাস এখানে থাকিয়া সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া নিদান পক্ষে ১০০ এক শত টাকা লাভ করিতে পারিবে। আর যে ভদ্রসন্তান গাছীদের দল আনিয়া আমাদের কোম্পানিভুক্ত হইয়া প্রতি বৎসর কার্য্য চালাইবেন তাঁহারাও ঐ গাছীদের উৎপন্ন ও আমদানি হইতে অংশ পাইবেন। কিছুদিন বাদে আমি কলিকাতাতে ও যশোহরে গিয়া সম্পূর্ণ আলোচনা করিব ও যাহারা এ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগের সহিত পাকা ব্যবস্থা করিতে পারিব।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—উকিল, খাণ্ডুয়া, সি, পি। প্রবাসী।

স্বাধীন ব্যবসা—দেশলাই।

ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় ২৫ বৎসর অদম্য উদ্যমের পর দেশলাই প্রস্তুতের কল আবিষ্কার করিয়াছেন। সমস্ত সাজসরঞ্জাম সমেত কলটির মূল্য দুই সহস্র টাকা মাত্র। একটি কলে প্রতিদিন আট গ্রোস বা ৯৬ ডজন দেশলাই প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলটিতে আরও একটি সুবিধা যে, কোন কাঠে কাজ চলিতে পারে, কিন্তু বিলাতী কলে তাহা চলে না। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার দেশলাই জাপান ও সুইডেন হইতে আমদানী হয়, আমাদের আশা আছে প্রতি জিলায় অন্ততঃ ২।৪টী দেশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। "দেশলাইটি পর্য্যন্ত আসে বিদেশ হ'তে কি লজ্জার কথা।—যশোহর।

বাগানের মাসিককার্য্য

চৈত্র মাস

সব্জীবাগান—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জল্‌দী ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিতে থাকে।

কৃষিক্ষেত্র—এমাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেতে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেতে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন জল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে কিন্তু নাবি ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান—শীতকালে বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল শীতেরও শেষ হইল গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, ন্যাষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জল্‌দি লিচু এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

বৈশাখ মাস

সব্জীবাগান—মাখম সীম, বরবটী লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারি বীজ জৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শসা বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা, ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারী পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ ইক্ষুর বা আখের টাক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেত্রে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুলবাগান—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারহাস, দোপাটী, গ্লোব আমরান্থাস, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াভায়াগুা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিবিয়া

ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী, ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরির্য্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি, গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আটিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সবগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা